জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত সচিত্র মাসিকপত্র

দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক সূচীপত্র

1971

চতুর্বিংশ বর্ষ ঃ জুলাই—ডিসেম্বর

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পি 23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-6

'পরিষদ ভবন'

ফোন ঃ 55-0660

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বর্ণানুক্রমিক ষাণ্মাসিক বিষয়সূচী

জুলাই হইতে ডিসেম্বর —1971

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষাণ্মাসিক লেখকসূচী

জুলাই হইতে ডিসেম্বর—1971

চিত্রসূচী

বিবিধ

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

চতুর্বিংশ বর্ষ | জুলাই, 1971 | সপ্তম সংখ্যা

[সম্প্রতি আমাদের দেশে কনজাংক্টিভাইটিস (চোখ-ওঠা) রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। এই রোগের কারণ, উপসর্গ ও প্রতিকার প্রভৃতি বিষয়ে জনসাধারণের মনে নানা রকম প্রশ্ন রয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে ঐ সব বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক। প্রঃ সঃ]

কনজাংক্টিভাইটিস

হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সম্প্রতি কলিকাতা শহরে কনজাংক্টিভাইটিস রোগটি ব্যাপক আকারে দেখা দিয়েছে। সাধারণতঃ যাকে আমরা চোখে ঠাণ্ডা লাগা বা চোখ-ওঠা বলে থাকি, তারই ডাক্তারী নাম কনজাংক্টিভাইটিস (Conjunctivitis)।

চোখ-ওঠা রোগটি প্রাচীন কাল থেকেই আছে এবং পৃথিবীব্যাপী এর প্রসার। সারা বছর ধরেই বিক্ষিপ্তভাবে এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। কিন্তু চোখ-ওঠা ব্যাপকভাবে মহামারী-রূপে কোথাও দেখা দেওয়া, বিশেষ করে কলকাতা

শহরে, পূর্বে কখনো ঘটেছে বলে শোনা যায় নি। তাছাড়া মহামারীরূপে যে সব রোগ মাঝে মাঝে দেখা যায়, সে তালিকার মধ্যেও চোখ-ওঠা রোগের নাম কোন দিন স্থান পায় নি। এবারে মহামারীরূপে দেখা দেওয়াটাই এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। হঠাৎ কয়েক দিনের মধ্যে শহর ও শহরতলীর লক্ষ লক্ষ লোক এই রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লো। অফিস, আদালত, রাস্তা প্রভৃতি সর্বত্রই দেখা যায় চোখ লাল অথবা কালো চশমায় চোখ ঢাকা। শহরবাসীর মুখে মুখে এই রোগের কারণ, প্রতিষেধন ও নিরাময়ের ঔষধ প্রভৃতি নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা এবং তর্কবিতর্ক প্রবল হয়ে উঠলো।

সাংবাদিকদের মতে, এই রোগটা নাকি মধ্য প্রাচ্য থেকে বোম্বাই এবং বোম্বাই থেকে কলকাতায় এসে উপস্থিত হয়েছে। রোগটি যে প্রবলভাবে সংক্রামক সে বিষয়ে দ্বিমত নেই।

চোখ-ওঠা বা কনজাংক্টিভাইটিস হলো কনজাংক্টিভার (Conjunctiva) জীবাণুঘটিত প্রদাহ। অক্ষিগোলকের অচ্ছোদপটল (Cornea) ছাড়া যে সাদা অংশটুকু দেখা যায়, সেই অংশটুকু এবং চোখের পাতার অভ্যন্তর ভাগ একটি স্বচ্ছ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর দ্বারা আস্তরের মত আবৃত থাকে। এই শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর নাম কনজাংক্টিভা এবং এরই প্রদাহকে কনজাংক্টিভাইটিস বলে। এই রোগের প্রধান লক্ষণ হলো, চোখ হঠাৎ লাল হয়ে ওঠে এবং চোখ থেকে ক্রমাগত জল পড়তে থাকে। এই জন্যে আয়ুর্বেদে এই রোগের নাম 'নেত্রাভিষ্যন্দ' (অভিষ্যন্দ অর্থাৎ ক্ষরণ বা বারি-প্রবাহ)। চোখ লাল হয়ে ওঠবার কারণ—কনজাংক্টিভার অভ্যন্তরে যে সূক্ষ্ম শিরা আছে, সেগুলির ভিতর দিয়ে অত্যধিক রক্ত চলাচল সুরু হওয়া। শিরা-ধমনীর স্ফীতির জন্যে চোখ করকর করে, মনে হয় যেন চোখে কিছু পড়েছে। সময়ে সময়ে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীই স্ফীত হয়ে ওঠে এবং কতকটা থলথলে মত দেখায়। এমন কি, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর ভিতর দিকে রক্তস্রাব (Conjunctival hæmorrhage) পর্যন্ত হতে দেখা যায়। এই রক্তক্ষরণ দূরীভূত হতে বেশ সময় লাগে। তবে এতে ভয় পাবার কিছু নেই। এতে স্থায়ী কোন ক্ষতি হয় না। রোগের প্রাবল্য অনুসারে চোখ থেকে নিঃসৃত জল গাঢ়তর হয়ে ক্রমশঃ পুঁজের মত এবং আঠালো হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় ঘুমাবার পর চোখের পাতা জুড়ে যায়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে লক্ষণগুলি গুরুতর ও বিশেষ কষ্টদায়ক হতে দেখা গেছে। এমন কি, কোন কোন ক্ষেত্রে শারীরিক অসুস্থতা, গা ম্যাজম্যাজ করা, জ্বরভাব প্রভৃতি লক্ষণও দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে সারবার পর আবার লক্ষণগুলি ফিরে আসে। কোন কোন ব্যক্তি রোগ সারবার পর কিছুদিন পর্যন্ত চোখে ঝাপসা দেখেন।

নানাপ্রকার জীবাণুর দ্বারাই কনজাংক্টিভাইটিস রোগ উৎপন্ন হয়। কক্-উইক্স ব্যাসিলাস (Koch weeks' bacillus), কক্কাই জাতীয় জীবাণু (Cocci), ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস (Influenza virus) প্রভৃতির দ্বারাই সাধারণতঃ এই রোগের সৃষ্টি হয়। এবারের মহামারী চোখ-ওঠার প্রকৃত দোষী জীবাণু এখনো নিশ্চিতরূপে নির্ণীত হয় নি। আপাততঃ অনুমান করা হচ্ছে, যে কোন ভাইরাসই এই রোগের কারণ।

আক্রান্ত ব্যক্তির চোখ থেকে নিঃসৃত জল ও পিচুটির মধ্যে দোষী জীবাণু বা ভাইরাস যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। এই জল বা পিচুটির মধ্যস্থিত জীবাণুগুলি হাওয়ায় সঞ্চালিত হয়ে অন্য কারোর চোখে বাসা বাঁধলে সে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়তে পারে। সংক্রমণের এই পন্থাটির কথা মনে রাখলে রোগবিস্তার প্রতিরোধ করা সহজ হয়। রোগাক্রান্ত ব্যক্তি নিজের চোখে হাত দিয়ে (যা সে প্রায়ই করতে বাধ্য হয়) চোখের জল বা পিচুটি যেখানে-সেখানে মোছে বা

দূষিত হাত রাখে (টেবিল, চেয়ার, খবরের কাগজ, বই, চশমা ইত্যাদি) এবং অপর কেউ যদি অনবধানতাবশতঃ ঐ সব জায়গায় হাত দেবার পর নিজের চোখে সেই হাত লাগায় তবে তারও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়বার সম্ভাবনা আছে। সে জন্যে আক্রান্ত ব্যক্তি যদি যখন-তখন চোখে হাত না দেয় এবং চোখের জলে ভেজা হাত যেখানে-সেখানে না মোছে, তাহলে রোগ বেশী ছড়াতে পারে না। কাজেই পরিষ্কার রুমাল বা ন্যাকড়া দিয়ে চোখ মুছে সেই ব্যবহৃত রুমাল বা ন্যাকড়া যেন নিরাপদ স্থানে ফেলে দেওয়া অথবা ভাল করে সাবান দিয়ে কেচে নেওয়া হয়—অবশ্য রুমাল বার বার বদলে ফেলা আরও ভাল।

যারা আক্রান্ত হয় নি, তাদেরও যথেষ্ট সাবধান হওয়া উচিত। যত দিন এই মহামারী চলতে থাকবে, ততদিন যখন-তখন কেউ যেন চোখে হাত না দেয়। যদি চোখে হাত দেবার প্রয়োজন হয়, তাহলে হাত ভাল করে ধুয়ে নেওয়া উচিত। এতদ্‌সত্ত্বেও হাওয়ায় সঞ্চালিত জীবাণু বা ভাইরাস সুস্থ চোখে বাসা বাঁধতে পারে। সেই জন্যে দিনে কয়েক বার করে পরিষ্কার জলের ঝাপ্‌টা দিয়ে চোখ ধুয়ে ফেলা নিরাপদ। সম্ভব হলে আই-ড্রপারে করে পরিস্রুত জল অথবা লবণ জল (Normal saline = 1 আউন্স জলে 1 চিমটি লবণ) দিয়ে ধুয়ে ফেললেও ভাল হয়। এক এক বারে দু-তিন ড্রপার ভর্তি জল দিয়ে ধুতে হবে। চোখ ধোয়ার জলে যেন কোন জীবাণুনাশক ঔষধ ব্যবহার না করা হয়। এই রোগের প্রসার প্রতিরোধ করতে হলে এই নিয়মগুলি প্রতিষেধক হিসাবে বিশেষ ফলপ্রসূ। এছাড়া এই রোগের যে ঔষধ ব্যবহার করা হয়, সেই ঔষধগুলি দিনে একবার কি দু-বার করে প্রতিটি চোখে এক ফোঁটা করে দিলেও ফলপ্রসূ হবে বলে অনুমান হয়।

এই রোগে নানাবিধ ঔষধ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। রৌপ্য ধাতুর নানা লবণ (Protargol, Argyrol), মার্কিউরোক্রোম, পেনিসিলিন, টেরামাইসিন, ক্লোর্যামফ্যানিকল, সালফাসেটামাইড প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শেষোক্ত ঔষধটি নিরাপদ এবং যথেষ্ট ফলপ্রসূ। এই প্রসঙ্গে সতর্ক করে দেওয়া সঙ্গত মনে করি যে, এই ঔষধগুলি যেন আপন মতে কেউ ব্যবহার না করে, সর্বদাই চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া উচিত। আপাতদৃষ্টিতে রোগটি মারাত্মক মনে হলেও জনসাধারণ যেন অনর্থক উদ্বিগ্ন বা চিন্তিত না হন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এই রোগ সপ্তাহ খানেকের মধ্যে নিরাময় হয়ে যায় এবং পরে কোন ক্ষয়-ক্ষতির লক্ষণ থাকে না।

নক্ষত্রের ব্যাস

গিরিজাচরণ ঘোষ

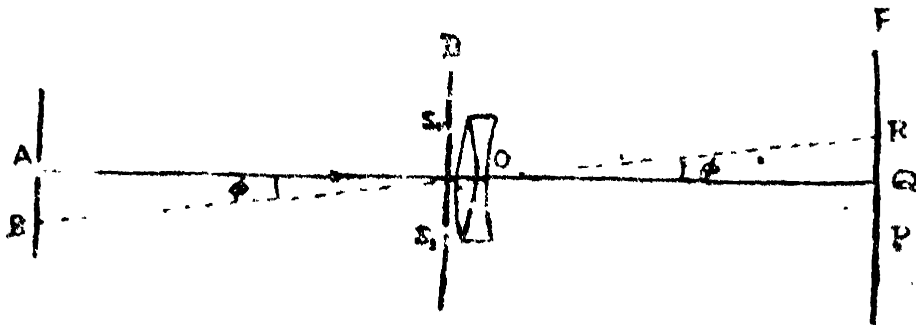
রাতের অন্ধকারে আকাশের দিকে তাকালে যে অসংখ্য নক্ষত্র আমাদের চোখে পড়ে সেগুলির প্রত্যেকটির ব্যাস কত, তা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও সঠিকভাবে জানবার কোন উপায় ছিল না। অনুমান করা হতো, ঐ নক্ষত্রগুলির ব্যাস আমাদের সূর্যের ব্যাসেরই সমান। আমাদের সূর্যের ব্যাস হলো 13 9 × 10⁵ কিলোমিটার বা 8642)0 মাইল। নক্ষত্রের ব্যাস পরিমাপের উপায় উদ্ভাবিত হবার পর দেখা গেল, আকাশে এমন অনেক নক্ষত্র রয়েছে, যাদের ব্যাস সূর্যের ব্যাসের চেয়ে বহুগুণ বড়। যেমন, বুটিস নক্ষত্রমণ্ডলীর অন্তর্গত স্বাতী নক্ষত্রের (Arclurus) ব্যাস হলো সূর্যের ব্যাসের সাতাশ গুণ, অর্থাৎ সাতাশটা সূর্য পাশাপাশি রাখলে স্বাতী নক্ষত্রের ব্যাস দাঁড়াবে। বৃষরাশির অন্তর্গত রোহিণী নক্ষত্রের (Aldebaran) ব্যাস হলো সূর্যের ব্যাসের আটত্রিশ গুণ। কালপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডলীর অন্তর্গত আর্দ্রা নক্ষত্রের (Betelgeuse) ব্যাস হলো সূর্যের ব্যাসের দু-শ' দশ গুণ। আর বৃশ্চিক রাশির অন্তর্গত জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের (Antares) ব্যাস হলো সূর্যের ব্যাসের সাড়ে চার-শ' গুণ অর্থাৎ এই নক্ষত্র পৃথিবীর কক্ষপথ সমেত আমাদের সূর্যকে অনায়াসে ঘিরে ফেলতে পারে।

নক্ষত্রের ব্যাস পরিমাপের পদ্ধতির কথা বিজ্ঞানী ফিজু (F.zeau) প্রথম জানান 1868 খৃষ্টাব্দে। পরে 1874 খৃষ্টাব্দে ষ্টীফান (Stephan) ফিজুর উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে নক্ষত্রের ব্যাস পরিমাপের চেষ্টা করেন। কিন্তু তখন নভো-দূরবীক্ষণ যন্ত্রের অভিলক্ষ্যের (Objective) পরিসর বেশী না থাকায় ষ্টীফান ঐ কাজে সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। 189) খৃষ্টাব্দে মাইকেলসন (Michelson) এই পদ্ধতিতে বৃহস্পতির উপগ্রহগুলির ব্যাস পরিমাপ করেন। পরে নভো-দূরবীক্ষণ যন্ত্রের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাওয়ায় ফলে নক্ষত্রের ব্যাস পরিমাপ করা সম্ভব হয়। তবে নক্ষত্রের ব্যাস সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয় বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে।

এখন ফিজু কর্তৃক উদ্ভাবিত নক্ষত্রের ব্যাস পরিমাপের পদ্ধতিটি কিরূপ, তা জানানো যেতে পারে। এই পদ্ধতিতে নভো-দূরবীক্ষণ যন্ত্রের অভিলক্ষ্যের সম্মুখে দ্বৈত চিড় (Double slit) ব্যবহার করে আলোর ব্যতিচারের (Interference) সাহায্যে নক্ষত্রগুলির ব্যাস পরিমাপ করা হয়। আলোর ব্যতিচার কাকে বলে, তা পূর্বে জানা প্রয়োজন। স্থির জলাশয়ে যদি একটা ঢিল ফেলা যায় তবে দেখা যাবে, ঐ জলে তরঙ্গ উঠছে। ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ঐ তরঙ্গের মধ্যে কোন অংশ জলের স্থির তলের কিছুটা উপরে রয়েছে এবং কোন অংশ স্থির তলের কিছুটা নীচে রয়েছে। তরঙ্গের যে অংশ স্থির তলের উপরে রয়েছে, তাকে বলা হয় তরঙ্গ-শীর্ষ (Crest) এবং যে অংশ স্থির তলের নীচে রয়েছে, তাকে বলা হয় তরঙ্গ-পাদ (Trough)। তরঙ্গ-শীর্ষ এবং তরঙ্গ-পাদের উত্থান-পতনেই ঢেউ এগিয়ে চলে। পর পর দুটি তরঙ্গ-শীর্ষের দূরত্বকে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য (Wave length) বলা হয়। এখন মনে করা যাক, কোন স্থির জলাশয়ে পাশাপাশি দুটি ঢিল ফেলা হলো। এই অবস্থায় নিক্ষেপিত দুটি ঢিল থেকেই তরঙ্গ উঠতে থাকবে। এখন লক্ষ্য করলে এমন কতকগুলি স্থান দেখা যাবে, যেখানে

একটির তরঙ্গ-শীর্ষ অপরটির তরঙ্গ-পাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে উত্থান-পতন রহিত অবস্থায় রয়ে গেছে। আবার এমন কতকগুলি স্থান দেখা যাবে, যেখানে একটির তরঙ্গ-শীর্ষ অপরটির তরঙ্গ-শীর্ষের উপর পড়েছে অথবা একটির তরঙ্গ পাদ অপরটির তরঙ্গ-পাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই অবস্থায় জলাশয়ের ঐ স্থানগুলির দ্বিগুণ উত্থান এবং দ্বিগুণ পতন পরিলক্ষিত হবে। একেই বলা হয় ব্যতিচার (Interference)। যেহেতু আলোও তরঙ্গের আকারে গমন করে, সেহেতু অনুরূপ দুটি বিন্দু আলোক-উৎস যদি পাশাপাশি রাখা যায়, তবে ওদের তরঙ্গের পারস্পরিক উপরিপাতের ফলে কোন কোন বিন্দু সম্পূর্ণ আলোকবিহীন অবস্থায় এবং কোন কোন বিন্দু দ্বিগুণ আলোকিত অবস্থায় দেখা যাবে অর্থাৎ উজ্জ্বল এবং অন্ধকার রেখার ঝালর (Fringe) সৃষ্টি হবে।

এবার ফিরে আসা যাক নক্ষত্রের ব্যাস পরিমাপের পদ্ধতিতে। মনে করা যাক, O হলো একটি নভো-দূরবীক্ষণ যন্ত্রের অভিলক্ষ্য (Objective), যার F হলো ফোকাস-তল (1নং চিত্র)। ঐ অভিলক্ষ্যের সম্মুখে D হলো একটি ঢাকনা, যার মধ্যে S_1 এবং S_2 হলো দুটি সমান্তরাল পরিবর্তনশীল সরু চিড় (Slit)। মনে করা যাক ঐ দূরবীক্ষণ যন্ত্রের অভিলক্ষ্যের সামনে বেশ খানিকটা দূরে একটা সোডিয়াম আলোক-উৎস রাখা হলো। একটা সরু চিড় A দিয়ে ঐ আলো গিয়ে পড়লো D ঢাক্নার S_1 এবং S_2 চিড়-এ। এখানে S_1 এবং S_2 দুটি অনুরূপ আলোক-উৎস (Coherent sources) হিসেবে কাজ করবে, ফলে দূরবীক্ষণের F ফোকাস-তলে ওদের ব্যতিচার পরিলক্ষিত হবে। যেহেতু Q হলো S_1 এবং S_2 থেকে সমান দূরবর্তী, সেহেতু উভয় আলোক-উৎস থেকে আগত তরঙ্গের তরঙ্গ-শীর্ষ (অথবা তরঙ্গ-পাদ) ঐ Q বিন্দুতে মিলিত হবে এবং ঐ স্থানে একটি উজ্জ্বল আলোক-রেখার সৃষ্টি হবে। যদি Q-এর পার্শ্ববর্তী R এবং P স্থানে S_1 এবং S_2 উৎস দুটি থেকে আগত তরঙ্গদ্বয়ের একটির তরঙ্গ-শীর্ষ অপরটির তরঙ্গ-পাদের সঙ্গে মিলিত হয়, তবে ঐ R এবং P স্থান দুটিতে অন্ধকার রেখার সৃষ্টি হবে। এইভাবে F ফোকাস-তলে পর পর উজ্জ্বল এবং অন্ধকার রেখা সমন্বিত ঝালর দেখা যাবে। এখন মনে করা যাক, আলোক-উৎসের চিড়টি A স্থানে না রেখে B স্থানে স্থাপন করা হলো। এই অবস্থায় দূরবীক্ষণ যন্ত্রের F ফোকাস-তলে উজ্জ্বল রেখাটি Q স্থানের পরিবর্তে R স্থানে সৃষ্ট হবে এবং Q স্থানে সৃষ্টি হবে অন্ধকার রেখাটি। এবার মনে করা যাক, A এবং B উভয় স্থানেই আলোক-উৎসের দুটি চিড় রাখা হলো। এখন F ফোকাস-তলে একটি উৎসের জন্যে যেখানে অন্ধকার রেখা সৃষ্টি হবে, অপর উৎসের জন্যে সেখানে সৃষ্টি হবে উজ্জ্বল রেখা। ফলে F ফোকাস-তলে আর ঝালর দেখা যাবে



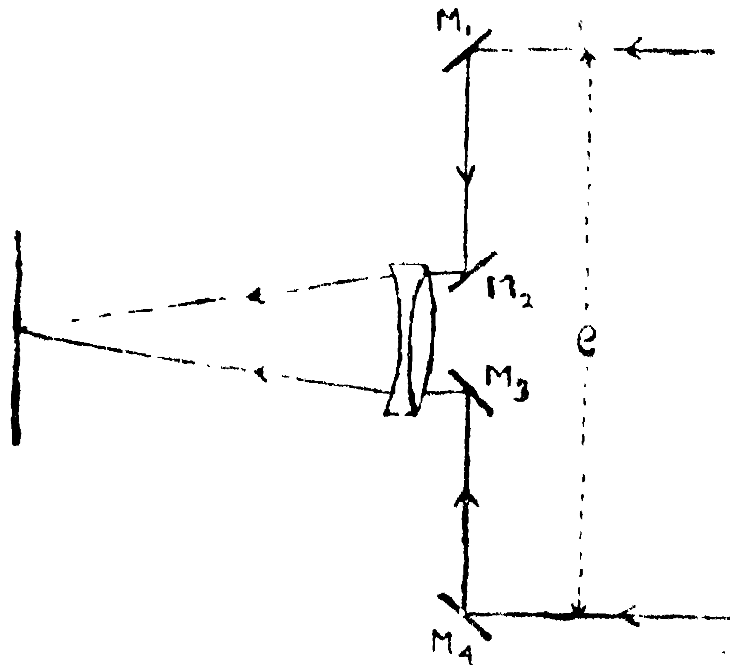
1নং চিত্র

না। ঐ ফোকাস-তল তখন সমভাবে আলোকিত অবস্থায় দেখা যাবে।

যদি AB দূরত্বটুকু অভিলক্ষ্যের O বিন্দুতে ϕ কোণ সৃষ্টি করে, তবে সাধারণ জ্যামিতির সাহায্যে প্রমাণ করা যাবে $\phi = \frac{\lambda}{2a}$, যেখানে λ হলো আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য এবং a হলো S_1 এবং S_2 চিড় দুটির দূরত্ব।

এখন একটা পরীক্ষা করা যেতে পারে। S_1 এবং S_2 চিড় দুটির দূরত্ব (অর্থাৎ a) স্থির রেখে আলোক-উৎসের চিড়টি A থেকে B এর দিকে ধীরে ধীরে প্রসারিত করা হতে লাগলো। এই অবস্থায় ঐ চিড়টিকে অসংখ্য চিড়ের সমষ্টি বলে গণ্য করা হবে। ফলে প্রতিটি চিড়-এর জন্যে F মনে রাখতে হবে, এক্ষেত্রে AB-এর দূরত্ব খুবই সামান্য।

এবার মনে করা যাক, আলোক-উৎসের ফাঁক AB স্থির রাখা হলো, অর্থাৎ ϕ এর মান নির্দিষ্ট রইলো। উপরের সমীকরণ থেকে দেখা যাচ্ছে ϕ-এর মান a-এর মানের উপর নির্ভরশীল। ϕ-এর মান কম হলে a-এর মান বাড়াতে হবে। সুতরাং ϕ-এর মান নির্দিষ্ট থাকলে a-র মান অর্থাৎ S_1 এবং S_2 চিড় দুটির দূরত্ব হ্রাস-বৃদ্ধি করে F ফোকাস-তলের ঝালর সম্পূর্ণ অদৃশ্য করা যায়। তবে মনে রাখতে হবে, ϕ-এর মান $\frac{3\lambda}{2a}$, $\frac{5\lambda}{2a}$, ...ইত্যাদির জন্যেও ঝালর সম্পূর্ণ অদৃশ্য হবে। কাজেই a-র যে সর্বনিম্ন মানের



2নং চিত্র

ফোকাস-তলে পাশাপাশি অসংখ্য ঝালর সৃষ্টি হতে থাকবে, অর্থাৎ F ফোকাস-তলের ঝালর অস্পষ্ট হতে থাকবে। উৎসের চিড়টি যখন A থেকে B পর্যন্ত সম্পূর্ণ প্রসারিত হবে, তখন ফোকাস-তলের ঝালর সম্পূর্ণ অদৃশ্য হবে। তবে জন্যে ঐ ঝালর অদৃশ্য হবে, তাই গ্রহণ করতে হবে। আর একটি কথা, AB উৎসটি যদি চিড়-এর পরিবর্তে একটি বৃত্তাকার আলোক-উৎস হয়, তবে বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ঐ বৃত্তের কৌণিক ব্যাস $\phi = 1.22\frac{\lambda}{a}$ হবে।

এখন AB-কে যদি দূরবর্তী কোন নক্ষত্রের ব্যাস হিসেবে ধরা হয়, তবে তার কৌণিক ব্যাস ϕ-এর মান উপরিউক্ত সমীকরণের সাহায্যে নির্ণয় করা যাবে। যদি ঐ নক্ষত্রের দূরত্ব D জানা থাকে তবে ঐ নক্ষত্রের রৈখিক ব্যাস $d = D\phi$ হবে।

সাধারণতঃ স্থির নক্ষত্রগুলির কৌণিক ব্যাস 0·01 সেকেণ্ড কোণের মাপকাঠি অনুসারে পাওয়া যায়। ফলে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের অভিলক্ষ্যের পরিসর বেশী হওয়া একান্ত প্রয়োজন। পরিসর বেশী করার উদ্দেশ্য মাইকেলসন উপরিউক্ত পদ্ধতির কিছুটা পরিবর্তন (Modification) করেন। তিনি তাঁর পরিবর্তিত পদ্ধতিতে চারটি দর্পণ M_1, M_2, M_3 এবং M_4 একটি ফ্রেমের উপর স্থাপন করেন (2নং চিত্র) এবং তার সঙ্গে যুক্ত করেন একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র। দূরবর্তী নক্ষত্র থেকে আগত আলো M_1 এবং M_4 দর্পণে প্রথমে আপতিত হয়, পরে সেগুলি M_2 এবং M_3 দর্পণে প্রতিফলিত হয়ে দূরবীক্ষণের অভিনেত্রে (Eye-piece) গিয়ে পড়ে। M_1 এবং M_4 দর্পণ দুটির পারস্পরিক দূরত্ব ইচ্ছামত পরিবর্তন করা যায়। যদি উক্ত দর্পণ দুটির দূরত্ব হয় e, তবে নক্ষত্রের কৌণিক ব্যাস $\phi = 1.22 \frac{\lambda}{e}$ রেডিয়াস।

মাইকেলসন কালপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডলীর অন্তর্গত আর্দ্রা নক্ষত্রের ব্যাস পরিমাপের সময় $e = 121''$ দেখলেন। যদি $\lambda = 5750$ A. U. হয়, তবে আর্দ্রার কৌণিক ব্যাস $\phi = 0{\cdot}047''$।

শুধু আর্দ্রা নয়, পরে এই পদ্ধতিতে বহু নক্ষত্রের ব্যাস পরিমাপ করা সম্ভব হয়েছে। নক্ষত্রের ব্যাস পরিমাপের আর একটি পদ্ধতি চালু আছে। নক্ষত্রের বর্ণালী থেকে তার তাপের পরিমাণ জানা যায়। তার ফলে নক্ষত্রের এক বর্গ সেন্টিমিটার থেকে বিচ্ছুরিত দীপ্তির পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। এই অবস্থায় যদি ঐ নক্ষত্রের দূরত্ব এবং দৃষ্টিগত ঔজ্জ্বল্য জানা থাকে, তবে ঐ নক্ষত্রের উপরিতলের বিকিরণের পরিমাণ নির্ণয় করে ঐ নক্ষত্রের উপরিতলের ক্ষেত্রফল পরিমাপ করা যায় এবং তা থেকে নির্ণয় করা হয় নক্ষত্রের ব্যাস।

কীটনাশক মাটি

প্রশান্ত মৈত্র*

সৃষ্টির আদি থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে ধূলা, বালি, মাটি, পাথর, কার্বন ইত্যাদি উদ্ভিদ ও জীব জগতের অভ্যুদয়ে ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে আসছে। কীট-পতঙ্গের বিকাশের ক্ষেত্রে মাটির যে অবদান, কীট-পতঙ্গ ধ্বংসের ক্ষেত্রে বিপরীত কি গুণ সে অর্জন করতে পারে, তাই আজ আমাদের বিচার্য। তার আগে সংক্ষেপে বলি মাটি (Clay) কি?

পার্থিব পদার্থ দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত—জৈব ও অজৈব। প্রাণী, উদ্ভিদ ইত্যাদি জৈব পদার্থের দ্বারা গঠিত। পাহাড়-পর্বত, পাথর, বালি ইত্যাদি অজৈব গোষ্ঠীভুক্ত। পাহাড়, পাথর ইত্যাদির অন্তর্গত অ্যালুমিনিয়াম ও সিলিকন যৌগ জল-বায়ু ও আবহাওয়ার দ্বারা রাসায়নিক উপায়ে পরিবর্তিত ও বিশ্লেষিত হয়ে এক নূতন যৌগিক পদার্থে পরিণত হয়, যাকে আমরা মাটি বলে জানি। মাটির বড় গুণ হলো—অল্প জল মিশ্রিত করলে নমনীয়তা আসা।

খনিজ পদার্থ, কার্বন বা অঙ্গার, ধূলা এবং মাটি—এই জাতীয় কয়েকটি পদার্থ রাসায়নিক সংযোগে কীটনাশকে পরিণত হয়। ময়দার পোকার (Trileolium castaneum) উপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, একমাত্র রাসায়নিক পদার্থমিশ্রিত মাটি ও কার্বনে কীটনাশক গুণাগুণ বেশী এবং অ্যাসিডমিশ্রিত চীনামাটি (Kaolin) এত ভাল ফল দেয় যে, ডি. ডি. টি-র সঙ্গে তুলনীয়।

বিভিন্ন জাতীয় মাটি, কার্বন ইত্যাদি নিয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ চাপ, তাপ ও সময়ে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় হাইড্রোক্লোরিক বা সালফিউরিক অ্যাসিড মিশ্রিত করা হয়। তাতে মাটি বা ঐ পদার্থের অনেক গুণ লক্ষ্য করা যায়, যেমন কীটনাশকতা, আর্দ্রতাশোষণ ইত্যাদি।

পরীক্ষাগারে কাচের আধারে 24 ঘণ্টা ধরে শতকরা 60 ভাগ আর্দ্রতায় এবং 80° ফারেনহাইট তাপে কীটের (Insect pest) উপর এই জাতীয় মাটি বা পদার্থের পরীক্ষা করা হয়েছে। ফলাফলস্বরূপ মৃত্যুর শতকরা হিসাব বের করা হয়। নিম্নে কয়েকটি দেখান হলো।

কীটনাশক মাটি বা দ্রব্য	মৃত্যুর শতকরা হার
(1) বালি (Sand)	55
(2) কাঠের ছাই (Wood ash)	7
(3) গোবরের ছাই (Dung ash)	16
(4) তুষের ছাই (Paddy husk ash)	58
(5) নারকেল খোসার ছাই (Cocoanut shell carbon)	100
(6) অঙ্গার (Carbon)	100
(7) মাটি (Earth)	83

অ্যাসিডমিশ্রিত এই জাতীয় মাটিকে আমরা 'রূপান্তরিত মাটি' আখ্যা দিতে পারি। রূপান্তরিত মাটি বা ধূলা শস্যের সঙ্গে মিশিয়ে এবং উপযোগিতা দেখবার জন্যে বিশেষ করে এক ধরণের কীট-পতঙ্গ ধ্বংসকারী জীবাণুর (Baclius thuringiensis) সঙ্গে মিশিয়ে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং সংরক্ষণাগারের খাদ্যশস্যের বস্তার প্রতি বর্গফুটে 250 গ্র্যাম করে ছিটিয়ে দেখা গেছে যে, 4 মাস পর্যন্ত কীট-পতঙ্গ (যেমন চালের পোকা,

*পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংরক্ষণাগার সংস্থা, 45, গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-13

ময়দার পোকা, মথ) ঐ খাদ্যশস্য আক্রমণ করতে পারে না। বিভিন্ন তাপ ও আর্দ্রতায় কীট-পতঙ্গের উপর এই মাটির ফলাফল নিয়ে পরীক্ষা চলছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে কাঁচা মাটি সংগ্রহ করে অ্যাসিড প্রক্রিয়ায় তাদের কীটনাশক হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছে। সমস্ত ধরণের মাটির ভিতরে চীনামাটিজাতীয় মাটি এই কাজে সর্বাপেক্ষা ফলপ্রদ। আর্দ্রতা শোষণ, ব্লীচিং ক্ষমতাও এর অনেক বেশী।

কেন্দ্রীয় খাদ্য গবেষণাগারে (মহীশূর) এই জাতীয় এক ধরণের মাটিকে কীটনাশক হিসাবে তৈরি করবার প্রণালী বের করা হয়েছে। এখানে তার সংক্ষিপ্ত পরিকল্পনা দেয়া হলো।

মাটি পেষাইকরণ → সালফিউরিক অ্যাসিড যুক্তকরণ → পাথরের পাত্রে মিশ্রিতকরণ [6 ঘণ্টা ধরে প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে 3 পাউণ্ড চাপে] → ধৌতকরণ → রৌদ্রে শুষ্ককরণ → গরম বায়ুতে শুষ্ককরণ [3 ঘণ্টা ধরে 110° সেণ্টিগ্রেড তাপে] → চূর্ণকরণ → তাপ প্রয়োগ।

এখন দেখা যাক রূপান্তরিত মাটি কীট-পতঙ্গের উপর কিভাবে কাজ করে। মাটিকে এইভাবে রাসায়নিকের দ্বারা রূপান্তরিত করলে তার আর্দ্রতা শোষণ করবার ক্ষমতা ভয়ানকভাবে বৃদ্ধি পায়। কীট-পতঙ্গ সংরক্ষণাগারের বস্তার উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় তাদের বহিস্ত্বকে (Cuticle) এই মাটি লেগে বহিস্ত্বকের তৈলাক্ত পদার্থ নষ্ট হয় এবং ধীরে ধীরে এই মাটি কীট-পতঙ্গের শারীরিক আর্দ্রতা (Moisture) শোষণ করে এবং শুষ্কতা-হেতু তাদের বিনাশ হয়। আবহাওয়ার আর্দ্রতা শোষণ করতে করতে অবশ্য কীটনাশকতার গুণ কিছু কমে গেলেও সম্পূর্ণ নষ্ট হয় না। এই প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত মাটি কীট-পতঙ্গ ধ্বংস করে বলে তারা স্ব স্ব প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে পারে না।

শারীরিক আর্দ্রতাহীনতার জন্যে ময়দার পোকার মৃত্যুর হার এখানে দেখানো হলো। আর্দ্রতা শতকরা 75 ভাগ ও তাপমাত্রা 78° ফারেনহাইট।

পরীক্ষাকালের সময় (Exposure)	ওজন হ্রাস (শতকরা হিসাব) শারীরিক (Weight loss)	মৃত্যুর হার (শতকরা হিসাব)
4 ঘণ্টা পরে	5·33	0·0
16 ঘণ্টা পরে	23·30	69·0
24 ঘণ্টা পরে	35·22	100·0

সংরক্ষণাগারের খাদ্যশস্যের বস্তায় রূপান্তরিত মাটি ছিটিয়ে দেখা গেছে যে, চালের পোকা, ময়দার পোকা ও খাপ্‌রার ক্ষেত্রে খুব ভাল ফল দেয়। Bacillus thuringiensis নামক জীবাণু মিশিয়ে এই মাটি প্রয়োগ করে দেখা গেছে যে, মথের আক্রমণ থেকে খাদ্যশস্য রক্ষা পায়। তাছাড়া, রবিশস্য, ঔষধ, কফি ইত্যাদির কীট-পতঙ্গের ক্ষেত্রেও এই মাটি ভাল ফল দেয়।

রূপান্তরিত মাটি কীট-পতঙ্গের আক্রমণ থেকে খাদ্যশস্যকে দীর্ঘদিন অক্ষত অবস্থায় রাখে এবং বিশেষ করে বীজ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ভাল ফল দেয়। ফসল কেটে শুকিয়ে নেবার পর তাতে যদি এই মাটি প্রয়োগ করা হয়, তবে শস্য দীর্ঘ দিন ভাল থাকে।

রূপান্তরিত মাটি সংরক্ষণাগার ছাড়াও গৃহে ব্যবহার করা যায়। শস্যদানা ঝেড়ে ঢেলে পরিষ্কার করতে হবে, যাতে ধুলা, বালি, খড়-কুটা বা ধানের তুষ না থাকে। এইবার ওই মাটি শস্যে ঢেলে দিয়ে পাত্রটিকে ঝাঁকিয়ে ও নাড়া-চড়া করে শস্য দানার সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। শস্যের পরিমাণ বেশী হলে ঐ প্রক্রিয়ায় ভাগ ভাগ করে মেশাতে হবে। এই মাটি-মিশ্রিত শস্যদানা দীর্ঘদিন কীট-পতঙ্গের কবল থেকে রক্ষা পায়। তবে আটা ময়দাজাতীয় পেষাই করা খাদ্যে এই মাটি মেশানো চলবে না।

[প্রবন্ধটির জন্যে C.F.T.R.I, Mysore-এর [illegible] । —লেখক]

শ্রবণোত্তর শব্দ

সন্তোষকুমার ঘোড়ই

বস্তুর কম্পনই শব্দ সৃষ্টির মূল কারণ। বস্তুর কম্পনজাত তরঙ্গ কানের পর্দায় আঘাত করলে শব্দ শ্রুতিগোচর হয়। তাই বলে সমস্ত কম্পনই শব্দের অনুভূতি জন্মায় না। কম্পনের দ্রুততা বা কম্পনাঙ্কের উপর তা নির্ভর করে। সেকেণ্ডে কম্পনের সংখ্যা কমপক্ষে 20 ও অনধিক প্রায় 20,000 হলে আমরা সাধারণতঃ শব্দ শুনতে পাই। কম্পনাঙ্কের এই সীমানাকে শ্রাব্যতা সীমা বলে। অবশ্য এই সীমা ব্যক্তিবিশেষে কিছুটা পরিবর্তিত হয়। সেকেণ্ডে 20,000-এর উপর কম্পন হলে তাকে আলট্রাসোনিক বা শ্রবণোত্তর কম্পন বলা হয়। শ্রবণোত্তর কম্পন যে তরঙ্গের সৃষ্টি করে, তাকে বলা হয় শ্রবণোত্তর তরঙ্গ। শ্রবণোত্তর কম্পন আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রে কোন অনুভূতি জন্মায় না, সুতরাং তা নীরব তরঙ্গই সৃষ্টি করে। সাধারণ ফড়িং বা ঝিঁঝি পোকার শব্দ শ্রাব্যতার উঁচু সীমানা—সেকেণ্ডে 20,000 কম্পনের কাছাকাছি থাকে অর্থাৎ সরব ও নীরব তরঙ্গের সীমানারেখায়। তাই দেখা যায় আমরা যে ফড়িঙের শব্দ শুনি, অনেকে বিশেষতঃ বয়স্ক ব্যক্তিরা সাধারণতঃ তা শুনতে পান না।

পরীক্ষায় দেখা গেছে কুকুর কম শ্রবণোত্তর কম্পনাঙ্কে সাড়া দিতে পারে, আবার অনেক পাখীর ডাকও 50,000 কম্পনাঙ্ক ছাড়িয়ে যায়। ফড়িং ও ঝিঁঝি পোকার পায়ে শ্রবণেন্দ্রিয় থাকে এবং তা দিয়ে তারা উচ্চ কম্পনাঙ্কের ধ্বনি শুনতে পায়। বাদুড় ডানা দিয়ে প্রায় 30,000 থেকে 50,000 কম্পনাঙ্কের তরঙ্গ সৃষ্টি করে এবং প্রতিবন্ধক থেকে এই তরঙ্গের প্রতিধ্বনির অনুভূতি লাভ করে সহজে পথ চিনে চলতে পারে। অনেক সামুদ্রিক মাছ ও কয়েক জাতীয় প্রাণীও শ্রবণোত্তর তরঙ্গ দিয়ে দূরের স্বজাতীয়দের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। স্তন্যপায়ী কুব্জপৃষ্ঠ তিমি মাছও নাকি সেতারের তানের মত গান করে এবং এই শব্দের সঙ্গে শ্রবণোত্তর শব্দও মেশানো আছে। সমুদ্রের কোন কোন স্তরে এই শব্দ সহজে হাজার হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে।

সাধারণ শব্দ-তরঙ্গের মত শ্রবণোত্তর তরঙ্গেরও বাহন হিসেবে বাস্তব মাধ্যম অপরিহার্য। প্রায় যে কোন স্থিতিস্থাপক বস্তুর দ্বারা শ্রবণোত্তর তরঙ্গ প্রবাহিত হতে পারে। কম্পনাঙ্ক বেশী বলে শ্রবণোত্তর তরঙ্গের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য খুব কম। সাধারণতঃ শ্রবণোত্তর কম্পনের উঁচু সীমার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য 10^{-4} সে. মি. অথচ শ্রুতিগোচর শব্দের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য প্রায় 30 সে. মি.। আজ পর্যন্ত পাওয়া সবচেয়ে বেশী শ্রবণোত্তর কম্পনাঙ্ক হলো সেকেণ্ডে 10^{11} কম্পন। শ্রবণোত্তর তরঙ্গের প্রবাহ মাধ্যমের সান্দ্রতা (Viscocity), তাপ পরিবাহিতাঙ্ক, নির্দিষ্ট আয়তনে আপেক্ষিক তাপ এবং দুই আপেক্ষিক তাপের অনুপাতের উপর নির্ভর করে। আবার শ্রুতিগোচর শব্দ-তরঙ্গের মত রুদ্ধতাপ অবস্থায় (Adiabatic condition) এই তরঙ্গ প্রবাহিত হয় এবং তা আলোর মত প্রতিফলিত, প্রতিসরিত, ব্যতিচারিত ও ব্যবর্তিত হয়। বিশোষণের (Absorption) ক্ষেত্রে শ্রবণোত্তর শব্দের আচরণ একটু ভিন্ন প্রকৃতির। নানান উপায়ে এই বিশোষণ পরিমাপ করা যায়। বিশোষিত শব্দশক্তি মাধ্যমের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে। বিশোষণের দ্বারা

কোন মাধ্যমের চলমান অবস্থার তাপীয় ও যান্ত্রিক ধর্মের খবরাখবর পাওয়া যায়।

শ্রবণোত্তর শব্দ সৃষ্টির উপায়

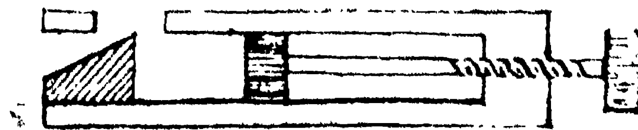
নানা উপায়ে এই শব্দ-তরঙ্গ সৃষ্টি করা যায়।

1. যান্ত্রিক উপায়ে কম্পন সৃষ্টি

যেহেতু শ্রুতিগোচর শব্দ ও শ্রবণোত্তর শব্দের মধ্যে পার্থক্য হলো শুধু কম্পনাঙ্কের, সুতরাং সুর সৃষ্টিকারী সুরশলাকা, বার্টমেন হুইসেল, গ্যালটন হুইসেল কিংবা কম্পমান কাচের বা ধাতুর দণ্ডও শ্রবণোত্তর কম্পান সৃষ্টি করতে পারে। সুরশলাকার কম্পন শলাকার দৈর্ঘ্যের বর্গের ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয়। সুতরাং খুব কম দৈর্ঘ্যের অর্থাৎ প্রায় কয়েক মিলিমিটার দৈর্ঘ্যের সুরশলাকার দ্বারা শ্রবণোত্তর কম্পন সৃষ্টি করা যায়। চার্লস-ডারউইনের সম্পর্কিত এক ভাই গ্যালটনের তৈরি হুইসেল দিয়ে সৃষ্ট শব্দ শ্রাব্যতা সীমা ছাড়িয়ে যায়। এই হুইসেলটি 6 সে. মি. দৈর্ঘ্য ও ·5 সে. মি. ব্যাসার্ধবিশিষ্ট একটি পিতলের চোঙ বিশেষ (1নং চিত্র)।

2. বস্তুর চৌম্বক ধর্মীয় পরিবর্তনের দ্বারা কম্পন সৃষ্টি (Magnetostrictive oscillator)

যদি কোন অয়শ্চৌম্বক (Ferromagnetic) পদার্থের তৈরি দণ্ড চুম্বকত্ব পায়, তাহলে তার দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন ঘটে। এই ঘটনাকে ম্যাগ্নেটোষ্ট্রিকশন (Magnetostriction) বলে। অন্যভাবে বলা যায়—যদি কোন চুম্বকত্বপ্রাপ্ত দণ্ডের দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন করা যায়, তাহলে তার চুম্বকের পরিমাত্রা পরিবর্তিত হবে। অয়শ্চৌম্বক পদার্থের এই দুটি ধর্মকে কাজে লাগিয়ে স্থিতিশীল শ্রবণোত্তর কম্পন সৃষ্টি করা হয়। বস্তুর আকৃতির পরিবর্তন নির্ভর করবে স্থায়ী চৌম্বকাবেশ রেখাগুচ্ছের ঘনত্ব (Mag. Flux density) এবং তার পরিবর্তনের উপর। [$\Delta L = K.\ B.\ dB$;] ΔL আকৃতির পরিবর্তন, B→ চৌম্বকাবেশ রেখাগুচ্ছের ঘনত্ব, ΔB = Bএর পরিবর্তন, K-ধ্রুবক। 2নং ছবিতে অয়শ্চৌম্বকের উপরিলিখিত ধর্মের ব্যবহার করে শ্রবণোত্তর তরঙ্গ সৃষ্টির একটি বর্তনী দেওয়া হলো। দণ্ডের অনুদৈর্ঘ্য কম্পন এখানে তরল মাধ্যমের দ্বারা প্রবাহিত হয়।



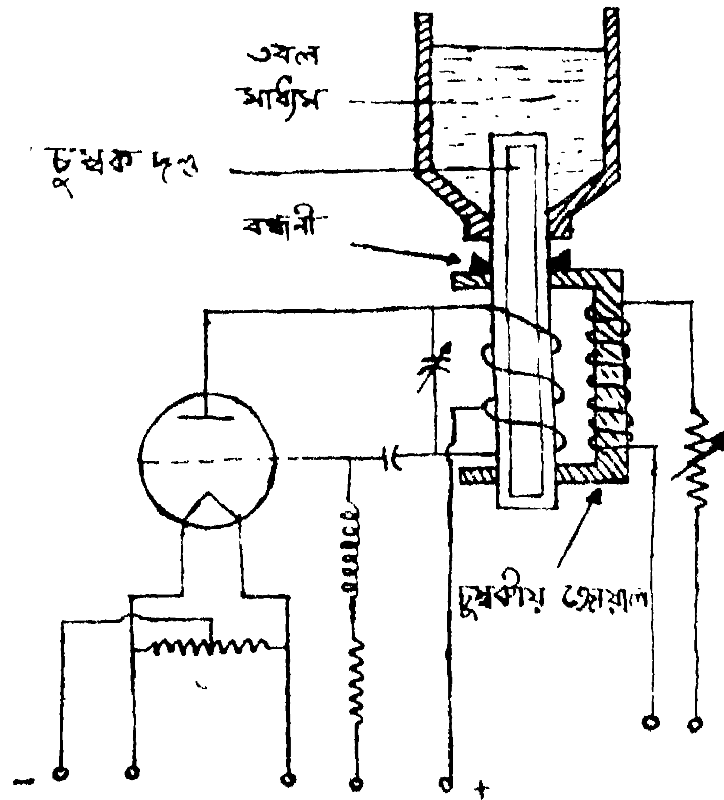
1নং চিত্র
গ্যালটন-হুইসেল

গ্যালটন হুইসেলে সজোরে ফুঁ দিয়েও পিষ্টনটাকে সরিয়ে সরিয়ে প্রায় 30,000 কম্পনাঙ্কবিশিষ্ট শব্দ পাওয়া যায়। তবে এই সব পদ্ধতিতে সৃষ্ট কম্পন নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ। সুতরাং বাস্তব ক্ষেত্রে এই সব পদ্ধতির প্রয়োগ প্রায় অচল।

এই পদ্ধতিতে সেকেণ্ডে 15,000 থেকে 60,000 কম্পন সৃষ্টি করা সুবিধাজনক। এরও উপরে কম্পনাঙ্ক সৃষ্টি করতে হলে অন্য পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে।

3. পিজো ইলেকট্রিক ট্র্যান্সডিউসার (Piezo-Electric Transducer) পদ্ধতি

কোন শব্দায়মান বস্তু যান্ত্রিক শক্তিকে কম্পন-শক্তিতে রূপান্তরিত করে। যে প্রণালীতে এই রূপান্তর ঘটে, তাকে ট্র্যান্সডিউসার বলে। তাই এই পদ্ধতিকে চুম্বকীয় ট্র্যান্সডিউসার পদ্ধতি বলা যেতে পারে। প্রেরক ট্র্যান্সডিউসারগুলির উদ্দেশ্য হলো কম্পনময় পর্যাবৃত্ত গতির দ্বারা শ্রবণোত্তর কম্পন সৃষ্টি করা। যদি কোন কেলাসের উপর চাপ বা টান প্রয়োগ করা হয়, তাহলে কেলাসের তলগুলিতে তড়িৎ সৃষ্টি হয়। কিংবা যদি কেলাসের পরস্পর বিপরীত তলে কোন বিভব পার্থক্য প্রয়োগ করা যায়, তাহলে কেলাসের আকৃতির পরিবর্তন ঘটবে। এই ঘটনাকে পিজো-ইলেকট্রিক প্রক্রিয়া বলা হয়। দ্রুত দিক পরিবর্তনশীল তড়িৎক্ষেত্রে কেলাসের আকৃতি পর্যাবৃত্তভাবে পরিবর্তিত হবে; অর্থাৎ তড়িৎ অক্ষ বরাবর পর্যায়ক্রমে হ্রাস-বৃদ্ধি চলতে থাকবে, যা কম্পন সৃষ্টি করবে। সাধারণতঃ কোয়ার্ট্‌জ্‌ কেলাসই ব্যবহৃত হয়। শ্রবণোত্তর শব্দ-প্রবাহ সৃষ্টির জন্যে একটি পিজো-ইলেকট্রিক ট্র্যান্সডিউসারকে শ্রবণোত্তর কম্পনাঙ্কবিশিষ্ট ইলেকট্রনিক অসিলেটরের সাহায্যে পরিচালিত করা হয়। এই ট্র্যান্সডিউসারকে যখন মাধ্যম সংলগ্ন রাখা হয়, তখন মাধ্যমের মধ্য দিয়ে শ্রবণোত্তর শব্দ সাধারণতঃ অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গে প্রবাহিত হয়।



2নং চিত্র

শ্রবণোত্তর তরঙ্গমালাকে কোন একটি স্থানে ফোকাস করতে হলে একটি বক্রতলীয় কেলাস দরকার। এর জন্যে অবতল-কেলাস ব্যবহৃত হয়। তবে বিস্তৃত জায়গায় অনুসন্ধান চালাতে গেলে উত্তল-কেলাস দরকার, যেমন—বিশাল সমুদ্রের

ভিতর ডুবোজাহাজের অবস্থান জানবার জন্তে, যাকে বলা হয় সোনার (SONAR—Sound Navigation & Ranging)। পিজো-ইলেক-ট্রিক ধর্ম ব্যবহার করে শ্রবণোত্তর তরঙ্গ জানা ও মাপা যায়। এক্ষেত্রে কেলাসের উপর শব্দ-তরঙ্গ লম্বভাবে পড়লে পর একটি দিক পরিবর্তনশীল বিদ্যুৎচালক বলের সৃষ্টি হয় এবং তা পরিমাপ করেই শ্রবণোত্তর শব্দের গতি-প্রকৃতি জানা সম্ভব। একে বলা যায় গ্রাহক ট্র্যান্সডিউসার।

বাস্তব জীবনে শ্রবণোত্তর শব্দের প্রভাব ও প্রয়োগ

হিসাব করে দেখানো যায় যে, যদি কোন লোক অনর্গল এক-শ' পঞ্চাশ বছর কথা বলে চলে এবং তা থেকে যা শব্দশক্তি পাওয়া যায়, তা মাত্র এক কাপ জল ফুটাতে সক্ষম, অথচ জলের মধ্যে শ্রবণোত্তর তরঙ্গ পাঠিয়ে মাত্র পাঁচ মিনিটে একটি ডিম সিদ্ধ করা যায়। এ থেকেই শ্রবণোত্তর তরঙ্গের শক্তির পরিমাণ অনুমেয়। যত কম্পনাঙ্ক বাড়ে, ততই বিশোষণ বেশী হয় এবং তাপমাত্রাও বৃদ্ধি পায়। সাধারণতঃ দুই বিপরীত ধর্মী মাধ্যমের সংযোগস্থলে এই ঘটনা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়, যেমন—কোন তরল পদার্থের মধ্যে কঠিন জিনিস বা বুদ্বুদের উপস্থিতি। কোন তরল পদার্থের মাধ্যমে বেশী ক্ষমতাসম্পন্ন শ্রবণোত্তর তরঙ্গ পাঠালে তরলের মধ্যে বুদ্বুদ সৃষ্টি হতে পারে কিংবা সৃষ্ট বুদ্বুদ সজোরে বিনষ্ট হতে পারে।

যখন বেশী প্রাবল্যের শ্রবণোত্তর তরঙ্গ কোন তরল ও বাতাসের সংযোগ স্থলে গিয়ে ধাক্কা দেয়, তখন খানিকটা তরল পদার্থ ফিন্‌কি দিয়ে উপরে উঠে পড়ে এবং তা গুঁড়া গুঁড়া হয়ে কুয়াশার সৃষ্টি করে। কুয়াশার ঘনত্ব নির্ভর করবে তরলের পৃষ্ঠটান ও শ্রবণোত্তর তরঙ্গের ক্ষমতার উপর। শ্রবণোত্তর শব্দের সঙ্গে আলোর সংঘাত বিষয়ে রামন ও তাঁর সহকর্মীরা কিছু কাজ করেছেন। দেখা যায় যে, শ্রবণোত্তর তরঙ্গ কোন স্বচ্ছ তরল মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে চাপের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটায় এবং মাধ্যমটি তখন একটি আলো-প্রবেশ্য গ্রেটিং হিসেবে কাজ করে, যার উপরে আলো পড়ে অপবর্তিত হয়।

প্রযুক্তিবিদ্যায় :—তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য খুব কম হওয়ার জন্তে কোন নির্দিষ্ট দিকে শ্রবণোত্তর শব্দ চালনা করা যায় এবং কোন বস্তু থেকে তার প্রতিফলন বা প্রতিসরণ দিয়ে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বস্তুর অবস্থান প্রভৃতি বিষয় জানা হয়। এজন্তে গ্রাহক ও প্রেরক—উভয় যন্ত্র প্রয়োজন। এই পদ্ধতিতে ডুবোজাহাজে করে সারা সমুদ্রতলদেশের একটা সম্পূর্ণ মানচিত্র তৈরি করা সম্ভব; মাছের ঝাঁক, নিমজ্জিত পাহাড়, ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজ বা যুদ্ধকালীন শত্রুপক্ষের ডুবোজাহাজের অবস্থানও জানা যায়। মাছের পেটের বায়ু-থলি থেকে শ্রবণোত্তর তরঙ্গের প্রতিফলন মাছের ঝাঁকের অবস্থান জানিয়ে দেয়। যুক্তরাজ্যে জেলেদের মাছধরা জাহাজে এখন এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হচ্ছে।

কোন ধাতুতে বা রবার-টায়ারে কোন ফাটল বা ছিদ্র থাকলে তা সহজে শ্রবণোত্তর তরঙ্গ পাঠিয়ে জানা যায়। এই পরীক্ষায় বস্তুটির কোন ক্ষতি হয় না। গ্রাহক ও প্রেরক ট্র্যান্সডিউসার দুটি পরীক্ষার জন্তে আনা বস্তুটির পরস্পর বিপরীত পার্শ্বে রাখা হয়। যদি কোন ত্রুটি বস্তুটির মধ্যে থাকে, তাহলে গ্রাহক যন্ত্রে স্পন্দন কম হবে, কারণ ত্রুটিপূর্ণ জায়গাটি শ্রবণোত্তর তরঙ্গ-প্রবাহ আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেয়। এই পদ্ধতির দ্বারা চুলের মত সরু ফাটলও ধরা পড়ে, যা অন্ত কোন উপায়ে পাওয়া দুষ্কর। বিমানের পাখা, বাষ্পাধার, ক্রতচালিত গ্যাস টারবাইন প্রভৃতি অত্যাবশ্যক প্রধান জিনিসগুলি পরীক্ষার জন্তে এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। একইভাবে ভূত্বকের কোথায় কি পদার্থ আছে, তা জানা যায়। অষ্ট্রেলিয়াতে

এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে ম্যাকোয়ারী হ্রদের তলায় লক্ষ লক্ষ মণ কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে।

সমুদ্রে জলের নীচে তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের দ্বারা বেতার যোগাযোগ সম্ভব নয়। এজন্যে 30,000 কম্পনাঙ্কের শ্রবণোত্তর তরঙ্গই বাহক-তরঙ্গের কাজ করে এবং বেতার যোগাযোগ রক্ষা করে।

সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি, যেমন—ঘড়ি, ছোট যন্ত্রের গিয়ার, বলপেনের মুখ, অপারেশন করবার যন্ত্রপাতি, দামী কারুকার্যখচিত গহনাপত্র প্রভৃতি বেশী ক্ষমতা-সম্পন্ন শ্রবণোত্তর তরঙ্গ দিয়ে ভালভাবে পরিষ্কার ও ধৌত করা হয়। কোন কঠিন পদার্থকে তৈলাক্ত পদার্থের বা অন্য কোন খারাপ পদার্থের পাত্‌লা আবরণ থেকে মুক্ত করা যায়। ধৌতকরণ সাধারণতঃ ক্যাভিটেশন (Cavitation) পদ্ধতিতে সংঘটিত হয়। ক্যাভিটেশন হলো শ্রবণোত্তর তরঙ্গ-প্রবাহের ফলে চাপের দ্রুত হ্রাস-বৃদ্ধির দরুণ কোন পদার্থের মধ্যে বুদ্‌বুদ বা ক্ষুদ্র গহ্বরের সৃষ্টি এবং তার সজোরে বিলুপ্তিসাধন। বুদ্‌বুদগুলির তীব্র সংকোচন বা বিলুপ্তিসাধন সেখানকার তাপমাত্রাকে কয়েক-শ' ডিগ্রি এবং চাপকে কয়েক-শ' অ্যাটমস্ফিয়ারে বাড়িয়ে দেয়। শ্রবণোত্তর তরঙ্গ-প্রবাহের দরুণ মাধ্যমের কণাগুলির বেশী ত্বরণপ্রাপ্তি হেতুও কিছুটা ঘটে থাকে। শ্রবণোত্তর তরঙ্গ দিয়ে তরল বা কঠিন মাধ্যমে লুকিয়ে থাকা গ্যাসকে দূর করা যায়। বর্তমান বিদেশে বহু লণ্ড্রিতে ময়লা জামাকাপড় পরিষ্কার করবার জন্যেও এই তরঙ্গ ব্যবহৃত হয়। শ্রবণোত্তর তরঙ্গ জামাকাপড়ের বিন্দুমাত্র ক্ষতিসাধন না করে জামাকাপড় থেকে তাড়াতাড়ি ধুলা ময়লা ধুয়ে-মুছে সাফ করে দেয়।

বেশী কম্পনাঙ্কের এই শব্দ দিয়ে বাতাসে বা তরলে ভাসমান কণাগুলিকে বিচ্ছুরিত বা জমাট বাঁধানো যায়। বিচ্ছুরণের দরুণ তেলে জলে মিশ খাওয়ানো যায়; কর্পূরকে (যা সাধারণভাবে জলে দ্রবীভূত হয় না) জলে দ্রবীভূত করা যায়। ধোঁয়া ও কুয়াশার মধ্য দিয়ে শ্রবণোত্তর তরঙ্গ পাঠালে বাতাসে ভাসমান ঐ কণাগুলি জমাট বেঁধে বড় হয় এবং মাটিতে পড়ে যায়। ভাসমান কণাগুলির আকৃতি ও শব্দের কম্পনাঙ্কের উপর নির্ভর করবে—বিচ্ছুরণ হবে, না জমাট বাঁধবে। বড় বড় কলকারখানায় এই তরঙ্গ পাঠিয়ে চতুঃপার্শ্বের বায়ুমণ্ডলকে ধূলি ও ধোঁয়ামুক্ত রাখা হয়।

সাধারণভাবে গরম করে ঝাল দেওয়ার সময় বস্তুটির উপর একটি অক্সাইড আবরণ তৈরি হয়, যা অনেক ক্ষেত্রে ঝাল গ্রহণে বাধা প্রদান করে। শ্রবণোত্তর তরঙ্গ দিয়ে ঝাল দিলে এই সমস্ত ঝামেলার সম্মুখীন হতে হয় না। কোন কাচের দণ্ড শ্রবণোত্তর কম্পনে কাঁপতে থাকলে তা লোহা বা কাচের মত শক্ত বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করে ছিদ্রের সৃষ্টি করে।

নিশাকালীন দুষ্কৃতকারীদের হাত থেকে কোন বাড়ী বা সম্পত্তি রক্ষা করার ক্ষেত্রেও শ্রবণোত্তর তরঙ্গ ব্যবহৃত হয়। কোন দুষ্কৃতকারী সবার অজান্তে বাড়ী বা ঘেরা এলাকার মধ্যে প্রবেশ করে ভিতরের দিকে এগুতে থাকলে শ্রবণোত্তর তরঙ্গ তার দেহ থেকে প্রতিফলিত হয়ে নির্দিষ্ট একটি বর্তনী সম্পূর্ণ করে এবং তার ফলে সংলগ্ন ঘণ্টাটি বেজে উঠে' সবাইকে সজাগ করে দেয়। দুষ্কৃতকারী ভিতরের দিকে আসতে থাকলে ডপ্‌লারের নিয়ম অনুযায়ী প্রতিফলিত তরঙ্গের কম্পনাঙ্ক আপতিত নির্দিষ্ট কম্পনাঙ্ক থেকে আলাদা হয়, যার ফলে বর্তনী সংযোগ ঘটে ও ঘণ্টা বাজতে থাকে।

বর্তমানে নিউক্লীয় ও মৌলিক কণা সম্বন্ধীয় পদার্থবিদ্যার রাজ্যেও এর প্রয়োগবিধি উল্লেখযোগ্য। হিলিয়াম বুদ্‌বুদ প্রকোষ্ঠের (Helium Bubble Chamber) প্রয়োজনীয় প্রসারণ শ্রবণোত্তর তরঙ্গ দ্বারা সাধিত হচ্ছে।

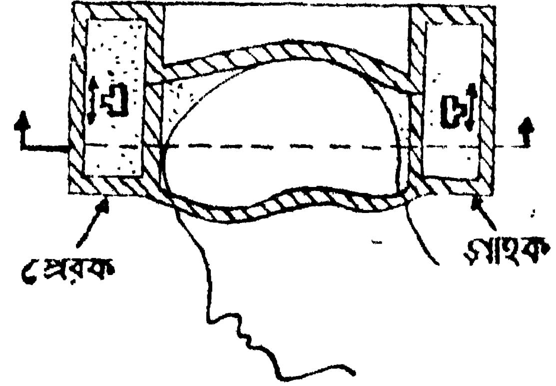
রসায়নের ক্ষেত্রে—কেলাসীকরণের সময় গলিত ধাতুতে শ্রবণোত্তর তরঙ্গ পাঠিয়ে ছোট এবং

একই পরিমাণের কেলাস সৃষ্টি করা হয়। জটিল জৈব যৌগগুলিকে ভাঙা, রাসায়নিক বিক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা, বস্তুর স্ফুটনাঙ্কের পরিবর্তন করা, দ্রুত জারণক্রিয়া ঘটানো প্রভৃতি রাসায়নিক পরিবর্তন শ্রবণোত্তর তরঙ্গের দ্বারা সংঘটিত হয়। রসায়নে অনেক ক্ষেত্রে এই তরঙ্গকে অনুঘটক হিসেবে কাজে লাগানো হয়, যেমন—স্টার্চের দ্রবণে বেশী ক্ষমতাসম্পন্ন তরঙ্গ পাঠালে কিছুক্ষণ পরে স্টার্চকণা ডেক্সট্রিন কণায় পরিবর্তিত হয়। অনেক রসায়নবিদের মতে জল শ্রবণোত্তর তরঙ্গের দ্বারা সহজে জারিত হয়ে হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড গঠন করে।

জীববিদ্যায়—শক্তিশালী শ্রবণোত্তর শব্দ-তরঙ্গ জীবদেহের লোহিত কণিকা নষ্ট করে দেয়। প্রোটোজোয়া ও কয়েক জাতীয় জীবাণুকে এই তরঙ্গ একেবারে মেরে ফেলে বা পঙ্গু করে দেয়। এই তরঙ্গ প্রয়োগে ঈষ্ট তার প্রজনন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তামাক গাছের সংক্রামক রোগ-জীবাণু (Tobacco Mosaic Virus) সম্পূর্ণ অক্ষম হয়ে পড়ে।

দুধ বিশুদ্ধিকরণের সময় এই তরঙ্গ পাঠালে কয়েক জাতীয় জীবাণু সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যায়। সাধারণতঃ কলেরা, বসন্ত প্রভৃতির বীজাণুগুলিতে শ্রবণোত্তর তরঙ্গ পাঠিয়ে তাদের বেশ কিছুটা দুর্বল করে দিয়ে রোগ প্রতিষেধক বীজাণু তৈরি করা হয়, যা টিকা বা ইঞ্জেকশন প্রভৃতির দ্বারা আমাদের শরীরে ঢুকিয়ে ঐ সব রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়ানো হয়। শ্রবণোত্তর তরঙ্গ পাঠিয়ে কোন বীজের অঙ্কুরোদ্গম সাময়িকভাবে বন্ধ করা যায়, কারণ এই তরঙ্গ পাঠালে বীজের কোষ-বিভাজন ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানে—মানবদেহের উপর শ্রবণোত্তর তরঙ্গ প্রয়োগের প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেহের তাপমাত্রা বেড়ে কৃত্রিম জ্বরের সৃষ্টি করে। এই প্রতিক্রিয়া কাজে লাগিয়ে কোন কোন অসুখে অসুস্থ জায়গায় এইভাবে তাপ প্রয়োগ করে তা সুস্থ করা হয়। দেহের কোন অংশের ব্যথা, বিশেষ করে বাতের বা গাঁটের ব্যথা দূর করা যায়।



3নং চিত্র
শ্রবণোত্তর তরঙ্গের সাহায্যে মস্তিষ্ক পরীক্ষা

কোন নির্দিষ্ট টিস্যুকে শরীর থেকে বাদ দিতে হলে শ্রবণোত্তর তরঙ্গ ঐ স্থানে ফোকাস করে টিস্যুটিকে নষ্ট করে দেওয়া হয়। এরূপ চিকিৎসাকে অস্ত্রবিহীন শল্যচিকিৎসা বলা হয়। বর্তমানে স্নায়ু-চিকিৎসায়ও এর অবদান উল্লেখযোগ্য। বিশেষভাবে মস্তিষ্কের টিউমার বা শরীরের অভ্যন্তরে কোন অংশে ক্যান্সার বা ফোঁড়া, গলপাথর নির্ধারণের জন্যে এবং অন্ত্রের মিউকোসা (Mucosa) স্তরের ঘনত্ব পরিমাপের জন্যে শ্রবণোত্তর তরঙ্গ ব্যবহৃত হচ্ছে। ডিপথেরিয়া, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের জীবাণু এই তরঙ্গে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। হুপিং কাশির সিরামও শ্রবণোত্তর তরঙ্গ পাঠিয়ে তৈরি করা হয়।

বেশী শক্তিমাত্রার শ্রবণোত্তর তরঙ্গ গর্ভাশয়ে পাঠিয়ে ভ্রূণ নষ্ট কিংবা মহিলাদের ডিম্বাশয়ে বা পুরুষদের শুক্রাশয়ে পাঠিয়ে বন্ধ্যাত্ব আনয়ন করা যায়। এসব ক্ষেত্রে এই তরঙ্গ ঐ সমস্ত জায়গার টিস্যুগুলিকে পুড়িয়ে নষ্ট করে দেয়। খুব বেশী শক্তিমাত্রার তরঙ্গ দিয়ে ক্রোমোজোমের মধ্যস্থিত জিনগুলির (যা জীবের কোন না কোন গুণ

বা দোষের জন্যে দায়ী) আভ্যন্তরীণ গঠনে কিছুটা পরিবর্তন ঘটানো যেতে পারে।

কম শক্তিমাত্রার শ্রবণোত্তর তরঙ্গ মহিলাদের গর্ভাবস্থা জানায় সহায়তা করে। গর্ভবতী মহিলাদের জরায়ুতে কম কম্পনাঙ্কের শ্রবণোত্তর তরঙ্গ পাঠানো হয়। জরায়ুর স্থিতিশীল স্থানগুলি থেকে প্রতিফলিত তরঙ্গ গতিশীল স্থানগুলি থেকে ভিন্ন হয়। সুতরাং ভ্রূণটি যদি দশ সপ্তাহের কিংবা তার বেশী হয়, তাহলে ভ্রূণটির গতিশীল হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া প্রতিফলিত শ্রবণোত্তর তরঙ্গের দ্বারা বোঝা যাবে। প্রতিফলিত শ্রবণোত্তর তরঙ্গের তীক্ষ্ণতা থেকে ভ্রূণের হৃৎস্পন্দন ভালভাবে বোঝা ও সঠিকভাবে গর্ভাবস্থা নির্ধারণ করা সম্ভব।

শ্রবণোত্তর শব্দের উপর গবেষণা এগিয়ে চলেছে। দিনের পর দিন নানা ক্ষেত্রে এর নিত্য নতুন ব্যবহার বেড়েই চলেছে। বর্তমান শিল্প-জগতে শ্রবণোত্তর শব্দ এক যুগান্তকারী বিপ্লব এনে দিয়েছে। উন্নত দেশগুলিতে শ্রবণোত্তর শব্দের যন্ত্রপাতি তৈরির জন্যে কারখানা স্থাপিত হয়েছে। আমাদের দেশেও কিছু কিছু কারখানায় শ্রবণোত্তর শব্দ দিয়ে খুঁৎ নির্ধারণ ও সূক্ষ্ম বস্তু পরিষ্কার করবার জন্যে যন্ত্রপাতি তৈরি হচ্ছে। পরিশেষে বলা যায়, ক্রমবর্ধমান উপযোগিতার জন্যে শ্রবণোত্তর শব্দ নিঃসন্দেহে একদিন ব্যবহারিক জীবনে একটা বিরাট স্থান অধিকার করবে।

চর্মরোগে আলোক-সংবেদনের ভূমিকা

সুধাংশুবল্লভ মণ্ডল ও অজিতকুমার দত্ত*

আলোক-সংবেদন (Photosensitisation) শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো আলোক-রশ্মির প্রতি সংবেদনশীলতা। নিদানিক চর্মরোগের ক্ষেত্রে কিন্তু এই শব্দের প্রয়োগ মোটেই অর্থবহ নয় বরং বিভ্রান্তিকর। কারণ এই সংজ্ঞার অপ-প্রয়োগের দ্বারা একটা শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াকে চর্মে সৃষ্ট এক প্রকার রোগলক্ষণ বলে আখ্যা দেওয়া হয়; অর্থাৎ এর দ্বারা বোঝানো হয় আলোক-রশ্মির প্রভাবে ত্বকের অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া, যেখানে অ্যালার্জিঘটিত ব্যাপারগুলি সর্বাবস্থায় বর্তমান নাও থাকতে পারে। আরো বিশদভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কিছু উদ্ভিদ ও ঔষধাদি আছে, যার মধ্যে এমন কোন বস্তু থাকে, যা ত্বকের কোষবিশেষকে হ্রস্ব-তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোক-রশ্মির প্রতি অস্বাভাবিকভাবে সংবেদনশীল করে তোলে। আর এই সকল বস্তুর সংস্পর্শের ফলে সূর্য রশ্মির প্রতি ঊর্ধ্বত্বকের জীবকোষের যে অতি সংবেদনশীলতা দেখা দেয়, তারই পরিণতিতে ত্বকে উৎপন্ন হয় বিশেষ রোগ-লক্ষণ। চর্মরোগের ক্ষেত্রে এই রোগকেই বস্তুতঃ আলোক-সংবেদনশীল নামে অভিহিত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে একে আলোক-সংবেদজ চর্মরোগ বলে চিহ্নিত করাই সমীচীন বলে মনে হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, আকস্মিক ও কিছু মেয়াদী পর্যায়ভুক্ত Lupus Erythematosus রোগের ক্ষেত্রে সূর্যালোক সম্পাতের ফলে উদ্ভূত চর্মরোগের অস্বাভাবিক প্রাবল্য ঘটে, তাছাড়া আনুষঙ্গিক অন্যান্য ব্যাধির প্রকোপে সময়বিশেষে জীবনসংশয়ও হতে পারে। সে জন্যে Hydroa-vacciniforme, Xeroderma-pigmentosum

*কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর চর্মরোগ-বিজ্ঞান শাখা।

প্রভৃতি কোন কোন চর্মরোগের ক্ষেত্রে সূর্যালোক অথবা অতিবেগুনী আলোকসম্পাত সর্বতোভাবে পরিহার করা দরকার।

আবার এমন কিছু চর্মরোগ আছে, যেখানে চিকিৎসায় প্রত্যাশিত সুফলের আশায় ইচ্ছাকৃতভাবেই আলোক-সংবেদন প্রক্রিয়ার সাহায্য নেওয়া হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ Goeckerman-O' Leary কর্তৃক নির্দেশিত সোরিয়াসিস (Psoriasis) রোগের চিকিৎসা পদ্ধতির উল্লেখ করা যায়।

দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সব বিষয়ে চিকিৎসকের যথাযথ জ্ঞানের অভাব অথবা ইচ্ছাকৃত উপেক্ষার জন্যে অনেক সময় সূর্যরশ্মি প্রয়োগের দ্বারা নানা রোগচিকিৎসার ক্ষেত্রে স্বভাবতঃই বিবিধ বিরূপ প্রতিক্রিয়া এমন কি মারাত্মক বিপর্যয় পর্যন্ত ঘটে।

মাত্র কিছু রোগলক্ষণের ভিত্তিতে চর্মরোগের ক্ষেত্রে আলোক-সংবেদন শব্দটি অসংলগ্নভাবে ব্যবহৃত হলেও আসলে এর পশ্চাতে অন্তর্নিহিত প্রকৃত শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন ও ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান খুবই সীমিত। যা হোক, বহু গবেষকের সাধনাপ্রসূত তথ্য এবং আধুনিক চিন্তাধারার পটভূমিকায় এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাতের উদ্দেশ্যেই আলোচ্য প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

আলোক-সম্পাতের ফলে যে সকল চর্মরোগ উৎপন্ন হয়, তা মুখ্যতঃ দ্বিবিধ প্রতিক্রিয়ার দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। যেমন—(1) ফটোটক্সিক প্রতিক্রিয়া অথবা (2) ফটোঅ্যালার্জিক প্রতিক্রিয়া। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে রাসায়নিক বা আলোক-সম্পাতের সূচনাতেই প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এখানে দূষিত রাসায়নিকের কেন্দ্রীভবন ও আলোক-সম্পাতের স্থিতিকালই প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। মাত্রাধিক সূর্যাতপের দহনের প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে এর বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায় এবং দেহের অনাবৃত অংশেই রোগলক্ষণ সীমিত থাকে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে সংবেদন সৃষ্টির প্রাক্কালে দূষিত বস্তুর সংস্পর্শই প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এখানেও রোগলক্ষণের সঙ্গে সূর্যাতপে দহনের সাদৃশ্য থাকে। তা ছাড়াও আমবাত রূপে, স্থির রক্তাভ চিহ্নাকারে, আবের মত, প্রদাহ আকারে কিংবা স্ফোটকরূপেও রোগলক্ষণ আবির্ভূত হতে দেখা যায়। অনাবৃত ছাড়া আবৃত দেহাংশেও রোগলক্ষণ যথেষ্ট দেখা যায় এবং সেগুলি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী হয়। শেষোক্ত প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে অতিবেগুনী রশ্মির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কারণতত্ত্ব অনুসন্ধান

জীবকোষের ভূমিকা ও লাইসোজোমের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—কোষের অভ্যন্তরে প্রথম অনুঘটকের (Enzyme) উপস্থিত নির্ণয় থেকে সুরু করে লাইসোজোমের (Lysosome) আধুনিক আবিষ্কার কাল অবধি—এই সুদীর্ঘ সময়ব্যাপী আলোক-সংবেদন প্রক্রিয়ার অন্তরালে লুপ্ত শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানা ছিল না বললেই চলে। অবশ্য সম্প্রসারিত এই অন্তর্বর্তীকাল-ব্যাপী Van Potter থেকে সুরু করে Elvejhem, Rouiller, de Duve, Harper, Blackwell, Riley, Slater, White, Harper, Braun-Falco, Jarrett, Zelickson, Nordquist, Olson, Spearman, Rees, Allison প্রমুখ বহু কৃতী গবেষক অক্লান্ত সাধনায় এই রহস্য সন্ধানের কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। আর এই ব্যাপক অনুসন্ধানের ফলে ইদানীং লাইসোজোম সংক্রান্ত বহু অজ্ঞাত তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে এবং এই ব্যাপারে লাইসোজোমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা জানা গেছে।

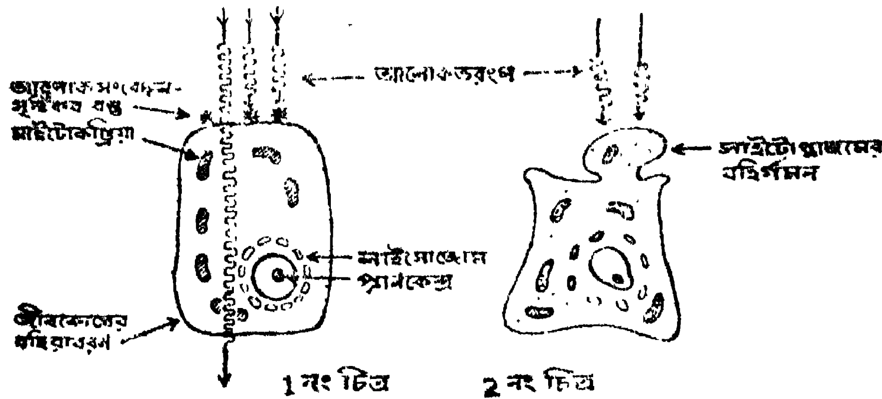
অন্যান্য বহুবিধ বস্তুর মত এই বস্তুটি জীবকোষের অভ্যন্তরে অবস্থিত থাকে। মাইটোকন্ড্রিয়া ও মাইক্রোজোমের মধ্যবর্তী পর্যায়ভুক্ত এই

বস্তুটি প্রায় মাইটোকণ্ড্রিয়ার মত হলেও বিশেষ কোন আভ্যন্তরীণ আকৃতি এর নেই। এর অভ্যন্তরে এপর্যন্ত সমগোত্রীভুক্ত 14 প্রকার জল-বিধ্বংসী (Hydrolytic) অনুঘটকের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই বস্তুকণাগুলি লাইপোপ্রোটিনের পাতলা আবরণের দ্বারা ঢাকা থাকে, যার ফলে এর অভ্যন্তরে অবস্থিত অনুঘটক ও এর বাইরে অর্থাৎ জীবকোষের অভ্যন্তরস্থ সাবস্ট্রেটের মধ্যে পারস্পরিক ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ার পথ রুদ্ধ থাকে। অন্যথায় এই প্রতিক্রিয়ার ফলে জীবকোষের বিনাশ ও ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী। এছাড়া এই বস্তুকণাগুলি আবার জীবকোষের কেন্দ্রীনকে পরিবেষ্টন করে এমনভাবে অবস্থান করে, যার ফলে কার্যতঃ কেন্দ্রীনের চারপাশে অদৃশ্য এক প্রতিরক্ষামূলক আবরণ রচিত হয়। বিশিষ্ট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যযুক্ত ক্ষতিকর আলোকরশ্মির দ্বারা জীবকোষ তথা লাইসোজোমের বিনাশ ঘটে।

3200 একক পর্যন্ত প্রসারিত এবং সর্বাধিক দহন ঘটে আবার 2500 থেকে 3000 একক তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যযুক্ত আলোকরশ্মির দ্বারা। সুতরাং দিগন্তে উপনীত আলোকরশ্মি স্বভাবতঃই ক্ষতিকর দহন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় না। ঘরের জানালায় ব্যবহৃত মামুলি কাচ 3200 অ্যাংষ্ট্রমের কম তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যযুক্ত আলোকরশ্মি প্রতিহত করতে পারে। সুতরাং এর দ্বারা সূর্যাতপ কর্তৃক দহন প্রতিহত হয় ঠিকই, কিন্তু আলোক-সংবেদন প্রতিক্রিয়া উৎপাদন অপ্রতিহত থাকে।

আলোক-সংবেদন প্রক্রিয়ার সম্ভাব্য ক্রিয়াকলাপ

জানা গেছে, আলোক-সংবেদন সৃষ্টিকারী কিছু বস্তু লাইসোজোমের উপরেই আসক্ত ও কেন্দ্রীভূত হয় এবং অন্য শ্রেণীর কিছু বস্তু আবার আসক্ত হয় জীবকোষের বহিরাবরণের উপর।



1 নং চিত্র 2 নং চিত্র

সূর্যরশ্মির ভূমিকা—সূর্য থেকে উৎপন্ন, প্রসারিত আলোকরশ্মি, তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বিস্তৃতি প্রায় বর্ণালীযুক্ত যে 2500 থেকে 18500 অ্যাংষ্ট্রম পর্যন্ত। কিন্তু মেঘ ধোঁয়া, কুয়াশা প্রভৃতির স্তর ভেদ করে যে রশ্মি দিগন্তে উপনীত হতে সক্ষম হয়, তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অবশ্য 3300 এককের মত। দহন-কারী আলোকরশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য 2500 থেকে

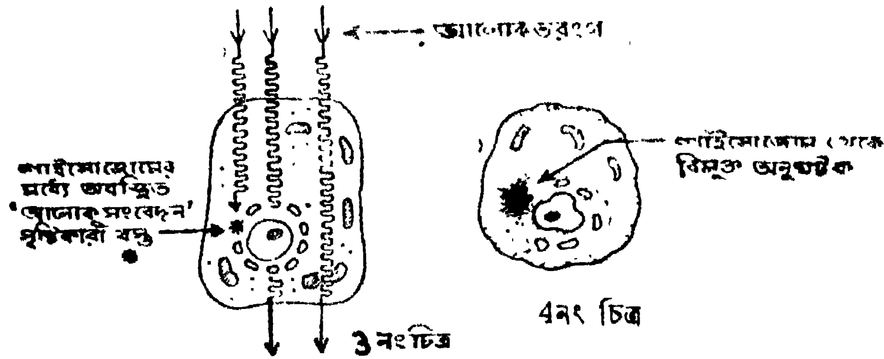
দুই শ্রেণীর ক্রিয়াকলাপের মধ্যে এক ক্ষেত্রে জীবকোষের মধ্যে লাইসোজোমের ভেদ্যতা বৃদ্ধি ও আনুষঙ্গিক বিধ্বংসী অনুঘটক নিষ্ক্রমণের ফলেই মূল প্রতিক্রিয়ার সূচনা হয়। পক্ষান্তরে অপর ক্ষেত্রে যে প্রতিক্রিয়া হয়, তার জন্যে মুখ্যতঃ দায়ী জীবকোষের নিজস্ব দেহাবরণের অভেদ্যতার হ্রাস-প্রাপ্তি। এখানে উপস্থাপিত রেখাচিত্রের সাহায্যে

উল্লেখিত দুই শ্রেণীর কার্যপদ্ধতির পার্থক্য দেখানো হয়েছে।

1নং চিত্রে স্বাভাবিক জীবকোষের আণুবীক্ষণিক আকৃতি দেখানো হয়েছে। এর মধ্যে সাইটো-প্লাজমের অন্তর্গত বিভিন্ন বস্তুর সঙ্গে লাইসো-জোমের কাল্পনিক অবস্থানও দেখানো হয়েছে। আলোক-সংবেদনের ফলে ঐ একই জীবকোষের বিনাশের সূচনা দেখানো হয়েছে 2নং চিত্রে। অকুস্থানে বিক্ষত জীবকোষের আবরণ ভেদ করে আভ্যন্তরীণ সাইটোপ্লাজমকে আকস্মিকভাবে বহির্গত হতে দেখা যাচ্ছে।

ঘটে। 3200 অ্যাংস্ট্রম ও তদূর্ধ্ব তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোকরশ্মির দ্বারাই আলোক-সংবেদনজাত চর্মরোগের সৃষ্টি হয়।

3নং চিত্রেও অপর এক স্বাভাবিক জীবকোষ চিত্রিত হয়েছে। অভ্যন্তরে অবস্থিত লাইসো-জোমের মধ্যেই এবার কালো তারকাচিহ্নের দ্বারা আলোক-সংবেদনশীল বস্তুর অবস্থান দেখানো হয়েছে। অকুস্থানে বিধ্বংসী অনুঘটক বিমুক্তির ফলে ঐ জীবকোষের বিনাশপ্রাপ্তির অবস্থা দেখানো হয়েছে 4নং চিত্রে। উভয় চিত্রেই (1নং ও 3নং) তরঙ্গায়িত রেখাচিহ্নের সাহায্যে আলোকরশ্মির গতিপথ চিহ্নিত করা হয়েছে।



3নং চিত্র

4নং চিত্র

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য Rose Bengal, Eosin রঞ্জকের উপাদান, Fluoresic acid, আলকাত্‌রা ও আলকাত্‌রাজাত পদার্থসমূহ Rutacae, Umbelliferae-জাতীয় উদ্ভিদ প্রভৃতি বিবিধ উপাদানের মধ্যে আলোক-সংবেদন প্রতিপাদনক্ষম যে বস্তু বর্তমান থাকে, তা মুখ্যতঃ জীবকোষের বহিরাবরণের উপর কেন্দ্রীভূত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ গাঢ় কালো রঙের তারকা চিহ্নের সাহায্যে এদের অবস্থান 1নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। এই বস্তুগুলির দ্বারা ক্ষতিকর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যযুক্ত আলোকরশ্মি বিশোষিত হলে যে তাৎক্ষণিক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, তারই ফলস্বরূপ জীব-কোষের আবরণ বিক্ষত হয়। এর পরিণামে আবার কোষের অন্তর্গত পটাসিয়াম বিনষ্ট হয় এবং এইভাবে অবশেষে জীবকোষের মৃত্যু

Onthracene, Porphyrin ইত্যাদি অন্যান্য কিছু বস্তু আবার জীবকোষের অভ্যন্তরস্থ লাইসোজোমের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত হয়। এই বস্তুগুলি ক্ষতিকর আলোকরশ্মি শোষণ করলে লাইসোজোমের আবরণের অখণ্ডতা বিনষ্ট হয়। ফলে কোষের আভ্যন্তরীণ অতীব গুরুত্বপূর্ণ বস্তু-সমূহ বিমুক্ত বিধ্বংসী অনুঘটকের দ্বারা আক্রান্ত হয়। এর উপর ভিত্তি করে আবার একাধিক মধ্যবর্তী পর্যায়ের রাসায়নিক পদার্থও নির্গত হয় (যেমন, আমবাতের ক্ষেত্রে হিষ্টামিন)। যাহোক, চূড়ান্ত পরিণতি হিসাবে আক্রান্ত জীবকোষ স্ফীত হয়ে শেষ পর্যন্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

উভয় ক্ষেত্রেই কিন্তু আলোক-সংবেদন সৃষ্টিকারী বস্তু বর্তমান না থাকলে উল্লিখিত তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যযুক্ত

আলোকরশ্মি বিন্দুমাত্র ক্ষতি না করে, অবলীলাক্রমে ও স্বচ্ছন্দে জীবকোষ ভেদ করে নিষ্ক্রান্ত হতে সক্ষম হয়।

যাহোক, শেষ করবার আগে সচরাচর ব্যবহৃত বস্তুসমূহ, যেগুলির দ্বারা আলোক-সংবেদন-জাত চর্মরোগের সৃষ্টি হয়, সেই সকল বস্তু-সামগ্রীর সংক্ষিপ্ত একটা তালিকা এখানে সংযোজন করা হলো। তাত্ত্বিক বিচারে এরূপ বস্তুর সংখ্যা অবশ্য অগণিত। সুতরাং বাস্তব ক্ষেত্রে সচরাচর বেশী ব্যবহৃত হয়, এরূপ বস্তুসমূহই এই তালিকায় সংযোজিত হয়েছে।

আলোক-সংবেদনজাত চর্মরোগ সৃষ্টিকারী বস্তুসমূহের তালিকা

1. প্রণালীবদ্ধ পদ্ধতিতে যেগুলি গ্রহণ করা হয়

(ক) Sulfonylurea ··· বহুমূত্র রোগের চিকিৎসার্থে ব্যবহৃত ওষুধের মৌলিক উপাদান।

(খ) Tetracyclines ···
(গ) Sulfonamaides
} বিভিন্ন জীবাণুঘটিত রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত।

(ঘ) Griseofulvin ··· বিভিন্ন প্রকার ছত্রাকঘটিত রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত।

(ঙ) Lamprene ··· কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা ও প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত ওষুধ।

(চ) Chlorthiazides
(ছ) Phenothiazines
} চুলকনা প্রতিরোধ এবং স্নায়বিক উত্তেজনা প্রশান্তকারী ওষুধসমূহের মৌলিক উপাদানসমূহ।

2. যেগুলি সচরাচর স্থানীয়ভাবে প্রয়োগ করা হয়

(ক) TCSA (Tetra-chlor-salicylanilide)
ও TBS (Tribromo-salicylanilide)
} জীবাণু প্রতিষেধকরূপে সাবানের মধ্যস্থিত উপাদান।

(খ) Bithinol ······ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত জীবাণু-প্রতিষেধক।

(গ) Blankophores ··· রাসায়নিক বিচারে এগুলি Sulfonamide-পর্যায়ভুক্ত। কাপড়, কাগজ, খেলনা প্রভৃতি হরেক রকম বস্তুতে বর্ণের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধির জন্যে এই সব বস্তু প্রয়োগ করা হয়। এর দ্বারা অতিবেগুনী রশ্মি বিশোষিত হয়ে শুধুমাত্র নীল রশ্মি প্রতিফলিত হওয়ায় এই ঘটনা সম্ভব হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ টিনোপাল উল্লেখযোগ্য, যা কাপড় কাচবার পর ধব্‌ধবে ফর্সা করবার জন্যে হামেশাই ব্যবহৃত হয়।

(ঘ) আলকাত্‌রা ও আলকাত্‌রাজাত (যেমন ন্যাপথলিন) প্রভৃতি—যথাক্রমে চুলকনাযুক্ত কিছু চর্মরোগের চিকিসায় ব্যবহৃত মলমের উপাদান এবং সুগন্ধি বা পোকামাকড়ের উপদ্রব থেকে বিবিধ গৃহসামগ্রী রক্ষার্থে এগুলি ব্যবহার করা হয়।

3. উদ্ভিদ বা লতাগুল্ম প্রভৃতি

Umbelliferae এবং Rutaceae-র অন্তর্গত বিভিন্ন উদ্ভিদ, যাদের মধ্যে আলোক-সংবেদনশীল মৌলিক ও যৌগিক পদার্থরূপে Furocoumarin বর্তমান থাকে। শ্বেতিরোগের চিকিৎসায় এর প্রয়োগ ফলদায়ক। গ্রহণযোগ্য বটিকা স্থানীয় প্রয়োগযোগ্য দ্রবণ, প্রলেপ এবং ত্বকের নিম্নে প্রয়োগের উপযোগী ইনজেকশন (তৈলাক্ত) প্রভৃতি বিভিন্ন আকারে এটি ব্যবহৃত হয়।

বিস্ফোরক পদার্থের উৎপাদন ও ব্যবহার

আশিসকুমার সান্যাল

মানুষের দ্বারা এযাবৎ আবিষ্কৃত বস্তুসমূহের মধ্যে বিস্ফোরকই বোধহয় একমাত্র পদার্থ, যা মানুষের কল্যাণকর কাজে যতখানি ব্যবহৃত হতে পারে, ঠিক ততখানিই ব্যবহৃত হতে পারে অকল্যাণকর কাজে—তা সে কয়েক শত বছর আগে আবিষ্কৃত বারুদ বা সাম্প্রতিকতম বিস্ফোরক অ্যাটম বোমা অথবা হাইড্রোজেন বোমা যাই হোক না কেন। বারুদের সাহায্যে ছোট ছোট পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে রাস্তা তৈরির সুবিধার জন্যে পাহাড় ভেঙে ফেলা যায় আবার শত্রুপক্ষের বাড়ীঘরও উড়িয়ে ফেলা যায়। আমেরিকা মাটির নীচে বড় বড় আধার, পাহাড়ের মধ্য দিয়ে সুড়ঙ্গ ইত্যাদি তৈরির কাজে কম শক্তিসম্পন্ন পারমাণবিক বোমা ব্যবহার করা সুরু করেছে। এটা পারমাণবিক বোমার কল্যাণকর ব্যবহারের দিক। আর হিরোসিমা ও নাগাসাকি পৃথিবীর মানুষের চোখের সামনে পারমাণবিক বোমার অকল্যাণকর ব্যবহারের জলন্ত নিদর্শন হয়ে আছে।

রাসায়নিক বিস্ফোরকসমূহের ক্ষেত্রে বিস্ফোরকটি রাসায়নিকভাবে ভেঙে খুব অল্প সময়ের মধ্যে নিজ আয়তনের বহু গুণ বেশী আয়তনের গ্যাসীয় পদার্থ ও প্রচুর তাপ উৎপন্ন করে। এই উৎপন্ন গ্যাসীয় পদার্থ প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি করে, যা হলো বিস্ফোরণের মূল কথা।

মানুষের আবিষ্কৃত প্রথম বিস্ফোরক হচ্ছে বারুদ। এতে শতকরা 75 ভাগ পটাশিয়াম নাইট্রেট (KNO_3), শতকরা 10 ভাগ সালফার বা গন্ধক আর শতকরা 15 ভাগ কাঠকয়লা থাকে। এগুলিকে পৃথকভাবে গুঁড়া করে একটি ঘূর্ণায়মান পিতলের চোঙে মেশানো হয়। মিশ্রিত পদার্থকে এরপর Edge-runner নামক এক প্রকার যন্ত্রে 6 ঘন্টা ধরে গুঁড়া করা হয়। এই সময় শতকরা 6 ভাগ জল যোগ করা হয়, নচেৎ ঐ সময়েই বিস্ফোরণ ঘটে যেতে পারে। এইভাবে উৎপন্ন ডেলার মত জিনিষটাকে আবার গুঁড়া করে হাইড্রলিক প্রেসে চাপ দিয়ে কেক-এর মত আকার দেওয়া হয়। সাধারণ বারুদের জন্যে এগুলিকে গুঁড়া করে চালুনি দিয়ে ছেঁকে প্রয়োজনীয় আকারের দানা সংগ্রহ করা হয়। সামান্য গ্র্যাফাইট মিশিয়ে ঘূর্ণায়মান কাঠের চোঙে ঝাঁকিয়ে এগুলিকে পালিশ করা হয় এবং এইভাবে মসৃণ ও ছিদ্রবিহীন উজ্জল দানা পাওয়া যায়। তারপর 24 ঘন্টার জন্যে গরম বায়ু প্রবাহে এই দানাগুলিকে শুকানো হয়।

পটাসিয়াম নাইট্রেট থেকে নির্গত অক্সিজেনে গন্ধক এবং কার্বনের দ্রুত দহনই বারুদের বিস্ফোরণের মূল কারণ। এতে হঠাৎ খুব উচ্চ তাপমাত্রায় প্রচুর পরিমাণ গ্যাসীয় পদার্থ পাওয়া যায়। এই রাসায়নিক ক্রিয়া খুবই জটিল বলে এখনও এর স্বরূপ নির্ধারিত হয় নি। তবে অ্যালবেল ও নোবেলের বিস্তারিত অনুসন্ধান থেকে জানা গেছে যে, উৎপন্ন পদার্থে ওজন অনুযায়ী শতকরা 57 ভাগ কঠিন ও 43 ভাগ গ্যাসীয় পদার্থ থাকে। বিস্ফোরণ সম্পূর্ণ বন্ধ জায়গায় ঘটলে উৎপন্ন গ্যাসের আয়তন বারুদের 280 গুণ হয় আর তাপমাত্রা হয় 2200° সেন্টিগ্রেড। উৎপন্ন গ্যাস প্রতি বর্গইঞ্চিতে 42 টন চাপ দেয়। এই চাপে বদ্ধ আধার টুকরা টুকরা হয়ে যায়। উৎপন্ন গ্যাসীয় পদার্থের মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন, কার্বন মনোক্সাইড ও

হাইড্রোজেন সালফাইড প্রধান। উৎপন্ন কঠিন পদার্থে থাকে পটাশিয়ামের কার্বোনেট, থায়ো-সালফেট, সালফেট ও সালফাইড লবণ এবং আরও অনেক কিছু। কঠিন জিনিষগুলি ধোঁয়ার সৃষ্টি করে, যা কোন কোন কাজে অসুবিধাজনক। তাই পরবর্তীকালে ধোঁয়াশূন্য বিস্ফোরক গুঁড়া তৈরির চেষ্টা চালানো হয়।

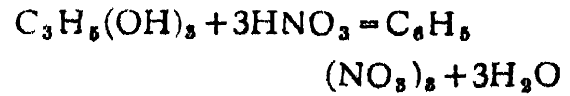
তুলা, ঘাস, কাঠ, পশম সেলুলোজজাতীয় পদার্থ। সাধারণভাবে সেলুলোজের সঙ্কেত $(C_6H_{10}O_5)n$; 3:1 অনুপাতে গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিড আর গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডের মিশ্রণের সঙ্গে তুলা নিম্ন উষ্ণতায় সেলুলোজ ট্রাইনাইট্রেট নামক এষ্টার উৎপন্ন করে।



$$C_6H_{10}O_5+3HNO_3=C_6H_7O_2(NO_3)_3+3H_2O$$

গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপন্ন জলকে শোষণ করে। একেই বলা হয় গান-কটন। বিশেষ ব্যবস্থায় সমস্ত তুলাকে নাইট্রেটেড করা হয় এবং সম্পূর্ণ অ্যাসিড অপসারিত করা হয়। উৎপন্ন মণ্ডকে আর্দ্র অবস্থাতেই প্রচণ্ড চাপে প্রয়োজনীয় আকার দেওয়া হয় আর তার চারপাশে মোম অথবা অন্য কোন অভেদ্য জিনিষের প্রলেপ দেওয়া হয়, যাতে আর্দ্রতা বজায় থাকে। আর্দ্র গান-কটন পরিবহনের উপযোগী আর সামান্য আঘাতেই এর বিস্ফোরণ ঘটে না। মারকারি ফুলমিনেট ক্যাপ দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটালে গান-কটন তীব্রভাবে বিস্ফোরিত হয় এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়। এই সকল পদার্থই গ্যাসীয়। টর্পেডো এবং সাবমেরিন মাইনে এর ব্যবহার উল্লেখযোগ্য।

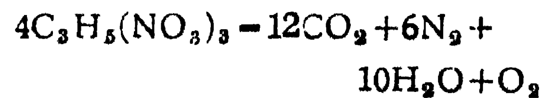
এর পরই আর একটি বহুল-প্রচলিত বিস্ফোরক হিসাবে নাইট্রো-গ্লিসারিনের নাম করতে হয়। গ্লিসারিনের রাসায়নিক সঙ্কেত $C_3H_5\,(OH)_3$। একে গাঢ় সালফিউরিক এবং গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিডের মিশ্রণের সাহায্যে নাইট্রেশন (Nitration) বিক্রিয়া করলে হরিদ্রাভ, তৈলাক্ত ও জলে অদ্রাব্য যে পদার্থ পাওয়া যায়, তাকেই বলা হয় নাইট্রো-গ্লিসারিন। এর রাসায়নিক নাম অবশ্য গ্লিসারিল ট্রাইনাইট্রেট। লোহা অথবা সীসার আস্তরণযুক্ত একটা আধারে উল্লিখিত দুটি অ্যাসিডের মিশ্রণের সঙ্গে গ্লিসারিন মিশিয়ে নাইট্রো-গ্লিসারিনের পণ্যোৎপাদন করা হয়। আধারটিকে শীতল জলের প্রবাহযুক্ত নলের সাহায্যে ঠাণ্ডা করা হয়। মিশ্রণের মধ্যে দিয়ে শুষ্ক বায়ু-প্রবাহ চালিয়ে মিশ্রণকে আলোড়িত করা হয়। এক্ষেত্রে নিম্নরূপ বিক্রিয়া হয়ে থাকে।



$$C_3H_5(OH)_3+3HNO_3=C_3H_5(NO_3)_3+3H_2O$$

উৎপন্ন পদার্থকে অন্য একটা আধারে নিয়ে অ্যাসিডকে থিতানো হয়। অ্যাসিডের উপর থেকে নাইট্রো-গ্লিসারিন অপসারিত করে জল এবং সোডিয়াম কার্বোনেট দ্রবণে ধুয়ে নেওয়া হয়।

নাইট্রো-গ্লিসারিন খুব সুবেদী ও শক্তিশালী বিস্ফোরক পদার্থ। এর বিস্ফোরণক্রিয়া নিম্নলিখিত সমীকরণ দ্বারা প্রকাশ করা হয়—



$$4C_3H_5(NO_3)_3=12CO_2+6N_2+10H_2O+O_2$$

উৎপন্ন গ্যাসের আয়তন বিস্ফোরকের আয়তনের প্রায় 11,000 গুণ। এর বিস্ফোরণের তীব্রতার জন্যে একে অন্য পদার্থের সঙ্গে মিশিয়ে তীব্রতা হ্রাস করে ব্যবহার করা হয়।

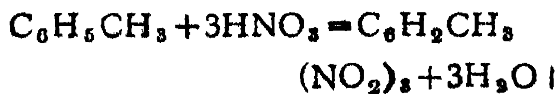
কিসেলগাড় (Kieselguhr), কাঠের মণ্ডজাতীয় সচ্ছিদ্র পদার্থে নাইট্রো-গ্লিসারিন শোষণ করিয়ে ডিনামাইট তৈরি করা হয়। এইভাবে প্রাপ্ত নমনীয় পদার্থকে (যাতে শতকরা 75 ভাগ নাইট্রো-গ্লিসারিন থাকে) গোলার আকার দেওয়া হয়। ডিনামাইট খুব সুবেদী নয়, একে ব্যবহার করবার জন্যে ডেটোনেটরের প্রয়োজন হয়। বিশেষ বিশেষ কাজের জন্যে বিশেষ বিশেষ শোষক

ব্যবহার করা হয়; যেমন—কাঠকয়লা, কাঠের তন্তু, কাঠের গুঁড়া ইত্যাদি। বিস্ফোরণের হার নিয়ন্ত্রণের জন্যে সোডিয়াম নাইট্রেট, পটাসিয়াম নাইট্রেট বা সালফার মিশ্রিত অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট যোগ করা হয়।

করডাইট হচ্ছে একটি ধোঁয়াশূন্য সামরিক বিস্ফোরক, কামান থেকে গোলা ছুঁড়তে প্রোপেলেন্ট হিসাবে ব্যবহৃত হয়। খনিতে ব্যবহারের পক্ষে করডাইট অত্যধিক ব্যয়বহুল। বিস্ফোরণের সময় রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে কোন কঠিন পদার্থ উৎপন্ন হয় না বলেই এতে ধোঁয়া উৎপন্ন হয় না। এতে শতকরা 37 ভাগ গান-কটন, 58 ভাগ নাইট্রো-গ্লিসারিন আর 5 ভাগ ভেসেলিন থাকে। নাইট্রো-গ্লিসারিন আর গান-কটন মিশিয়ে অ্যাসিটোন আর ভেসেলিন দিয়ে লেই প্রস্তুত করা হয়। এথেকে অ্যাসিটোন বাষ্পীভূত করিয়ে কঠিন পদার্থ উৎপন্ন করা হয়।

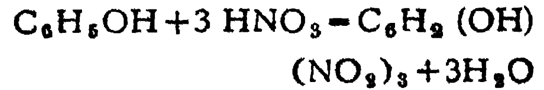
টি. এন. টি. বা ট্রাই-নাইট্রোটলুয়িন আর পিক্‌রিক অ্যাসিডজাতীয় উচ্চ বিস্ফোরক কামানের গোলা, টর্পেডো, মাইন ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়।

টি. এন. টি-র রাসায়নিক সঙ্কেত $C_6H_2CH_3(NO_2)_3$। টলুইনকে ($C_6H_5CH_3$) গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডের উপস্থিতিতে গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করিয়ে টি. এন. টি. পাওয়া যায়।



$$C_6H_5CH_3+3HNO_3=C_6H_2CH_3(NO_2)_3+3H_2O$$ ।

পিক্‌রিক অ্যাসিডের রাসায়নিক সঙ্কেত $C_6H_2OH(NO_2)_3$; উপরিউক্ত উপায়ে ফিনোলকে (C_6H_5OH) নাইট্রেশন করালে পিক্‌রিক অ্যাসিড পাওয়া যায়।



$$C_6H_5OH+3\ HNO_3=C_6H_2(OH)(NO_2)_3+3H_2O$$

আধুনিক উচ্চ বিস্ফোরকসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সাইক্লোনাইট, রাসায়নিক নাম ট্রাই-মেথিলিন ট্রাইনাইট্রামিন। শতকরা 70 ভাগ টি. এন. টি.-র সঙ্গে মিশিয়ে একে টর্পেডো, ক্ষেপণাস্ত্র ইত্যাদিতে ব্যবহার করা হয়। শতকরা 80 ভাগের বেশী অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট আর ডাই-নাইট্রোবেঞ্জিনযুক্ত রোবুরাইট আর বেলাইট খনিতে বিস্ফোরক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

এতক্ষণ আলোচিত সমস্ত বিস্ফোরকগুলিকে রাসায়নিক বিস্ফোরক বলা যেতে পারে। এর বেশীর ভাগকে বিস্ফোরিত করাবার জন্যে ডেটোনেটরের প্রয়োজন হয়। এটা আর কিছুই নয়, কোন কম শক্তিশালী পদার্থের বিস্ফোরণের সাহায্যে মূল বিস্ফোরকের বিস্ফোরণ ঘটানো। এই সকল পদার্থকে বলা হয় ডেটোনেটর। ডেটোনেটর হিসাবে মারকারি ফুলমিনেট [$Hg(OCN)_2$] বা লেড অ্যাজাইড [$Pb(N_3)_2$] ব্যবহৃত হয়।

পারমাণবিক ও হাইড্রোজেন বোমাকে নিউক্লিয়ার বিস্ফোরক বলা যায়। এদের কার্যপদ্ধতি রাসায়নিক বিস্ফোরকের কার্যপদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এগুলির বিস্ফোরণের তীব্রতাও ভীষণ। এক একটি পারমাণবিক বা হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ক্ষমতা কয়েক মিলিয়ন টন টি. এন. টি. হিসাবে পরিমাপ করা যায়। এথেকেই ঐ সকল বোমার বিস্ফোরণ-ক্ষমতা বোঝা যায়।

উপগ্রহের কথা

শ্রীঅলোককুমার সেন

আমাদের সৌরজগতের গ্রহের সংখ্যা হলো নয়। এদের মধ্যে বুধ, শুক্র আর প্লুটোর কোন উপগ্রহ এখনও আবিষ্কৃত হয় নি, অন্যান্য গ্রহের সম্মিলিত উপগ্রহ সংখ্যা একত্রিশ। বৃহস্পতির রয়েছে বারোটি উপগ্রহ। এর পরেই রয়েছে শনি নয়টি উপগ্রহ নিয়ে। তারপর একে একে আসে ইউরেনাস, নেপচুন ও মঙ্গল। তাদের উপগ্রহের সংখ্যা যথাক্রমে পাঁচ, দুই ও দুই। আর পৃথিবী রয়েছে তার একমাত্র উপগ্রহ—চন্দ্রকে নিয়ে। বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হলো, এসব উপগ্রহের জন্ম-রহস্য, উপাদান ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা।

প্রথমেই ধরা যাক বুধ আর শুক্র গ্রহকে। আমরা জানি যে, এদের কোন উপগ্রহ নেই, কিন্তু গত শতাব্দীতে কেপ্‌লারের সূত্র বিশ্লেষণ করে কোন কোন বিজ্ঞানী সিদ্ধান্ত নেন যে, উপগ্রহ ব্যতীত কোন গ্রহ সূর্যকে উপবৃত্তাকার পথে পরিভ্রমণ করতে পারে না। কারণ সূর্য আর কোন গ্রহের পারস্পরিক আকর্ষণ বলে গ্রহটি বৃত্তাকার পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করবে। তাই উপগ্রহের অবস্থানই গ্রহকে উপবৃত্তাকার পথে ঘুরতে বাধ্য করে। এই তত্ত্বের সত্যতা এখনো নিরূপিত হয় নি, তবে অনেকেই এর অনুকূলে মত প্রকাশ করছেন।

কয় বছর আগে থেকেই কেউ কেউ বলেছেন যে, বুধ হলো শুক্রের হারিয়ে-যাওয়া উপগ্রহ। সম্প্রতি এক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণায় এই সন্দেহের সত্যতা অনেকাংশে প্রমাণিত হয়েছে। আমরা জানি যে, সূর্য পরিক্রমায় বুধের সময় লাগে 44 দিন আর সে সময়ের মধ্যে সে একবার আপন কক্ষ ঘিরে পাক খায়। তার মানে বুধের বেলায় দিন ও বছর সমান।

1965 সালের এপ্রিল মাসে মার্কিন ভূ-পদার্থ বিজ্ঞানী সংসদের এক অধিবেশনে এই চিরন্তন সত্যের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুললেন কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপক। এঁদের মধ্যে আছেন গর্ডন পেটেনজিল, রল্‌ফ ডাইস ও গোল্ড। এঁরা পুর্টোরিকার আরেসিবো শহরে পৃথিবীর বৃহত্তম রেডিও-রেডার দূরবীনের মাধ্যমে বুধ সম্বন্ধে নানা তথ্যানুসন্ধান করেছেন। তাঁদের অনুসন্ধান থেকে দেখা যায় যে, বুধ তার আপন কক্ষে এক বার ঘুরতে সময় নেয় 54 থেকে 64 দিন (যদি তার পাকের গতি সূর্য প্রদক্ষিণের গতির দিকে হয়) অথবা 41 থেকে 51 দিন (পাকের গতি প্রদক্ষিণ গতির বিপরীতমুখী হলে)। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, সূর্যের এত কাছে থেকেও (সূর্য থেকে বুধের দূরত্ব 3 কোটি 60 লক্ষ মাইল) বুধ কিভাবে তার নিজস্ব গতি বজায় রাখে?

এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন টমাস গোল্ড। তিনি গাণিতিক পদ্ধতিতে প্রমাণ করেছেন যে, বুধের গতি একই কক্ষে 40 কোটি বছরের বেশী থাকতে পারে না। কাজেই অনুমান করা হচ্ছে, এককালে বুধ ছিল শুক্রের উপগ্রহ। পরে সে শুক্র থেকে দূরে সরতে থাকে এবং অবশেষে সূর্যের বন্ধনে বন্দী হয়ে যায়। বুধ হারিয়ে-যাওয়া উপগ্রহ বলে সনাক্ত করবার আর একটি কারণ হলো এই যে, তার কক্ষপথ অন্যান্য গ্রহের তুলনায় বেশী উপবৃত্তাকার।

তাছাড়া রেডারের পরীক্ষায় বুধ ও চাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য পাওয়া গেছে। দুই-ই

উষ্ণ, ক্ষুদ্র, এদের ত্বক মোটামুটি মসৃণ, মাঝে মাঝে রয়েছে খাদ ও আগ্নেয়গিরি।

এবার আসা যাক চাঁদের কথায়। চাঁদ হলো আমাদের এক মাত্র উপগ্রহ, পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব 2,38,840 মাইল। পৃথিবীর চার পাশে ঘুরতে সে সময় নেয় 27·32 দিন। চাঁদ যে সময়ে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে, ঠিক সেই সময়ের মধ্যেই নিজের মেরুদণ্ডের চতুর্দিকে একবার ঘুরে যায়। এই কারণে তার একদিক চিরদিনই অদৃশ্য থেকে যায় পৃথিবীর মানুষের কাছে।

গত কয়েক বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়ার বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় চাঁদ সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা গেছে। অ্যাপেলো-11 ও অ্যাপেলো-12-র চন্দ্রপৃষ্ঠে পদার্পণের পর এই উপগ্রহটি সম্বন্ধে আমাদের ঔৎসুক্য ও কৌতূহলের সীমা নেই।

এতদিন ধরে আমরা জেনে এসেছি যে, চাঁদ হলো পৃথিবীরই বিচ্ছিন্ন অংশ। বহু কোটি বছর আগে কোন এক অজানা জ্যোতিষ্কের আকর্ষণে পৃথিবীর প্রশান্ত মহাসাগরের এক অঞ্চল—ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়ে চাঁদে পরিণত হয়—এটাই হলো সর্বজনস্বীকৃত সিদ্ধান্ত। কিন্তু চাঁদ থেকে প্রাপ্ত শিলার বিশ্লেষণে জানা গেছে যে, তার উৎস পৃথিবী নয়। প্রধানতঃ দুটি কারণে বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই কারণ দুটির প্রথমটি হলো—চান্দ্রশিলার কোন কোনটির বয়স পৃথিবীতে প্রাপ্ত সর্বপ্রাচীন শিলার বয়সের চেয়েও বেশী, দ্বিতীয়টি—চাঁদের পাথরে প্রাপ্ত মৌলিক পদার্থ পৃথিবীতে রয়েছে অত্যন্ত অল্প পরিমাণে, আবার এদের কয়টির অস্তিত্ব আমাদের গ্রহে নেই।

তাহলে চাঁদের জন্ম হলো কিভাবে? অনেকের মতে, প্রাচীনকালে চাঁদ ছিল একটি পৃথক গ্রহ। পরে পৃথিবীর আকর্ষণে তার উপগ্রহে পরিণত হয়।

সৌরজগতের চতুর্থ গ্রহ মঙ্গলের উপগ্রহের সংখ্যা দুই—ফোবোস আর ডিমোস। গ্রীক ভাষায় প্রথমটির অর্থ ভয়, দ্বিতীয়টির মানে ত্রাস। প্রসঙ্গতঃ মঙ্গলের ল্যাটিন নামটিও উল্লেখ করা যায়। মঙ্গলের নাম মার্স, যার মানে যুদ্ধ-দেবতা অর্থাৎ যুদ্ধের দেবতা তাঁর দুই অনুচর 'ভয়' ও 'ত্রাস'-কে নিয়ে বিরাজ করছেন মহাশূন্যে।

1877 সালে আমেরিকার আসফ হল সর্বপ্রথম উপগ্রহ দুটির অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করেন। সে বছরেই শিয়াপেরেলি মঙ্গলগ্রহে খালের অস্তিত্বের কথা প্রচার করেন। মঙ্গল থেকে ফোবোসের দূরত্ব 5,823 মাইল, এটির ব্যাস 10 মাইল, কক্ষপরিক্রমার সময় 7 ঘণ্টা 39 মিনিট। ডিমোসের দূরত্ব 15,000 মাইল, ব্যাস 5 মাইল, কক্ষ পরিক্রমা করতে সময় লাগে 30 ঘণ্টা 18 মিনিট

এই উপগ্রহটি আবিষ্কৃত হবার প্রায় দেড়-শ' বছর আগে জোনাথান সুইফ্‌ট তাঁর 'গ্যালিভারের ভ্রমণ কাহিনী' গ্রন্থে লিখেছিলেন যে, আপুটা দেশের অধিবাসীরা মঙ্গলের দুটি উপগ্রহ আবিষ্কার করেছে। এদের প্রথমটি গ্রহের চারপাশে ঘোরে 10 ঘণ্টায় আর দ্বিতীয়টি 21·5 ঘণ্টায়। এদের দূরত্ব যথাক্রমে 6,000 ও 12,000 মাইল। অষ্টাদশ শতকের এই লেখার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক তথ্যের সাদৃশ্য আমাদের বিস্মিত করে।

মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে রয়েছে অসংখ্য গ্রহাণুপুঞ্জ। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়টির নাম সিরিশ। গ্রহাণুপুঞ্জের পর বৃহস্পতি তার এক ডজন উপগ্রহ নিয়ে বিদ্যমান। এই গ্রহের সবচেয়ে বড় উপগ্রহটির নাম গ্যানিমিড, তার আকার বুধের চেয়েও বড়। প্রথম চারটি উপ গ্রহের (1নং তালিকা) ব্যাস 1760 থেকে 3000 মাইলের মধ্যে, বাকী আটটির 10 থেকে 100 মাইলের মধ্যে।

বৃহস্পতির নিকটতম অনামা উপগ্রহটি তার মহাকর্ষীয় টানে এখন প্রায় ডিম্বাকার হয়েছে,

অনুমান করা হয় যে, ভবিষ্যতে সে আরও কাছে আসবে, তারপর হবে দু-টুক্‌রা। ক্রমে এই দুই খণ্ড আবার বিভক্ত হবে—জ্যামিতিক প্রগতিতে (Geometric progression)। এই ভাঙার কাজ চলবে বহুদিন ধরে। অবশেষে বর্তমান উপগ্রহটি বলয় গঠন করবে—যেমন বলয় আমরা দেখি শনির চারপাশে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, চাঁদের পরিণতি সম্পর্কেও অনেকে এই মন্তব্য করেছেন। তাঁরা বলছেন, পৃথিবী ও চাঁদের দূরত্ব নাকি ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে। এর ফলে ভবিষ্যতে চাঁদের উপর পৃথিবীর আকর্ষণ বৃদ্ধি পাবে। আমাদের চাঁদও তখন ভেঙ্গে টুক্‌রা টুক্‌রা হয়ে অসংখ্য উপগ্রহে পরিণত হবে। তখন বিপদও দেখা দেবে নানা রকম। ক্ষুদে চাঁদেরা পারস্পরিক সংঘর্ষে অথবা পৃথিবীর আকর্ষণে লাফিয়ে পড়বে বাতাসের উপর, দেখা দেবে চান্দ্রশিলার বর্ষণ। তখনও যদি মানুষ থাকে এই পৃথিবীতে, তাহলে তাদের পক্ষে এই বৃষ্টির মধ্যে বেঁচে থাকা হবে কঠিন ব্যাপার।

সূর্য থেকে 88·8 কোটি মাইল দূরে তিনটি উজ্জ্বল বলয় ও নয়টি উপগ্রহকে সঙ্গে নিয়ে শনির অবস্থান। বলয়ের বাইরে রয়েছে নিকটতম উপগ্রহ—মিমাস, শনি থেকে যার দূরত্ব 1,17,000 মাইল। আশা করা যায় যে, পরবর্তী শতকের মহাকাশচারীরা শনিকে পর্যবেক্ষণ করতে মিমাসের বুকে নামবেন। দ্বিতীয়টির নাম এনসেলাডাস, দূরত্ব 1,57,000 মাইল। এই দুটি উপগ্রহকে দেখলে বরফের তৈরি মসৃণ গোলক বলে মনে হয়।

শনির সবচেয়ে বড় উপগ্রহ হলো টাইটান। বুধের সমান এর আয়তন, মঙ্গলের মত কমলা রং। সৌরজগতের 31টি উপগ্রহের মধ্যে একমাত্র এরই বায়ুমণ্ডল দেখা যায়, তবে এই অপার্থিব বাতাসের প্রধান উপাদান হলো আলেয়া গ্যাস, যার মধ্যে পার্থিব প্রাণের স্পন্দন কোন দিনই শোনা যাবে না।

শনির দূরতম উপগ্রহ ফোয়েব। সৌরজগতের যে দুটি উপগ্রহের গতি নিজ নিজ গ্রহের আবর্তনগতির বিপরীতমুখী, ফোয়েব তাদের অন্যতম।

1781 সালে বিখ্যাত বিজ্ঞানী উইলিয়াম হার্শেল ইউরেনাস গ্রহ আবিষ্কার করেন। এই গ্রহটির উপগ্রহের সংখ্যা পাঁচ। তাদের মধ্যে সবচেয়ে কাছেরটির নাম আরিয়েল, দূরত্ব 1,20,000 মাইল। সর্বশেষ উপগ্রহ মিরাণ্ডার দূরত্ব 4 লক্ষ মাইলেরও বেশী। এই পাঁচটি উপগ্রহই যে ইউরেনাস থেকে সৃষ্ট, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারণ এরা সব একই জাতীয় পদার্থে গঠিত।

ট্রাইটন আর নেরেইড নামক দুটি উপগ্রহ নিয়ে গঠিত নেপচুনের সংসার। ট্রাইটনের আবিষ্কর্তা ল্যাসেল। নেপচুনকে খুঁজে পাবার মাত্র একুশ দিন পরে তিনি এই উপগ্রহের অবস্থান প্রমাণিত করেন। নেপচুন থেকে এর দূরত্ব 2,21,500 মাইল, কক্ষ আবর্তনের সময় 5·88 দিন। সৌরজগতের সমস্ত উপগ্রহের মধ্যে এর ভর সবচেয়ে বেশী। ট্রাইটনের ব্যাস মোটামুটি 3,000 মাইল। এখানে মুক্তি-বেগের বেগ উঁচু বলে আবহাওয়া থাকতে পারে। নেপচুনের আকাশে ট্রাইটনকে বেশ বড় দেখায়, কিন্তু অত দূর অঞ্চলে সূর্যের রশ্মির প্রভাব এত কম যে, ট্রাইটনের প্রতিফলন শক্তি থাকা সত্ত্বেও তাকে বিবর্ণ দেখায়।

1949 সালে কুইপার দ্বিতীয় উপগ্রহ নেরেইডকে আবিষ্কার করেন। এর ব্যাস সম্ভবতঃ 200 মাইল, কক্ষপথ অনেকটা ধূমকেতুর মত। নেপচুন থেকে এর নিকটতম ও দূরতম দূরত্ব যথাক্রমে 10 লক্ষ ও 60 লক্ষ মাইল। সবচেয়ে দূরে থাকবার সময় এটিকে কক্ষে একবার পূর্ণ আবর্তিত হতে এক বছর সময় নেয়। নেরেইডের ঔজ্জ্বল্য

যখন সবচেয়ে বেশী, তখন নেপচুনের আকাশে তাকে দেখায় অস্পষ্ট আলোকবিন্দুর মত।

সৌরজগতের নবম গ্রহ প্লুটোকে গ্রহ না বলে নেপচুনের হারিয়ে-যাওয়া উপগ্রহ বলাই বোধ হয় ঠিক হবে। প্লুটোর পরিভ্রমণ পথ বিশ্লেষণ করে সম্প্রতি এক রুশ বিজ্ঞানী বলেছেন যে, এটি হলো নেপচুনের সুপ্ত উপগ্রহ, সৌরলোক সৃষ্টির পর নেপচুন তাকে হারায়। তিনি আরও বলেন, বহু কোটি বছর আগের সূর্য উজ্জ্বল হয়ে নেপচুনের সদ্যোজাত আবহাওয়া থেকে কিছু গ্যাস বের করে দেয়। তার ফলে গ্রহটির ভর ও অভিকর্ষের টান এত কমে যায় যে, প্লুটো তার টান থেকে মুক্ত হয়ে পরিচিত হয় পৃথক গ্রহরূপে। আবার হয়তো সে ধরা পড়বে নেপচুনের বন্ধনে। এখনই এমন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। প্লুটোর চাপা কক্ষপথ তাকে নেপচুনের কক্ষপথের ভিতর দিকে নিয়ে আসে, তখন ঐ গ্রহের থেকে সে প্রায় 3·5 কোটি মাইল এগিয়ে থাকে সূর্যের দিকে। এই অবস্থায় সে সহজেই আবার উপগ্রহে রূপান্তরিত হতে পারে।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, নেপচুনের উপগ্রহ ট্রাইটনও এই রকম মুক্তি পেয়েছিল, কিন্তু পরে কাছে এসে সে আবার ধরা পড়ে। কিন্তু এবার তার প্রদক্ষিণ গতির পথ উল্টে যায়।

বুধকে শুক্রের আর প্লুটোকে নেপচুনের উপগ্রহ হিসাবে ধরলে সৌরজগতের গ্রহের সংখ্যা হবে সাত, তার উপগ্রহের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে তেত্রিশ। তবে এই রকম কথা জোর দিয়ে বলা সম্ভব নয়।

1 নং তালিকা

গ্রহ	উপগ্রহের সংখ্যা	উপগ্রহ	গ্রহ থেকে দূরত্ব (মাইলে)	কক্ষ পরিক্রমা (দিনে)
বুধ	0			
শুক্র	0			
পৃথিবী	1	চন্দ্র	2,38,840	27·32
মঙ্গল	2	ফোবোস	5,828	0·32
		ডিমোস	15,000	1·26
বৃহস্পতি	12	আইয়ো	2,61,000	1·77
		ইউরোপা	4,15,000	3·55
		কলিস্তো	11,67,000	16·69
		গ্যানিমিড	6,64,000	7·15
		অনামা	1,12,500	0·50
		,,	71,10,000	250·6
		,,	1,49,40,000	738·90
		,,	1,49,40,000	745·00
		,,	71,85,000	254·20
		,,	1,40,24,800	652·50
		,,	?	?
		,,	?	?

গ্রহ	উপগ্রহের সংখ্যা	উপগ্রহ	গ্রহ থেকে দূরত্ব (মাইলে)	কক্ষ পরিক্রমা (দিনে)
শনি	9	মিমাস	1,17,000	0·94
		এনসেলাডাস	1,57,000	1·37
		তেথিস	1,86,000	1·89
		ডিওন	2,34,000	2·74
		রিয়া	3,32,000	4·52
		টাইটান	7,71,000	15·95
		হাইপেরিয়ন	9,34,000	21·28
		আয়াপেটাস	22,25,000	79·33
		ফোয়েব	80,54,000	550·45
ইউরেনাস	5	আরিয়েল	1,20,000	2·52
		আমব্রিয়েল	1,67,000	9·14
		টাইটানিয়া	2,73,000	8 71
		ওবেরোন	3,65,000	13·46
		মিরাণ্ডা	?	1·40
নেপচুন	2	ট্রাইটন	2,21,500	5·88
		নেরেইড	?	?
প্লুটো	0			

সঞ্চয়ন

দৈহিক এবং মানসিক রোগ নিরাময়ে অনশন

মস্কোর মানসিক রোগের চিকিৎসা কেন্দ্রের প্রধান অধ্যাপক ওয়াই. এস. নিকোলায়েভ সম্প্রতি ভারত দর্শনে এসেছিলেন। চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর গবেষণামূলক কাজ ডাক্তার এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রবল কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছে।

অধ্যাপক নিকোলায়েভ একজন চিকিৎসক, কিন্তু একটু স্বতন্ত্র ধরণের। দৈহিক এবং মানসিক অনেক রোগ নিরাময়কল্পে তিনি অনশন এবং যোগবিদ্যা প্রয়োগ করেন এবং তাতে ফল ভালই হয়। এই মানুষটির বয়স অনেক দিন ষাট পেরিয়ে গেছে। চল্লিশ বছর ধরে তিনি মনোরোগের গবেষণায় গভীরভাবে ব্যাপৃত আছেন। কিভাবে অনশনের দ্বারা রোগমুক্তির সুপ্রাচীন পদ্ধতিকে বিকশিত করা যায় এবং কিভাবে এই চিকিৎসা-পদ্ধতিকে একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড় করানো যায়—গত পঁচিশ বছর যাবৎ তিনি সেই চেষ্টা করে চলেছেন। মানসিক রোগ নিরাময়ে পৃথিবীতে তিনিই প্রথম অনশন পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। তিনি নিজেই বলেছেন যে, চিকিৎসার

ক্ষেত্রে যদি দৈহিক এবং মানসিক ঔষধের মিলিত প্রয়োগ ঘটে, তবেই তা সবচেয়ে বেশী ফলপ্রসূ হয়।

অধ্যাপক নিকোলায়েভ বলেছেন যে, তাঁর মানসিক রোগ সারাবার পদ্ধতি অন্যান্য পদ্ধতির থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। প্রথমতঃ, এতে রোগ সারাবার দৈহিক পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত হবে অন্যান্য ঔষধ ও পরীক্ষার জন্যে যন্ত্রপাতি।

দ্বিতীয়তঃ, এই পদ্ধতির সঙ্গে আয়ুর্বেদীয় এবং যৌগিক পদ্ধতির মূলগত পার্থক্য আছে। পার্থক্যটা এই যে, রোগ নির্ণয়ের জন্যে সব রকম ব্যবস্থা করা হয়, তাতে সমসাময়িক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সমস্ত পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়, যেমন—রঞ্জেন রশ্মি, আধুনিক গবেষণাগার এবং বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাশাস্ত্রের সর্বপ্রকার পদ্ধতি।

অধ্যাপক নিকোলায়েভ বলেছেন যে, ব্যাপক-ভাবে তাত্ত্বিক গবেষণা-সৃষ্ট এই সমন্বয়ের ফলে মানসিক ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম অনেক বেশী ফলপ্রসূ হবে। এই সব জটিল ব্যাধি অন্য কোন ভাবে সারানো যায় না।

কিন্তু তবু এখনো অনেক কিছু করবার আছে। নিকোলায়েভ বলেছেন—তাঁর চিকিৎসা কেন্দ্রে 5000 রোগী চিকিৎসিত হন। তার মধ্যে 60 থেকে 80 শতাংশ রোগমুক্ত হয়ে হাসপাতাল ছাড়েন। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে, এদের প্রতিটি ক্ষেত্রে কোন চিকিৎসায়ই আগে কোন ফল হয় নি।

তিনি এই বিষয়ে নিঃসন্দেহ, যে সব মানসিক ব্যাধি আধুনিক ঔষধে নিরাময় হয়, সেই সব মানসিক ব্যাধি অনশন পদ্ধতিতে অনেক তাড়া-তাড়ি ভালভাবে সারে।

তাঁর চিকিৎসা কেন্দ্রের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, সেখানে চিকিৎসার সব রকমের আধুনিক ব্যবস্থা আছে। সেখানে 12 জন ডাক্তার এবং 80টি শয্যা আছে। নিজের দৈনন্দিন কর্তব্য কাজ ছাড়াও প্রতিটি ডাক্তার একটি বিশেষ বিষয়ে গবেষণা চালান।

আসলে অনশনের দ্বারা রোগ নিরাময়ের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে সোভিয়েট ইউনিয়নে চালু ছিল। আর এই পদ্ধতির প্রবক্তা ছিলেন রুশ ডাক্তার পাশুতিন। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, অনশন-পদ্ধতির বাস্তব ভিত্তি ভারতবর্ষেই প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল এবং তারপর কোন না কোন প্রকারে তা রাশিয়ায়ও চালু হয়েছে।

এই বিষয়ে অনুসন্ধান করবার জন্যে তিনি দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষে এসেছেন, কিন্তু ভারতীয় প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভের জন্যে তাঁকে বারবার ভারতে আসতে হবে।

ভারতে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা পদ্ধতির উল্লেখ করে অধ্যাপক নিকোলায়েভ বলেন যে, এই চিকিৎসা পদ্ধতি এদেশে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয় না। কিন্তু তিনি মনে করেন তার সম্ভাবনা আছে।

অনশন-পদ্ধতিতে রোগ সারাবার জন্যে ভারতে কয়েকটি চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হয়েছে। তিনি তার প্রশংসা করেন।

অধ্যাপক নিকোলায়েভ অনশন-পদ্ধতিতে রোগমুক্তি সম্পর্কে কিছু মূল্যবান তথ্য নিয়ে যাচ্ছেন। এগুলি তিনি তাঁর চিকিৎসা কেন্দ্রের রোগীদের উপর প্রয়োগ করবেন।

বিমান ও মহাকাশযানের সাহায্যে প্রাকৃতিক সম্পদের সন্ধান

কয়েক বছর আগে আইসল্যাণ্ডের কয়েক জন মৎস্য-শিকারী আটলাণ্টিকের একটি উপসাগরে বেশ বড় এক ঝাঁক মাছের সন্ধান পেয়ে তাদের পিছনে ধাওয়া করে। কিছু দূর গিয়েই মাছের ঝাঁকটা কোথায় যেন হারিয়ে গেল, অনেক খোঁজা-খুঁজি করেও তাদের সন্ধান পাওয়া গেল না।

কিন্তু একজন বৈমানিক দিলেন সেই পলাতক মাছের ঝাঁকের সন্ধান। আটলাণ্টিকের জলের যে তাপমাত্রা, তার চেয়ে অন্ততঃ দশ ডিগ্রী উষ্ণতর উপসাগরের জল। সে কারণেই মাছগুলি সাধারণতঃ উপসাগর ছেড়ে যে সমুদ্রে যায় না— ঐ বৈমানিক তা জানতেন। সুতরাং ঐ মাছের ঝাঁক ঐ উষ্ণ জলধারার কোন কিনারায় নিশ্চয়ই লুকিয়ে রয়েছে—এই ছিল তাঁর সুনিশ্চিত ধারণা। সমুদ্র ও উপসাগরের মধ্যে যে অদৃশ্য সীমারেখা রয়েছে, সেখানেও ঐ মাছগুলি থাকতে পারে। ঐ বিমানে উপসাগর ও মহাসাগরের তাপমাত্রা নিরূপণ ও দূরবর্তী স্থানের তথ্যাদি সংগ্রহের যন্ত্রপাতি ছিল। এগুলিকে বলা হয় 'রিমোট সেন্সিং' যন্ত্র। এর সাহায্যে বিমানটি ঐ উপসাগরের উপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় জলের তাপমাত্রা নিরূপণ ও ওই সব মাছের অবস্থিতি নির্ণয় করে।

ভূগর্ভে লুক্কায়িত পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদের অবস্থান নির্ণয়েও আমেরিকা ঐ সকল যন্ত্রের সাহায্যে নিচ্ছে এবং কেবল বিমানে নয়, মহা-কাশযানে রক্ষিত ঐ সকল স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যেও ভূগর্ভে লুক্কায়িত সম্পদের সন্ধানে উদ্যোগী হয়েছে। আশা করা যায়, আগামী বছরেই আমেরিকার একটি সম্পদ-সন্ধানী উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হবে।

পৃথিবীর সকল বস্তু থেকেই বিদ্যুৎ-চৌম্বক তেজস্ক্রিয় শক্তি বা ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক রেডিয়েশন বিচ্ছুরিত হয়, কিন্তু খালি চোখে তা দেখা যায় না এবং অপটিক্যাল ক্যামেরার সাহায্যেও তার ছবি তোলা যায় না। তবে ক্যামেরায় কালার ফিল্টার দিয়ে বিভিন্ন স্তরের অবলোহিত রশ্মির তেজস্ক্রিয়তার ছবি তোলা যায়। বিভিন্ন স্তরের তেজস্ক্রিয়তা থেকে বিভিন্ন বস্তুর অস্তিত্ব নিরূপিত হয়।

সমগ্র পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদের সন্ধান নিতে হলে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের এই ব্যাপারে সহযোগিতা প্রয়োজন। গত মে মাসে আমেরিকার মিচিগান রাজ্যের আনআরবারে জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা দু-সপ্তাহের জন্যে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে। ঐ সভায় 37টি দেশের এবং 12টি আন্তর্জাতিক সংস্থার চার শতেরও বেশী বিজ্ঞানী ও পদস্থ কর্মচারীরা অংশগ্রহণ করেন। ভারতের পক্ষে ইণ্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গ্যানিজেশন-এর ডক্টর টি. এ. হরিহরণ, ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচার্যাল রিসার্চ ইন-স্টিটিউটের ডক্টর এ. এস. সম্মানাভার, জিওলোজি-ক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার কে. উন্নি, সার্ভে ট্রেনিং স্কুলের কর্ণেল এন. কে. সেন, ইণ্ডিয়ান ফটো ইনটারপ্রিটেশন ইনস্টিটিউটের কর্ণেল আর. কে. আগওয়ালা এবং ফিজিক্যাল রিসার্চ লেবরেটরীর ডক্টর পি. আর. পিশারটি ঐ বৈঠকে যোগদান করেছিলেন।

ঐ সকল বৈঠকে আমেরিকার জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থার বিজ্ঞানী 'রিমোট সেন্সিং' পদ্ধতি বিশ্লেষণ করেন এবং এই পদ্ধতি যে কৃষি-বিজ্ঞান, বন-বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, জল-বিজ্ঞান, সমুদ্র-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এবং পরিবেশ ও জলবায়ু দূষিতকরণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে, তা বিশদভাবে ব্যাখ্যা ও প্রতিপাদন করেন।

মার্কিন জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ

সংস্থার আন্তর্জাতিক বিষয় বিভাগের সহকারী কর্ম পরিচালক আর্নল্ড ক্রুটকিন ঐ বৈঠকে বলেন যে, পৃথিবীর প্রথম সম্পদ-সন্ধানী উপগ্রহের সাহায্যে সংগৃহীত তথ্যাদি ঐ কার্যসূচী সমাপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই আগ্রহশীল রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বন্টন করা হবে। তবে পৃথিবীর যে সকল দেশে মহাকাশযান থেকে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে প্রেরিত তথ্য সংগ্রহ করবার ব্যবস্থা রয়েছে, সেই সকল দেশ ঐ উপগ্রহ থেকে সরাসরিই তথ্যাদি পেয়ে যাবে। যে সকল দেশে তা নেই, সেই সকল দেশকে মার্কিন জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা এবং অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠান ঐ সকল তথ্য সরবরাহ করবে।

ঐ বৈঠকে প্রধান ভারতীয় প্রতিনিধি ডক্টর পিশারটি 'রিমোট সেন্সিং' টেক্‌নোলজী সম্পর্কে ভারত যে বিশেষ আগ্রহশীল এবং এই বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রবেশ সম্পর্কে ভারতে যে পরীক্ষানিরীক্ষা চালানো হচ্ছে, তা জ্ঞাপন করেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনি দুটি পরীক্ষার কথা উল্লেখ করেন।

প্রথমতঃ, ভারতের কেরল রাজ্যে নারকেল গাছে এক প্রকার ভাইরাসবাহিত রোগ হয়। ঐ সকল ভাইরাসের সন্ধান এবং তাদের ধ্বংস করবার জন্যে এই 'রিমোট সেন্সিং' টেক্‌নোলোজীর সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। নারকেল গাছ ঐ রোগে আক্রান্ত হলে ফলন প্রচুর পরিমাণে কমে যায়। বহু বিস্তীর্ণ অঞ্চল এই রোগে আক্রান্ত হবার পর বাইরে তেমন কোন লক্ষণ দেখা যায় না। বাইরের লক্ষণ প্রকাশ হওয়া মাত্র মূলসহ ঐ গাছ উপড়ে ফেলতে হয়।

কিন্তু হেলিকপ্টারে রক্ষিত ক্যামেরায় অবলোহিত আলোয় গৃহীত আলোকচিত্রের মাধ্যমে নারকেল গাছের ঐ রোগ নিরূপণ এখন আর কঠিন কাজ নয়। বাইরে থেকে একটি সুস্থ ও পীড়িত নারকেল গাছ দেখতে সম্পূর্ণ এক রকম। বিজ্ঞানীরা এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, বিমান থেকে আলোকচিত্র গ্রহণকালে পীড়িত বৃক্ষসমূহের লাল রং সুস্থ বৃক্ষের তুলনায় অনেক কম দেখায়। ভারত সরকারকে এই কাজে আমেরিকার জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা সাহায্য করছে।

ডক্টর পিশারটি এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এই 'রিমোট সেন্সিং' পদ্ধতির সাহায্যে উদ্ভিদের রোগ গোড়াতেই ধরা পড়ে, ফলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায়। তবে এই পদ্ধতি কোন চিকিৎসা ব্যবস্থা নয়।

দ্বিতীয়তঃ, এই পদ্ধতির সাহায্যেই ভূগর্ভে সঞ্চিত ধাতব পদার্থের সন্ধান নেবার জন্যে ভারতে আর একটি পরীক্ষামূলক পরিকল্পনাও গৃহীত হয়েছে। বিজ্ঞানীরা এতে ম্যাগ্‌নেটোমিটার ও মাইক্রোওয়েভ যন্ত্র ব্যবহার করছেন। বিমানবাহিত ঐ সকল যন্ত্রের সাহায্যে ভারতের নানা স্থানে ধাতব পদার্থের সন্ধান নেওয়া হচ্ছে। কোন কোন বিদেশী বেসরকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান একাজে ভারত সরকারকে সাহায্য করেছেন।

ডক্টর পিশারটি প্রতিনিধিবর্গকে এই প্রসঙ্গে আরও বলেছেন যে, এই 'রিমোট সেন্সিং' টেক্‌নোলোজীর সাহায্যে সমুদ্রের উপরিভাগের তাপমাত্রা সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করে মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ বা বর্ষারম্ভের পূর্বাভাস জ্ঞাপন করা যায় কি না, সে বিষয়েও পরীক্ষা চালানো হচ্ছে।

তিনি বলেন যে, মৌসুমী বায়ুপ্রবাহের সঠিক সময় নির্ধারণ করতে পারলে বর্ষারম্ভের অন্ততঃ চার-পাঁচ দিন পূর্বে সঠিক পূর্বাভাস দিতে পারলে ভারতের কৃষিব্যবস্থার খুবই উপকার হতে পারে। এই মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ সমুদ্রের উপরিভাগের তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল।

বিমান বা মহাকাশযান থেকে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রাকৃতিক সম্পদের সন্ধানলাভ এবং আবহাওয়া সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান এই সকল ব্যবস্থার দ্বারা পৃথিবীর উন্নতিশীল রাষ্ট্রগুলিসহ সকলেই উপকৃত হবেন। এই পদ্ধতির সাহায্যে ভবিষ্যতে মানুষের জীবনকে সমৃদ্ধতর করবার এবং প্রাকৃতিক সম্পদ অধিকতর পরিমাণে ব্যবহার করবার যে বিশেষ সম্ভাবনা রয়েছে, তা আলোচনা সভায় সমবেত সকলেই স্বীকার করেন।

টায়ারের কথা

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়*

প্রতিদিন সারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের পথে পথে মোটরযান ও ট্রাকে লক্ষ লক্ষ মানুষ ও পণ্যসামগ্রী বাহিত হয়ে থাকে। এই স্বয়ংচালিত যানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে টায়ার। আমাদের দেশে মোটরযান শিল্প যেমন ক্রমশঃ প্রসার লাভ করছে ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠছে, তেমনি টায়ার শিল্পও আজ এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

গত জানুয়ারী মাসে ব্যাঙ্গালোরে বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হবার পর মার্কিন তথ্য-কেন্দ্রের আমন্ত্রণে মাদ্রাজ শহরের উপকণ্ঠে তিরুবতী আয়ার অঞ্চলে মাদ্রাজ রাবার ফ্যাক্টরী দেখবার সুযোগ হয়। এই কারখানায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ম্যানসফিল্ড' প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় মোটরগাড়ী ও ট্রাকের উন্নত ধরণের টায়ার নির্মিত হচ্ছে। কারখানার ম্যানেজার শ্রীজে. ভি. রামানা এবং টায়ার নির্মাণের ম্যানেজার শ্রী টি. ইয়াপেন কোশী আমাদের কারখানার বিভিন্ন বিভাগ ঘুরিয়ে দেখান এবং টায়ার নির্মাণের সমস্ত কলকৌশলের ব্যাখ্যা করেন।

টায়ারের আদি কথা

মোটরগাড়ীর আদি যুগে গাড়ীতে নীরেট টায়ার ব্যবহৃত হতো। নীরেট টায়ার খুব ভারী বলে আইরিশ বিজ্ঞানী ডানলপ ফাঁপা টায়ারের প্রচলন করেন 1893 খৃষ্টাব্দে। এগুলির গা ছিল সমতল। এজন্যে এই টায়ার পিছলে যেত অনেক সময়। এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্যে আবিষ্কৃত হয় খাঁজ-কাটা (Non-skid) টায়ার। এরপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গুডইয়ার টায়ার জোড়া দেবার ভালকানিজেশন পদ্ধতি (Vulcanisation) আবিষ্কার করেন।

গুডইয়ার ছিলেন ফিলাডেলফিয়ার একজন ব্যবসায়ী। অল্প বয়স থেকেই তিনি রাবারকে এমনভাবে তৈরি করতে চেয়েছিলেন, যাতে সেটা খুব ঠাণ্ডা বা খুব গরমে টেক্সই হয়। গুডইয়ার কিন্তু রসায়নবিদ্যা জানতেন না কিছুই। রাবারের সঙ্গে এটা-ওটা মিশিয়ে তিনি পরীক্ষা করতেন, অবশ্য জানতেন না তার ফল কি হবে।

একদিন তিনি রাবারের আঠার সঙ্গে গন্ধক মিশিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। মিশ্রিত জিনিষ খানিকটা পড়ে গেল একটা উত্তপ্ত ষ্টোভের উপর। তিনি বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন, ওটা গলে গেল না। গুডইয়ার যা চাচ্ছিলেন, তা-ই আকস্মিকভাবে পেয়ে গেলেন। ফলে আবিষ্কৃত হলো মোটরগাড়ীর আধুনিক টায়ার।

টায়ারের বিভিন্ন অংশ

আজকাল মোটরগাড়ী ও ট্রাকে যে টায়ার ব্যবহৃত হয়, তা প্রধানতঃ তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত। এই তিনটি অংশ হচ্ছে—(1) ট্রেড (Tread), (2) প্লাইজ (Plies), (3) বীড্‌স (Beads)। ট্রেড বলতে বোঝায় টায়ারের সেই অংশটি—যা পথের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে এবং পথে চলাচলের ফলে যা কালক্রমে জীর্ণ হয়। যে ধরণের গাড়ীতে (যাত্রীবাহী বা পণ্যবাহী ট্রাক) টায়ার লাগানো হবে এবং যে ধরণের

---

*দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ, কলকাতা-29।

রাস্তার উপর দিয়ে গাড়ী যাতায়াত করবে, সেই অনুযায়ী টায়ারের আকার ও তার প্রস্তুত-প্রণালীর তারতম্য ঘটে। পথে চলাচলের সময় ট্রেড অংশটি কেটে, ছিঁড়ে বা ফেটে যেতে পারে। একারণে ট্রেড অংশটি যাতে তাড়াতাড়ি জীর্ণ না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রেখে টায়ার-বিশেষজ্ঞ রসায়ন-বিজ্ঞানীরা টায়ার প্রস্তুতের সময় যথোপযুক্ত রাসায়নিক পদার্থসমূহ সুষম পরিমাণে ব্যবহার করেন। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এমনভাবে টায়ার প্রস্তুত করা, যাতে পিছ্লানো রোধ করা যায়, টায়ার সবচেয়ে কম নমনীয় হয়, অনিয়মিতভাবে জীর্ণ না হয় এবং যতদূর সম্ভব বেশী দিন ভালভাবে চলতে পারে।

টায়ারের প্লাইজ অংশটিকে আমাদের দেহের অস্থি-কাঠামোর সঙ্গে তুলনা করা যায়। সংশ্লিষ্ট মহলে চলতি কথায় এদের বলা হয় ক্যানভাস বা কারক্যাস। টায়ারের এই অংশটি ভারী বোঝা বহনের শক্তি যোগায় এবং সাধারণতঃ এমন শক্ত হয় যে, বাইরের অংশ (ট্রেড) একাধিকবার বদ্‌লানো যেতে পারে। প্লাইজ হচ্ছে বলতে গেলে একটি তন্তুজ কাঠামো। সাধারণতঃ নাইলন বা কৃত্রিম রেশম দিয়ে এই তন্তু তৈরি হয়। পরপর দুটি তন্তুর মাঝখানে থাকে একটি স্থিতিস্থাপক রাবারের স্তর, যার ফলে তন্তুগুলি পরস্পর থেকে তাপ-অন্তরিত হয়। এই ধরণের কয়েকটি প্লাইজ এমনভাবে সাজানো হয়, যাতে একান্তর প্লাইজ একটা নির্দিষ্ট কোণে ছেদ করে। এই কোণ হচ্ছে টায়ার প্রস্তুতের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্লাইজে যে রাবার যৌগগুলি ব্যবহার করা হয়, সেগুলি তন্তুর সঙ্গে এঁটে লেগে থাকতে বিশেষ সাহায্য করে এবং স্থিতিস্থাপকতা অনেকখানি বাড়িয়ে দেয় ও আভ্যন্তরীণ তাপ উৎপাদন যতদূর সম্ভব কমিয়ে আনে।

বীড বলতে টায়ারের সেই অংশকে বোঝায়, যা মোটরযানের চাকার বেড়ের সঙ্গে টায়ারকে ধরে রাখে। বীড তৈরি হয় উচ্চ প্রসারণশীল ইস্পাতের তার দিয়ে। ইস্পাতের তার ছাড়া বীড তৈরির উপকরণে থাকে রাবারের খাদ, রাবারের অংশবিশেষ। এই সমস্ত উপকরণ টায়ারের বীড অংশকে চাপ ও টানের ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে রক্ষা করে এবং টায়ারকে সুদৃঢ় থাকবার শক্তি যোগায়।

টায়ারের প্রস্তুত-প্রণালী

যে কোন টায়ারের কারখানায় গেলে প্রথমে চোখে পড়ে বানবারি মিক্সার (Banbury Mixer)। এই মিশ্রণ যন্ত্রে রাবার ও কনভেয়র বেল্টের সাহায্যে বাহিত বিবিধ রাসায়নিক দ্রব্য মেশানো হয় এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যে প্রায় 500 পাউণ্ড ওজনের মিশ্রিত রাবার যৌগ বেরিয়ে আসে। উপকরণগুলি যাতে সম্পূর্ণ ও সমভাবে মিশ্রিত হয়, তার জন্যে এরপর একটি খোলা মিলে (মিশ্রণের আধার) মিশ্রণকারী যন্ত্রের সাহায্যে আরও ভালভাবে মেশানো হয়। এই সময় যে সব রাসায়নিক দ্রব্য যোগ করা হয়, সেগুলি হচ্ছে গন্ধক, কার্বন-ব্ল্যাক, জিঙ্ক অক্সাইড, স্টিয়ারিক অ্যাসিড ইত্যাদি। এর মধ্যে কতকগুলি দেওয়া হয় মিশ্রণকার্য ঠিকভাবে সম্পাদনের জন্যে, কতকগুলি দেওয়া হয় রাবারের অক্সিজেন সংযোগ (যা কালক্রমে হবার সম্ভাবনা থাকে) প্রতিরোধের জন্যে এবং বাকীগুলি যোগ করা হয় রাবারের উপর গন্ধকের প্রভাব ত্বরান্বিত করবার জন্যে। প্রত্যেক বার এই সমস্ত উপকরণ মিশিয়ে যে মিশ্র যৌগ প্রস্তুত হয়, তা যথাযথভাবে মিশ্রিত হয়েছে কিনা পরীক্ষা করে দেখা হয়। মিশ্র যৌগের আপেক্ষিক গুরুত্ব, দ্রাঢ্য ইত্যাদি পরীক্ষা করে তা নির্ধারণ করা যায়।

মিশ্রণ আধার থেকে মিশ্র রাবার যৌগ এরপর এক্সট্রুডার (Extruder) নামে একটি যন্ত্রে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এক্সট্রুডারের কাজ

হচ্ছে অনেকটা মাংস টুক্‌রা করবার দা-র মত। এক্সট্রুডার থেকে যে গরম রাবার যৌগ বেরিয়ে আসে, তা এক্সট্রুডারের মুখে লাগানো নির্দিষ্ট আয়তনের ছাঁচে প্রবেশ করে। এই ছাঁচে রাবার যৌগের পাতের পুরুত্ব নির্ধারিত হয়। এই রাবারের পাত্ দিয়ে নির্দিষ্ট আয়তনের টায়ারের ট্রেড অংশ প্রস্তুত হয়। ট্রেডের নীচের দিকে পলিথিন প্রলেপের একটি আবরণ জুড়ে দেওয়া হয়। ট্রেড ও প্লাইজ অংশ দুটিকে ভালভাবে সংযুক্ত করে রাখতে এই পলিথিনের আবরণ সাহায্য করে। আবরণযুক্ত ট্রেড এরপর জলের একটা লম্বা ট্যাঙ্কে এসে পৌঁছয় এবং সেখান থেকে ঠাণ্ডা ও পরিষ্কার হয়ে বেরিয়ে আসে। এরপর এটাকে নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যে কেটে ফেলা হয়। কি আয়তনের টায়ার তৈরি হবে, সেই অনুযায়ী এই দৈর্ঘ্য নির্ভর করে।

টায়ারের তন্তুজ অংশের আলোচনায় এবার আসা যাক। আগেই বলা হয়েছে, তন্তুজ অংশ গঠিত হয় নাইলন বা রেয়ন (কৃত্রিম রেশম) তন্তু দিয়ে। এই তন্তুকে টায়ারের পেশীতন্তুস্বরূপ বলা যায়। তন্তুজ অংশের দ্রাঢ্য গড়ে তোলবার জন্যে (যা ছাড়া টায়ারের দ্রাঢ্য বৃদ্ধি করা যায় না) একরকম নির্যাসের দ্রবণে ডোবানো হয়। এই দ্রবণে থাকে প্রধানত: সংশ্লেষিত ভিনাইল পিরিডাইন নির্যাস এবং কিছু পরিমাণ প্রকৃতিজ রাবারের নির্যাস। দ্রবণে ডোবানো তন্তু এরপর সম্পূর্ণ শুষ্ক ও প্রসারিত করা হয়। অতি জটিল যন্ত্রপাতির সাহায্যে তন্তুর ডোবানো, শুকানো ও প্রসারণ-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। মাদ্রাজ রাবার ফ্যাক্টরিতে এই ধরণের যে যন্ত্রপাতি আছে, তা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতির অন্যতম।

দ্রবণে ডোবানো তন্তু এরপর তিনটি রোলারের উপর রাবার যৌগের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। রাবার মিশ্রণের আধারে যে গরম রাবার যৌগ প্রস্তুত হয়, তা উপরের ও মাঝখানের রোলারের মধ্যে ঢোকানো হয়। যথাযথভাবে শুকিয়ে নেবার পর তন্তুজ অংশ মাঝখানের ও নীচের রোলারের মধ্যে ঢোকানো হয়। রোলারগুলির মধ্যে ব্যবধান বা ফাঁক কমানো-বাড়ানো যায়। যৌগের উপর তন্তুজ আবরণ খুব পাত্‌লা করে দেওয়া হয় এবং এক ইঞ্চির ভগ্নাংশের মধ্যে তা আনা যায়। ইলেকট্রনিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় এটা করা সম্ভব হয়। প্রথমে একদিকে আবরণ দেওয়া হয়, তারপর আরেক দিকে।

তন্তুজ আবরণ দেওয়া রাবার এবার নির্দিষ্ট প্রস্থে কাটা হয়। টায়ার প্রস্তুতের ক্ষেত্রে যে কোণে ও যে প্রস্থে এই কাটা হবে, সেটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণে একটু এদিক-ওদিক যাতে না হয়, সে জন্যে ফটো-ইলেকট্রিক কোষের সাহায্যে এই কাটা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। তন্তুজ প্রলেপ দেওয়া কাটা রাবার এরপর টায়ার তৈরির যন্ত্রপাতিতে নিয়ে আসা হয়।

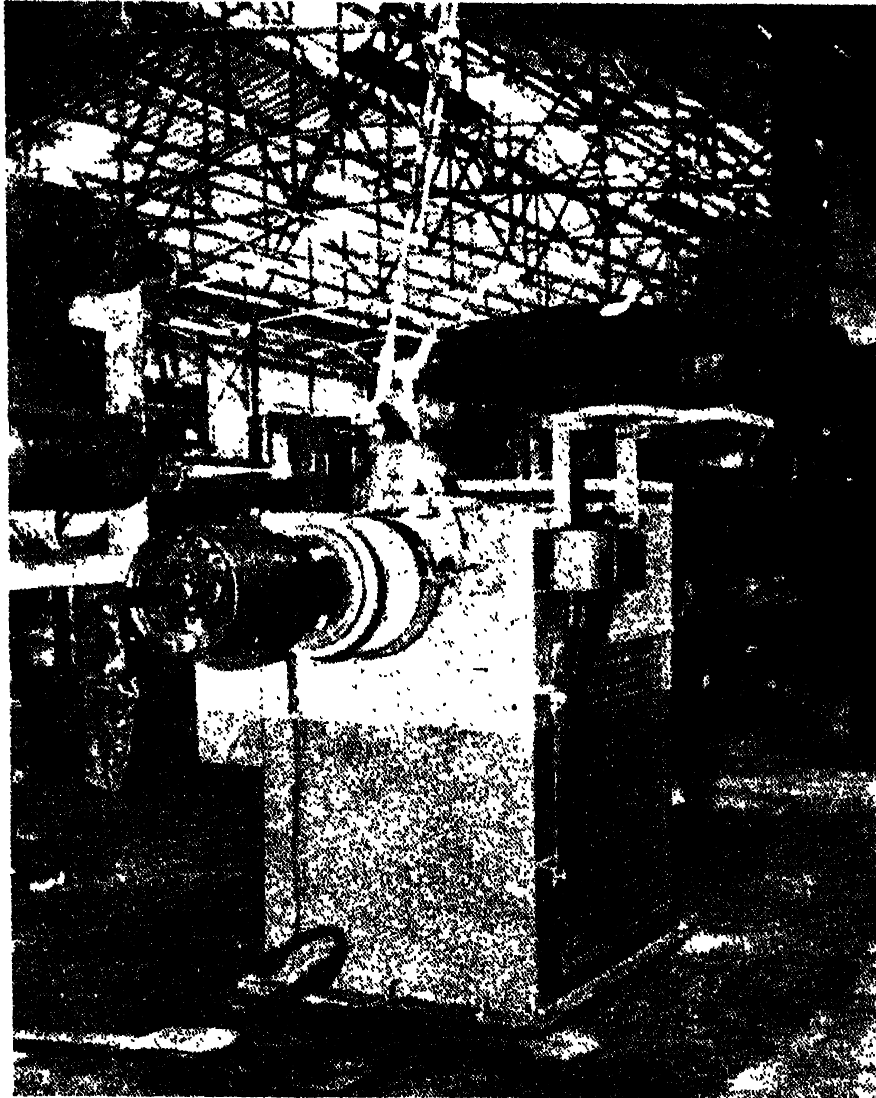
পিতল বা তামার আবরণ দেওয়া উচ্চ প্রসারণশীল ইস্পাতের তারের বীড একটি অতি-ক্ষুদ্র রাবার এক্সট্রুডারের মধ্য দিয়ে চালনা করা হয়। এর ফলে বীডের তারের উপর রাবারের প্রলেপ জুড়ে যায়। রাবারের প্রলেপ দেওয়া বীডের তারগুলি দিয়ে নির্দিষ্ট ব্যাসের বেড় তৈরি করা হয়। যে আয়তনের টায়ার তৈরি হবে, সেই অনুযায়ী বীডের বেড়ের ব্যাস ঠিক করা হয়। বীডের বেড় এরপর তন্তুজ বস্ত্র দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। বেড়গুলিকে যথাস্থানে রাখবার জন্যে এটা করা দরকার হয়।

ট্রেড অংশ এবং তন্তুজ অংশ এভাবে প্রস্তুত করবার পর টায়ার তৈরির যন্ত্রপাতিতে সেগুলিকে জোড়া হয়। টায়ার তৈরির যন্ত্রপাতির সামনে টারেট (Turret) নামে রোলে কাটা তন্তুজ প্লাইজ ঢোকানো হয়। অপারেটর যাতে একটার পর একটা প্লাইজ সহজে ঢোকাতে পারেন, সে জন্যে এই ব্যবস্থা করা হয়। টায়ার তৈরির

যন্ত্রপাতির পিছন দিকে ট্রেড অংশগুলিকে রাখা হয়। এই ব্যবস্থাও অপারেটরের কাজের সুবিধার জন্যে।

টায়ার তৈরির যন্ত্রপাতি

টায়ার তৈরির যন্ত্রপাতির মধ্যে থাকে একটি ঘূর্ণায়মান ড্রাম এবং ড্রামের উপর বিভিন্ন দেন। তার ফলে ড্রামে তন্তুজ অংশ বেশ শক্তভাবে গুটিয়ে যায়। এটি হলো টায়ারের প্রথম প্লাইজ। যে ধরণের টায়ার তৈরি হবে, তার উপর নির্ভর করে প্লাইজের সংখ্যা। ট্রাকের টায়ারের জন্যে দরকার হয় 10 থেকে 16 প্লাইজ, মোটর গাড়ীর জন্যে 4 থেকে 8 প্লাইজ, আর স্কুটারের জন্যে 2 থেকে 4 প্লাইজ।



টায়ার তৈরির যন্ত্রপাতি

প্লাইজকে লাগাবার জন্যে একটি গাইড টেবল। তন্তুজ অংশের একটা প্রান্ত অপারেটর ড্রামে ঢুকিয়ে ও গুটিয়ে দেন এবং অপর প্রান্ত পাকিয়ে

প্রথম প্লাইজ দেবার পর অপারেটর দ্বিতীয় প্লাই সাজিয়ে দেন। প্রথম প্লাই যেদিকে দেওয়া হয়, দ্বিতীয়টি দেওয়া হয় তার বিপরীত দিকে।

উভয় দিকে টায়ারকে মজবুত করে তোলবার জন্তে এই ব্যবস্থা করতে হয়। এভাবে নির্দিষ্ট ধরণের টায়ারের জন্তে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্লাই সাজানো হয়। তারপর সেগুলিকে সতর্কতার সঙ্গে মসৃণ এবং বায়ু চাপের দ্বারা চালিত যন্ত্রের সাহায্যে জোড়া হয়। এর ফলে প্লাইজের মাঝখানে বায়ু থাকলে তা দূরীভূত হয় এবং প্লাইগুলি ঠিকভাবে জুড়ে যায়। বীড তারের পাকানো কুণ্ডলী এরপর প্লাইজের উভয় প্রান্তে রাখা হয় এবং প্রান্তগুলি ড্রামের দুই দিক থেকে গুটিয়ে বীডের উপর আনা হয়। এভাবে পাউণ্ড বায়ুচাপে চালিত জোড়া লাগাবার যন্ত্রের সাহায্যে ট্রেড যথাযথভাবে জুড়ে দেওয়া হয়। টায়ার তৈরির যে ড্রামের উপর এই সমস্ত কাজ এতক্ষণ সম্পাদন করা হয়েছে, তা থেকে টায়ার-টিকে সরিয়ে এনে এবার র‍্যাকে রাখা হয়।

এভাবে যে টায়ার প্রস্তুত হলো, তাকে বলা হয় কাঁচা টায়ার (Green Tyre)। কাঁচা বলবার কারণ, এতক্ষণ পর্যন্ত টায়ারকে ভাল্কানাইজ্‌ড্‌ করা হয় নি। এবার এয়ার ব্যাগ (Air bag) নামে একটি পুরু রাবার টিউব টায়ারের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ছাঁচের মধ্যে টায়ারকে



টায়ারের ছাঁচ

প্লাইজের দ্বারা বীডগুলি যথাস্থানে দৃঢ়ভাবে জুড়ে থাকে।

অপারেটরের সামনে যে ট্রেড ছিল, সেটি এবার প্লাইজের উপর চাপানো হয়। 100

সর্বশেষ আকৃতি দেওয়া ছাড়া টায়ার এখন প্রায় সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে এসেছে।

ছাঁচ দু-ভাগে বিভক্ত। ট্রেডের প্যাটার্ন ছাঁচে কেটে বসানো হয়। ছাঁচের নীচের দিকে অর্ধাংশে

এয়ার ব্যাগসমেত টায়ার এবার ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ঢোকাবার পর ছাঁচটি বন্ধ করা হয় এবং টায়ারের ভাল্কানাইজেশন আরম্ভ হয়। তাপের সাহায্যে এই প্রক্রিয়া সম্পাদন করা হয়। এজন্যে 288° থেকে 300° ফাঃ পর্যন্ত তাপমাত্রা প্রয়োজন হয়। টায়ারের মধ্যে এয়ার ব্যাগে 175 পাউণ্ড বায়ু-চাপ দেওয়া হয়। তাপ প্রয়োগের ফলে প্রথমে রাবার নমনীয় হয়ে ওঠে। এয়ার ব্যাগের মধ্যে চাপ এই রাবারকে ছাঁচের ভিতরে কাটা আকৃতির রূপ দেয়। ক্রমশঃ রাবার তার নমনীয়তা হারিয়ে শক্ত হতে থাকে এবং এই প্রক্রিয়াই হলো ভাল্কানাইজেশন। সমস্ত কাজ সম্পাদিত হয় স্বয়ং-চালিত যন্ত্রের সাহায্যে। এই সমস্ত কাজ সম্পাদন করতে সময় লাগে মোটরগাড়ীর টায়ারের জন্যে 45 মিনিট এবং ট্রাকের টায়ারের জন্যে দেড় ঘন্টা। ছাঁচ থেকে টায়ার বের করবার পর তার গায়ে রাবারের ছোট ছোট খোঁচ দেখা যায়। এগুলিকে যন্ত্রের সাহায্যে ছেঁটে ফেলা হয়। টায়ার তৈরি এখন সম্পূর্ণ হয়েছে। টায়ারে কোনরকম দোষত্রুটি থেকে গেছে কিনা, তা পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে এর পর মান নিয়ন্ত্রণ (Quality Control) বিভাগে প্রত্যেকটি টায়ারকে পাঠানো হয়। সেখানে পরীক্ষায় উপযুক্ত বলে প্রমাণিত হবার পরই টায়ারকে বাজারে ছাড়া হয়। এই হলো টায়ার তৈরির সম্পূর্ণ কাহিনী।

ভারতে টায়ার শিল্প

মাদ্রাজ রাবার ফ্যাক্টরিতে বিমানযানের টায়ার ছাড়া অন্য সব রকমের টায়ার তৈরি হয়। এখানে বছরে 4 লক্ষ 50 হাজার টায়ার (সব রকমের) তৈরি হয়ে থাকে। ভারতে বিমানযানের চাকার উপযোগী টায়ার তৈরি হয় একমাত্র ডানলপ রাবার ফ্যাক্টরিতে। ট্রাকের টায়ারের প্রত্যেকটির দাম হচ্ছে এক হাজার টাকা এবং মোটরগাড়ীর টায়ারের প্রত্যেকটির দাম 200 টাকা। ট্রাকের টায়ার সাধারণতঃ স্থায়ী হয় এক বছর এবং মোটরযানের টায়ার দু-তিন বছর।

আন্তর্জাতিক মানের দিক থেকে ভারতের তৈরী টায়ার যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। এই কারণে বহির্ভারতের বহু দেশে ভারতে তৈরী টায়ার রপ্তানী হচ্ছে। শ্রীরামানা আমাদের জানালেন, শুধু গত বছরেই এক-মাত্র মাদ্রাজ রাবার ফ্যাক্টরি থেকে টায়ার-টিউব মিলিয়ে প্রায় 55 লক্ষ টাকার মত সামগ্রী বিদেশে রপ্তানী হয়েছে। তার শতকরা 35 ভাগ গেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, অবশিষ্ট মধ্য প্রাচ্য, পূর্ব আফ্রিকা এবং পূর্ব ইউরোপে। এছাড়া ক্যানাডা, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, ইরাক, কোয়াইট, যুগোশ্লাভিয়া, পূর্ব জার্মেনী, ইরান, বার্মা, থাইল্যাণ্ড, সিংহল, ইথিওপিয়া, মরিশাস এবং সুদানেও সম্প্রতি এই কারখানা থেকে টায়ার রপ্তানী হয়েছে। গত কয়েক বছরে উৎ-পাদনের শতকরা 10 ভাগ বিদেশে রপ্তানীর যোগ্যতা অর্জন করায় ভারত সরকার এই প্রতিষ্ঠানকে মেরিট সার্টিফিকেট দিয়েছেন। ভারতীয় শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে মাদ্রাজ রাবার ফ্যাক্টরি আজ এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে, একথা আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি।

প্রাণ-পরিপোষক মকরধ্বজ

শ্রীমাধবেন্দ্রনাথ পাল

প্রস্তাবনা

রাসায়নিক বিক্রিয়া বা রূপান্তর সাধন এবং উক্ত বিক্রিয়ার গতি ত্বরান্বিত করিবার জন্য বহুবিধ পদার্থ অতি সামান্য মাত্রায় ব্যবহার করা হয়। এই পদার্থগুলি নিজেরা রূপান্তরিত হয় না বরং উক্ত বিক্রিয়া সাধনের শেষে অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে। এই সকল পদার্থকে বলা হয় ক্যাটালিস্ট বা অনুঘটক। অনুঘটক জৈব বা অজৈব উভয় রকমের পদার্থ হইতে পারে। জীবন্ত বস্তুর মধ্যে এমন অনেক জৈব পদার্থ পাওয়া যায়, যাহারা জীবন্ত বস্তুর মধ্যে যে সকল রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে, তাহা সম্পাদন এবং ঐ সকল বিক্রিয়ার গতি দ্রুততর করিতে পারে। ইহাদিগকে বলে জৈব-অনুঘটক বা এন্‌জাইম।

আবার এমন অনেক পদার্থ পাওয়া যায়, যাহা অতি অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিলে অনুঘটকের কার্যকারিতা বর্ধিত হয়। এই প্রকার পদার্থের নাম অনুঘটক-পরিপোষক বা প্রোমোটার। প্রধানতঃ জৈব অনুঘটক জীবন্ত বস্তুর মধ্যে বর্তমান থাকে বলিয়া উহারা স্বতঃই প্রাণচাঞ্চল্যের সহায়ক। যে পদার্থ এই প্রকার জৈব অনুঘটকের কার্যকারিতা বর্ধিত করিতে পারে, তাহাকে এনজাইম-প্রোমোটার বা প্রাণ-পরিপোষক পদার্থ বলা যায়। পরবর্তী অংশের আলোচনা হইতে লেখকের অনুমান হয় যে, মকরধ্বজ এই প্রকার একটি প্রাণ-পরিপোষক পদার্থ।

মকরধ্বজের কার্য-তৎপরতা

মকরধ্বজ প্রধানতঃ ত্রিবিধ ধারায় ক্রিয়া করিয়া থাকে। প্রথমতঃ, ইহা মুমূর্ষু রোগীর ক্ষেত্রে সঞ্জীবনী শক্তি দ্রুত পুনরুদ্ধার করিয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, জীর্ণ আহার্য দ্রব্য সুষ্ঠুভাবে পরিপাকের পর দেহের পুষ্টিসাধন করে। রসায়ন-রূপে সেবন করিলে মকরধ্বজ এই প্রকার দেহ-পোষণের কার্যে বিশেষভাবে সহায়তা করে। তৃতীয়তঃ, বিভিন্ন রোগের উপযুক্ত ভেষজ অনু-পান হিসাবে মকরধ্বজের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলে ঐ সকল রোগ নিরাময়ে মকর-ধ্বজ দ্রুত ফলপ্রসূ হইয়া থাকে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে মকরধ্বজ উক্ত ভেষজসমূহের কার্যকারিতা বর্ধিত করে বলিয়া মনে হয়। এই প্রসঙ্গে লেখকের "মকরধ্বজের রহস্য" শীর্ষক প্রবন্ধ (জ্ঞান ও বিজ্ঞান, মার্চ 1968, 21শ বর্ষ 3য় সংখ্যা পৃঃ 134-140) দ্রষ্টব্য।

অতি প্রাচীনকালে প্রধানতঃ উদ্ভিজ্জ পদার্থ ভেষজরূপে প্রয়োগ করা হইত। উহারা সাধারণতঃ কাষ্ঠৌষধি নামে পরিচিত। অনেক ক্ষেত্রে উহাদের কার্যকারিতা প্রবল হইলেও উহাদের ভেষজ-ক্ষমতা বেশী দিন থাকে না। কিন্তু খনিজ পদার্থ ভেষজরূপে প্রয়োগ করিলে উহাদের কার্য-কারিতা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী হয়। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণ লক্ষ্য করেন যে, পারদ বা রসের সংযোগে উৎপন্ন খনিজ ভেষজের কার্যকারিতা প্রবল ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। এই প্রসঙ্গে পারদ ও গন্ধকের সংমিশ্রণে উৎপন্ন কজ্জলী, পর্পটি ইত্যাদি ভেষজের কার্যকারিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই শ্রেণীর অন্তর্গত রস বা পারদঘটিত ভেষজ রসৌষধি নামে পরিচিত। বহু চিকিৎসকের দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া কাষ্ঠৌষধি (উদ্ভিজ্জ)

ও রসৌষধির (খনিজ) সংমিশ্রণ ঘটাইয়া দেখা গেল যে, উক্ত মিশ্রিত ভেষজের কার্যকারিতা প্রবলতর ও অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী হয়।

অর্জুন ছাল হৃদ্‌রোগ উপশম করে। কিন্তু অভ্র (খনিজ) ও অর্জুন ছালের কাথে (উদ্ভিজ্জ) ভাবনা দিয়া প্রস্তুত নাগার্জুনাভ্র নামক ভেষজটি প্রধানতঃ হৃদ্‌রোগে বিশেষ ফলপ্রদ। ধুতুরা, সিদ্ধি, বৃদ্ধদারক ইত্যাদি উদ্ভিজ্জ এবং পারদ ও অভ্র প্রভৃতি খনিজ পদার্থের সহযোগে প্রস্তুত লক্ষ্মীবিলাস ভেষজ সর্বপ্রকার জ্বর, বিশেষতঃ বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরে অত্যন্ত ফলপ্রসূ। বিষ (অ্যাকোনাইট), মরিচ ইত্যাদি উদ্ভিজ্জ পদার্থের সহিত হিঙ্গুল (প্রকৃতিজাত পারদ ও গন্ধক যৌগিক পদার্থ) মিশ্রিত করিয়া উৎপন্ন মৃত্যুঞ্জয় নামক ভেষজ সকল প্রকার জ্বর, বিশেষতঃ অজীর্ণজনিত জ্বরে দ্রুত সুফল প্রদান করে। জৈত্রী, লবঙ্গ, ক্ষীরকাকলী, অশ্বগন্ধা ইত্যাদির সহিত লৌহ, অভ্র, রৌপ্য ও রসসিন্দুর (পারদ ও গন্ধকঘটিত) সহযোগে উৎপন্ন রসরাজ রস বাতব্যাধি, হৃদ্‌রোগ ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকরী। লক্ষণীয় যে, লক্ষ্মীবিলাস, মৃত্যুঞ্জয়, রসরাজ রস প্রতিটি ভেষজের মধ্যে পারদ—হয় প্রাকৃতিক খনিজ, না হয় কৃত্রিম যৌগিক পদার্থরূপে বিদ্যমান এবং সম্ভবতঃ পারদের সান্নিধ্যে ঐ সকল ভেষজের কার্যকারিতা বর্ধিত হইয়া থাকে।

আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকের নিকট নবায়স পাণ্ডু বা কামলা (জণ্ডিস) রোগের একটি অমোঘ ভেষজ। ইহার উপাদান হইতেছে—লৌহ, ত্রিকটু (শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ), ত্রিমদ (চিতা, মুথা ও বিড়ঙ্গ) এবং ত্রিফলা (হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া)। শেষোক্ত নয়টি উপাদানের প্রতিটি এক এক ভাগ করিয়া নয় ভাগ এবং উহার সমভাগ লৌহ (অয়স) ভস্মের মিশ্রণে উৎপন্ন বলিয়া ভেষজটি নবায়স নামে পরিচিত। কাষ্ঠৌষধি ও খনিজৌষধির সংমিশ্রণে উৎপন্ন হওয়ায় ইহার কার্যকারিতা প্রবল ও অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী।

এই সকল আয়ুর্বেদীয় ধারণা ও জারণ-বিজারণ সংক্রান্ত ইলেকট্রনিক-তত্ত্বের কতকগুলি ধারণার বশবর্তী হইয়া লেখক জনৈক বিশিষ্ট কবিরাজকে প্রস্তাব দেন যে, নবায়সের সহিত মকরধ্বজ মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ-ব্যবস্থা দিলে সম্ভবতঃ নবায়সের কার্যকারিতা বর্ধিত হইতে পারে। কবিরাজ মহাশয় উক্ত প্রস্তাবানুসারে কয়েকটি ক্ষেত্রে মকরধ্বজসহ নবায়সের ব্যবস্থা দেন এবং লক্ষ্য করেন যে, রোগীর রক্তাল্পতা যেরূপ সময়ে সচরাচর দূরীভূত হইয়া সাধারণ পুষ্টি ঘটিয়া থাকে, তদপেক্ষা অল্প সময়ের মধ্যেই তাহা সম্ভব হইয়াছে। ইহাতে লেখকের অনুমান আরও দৃঢ় হইতেছে যে, মকরধ্বজ সহযোগে শুধুমাত্র আয়ুর্বেদোক্ত ভেষজই নয়, অপর যে কোন প্রকার কৃত্রিম ভেষজ (কেমোথিরাপিউটিক ঔষধ) ইত্যাদি প্রয়োগ করিলে উহাদের কার্যকারিতা বর্ধিত হওয়া সম্ভব এবং সে ক্ষেত্রে প্রচলিত মাত্রা অপেক্ষা অল্প মাত্রায় সেই সব ভেষজ সামান্য মকরধ্বজ সহযোগে প্রয়োগ করিয়া বাঞ্ছনীয় ফল পাওয়া যাইতে পারে। কিভাবে তাহা সম্ভব হইতে পারে, সেই বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাতের চেষ্টা করিব।

জীবকোষের কার্য-পদ্ধতি

দেহের ভিতরে কোন ভেষজ সাধারণতঃ কিভাবে কাজ করিয়া থাকে, তাহা বুঝিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে যে, কোটি কোটি জীবকোষের সমবায়ে মানুষের দেহ গঠিত। উহাদের তৎপরতার ফলে প্রাণের স্পন্দন চলিতে থাকে। কোন কারণে সেই তৎপরতা ব্যাহত হইলে বা বাধা পাইলে প্রাণের স্পন্দন শিথিল ও স্তিমিত হইয়া আসে এবং অন্য কোন উপায়ে উত্তেজিত করিতে পারিলে তাহা আবার স্বাভাবিক সচল

অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে পারে। ভেষজ মূলতঃ এইরূপ উত্তেজনার সহায়ক হইয়া থাকে।

জীবকোষ এতই সূক্ষ্ম যে, অতি শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতীত সেগুলিকে দেখা সম্ভব নয়। জীবকোষের চতুর্দিকে একটি সূক্ষ্ম ঝিল্লীর আবরণ (মেমব্রেন) থাকে। উহার ভিতর দিকে ফ্যাট (স্নেহজাতীয় পদার্থ, যেমন—ঘৃত, মাখন ইত্যাদি), প্রোটিন (আমিষজাতীয় পদার্থ, যথা—অ্যালবুমেন, ছানা ইত্যাদি), কার্বোহাইড্রেট (শর্করাজাতীয় পদার্থ, যথা—চিনি, গ্লুকোজ ইত্যাদি) এবং নানাবিধ আয়ন (তড়িৎ-আহিত পরমাণু, অণু বা অণুগুচ্ছ) মিলিয়া জট পাকাইয়া থাকে। তাহা ছাড়া শ্বাসগ্রহণের পথে আনীত অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও প্রশ্বাসে উদ্ভূত কার্বন ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি নানা জাতীয় গ্যাসীয় পদার্থ ও জল থাকে। জীবকোষের ঝিল্লীর উপরিতলে সুনির্দিষ্ট সজ্জায় ফ্যাট ও প্রোটিনের অণু সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকে এবং কোষের ভিতর নানাবিধ প্রোটিন অণুর সমাবেশে যেন এক-একটি বৈচিত্র্যমণ্ডিত বিশেষ চিত্রপট বা প্রোটিন-মোসেইকের সৃষ্টি হয়। ঝিল্লীর সহিত বহিরাগত কোন অণু, যথা ভেষজের অণুর সংঘর্ষ ঘটিলে প্রোটিন মোসেইকের পুনর্বিন্যাস ঘটিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে শ্রডিংগার জোর দিয়া বলিয়াছেন যে, কেলাসের মধ্যে যেমন একটি নির্দিষ্ট নক্সা বার বার ধরিয়া চলিতে থাকে, ঠিক তাহার বিপরীত অবস্থা জীবকোষের ভিতর বর্তমান। বিশালাকায় যে সকল অণুর সাহায্যে জীবন্ত পদার্থ গঠিত, তাহাদের সমাবেশে বিচিত্র ভঙ্গীতে রচিত চিত্রপটই (প্রোটিন-মোসেইক) মুখ্য বিষয় এবং বার বার কোন একটি ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি এই ক্ষেত্রে আসল রহস্য নহে।

জীবকোষের ফ্যাট, প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও আয়ন প্রভৃতি পদার্থ কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় অবস্থায় থাকিয়া এমন একটি পরিবেশ রচনা করে, যাহাতে জীবকোষের তৎপরতা চলিতে পারে। তৎপরতা চলিবার জন্য শক্তির প্রয়োজন। জীর্ণ আহার্য হইতে শক্তির সঞ্চার হয়। ফ্যাট, প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য হইতে আসিয়া থাকে। ইহারা সতত নানাবিধ রাসায়নিক বিক্রিয়া, বিশেষতঃ শ্বাসের সহিত আনীত অক্সিজেনের সাহায্যে জারিত হইবার ফলে ধাপে ধাপে ক্রমশঃ নানাভাবে বিয়োজিত হইয়া থাকে এবং অবশেষে তাহা হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ও জল উৎপন্ন হয়। রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে ঐ সকল পদার্থ ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ক্ষয় পূরণের জন্য আবার উহাদের আমদানী হওয়া প্রয়োজন। বস্তুতঃ জীবকোষের ঝিল্লী ও উহার ভিতর দিকে বর্তমান উপাদানসমূহের সতত পরিবর্তন ঘটে এবং উহাদের মধ্যে নিরন্তর বস্তু বিনিময় চলিয়া থাকে। জীর্ণ আহার্য দ্রব্য হইতে উৎপন্ন প্রোটিন ও ফ্যাট ঝিল্লীতে রূপান্তরিত হয় এবং অবশেষে উহারাই কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসরূপে মুক্ত হইয়া যায়।

জীবকোষের রাসায়নিক বিক্রিয়াসমূহ যে কেবলমাত্র ভৌত রাসায়নিক সূত্র ধরিয়া ঘটিয়া থাকে, তাহা ভাবা ঠিক হইবে না অথবা জীবকোষ শুধু যে আহার্য দ্রব্যকে অক্সিজেনের সাহায্যে জারিত করিয়া শক্তি সঞ্চার করিবার একটি মাত্র কৌশল, তাহাও ঠিক নহে। জীবকোষের নিয়ম-কানুন একটু স্বতন্ত্র ধরণের। কোষের অভ্যন্তরে এই সকল রূপান্তরের অধিকাংশই প্রধানতঃ জৈব অনুঘটক (এনজাইম) ও উত্তেজক রসের (হর্মোন) সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। যে পদার্থটি কোন একটা এনজাইমের নিয়ন্ত্রণে রূপান্তরিত হয়, তাহাকে 'সাবস্ট্রেট' বলে। কোন একটি এনজাইম কোন্ কোন্ সাবস্ট্রেটের রূপান্তর সাধন করিবে, তাহার সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। পরিচিত এনজাইম এক

এক ধরণের এক-একটি প্রোটিনবিশেষ। সাধারণতঃ এক এক ধরণের কাজের জন্য এক এক ধরণের এনজাইমের প্রয়োজন। জারণ, আর্দ্রবিশ্লেষণ, ইত্যাদি কার্য সম্পাদনের জন্য পৃথক পৃথক এনজাইম কোষের মধ্যে বর্তমান। স্টার্চ, মল্ট সুগার, প্রোটিন ও চর্বি বা স্নেহজাতীয় পদার্থের আর্দ্রবিশ্লেষণ ঘটাইবার জন্য যথাক্রমে টায়ালিন, মল্টেজ, পেপ্‌সিন ও লাইপেজ নামক এনজাইম-গুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এক-একটি এনজাইম আবার একাধিক ধরণের কাজ করিতে পারে; যথা—সাল্‌ফ্-হাইড্রিল এনজাইম জারণ ও আর্দ্রবিশ্লেষণ—এই দুইটি কাজের সহিত সংশ্লিষ্ট।

জীবকোষের সত্তা ও স্থায়িত্ব অটুট রাখিবার জন্য ধ্বংস ও সৃষ্টি উভয়বিধ কার্যের মধ্যে সাম্য রাখিতে হয়। একদিকে যেমন জারক, আর্দ্র-বিশ্লেষক ইত্যাদি ধ্বংস-সহায়ক বিশ্লেষক এন-জাইমগুলি ফ্যাট, প্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেট প্রভৃতি পদার্থগুলির ধ্বংসসাধন করিয়া শক্তি সঞ্চার করে, অপর দিকে তেমনই অন্যান্য সৃজনশীল সংশ্লেষক এনজাইমসমূহ জীর্ণ আহার্য পদার্থ হইতে উৎপন্ন অপর সকল পদার্থ ও ধ্বংসাবশেষ হইতে কোষের চাহিদামত নূতন নূতন পদার্থ সৃষ্টি করিয়া থাকে। সেই জন্য জীবকোষের সত্তা ও স্থায়িত্ব একটি গতিশীল সাম্যাবস্থাগত ব্যাপার মাত্র। কিন্তু অজৈব পদার্থের সত্তা ও স্থায়িত্ব একই ধরণের অপরিবর্তিত অণুর অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল। অপর পক্ষে জীবকোষের সত্তা ও স্থায়িত্ব উহার ও উহার ভিতরে বর্তমান অণু-সমূহের অবিরাম রূপান্তর সাধনের জন্যই সম্ভব হইয়া থাকে। এইরূপ রূপান্তর সাধনের ক্ষেত্রে এনজাইমের ভূমিকা কতখানি, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

এনজাইম ও মকরধ্বজের যৌথ ভূমিকা

জীবকোষে ভেষজ কিভাবে কাজ করিয়া থাকে, সে সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত। তাহার মধ্যে একটি সাধারণ মতবাদ এই যে, ভেষজ কোন রুগ্ন তন্তুর স্বাভাবিক গঠন ফিরাইয়া আনে না। যখন প্রকৃতির নিজস্ব কৌশলে উক্ত তন্তুর সংস্কারের কাজ চলিতে থাকে, তখন সেই কাজে উদ্দীপনা বা উত্তেজনা দেওয়া অথবা সেই কাজে কোনরূপ অতি-উত্তেজনা ঘটিলে তাহা প্রশমিত করাই ভেষজের অন্যতম কাজ। জীব-কোষের রূপান্তর সাধনে এনজাইমের ভূমিকার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে

অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, ভেষজের মাত্রা অতি অল্প হইলে উহার কার্যকারিতা অধিক হইয়া থাকে। এনজাইমের অণুর সহিত ভেষজের অণুর একপ্রকার শিথিল সংযোজন ঘটিবার ফলে ভেষজের কাজ চলিতে থাকে। আরও জানা গিয়াছে যে, ফ্যাট, প্রোটিন ও কার্বো-হাইড্রেট পদার্থের রূপান্তর সাধনে সাল্‌ফ্-হাইড্রিল এনজাইম জারকও আর্দ্রবিশ্লেষকের ভূমিকা গ্রহণ করে। মারকিউরিক (পারদঘটিত) আয়ন সাল্‌ফ্-হাইড্রিল এনজাইমের সহিত সংযোজনের ক্ষমতা রাখে। প্রকৃত পক্ষে 10^{-5} (M) মার-কিউরিক ক্লোরাইড দ্রবণ (অর্থাৎ এক লিটার পরিমাণ তরল পদার্থে দ্রবীভূত মারকিউরিক ক্লোরাইডের 171 গ্র্যামের এক লক্ষ ভাগের এক ভাগ মাত্রায়) প্রয়োগ করিলে উক্ত এনজাইমের কার্যকারিতা শতকরা প্রায় নব্বই ভাগ ব্যবহার হয়।

মকরধ্বজের অণুতে পারদঘটিত মারকিউরিক আয়ন বিদ্যমান। কোন ভেষজের সহিত মকর-ধ্বজ অতি অল্প মাত্রায় মিশাইয়া প্রয়োগ করিলে জীবকোষের মধ্যে বর্তমান এনজাইমের কার্য-কারিতা বর্ধিত হওয়া অসম্ভব নয়। এই জন্য

মকরধ্বজকে এনজাইম্-প্রোমোটার বা প্রাণ-পরিপোষক বলা যায়।

'মকরধ্বজের রহস্য' শীর্ষক প্রবন্ধটি (মিকানিজম অব অ্যাকশন অব মকরধ্বজ, Nagarjum, February, 1968, Vol. XI, pp. 309-316 দ্রষ্টব্য) পাঠ করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তদানীন্তন আয়ুর্বেদ উপদেষ্টা কবিরাজ মণীন্দ্রলাল দাশগুপ্ত, এম. বি. মহাশয় মন্তব্য করেন: "বহু লোকের কথা আমি জানি, যাহারা অভ্যাস-বশে নিত্য মকরধ্বজ সেবন করে; কিন্তু সে জন্য তাহাদের মধ্যে পারদঘটিত ঔষধের প্রতিকূল প্রতিক্রিয়াজনিত দোষ টায়ালিজম্, জিনজি-ভাইটিস বা নেফ্রাইটিস দেখা যায় না। এই বিষয়ের কারণ অনুসন্ধানের জন্য আমি লেখককে অনুরোধ করিতেছি।" মকরধ্বজ এনজাইম-প্রোমোটার (প্রাণ-পরিপোষক) হিসাবে কাজ করে, এইরূপ অনুমান করিলে উক্ত প্রশ্নের সমাধানের পথ খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব বলিয়া লেখকের ধারণা।

কখনও মধু ছাড়া মকরধ্বজ প্রয়োগের ব্যবস্থা দেওয়া হয় না কেন, লেখকের 'মধুর কথা' শীর্ষক প্রবন্ধে (জ্ঞান ও বিজ্ঞান, মার্চ 1970, 23শ বর্ষ, 3য় সংখ্যা, পৃঃ 174—178 দ্রষ্টব্য) তাহার কারণ বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। মধুর মাধ্যমে কোন ভেষজ ও অতি অল্প মাত্রায় মকরধ্বজ মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলে উহার কার্যকারিতা বা ভেষজ-ক্ষমতা আরও বিশেষভাবে বর্ধিত হইবে, ইহাই বর্তমান লেখকের বদ্ধমূল ধারণা। তবে এই সকল অনুমান বা ধারণা সত্য কিনা, তাহা যাচাই করিবার জন্য ব্যাপক পরীক্ষা হওয়া উচিত।

বৃটিশ ইনফরমেশন সার্ভিসের প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ—সাম্প্রতিক গবেষণায় আভাস পাওয়া যাইতেছে যে, এনজাইমের সাহায্যে একাধিক রোগের চিকিৎসা করা সম্ভব হইবে। বিয়ার নামক এক প্রকার মদ্যের স্থায়িত্ব বিধানে এনজাইমের ব্যবহার হইতেছে। এনজাইমের ভাবী ব্যবহারের সম্ভাবনার কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া ইংল্যাণ্ডের অতি বিশুদ্ধ এন্‌জাইম প্রস্তুতকারক হোয়াইটম্যান বায়োক্যামিক্যালস লিঃ পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের অতি আধুনিক একটি এনজাইম উৎপাদনের কারখানা খুলিয়াছে। আরও প্রকাশ, বৃটিশ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের লেবরেটরীগুলির সহিত তাহারা সহযোগিতা করিয়া চলিবে, যাহাতে গবেষণার ফল বাণিজ্যিক স্তরে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়।

আশা করা যায়, এনজাইমের পরিপোষক-রূপে মকরধ্বজ কাজ করিয়া থাকে—এই ধারণার সত্যতা সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাইলে ভেষজ, তথা জীব-বিজ্ঞানের একটি নূতন দিগ উদ্ঘাটিত হইবার সম্ভাবনা দেখা দিবে।

রিফামাইসিন

সুশ্বেতা বিশ্বাস*

রিফামাইসিন এক ধরণের প্রতিজীবক (Antibiotic)। 1940 সালে প্রথম পেনিসিলিন আবিষ্কারের পর থেকে এপর্যন্ত আরো অনেক প্রতিজীবক আবিষ্কৃত হয়েছে। হয়তো মনে হতে পারে রিফামাইসিন অন্যান্য অনেক প্রতিজীবকের মতই কোন বিশেষত্ব এর নেই। কিন্তু সেটা ঠিক নয়। সেই জন্যেই এই বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি।

পেনিসিলিন আবিষ্কারের পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ওষুধের কারখানা এবং বিভিন্ন গবেষণাগারে আরও জোরালো নতুন প্রতিজীবক আবিষ্কারের চেষ্টা চলেছে। রিফামাইসিনের আবিষ্কার হয় ইটালীর (মিলান) লেপেটিট গবেষণাগারে। ফ্রান্সের সেন্ট র‍্যাফেলের কাছে ঘন পাইন বনের একটুখানি মাটি ছিল এর উৎস। এই মাটিতে ছিল সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র জীবাণু। কিন্তু সকলকে নিয়ে গবেষণা চালানো সহজসাধ্য নয়। সেখান থেকে স্ট্রেপ্টোমাইসিটসকে পৃথক করা সম্ভব হয়েছিল। এই স্ট্রেপ্টোমাইসিটিস এক ধরণের ক্ষুদ্র এবং সক্রিয় জীবাণু, যা থেকে প্রতিজীবক তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। ওই মাটি থেকে স্ট্রেপ্টোমাইসিস মেডিটারেনিকে পৃথক করে দেখা গেছে যে, ওই ক্ষুদ্র জীবাণুর স্বাভাবিক বৃদ্ধির সময় পাঁচটি পরস্পর অতি নিকট সম্পর্কযুক্ত প্রতিজীবক তৈরি হয়। এই পাঁচটিকে একই সঙ্গে বলা হয় রিফামাইসিন যৌগিক বস্তু। এই রিফামাইসিন থেকে রিফামাইসিন B-কে পৃথক ও বিশুদ্ধ করা সম্ভব হয়েছে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, রিফামাইসিন-B জীবাণুর প্রতিপক্ষ হিসাবে খুব কার্যকরী নয় বরং ওই পদার্থটি খুব ধীরে ধীরে ভেঙে জলের সঙ্গে মিশে একটি ক্রিয়াশীল পদার্থ তৈরি করে, যার নাম রিফামাইসিন SV। এই রিফামাইসিন SV থেকে আবার আর একটি পদার্থ উৎপন্ন হয়, যার নাম দেওয়া হয়েছে সংক্ষেপে রিফামপিসিন (Rifampicin); অর্থাৎ সেটি হলো 3-(4-মিথাইল পাইপার অ্যাজিনিল ইমিনো মিথাইল রিফামাইসিন SV. [3 (4 – methyl piper azinyl imino methyl rifamycin SV]

সম্প্রতি রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে এই রিফামপিসিন সংশ্লেষণ সম্ভব হয়েছে এবং এই পদ্ধতিই রিফামপিসিন তৈরি করবার উপায়।

রিফামপিসিন নিয়ে গবেষণার প্রথম পর্যায়ে এটি প্রয়োগ করে যে ফল পাওয়া গেছে, তা খুবই আশাপ্রদ। এই প্রতিজীবকটির প্রভাবে যক্ষ্মারোগের জীবাণু মাইকোব্যাক্টিরিয়াম টিউবারকিউলোসিমস বংশবৃদ্ধি করতে পারছে না। কিন্তু গবেষণার এই পর্যায়টি এরপর সীমিত হয়ে যায় প্রধানতঃ একটি কারণে—সেটি

---

* বসু বিজ্ঞান মন্দির, 93/1, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-9

হলো রিফামপিসিন একমাত্র ইঞ্জেকসনের মাধ্যমে প্রয়োগ করতে হয়। এর ফলে এই ওষুধটি শরীরে খুব ছড়িয়ে পড়ে না এবং খানিকটা সীমাবদ্ধ অবস্থায় থাকে। এই সব অপূর্ণতার জন্যে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে। অবশেষে অধ্যাপক পি. সেনসি লেপেটিট গবেষণাগার থেকে পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এই ওষুধটি মুখ দিয়ে গ্রহণ করলে ভাল করে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়া সম্ভব।

এখন কথা হলো—এই ওষুধটি কিভাবে কাজ করে, কেনই বা এর কাজের ভূমিকা অন্যান্য প্রতিজীবক থেকে স্বতন্ত্র ও গুরুত্বপূর্ণ? আমরা জানি অক্তিকার ডি এন এ অণুর ছাঁচে আর এন এ অণুর জন্ম হয় এবং এই আর এন এ সৃষ্টি করে নানারকম এনজাইম-প্রোটিন। এখন ডি এন এ-র বার্তা বংশপরম্পরায় চলে আসে আর এন এ-তে এবং এটি সম্ভব হয় বিশেষ এক ধরণের এনজাইমের উপস্থিতির ফলে। এই বিশেষ এনজাইমকে বলা হয় আর এন এ পলি-মারেজ (RNA Polymerase)। এই এনজাইমটি ভাইরাস থেকে সুরু করে মানুষ অবধি সকলের কোষে বর্তমান। বংশবৃদ্ধির জন্যে এই এনজাইমের ভূমিকা অনেকখানি। মানুষ বা অন্য কোন জীব-দেহ যদি কোন রোগ বহনকারী ভাইরাসের দ্বারা আক্রান্ত হয়, তবে সেই দেহে ক্রমশঃ ভাইরাসের বংশবৃদ্ধি হতে থাকে। বংশবৃদ্ধির জন্যে প্রজননের বার্তা ডি এন এ থেকে আর এন এ এবং আর এন এ থেকে প্রোটিনকে নিতে হয়। প্রথম পদ-ক্ষেপটির জন্যেই প্রয়োজন আর এন এ পলিমারেজ এনজাইমের উপস্থিতি। আর এন এ পলি-মারেজ জীবদেহে যেমন বর্তমান, তেমনি যে ভাই-রাসের দ্বারা জীবদেহ আক্রান্ত হয়েছে, তাতেও বর্তমান। রিফামপিসিনের বিশেষত্ব এখানেই যে, এই ওষুধটি জীবদেহের আর এন এ পলিমারেজের উপর কোন কাজ করে না, কিন্তু খুব অল্প পরি-মাণেই ভাইরাসের আর এন এ পলিমারেজকে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করে।

গত কয়েক বছর আণবিক জীব-বিজ্ঞানে ডি এন এ-র উপর নির্ভরশীল এনজাইম আর এন এ পলিমারেজের গুণাগুণ বিচার করবার একটি রীতি চলে আসছে। রিফামপিসিন এই এন-জাইমের কার্যপ্রণালী বিজ্ঞানীদের কাছে আরও সহজ ও বোধগম্য করে তুলেছে। দেখা গেছে, আর এন এ পলিমারেজ দিয়ে ডি এন এ থেকে আর এন এ-র সংশ্লেষণ আরম্ভ হবার ঠিক প্রথম পর্যায়কে রিফামপিসিন প্রভাবিত করে; অর্থাৎ রিফামপিসিন দেবার সময় যে আর এন এ-র সংশ্লেষণ ইতিপূর্বেই সুরু হয়ে গেছে, তার উপর ওই ওষুধের কোন ফল হয় না। কিন্তু এর পর আর নতুন আর এন এ সংশ্লেষিত হতে পারে না।

আগেই বলা হয়েছে রিফামপিসিন যক্ষ্মারোগের প্রতিষেধক। এই রোগটি এখনও চিকিৎসা-বিজ্ঞানী-দের কাছে একটি সমস্যাস্বরূপ। কারণ এই রোগের চিকিৎসার জন্যে অনেকটা সময়ের প্রয়োজন। এই দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসার ফলে অনেক সময় একাধিক প্রতিজীবক ব্যবহার করা হয়। তার ফলে আর এক প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়। কেন হয় তাই বলি। কোন জীবাণুর বিরুদ্ধে যদি একই সময়ে দুটি প্রতিজীবক ব্যবহার করা হয় এবং দেখা যায় যে, সেই জীবাণুর একটি বিশেষ অবস্থা

যে কোন একটি প্রতিজীবককে সহ্য করতে সক্ষম, তাহলে অপরটিও নিজে থেকে সেই জীবাণু বৃদ্ধির প্রতিবন্ধক হয় না। এই অবস্থাকে বলা হয় পরস্পর বিরোধিতা (Cross resistance)। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, এই অবস্থা কোন প্রতি-জীবকের পক্ষেই অনুকূল নয়। কিন্তু রিফামপিসিনের অদ্বিতীয় গুণ হলো, এটি কখনও জীবাণুর পরস্পর বিরোধিতার সহায়ক হয় না।

এরপর অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গতভাবে এই ওষুধের ব্যবহার হয় কুষ্ঠব্যাধিতে। যক্ষা এবং কুষ্ঠ দুটি রোগের কারণ অনেকটা একই ধরণের জীবাণু। এর নাম মাইকোব্যাক্টিরিয়াম লেপার। লণ্ডনের ন্যাশন্যাল ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল রিসার্চে কুষ্ঠরোগের উপর এই ওষুধটি নিয়ে প্রাথমিক নানারকম গবেষণায় যে ফল পাওয়া গেছে, তা খুবই আশাপ্রদ। কুষ্ঠরোগে ব্যবহৃত অন্য প্রতিজীবকের সঙ্গে রিফামপিসিনের একটি বড় রকম অমিল দেখা যায়। অন্যান্য প্রতিজীবকের উপস্থিতিতে কুষ্ঠরোগের জীবাণুর বৃদ্ধি বন্ধ হয়, কিন্তু রিফামপিসিনের উপস্থিতিতে ওই জীবাণুগুলি মরে যায়।

এরপর ভাইরাসের উপর রিফামপিসিনের প্রভাব নিয়ে কিছু আলোচনা করবো। 1969 সালে দুটি গবেষক দল জেরুসালেমের ই. হেলারের নেতৃত্বে এবং গ্লাসগোর সুবাক সার্পের পরিচালনায় একই সঙ্গে তাঁদের গবেষণালব্ধ ফলের বিবরণ দিয়েছেন। এই রিফামপিসিন সাধারণতঃ জীবদেহের বিশেষ এক ধরণের ভাইরাসের বৃদ্ধিকে প্রতিহত করে। ব্যাপারটি যে কোন প্রতিজীবকের ক্ষেত্রেই খুব আশ্চর্যের। প্রথম দিকে এই কথাই চিন্তা করা যুক্তিযুক্ত ছিল যে, জীবাণুর প্রতিষেধক হিসাবে রিফামপিসিন যে ভাবে কাজ করে, ভাইরাসেও তেমনি কাজ করবে। এখন প্রশ্ন হলো, ভাইরাসের জীবন-পরিক্রমায় রিফামপিসিন ক্ষমতা প্রয়োগ করে কোন্‌খানে? বেথেসডার ন্যাশন্যাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথ থেকে দেখানো হয়েছে যে, ভাইরাসের পূর্ণতাপ্রাপ্তির শেষ ধাপকে রিফামপিসিন প্রভাবিত করে।

ক্যান্সার রোগ রিফামপিসিনের গুরুত্ব আরো বাড়িয়েছে। 1969 সালেই জুরিখের ডিগেলম্যান এবং ওয়াইসম্যান দেখিয়েছেন যে, ক্যান্সার রোগের ভাইরাসের বৃদ্ধি রিফামপিসিন দিয়ে কমানো সম্ভব হয় নি। কিন্তু সে ক্ষেত্রে স্বাভাবিক কোষকে ক্যান্সার রোগাক্রান্ত কোষে পরিণত হবার পথে রিফামপিসিন বাধার সৃষ্টি করে। অনেক ভাইরাস আছে, যা স্বাভাবিক কোষকে ক্যান্সার রোগাক্রান্ত স্ফীতিতে পরিণত করে। এই ধরণের অনেক ভাইরাসের মধ্যে বংশগত বার্তা ডি এন এ থেকে আর এন এ হয়ে প্রোটিনে আসে না। তার কারণ ওই সব ভাইরাসে ডি এন এ অনুপস্থিত থাকে। ওই সব ক্ষেত্রে প্রজননের বার্তা কিভাবে যায়, সেটা বহু দিন বৈজ্ঞানিকদের কাছে একটি বড় প্রশ্ন ছিল। উইসকন্‌সিন বিশ্ববিদ্যালয়ের হাওয়ার্ড টেমিন প্রথম সিদ্ধান্তে আসেন যে, ওই সব আর এন এ ভাইরাসের বৃদ্ধিতে ডি এন এ মধ্যবর্তী বস্তু হিসাবে উপস্থিত হতে পারে, যা তখন খুবই অসম্ভব মনে হয়েছিল। পরে অবশ্য অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ওই সিদ্ধান্তের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। এই গবেষণা ক্যান্সার রোগাক্রান্ত কোষে খুবই প্রাধান্য পেয়েছে। যে

এন্‌জাইম আর এন এ থেকে ডি এন এ সংশ্লেষণ করে, তাকে বলা হয় ডি এন এ পলিমারেজ। এই ডি এন এ পলিমারেজকে দমন করে ক্যান্সার-রোগাক্রান্ত কোষকে স্বাভাবিক কোষে পরিণত করা সম্ভব কি না—সেটাই এখন গবেষণার প্রধান বিষয় বস্তু।

এখন পর্যন্ত ক্যান্সার রোগাক্রান্ত কোষের সঙ্গে একটি স্বাভাবিক কোষের যে পার্থক্য দেখা গেছে, তা উভয়ের প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। এই বিষয়ে এখনও খুব বেশী জানা সম্ভব হয় নি। কিন্তু রিফামপিসিনের আবিষ্কারের পর থেকে এই বিষয়ে একটি নতুন দিকের সূচনা হয়েছে, যেখানে আঘাত করলে হয়তো এই সাংঘাতিক রোগ সম্বন্ধে আরও বেশী জানা সম্ভব হবে। এখন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকদের এই রোগ সম্বন্ধে ধারণা খুবই সীমিত। অনেক গবেষণাগারে এই নিয়ে গবেষণা চলছে সন্দেহ নেই। এখন অনেক বিজ্ঞানী দেখতে চেষ্টা করছেন, রিফামপিসিন সদৃশ অন্য পদার্থে প্রতিজীবকের গুণ কাজ করে কি না এবং তা দিয়ে ডি এন এ পলিমারেজকে দমানো কতখানি সম্ভব। রিফামপিসিনসদৃশ দুটি পদার্থ আবিষ্কার করেছেন ল্যানসিনি ও থারী। তাঁদের প্রাথমিক পরীক্ষার ফল খুবই আশাপ্রদ হয়েছে।

সাধারণতঃ রিফামপিসিন এন্‌জাইম প্রোটিনের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটায়, যার ফলে সেই প্রোটিনের সক্রিয় অবস্থা বা সক্রিয় দিকটির পরিবর্তন ঘটে। এখন কথা হলো, ডি এন এ-র উপর নির্ভরশীল এনজাইম আর এন এ-পলিমারেজকে যে প্রতিজীবক দমন করবে এবং আর এন এ-র উপর নির্ভরশীল এনজাইম ডি এন এ-পলিমারেজকে যে দমন করবে, এই দুটি প্রতি-জীবকের মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু পার্থক্য থাকতে হবে। সে জন্যে এখন প্রধান কাজ হলো, প্রচুর রিফামপি-সিনসদৃশ পদার্থ সংশ্লেষণ করা ও তাদের প্রতিজীবক গুণ নিয়ে পরীক্ষা করা। সমগ্র জগতে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে যে অভূতপূর্ব আলোড়ন এসেছে, তাতে কারো বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তবু ক্যান্সার রোগ নিয়ে বিজ্ঞানীরা এখনও প্রায় প্রথম ধাপেই দাঁড়িয়ে আছেন। তাই মনে হয়, রিফামপিসিনসদৃশ পদার্থের সংশ্লেষণের মধ্যেই পাওয়া যেতে পারে সেই মহারোগের ভাবী মহাশত্রুকে। হয়তো রিফামপিসিন দিয়েই সে পথের সুরু, কিন্তু তার শেষ কোথায় আজও জানা নেই।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং

রাধাকান্ত মণ্ডল*

ইতিপূর্বে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' খোরানা কর্তৃক কৃত্রিম জিন সংশ্লেষণ ও জেনেটিক কোডের পাঠোদ্ধার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে (জ্ঞান ও বিজ্ঞান—ডিসেম্বর, 1968, জানুয়ারী 1969 ও শারদীয়া 1970 দ্রষ্টব্য)। পরীক্ষাগারে জিন সংশ্লেষণ সম্ভব হবার ফলে যে বিষয়ে জীব-বিজ্ঞানী তথা চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের সবচেয়ে বেশী আশা ও ঔৎসুক্য দেখা গেছে, তা হলো ভবিষ্যতে জিনের প্রয়োগ বা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ব্যাপক সম্ভাবনা। জিনের গঠন-প্রকৃতি, তাদের উপাদান, জিনের বার্তা-সঙ্কেতের রহস্য, জিনের রদ্‌বদল ঘটানো সবই এখন মানুষের আয়ত্তের মধ্যে। এই জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে সুস্থ জিন দিয়ে কতকগুলি বংশগত বা জন্মগত রোগের নিরাময় সম্ভব হতে পারে। চিকিৎসকমহলে এটাকেই বলা হচ্ছে জিন থিরাপি বা জেনেটিক সার্জারি। এই জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ও জিন থিরাপি ব্যাপারটা কি, এখনই মানুষ একে কাজে লাগাবার কতটা কাছাকাছি আসতে পেরেছে—সে সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে।

ইতিমধ্যেই জানা গেছে যে, জীবকোষের কেন্দ্রে অবস্থিত বংশগতির ধারক ও বাহক মূলবস্তু হলো জিন (Gene)। বিভিন্ন জিন-গোষ্ঠীই নিয়ন্ত্রণ করে কোন জীবের রং, রূপ প্রভৃতি বাইরের বৈশিষ্ট্য ও দেহের ভিতরে বিপাক, বৃদ্ধি প্রভৃতি ক্রিয়া। মানুষের মত একটি বহুকোষী জীবের জন্মের সুরুতে ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর মিলন প্রকৃতপক্ষে মাতৃজিন ও পিতৃজিনের মিলন, যার ফলে মাতাপিতার গুণাগুণ সন্তানে বর্তায়। সনাতন প্রজননবিদ্যার বিমূর্ত জিনকে এখন আমরা আধুনিক জীব-বিজ্ঞানের আলোকে ধরতে পেরেছি, জেনেছি তার গঠন-রহস্য। রাসায়নিক দৃষ্টিতে জিন হচ্ছে DNA নামক অতিকায় অণু, যা অ্যাডেনিন (A), গুয়ানিন (G), থাইমিন (T) এবং সাইটোসিন (C)—এই চার রকমের ক্ষারকযুক্ত ছোট ছোট নিউ-ক্লিওটাইড এককের সমন্বয়ে তৈরী। কোন জিন বা DNA-র অংশবিশেষে নিউক্লিওটাইডগুলির সজ্জাক্রমের মধ্যেই লুকিয়ে আছে প্রোটিনে অ্যামিনো অ্যাসিডগুলির সজ্জাক্রমের সঙ্কেত। এটাই হলো জেনেটিক কোড।

জীবদেহে প্রোটিনের কাজের গুরুত্ব নিউক্লিক অ্যাসিডের পরেই। পেশীর তন্তু, মজ্জা, কোষ-প্রাচীর, নখ, চুল ইত্যাদির প্রধান গঠনমূলক উপাদান প্রোটিন। রক্তরসে অবস্থিত পুষ্টির যোগানদার বিভিন্ন প্রোটিন, রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতাযুক্ত গ্লোবিউলিন, অক্সিজেন বহনের হিমো-গ্লোবিন ইত্যাদি প্রোটিনজাতীয়। আর জীব-কোষের পক্ষে অপরিহার্য যাবতীয় রাসায়নিক ক্রিয়ায় সাহায্য করে যে জৈব অনুঘটক বা এন্‌জাইম, সেগুলিও প্রোটিন। ইনসুলিন, অক্সি-টোসিন, ভাসোপ্রেসিন প্রভৃতি বহু হর্মোনও প্রোটিনজাতীয়। বার্তাবহ RNA-র মাধ্যমে DNA-ই ঠিক করে দেয় দেহের কোথায় কখন কোন্ এন্‌জাইম কি পরিমাণে তৈরি হবে। কাজেই জিনের মধ্যে কোন ত্রুটি থাকলে (অর্থাৎ DNA অণুর কোথায় ও উল্টাপাল্টা নিউক্লিওটাইড থাকলে অথবা এক বা একাধিক

---

* বসু বিজ্ঞান মন্দির, কলিকাতা-9

নিউক্লিওটাইড কোন কারণে অন্তর্হিত হলে) তার সংকেতে হয় ত্রুটিপূর্ণ এনজাইম বা প্রোটিন তৈরি হবে (দু-একটি জায়গায় ভুল অ্যামিনো অ্যাসিড থাকবার জন্যে) বা আদৌ তৈরি হবে না। জিনের এই রকম ত্রুটির জন্যে অনেক বংশগত ও জন্মগত ব্যাধি দেখা যায়। যেমন, গ্যালাক্টোসিমিয়া রোগে একটি এনজাইমের অভাবে গ্যালাক্টোজ শর্করার (এই শর্করা দুধের ল্যাক্টোজে বর্তমান) বিপাক হয় না, ফলে রক্তে ঐ শর্করা সঞ্চিত হয়। আবার সিক্‌ল্ সেল অ্যানিমিয়া রোগে অস্বাভাবিক ত্রুটিপূর্ণ হিমোগ্লোবিন তৈরি হয়, যার ফলে রক্ত তার স্বাভাবিক অক্সিজেন পরিবহনের কাজ করতে পারে না, আর লাল রক্তকণিকা গোলাকার না হয়ে কাস্তের মত দেখায়। যদি কোন কৃত্রিম উপায়ে স্বাভাবিক প্রোটিন তৈরির উপযোগী সুস্থ জিন দেহে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে ঐ ত্রুটি সংশোধন হতে পারে। কৃত্রিম জিন প্রস্তুতি, জিনের বার্তার ইচ্ছামত পরিবর্তন, জীবদেহের জিন সংযোজন, কোন জিনের ক্রিয়া ইচ্ছামত ব্যক্ত বা সুপ্ত রাখা ইত্যাদিই হচ্ছে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর কাজ।

বর্তমানে আমরা এমন একটা যুগে পৌঁচেছি, যখন মানুষের (অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও) জিনের গঠনের ইচ্ছামত পরিবর্তন সাধন আর অসম্ভব কল্পনাবিলাস নয়। খোরানা পরীক্ষা-নলে ছোট জিন সংশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। ভবিষ্যতে এভাবে আরও অনেক জটিল জিনের সংশ্লেষণও সম্ভব হবে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বেকউইথ একটি প্রাকৃতিক জিন ই. কোলাই জীবাণু থেকে বের করতে সক্ষম হয়েছেন। ভবিষ্যতে যে ভাবেই হোক, আমরা অনেক সুস্থ স্বাভাবিক জিন প্রকৃতি থেকে বা কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করতে সক্ষম হবো। নিরেনবার্গের মতে, পঁচিশ বছরের মধ্যেই জিনের প্রয়োগ মানুষের আয়ত্তের মধ্যে এসে যাবে। এখন কথা হচ্ছে, কিভাবে জীবদেহে এই জিনের প্রয়োগ হবে? এই জিনকে তো সাধারণ ওষুধের মত জীবদেহে ইঞ্জেকশন দিলে হবে না। অতিরিক্ত প্রবিষ্ট জিন জীবকোষের কেন্দ্রে অবস্থিত আদি জিনের সঙ্গে স্থায়ীভাবে সংযোজিত হওয়া দরকার।

কয়েকটি সম্ভাব্য উপায়ের সন্ধান পাওয়া গেছে। কতকগুলি ভাইরাসকে এই কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। ভাইরাস হচ্ছে জড় ও জীবের সীমারেখায় অতি আণুবীক্ষণিক বস্তু। এতে আছে মাঝখানে একটি নিউক্লিক অ্যাসিড দণ্ড (DNA বা RNA), আর তার চারদিকে প্রোটিনের আবরণ। এরা পরাশ্রয়ী। অন্য কোন জীবকোষের মধ্যেই এদের বংশবৃদ্ধি সম্ভব। কোন ভাইরাস জীবকোষকে আক্রমণ করবার সময় প্রোটিনের খোলস বাইরে পড়ে থাকে, শুধু ভিতরের নিউক্লিক অ্যাসিড কোষের ভিতরে প্রবেশ করে। ঐ নিউক্লিক অ্যাসিড বা ভাইরাস জিন তার সঙ্কেত অনুযায়ী ভাইরাসের দেহের উপযোগী নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিন তৈরি করিয়ে নেয় আশ্রয়দাতা কোষের কলাকৌশল নিজের কাজে লাগিয়ে। এইভাবে ভাইরাসের বৃদ্ধি ঘটে। অধিকাংশ ভাইরাসের বেলায় প্রতিটি কোষে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ভাইরাস সৃষ্টি হলেই তারা ঐ কোষকে ফাটিয়ে বেরিয়ে পড়ে, আবার নূতন নূতন কোষকে আক্রমণ করে; অর্থাৎ এই ভাইরাসগুলি যে কোষে জন্মাচ্ছে তাকেই ধ্বংস করছে। কিন্তু কতকগুলি ভাইরাস আছে, যারা শুধুমাত্র 'যাত্রী'র মত দেহকোষের আশ্রয়ে কোষ থেকে কোষান্তরে যায়, দেহকোষের কোন স্থায়ী ক্ষতিসাধন করে না। SV40 ও শোপে প্যাপিলোমা ভাইরাস (SPV) এরূপ দুটি DNA-যুক্ত ভাইরাস, যারা মানুষের কোন ক্ষতি করে না। এই দুটির যে

কোন ভাইরাসের DNA-তে যদি একটি অতিরিক্ত কৃত্রিম DNA জিন রাসায়নিকভাবে সংযুক্ত করা যায়, তাহলে সেই ভাইসাসের সঙ্গে ঐ কৃত্রিম জিন দেহকোষে প্রবেশ করানো যাবে।

উদাহরণস্বরূপ ফিনাইলকিটোনিউরিয়া একটি বংশগত ব্যাধি। এই রোগে ফিনাইল অ্যালানিন নামক অ্যামিনো অ্যাসিডের বিপাক হয় না একটি গুরুত্বপুর্ণ এনজাইম না থাকবার ফলে। যদি SV-40 ভাইরাসে ফিনাইল অ্যালানিন হাইড্রক্সিলেজ এনজাইম তৈরির উপযোগী বার্তা বা জিন যোগ করে ঐ ভাইরাস দিয়ে রোগীকে সংক্রামিত করা যায়, তাহলে রোগীর দেহে ঐ এনজাইম তৈরি হবে এবং বংশগত রোগটি সেরে যাবে। যতদিন ঐ ভাইরাস দেহে থাকবে, ততদিনই রোগটির কোন লক্ষণ থাকবে না। SPV ভাইরাসের জিন মানবদেহে একবার প্রবেশ করিয়ে দিলে কুড়ি বছর পর্যন্ত তার কার্যকারিতা থাকতে দেখা গেছে। SPV দিয়ে আরও একপ্রকার সহজ জিন থিরাপির উদাহরণ আছে। আর্জিনিমিয়া রোগে রক্তে আর্জিনিন অ্যামিনো অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে যায়। এর ফলে মানসিক অপূর্ণতা ও আরও অনেক উপসর্গ দেখা দেয়। SPV দিয়ে সংক্রামিত করলে কোষে আর্জিনেজ এনজাইম প্রস্তুত হয়। ঐ এনজাইম আর্জিনেনকে ভেঙ্গে ফেলে।

DNA ও RNA-যুক্ত উভয় শ্রেণীর ভাই-রাসের জিনেই অতিরিক্ত DNA বা RNA জিন যোগ করে দেবার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। RNA-ভাইরাসে কোন DNA থাকে না। RNA-ই হলো তার জেনেটিক পদার্থ। প্রকৃতি থেকে কোন বিশেষ এনজাইমের উপযোগী বার্তাবহ RNA আহরণ করে RNA-ভাইরাসের মাধ্যমে প্রাণীর দেহে ঐ জিন প্রবেশ করানো সম্ভব। শুধু প্রয়োজন, ইচ্ছামত এনজাইমের জিন ও তার বহনোপযোগী ভাইরাস খুঁজে পাওয়া—যারা ক্ষতিকর নয়। পোলিও ভাইরাস, অ্যাডেনো ভাইরাসকেও পরিব্যক্ত (Mutated) করে তার রোগ সৃষ্টির ক্ষমতা কমিয়ে দিয়ে বাহক হিসাবে ব্যবহারের সম্ভাবনা আছে।

উদ্ভিজ্জ খাদ্যের পুষ্টিগুণও এইভাবে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সাহায্যে বৃদ্ধি করা যেতে পারে। গাছের বেলায় কৃত্রিম RNA জিন RNA-ভাইরাসের সাহায্যে ঢুকিয়ে দেওয়া খুবই সহজ। পরীক্ষায় দেখা গেছে, তামাক পাতার ভাইরাস TMV (Tabacco Mosaic Virus) RNA-তে খানিকটা poly A (শুধু অ্যাডেনিন নিউক্লিও-টাইড পর পর জুড়ে তৈরি) জুড়ে ঐ RNA দিয়ে তামাক পাতাকে আক্রান্ত করা হলে ঐ কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত RNA আবার TMV সৃষ্টি করে চলে। ঐ নবজাত TMV-তে অতিরিক্ত poly A বার্তা থাকবার দরুণ পলিলাইসিন (পর পর লাইসিন অ্যামিনো অ্যাসিড জুড়ে প্রোটিনের মত বস্তু) তৈরি হয় উপরি পাওনা হিসাবে, কারণ AAA হচ্ছে লাইসিনের সঙ্কেত। উদ্ভিজ্জ প্রোটিনে লাইসিন কম থাকবার দরুণ তার পুষ্টি-গুণ প্রাণীজ প্রোটিনের তুলনায় কম। যদি উপরিউক্তভাবে ফলনশীল গমের গাছের পক্ষে ক্ষতিকর নয়, এমন RNA ভাইরাসে এভাবে poly A যোগ করে সংক্রামিত করা হয়, তাহলে ঐ গমেও পলিলাইসিন তৈরি হতে পারে। ফলে গমের পুষ্টিমূল্য বেড়ে যাবে। এইভাবে ভাইরাস একবার তৈরি করলেই চলবে। তাথেকে উদ্ভূত প্রজন্ম ভাইরাসেও ঐ জেনেটিক বার্তা থাকবে, যাদের দিয়ে আবার নতুন নতুন ফসলকে সংক্রামিত করা যাবে।

আরও সম্ভাব্য একটি উপায় হলো, একেবারে কৃত্রিম ভাইরাস সৃষ্টি করা। প্রকৃতিতে ভাইরাস জীবকোষে বংশবৃদ্ধি ঘটাবার সময় কখনও কখনও ভুল করে কতকগুলি ভুল ভাইরাস

(Pseudovirion) তৈরি হয়, যার বাইরে থাকে ভাইরাসের প্রোটিনের আবরণ, কিন্তু মাঝখানে ভাইরাস জিনের বদলে খানিকটা আশ্রয়-কোষের জিন। আশা করা যাচ্ছে, এইভাবে কৃত্রিম নিউক্লিক অ্যাসিড জিনের চারদিকে কোন ভাইরাসের প্রোটিনের আবরণ দিয়ে ঐ কৃত্রিম ভাইরাসের মাধ্যমে জিনকে দেহকোষে জিন সংযোগ করা সম্ভব হবে।

সম্প্রতি ডেনিয়েলি কৃত্রিম অ্যামিবা-কোষ তৈরি করেছেন। তিনি একটি অ্যামিবার কোষ থেকে সূক্ষ্ম নলের সাহায্যে ভিতরের সমস্ত সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস বের করে নিয়ে অন্য একটি অ্যামিবার অভ্যন্তরস্থ সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস ঢুকিয়ে দিয়েছেন। এইভাবে সৃষ্ট কৃত্রিম অ্যামিবা শুধু বেঁচেই থাকে না, প্রজননেও সক্ষম। একটি জীবকোষে তার নিউক্লিয়াসের বদলে অন্য নিউ-ক্লিয়াস প্রতিরোপণ করা (Transplant) এখন সহজ ব্যাপার। এই জ্ঞানকে জেনেটিক ইঞ্জিনীয়ারিং-এ কাজে লাগানো যেতে পারে। ধরা যাক, জন্মগত কোন ত্রুটির জন্যে কারও লিভার বা প্লীহাতে কোন দরকারী এনজাইম তৈরি হয় না। এখন অবশ্য অসুস্থ প্রত্যঙ্গের বদলে সদ্যমৃত ও সুস্থ দাতার দেহ থেকে সংগৃহীত অঙ্গ সংযোজনের চেষ্টা চলছে। সে ক্ষেত্রে অসুবিধা প্রধানতঃ দুটি। প্রথমতঃ সময়মত দাতার প্রত্যঙ্গ পাওয়া; দ্বিতীয়তঃ গ্রহীতার দেহ অপরের প্রত্যঙ্গ কিছুদিন পরেই প্রত্যাখান করে। এই প্রত্যাখানের মূলে রয়েছে বিজাতীয় বস্তুর প্রতি আমাদের দেহের আভ্যন্তরীণ প্রতিরোধশক্তি (Immuno-response)। অঙ্গ প্রত্যাখানে মূলতঃ কোষের উপরস্থ অ্যান্টিজেনগুলি আছে। যদি আমরা রোগীর নিজের প্রত্যঙ্গের কিছু কোষ নিয়ে পরীক্ষাগারে টিস্যু কালচারে তাদের বর্ধিত করি এবং পরে তাদের নিউক্লিয়াসের বদলে সুস্থ ব্যক্তির নিউক্লিয়াস ঢুকিয়ে দিয়ে ঐ কোষ অঙ্গে সংযোজন করতে পারি, তাহলে রোগীর দেহ ঐ কোষ প্রত্যাখান করবে না। অথচ সুস্থ নিউক্লিয়াস (নিউক্লিয়াসই জিনের আবাসস্থল) থাকবার ফলে বাঞ্ছিত এনজাইম তৈরি হতে পারবে।

উপরে যতগুলি উদাহরণ আলোচিত হয়েছে, প্রায় সবগুলিতেই আক্রান্ত ব্যক্তির ত্রুটি সারাবার উপায় বর্ণিত হয়েছে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংকে অন্য একটি দিকেও নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। সেটি হলো, জন্মের আগেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জিন-সমাবেশ নির্ধারণ করে দেওয়া, যাতে ইচ্ছা-মত বৈশিষ্ট্য ও নিপুণতাসম্পন্ন মানব গোষ্ঠী তৈরি করা যায়। ক্লোনিং বা একটি কোষ থেকে ঠিক একই মানুষের প্রতিরূপ অবিকল এক মানব গোষ্ঠী তৈরি করা তার একটি উদাহরণ (জ্ঞান ও বিজ্ঞান, জানুয়ারী, 1971 দ্রষ্টব্য)। এই সব কাজে হাত দেবার আগে অনেক সামাজিক ও মানবিক সমস্যার কথা ভাবতে হবে। সমাজ-বিজ্ঞানী, রাষ্ট্র-বিজ্ঞানী ও জীব-বিজ্ঞানীদের একযোগে এই সব সমস্যার আলোচনার বিষয় ও তার সমাধানের কথা চিন্তা করতে হবে। এই প্রবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরে সে আলোচনা করা সম্ভব নয়।

কিশোর বিজ্ঞানীর
দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জুলাই — 1971

চতুর্বিংশ বর্ষ — সপ্তম সংখ্যা



অস্ত্রোপচারের পরিবর্তে লেসার রশ্মির সাহায্যে চোখের রেটিনার চিকিৎসার ব্যবস্থা। ডাক্তার ও তাঁর সহকারী রোগীর চোখের অভ্যন্তর ভাগ পরীক্ষা করে দেখছেন। কোনরূপ যন্ত্রণা বা অসুবিধার সৃষ্টি না করে লেসারের অতি সূক্ষ্ম রশ্মি চোখের লেন্সের মধ্য দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে রেটিনার ত্রুটি সংশোধন করে।

চাঁদ ও অন্যান্য জ্যোতিষ্কের আকাশ

পৃথিবীর কোন মানুষ চাঁদে পা দিলে প্রথমেই তার চোখে পড়বে চাঁদের আকাশের দিকে। পৃথিবীর মত সুনীল আকাশ সেখানে নেই, প্রচণ্ড রোদ থাকা সত্ত্বেও সেখানকার আকাশকে মাথার উপর একটা কালো ঢাক্‌নার মত মনে হবে। তার কারণ সেখানে বাতাস নেই, কাজেই বাতাসে ভাসমান ধূলিকণাও নেই। এই কারণেই ভোরে বা সন্ধ্যায় পৃথিবীর মত সেখানে আলো-আঁধারির ভাবটাও নেই। সেখানে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সেই আলোকচ্ছটাও নেই। হঠাৎ সেখানে দিন আসে আধার হঠাৎ রাতও আসে। সূর্যের আলো যেখানে সোজাসুজি পড়ে, সেই জায়গাটাই কেবল আলোকিত হয়, অন্যান্য জায়গাগুলি কালো আঁধারে ঢেকে থাকে।

চাঁদ থেকে পৃথিবীকে দেখা যাবে একটা বড় থালার মত, যার ব্যাস হবে পৃথিবী থেকে চাঁদের যে ব্যাস দেখা যায়, তার প্রায় চারগুণ। তবে চাঁদ থেকে পৃথিবী-পৃষ্ঠের খুঁটিনাটি কিছুই চোখে পড়বে না। এর কারণ পৃথিবীতে সূর্যের আলো পড়বার আগেই তার অনেক অংশই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে বিচ্ছুরিত হয়ে যায়।

আমাদের আকাশে যেমন চাঁদের কলা দেখতে পাই, চাঁদের আকাশেও পৃথিবীর সেরূপ কলা দেখা যাবে। তবে একটা অন্যটার বিপরীত। আমরা যখন পৃথিবীতে পূর্ণিমার চাঁদ দেখি, চাঁদ থেকে তখন দেখা যাবে শুক্ল প্রতিপদের পৃথিবী। তেমনি এখানে যখন শুক্লপক্ষের প্রতিপদ চাঁদ থেকে পৃথিবীকে থালার মত দেখাবে; অর্থাৎ সেখানে পূর্ণ পৃথিবী। এখান থেকে আমরা যখন দেখছি শুক্লপক্ষের চাঁদ পূর্ণিমার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, চাঁদের আকাশে দেখা যাবে কৃষ্ণপক্ষের পৃথিবী ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। চাঁদে যখন পূর্ণ পৃথিবী, সেখানে তখন আলোর প্লাবন বয়ে যাবে—মনে হবে নব্বইটা পূর্ণিমার চাঁদ যেন আলো দিচ্ছে। তখন অনায়াসেই সেখানে ছোট ছোট অক্ষরে লেখা বই পড়া যেতে পারে। আমাদের আকাশে চাঁদ ওঠে আর ডোবে। কিন্তু চাঁদের আকাশে পৃথিবীকে উঠতে বা ডুবতে দেখা যায় না—দেখা যাবে আকাশের এক জায়গায় স্থির হয়ে ভেসে থাকতে। আর তারাগুলিকে দেখা যাবে আকাশে তার পিছন দিয়ে ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। এর কারণ হলো, চাঁদ পৃথিবীর দিকে তার একটা মুখই ফিরিয়ে রাখে। তবে একেবারে স্থির হয়ে থাকে বললে ভুল হবে। কারণ চাঁদের যে সব জায়গা থেকে পৃথিবীকে দিগন্ত রেখার কাছাকাছি দেখা যাবে, সেখানে মনে হবে, আকাশ প্রদক্ষিণ না করেও পৃথিবী এক আঁকাবাঁকা পথে ভেসে চলেছে আর একবার উঠছে আর ডুবছে।

চাঁদের আকাশেও সৌর আর পার্থিব—এই দুই রকম গ্রহণ দেখতে পাওয়া যাবে। আমরা পৃথিবীতে যখন চন্দ্রগ্রহণ দেখি, চাঁদে তখনই সূর্যগ্রহণ হয়। পৃথিবী তখন সূর্য আর চাঁদের মাঝখানে এসে পড়ে আর চাঁদ পৃথিবীর ছায়ায় ডুবে যায়। চাঁদে সূর্যগ্রহণ পৃথিবীর মত কয়েক মিনিটের জন্যে নয়, তা চার ঘণ্টারও বেশী স্থায়ী হয়।

চাঁদের আকাশে পৃথিবীর গ্রহণ অতি সামান্য ব্যাপার। তখন চাঁদ থেকে দেখা যাবে, পূর্ণ পৃথিবীর বিরাট চাকার গায়ে একটা ছোট বৃত্তাকার অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থান। এটা আর কিছুই নয়, পৃথিবীর বুকের উপর চাঁদের ছায়া আর যে জায়গা দিয়ে এই বৃত্তটি যাবে, সেখান থেকেই পৃথিবীর সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে।

এবার শুক্রে আসা যাক। এখানকার আকাশে সূর্যকে দেখা যাবে দ্বিগুণ বড় আকারে—তার উত্তাপ আর আলোও হবে পৃথিবীর চেয়ে দ্বিগুণ বেশী। শুক্রের রাতের আকাশে পৃথিবীকে দেখতে পাওয়া যাবে অত্যন্ত উজ্জ্বল একটা তারা হিসাবে। পৃথিবী আর শুক্র আকারে প্রায় সমান অথচ পৃথিবী থেকে শুক্রকে যতটা উজ্জ্বল দেখায়, তার চেয়ে অনেক বেশী উজ্জ্বল দেখায় শুক্র থেকে পৃথিবীকে। এর কারণ আছে। শুক্র পৃথিবীর চেয়ে সূর্যের বেশী কাছে। তাই শুক্র যখন পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আসে, তখন তার আঁধারে ঢাকা দিকটাই আমাদের দিকে ফেরানো থাকে। তারপর একটু দূরে সরে যেতেই শুক্রের একটা ছোট অংশ বা কলা আমরা দেখতে পাই। অথচ শুক্র থেকে দেখা যাবে পৃথিবী যখন শুক্রের সবচেয়ে কাছে, তখনই পৃথিবীর সবটা আলোকিত অর্থাৎ পূর্ণ পৃথিবী। এই জন্যেই উজ্জ্বলতার এই বৈষম্য।

শুক্রের আকাশে একটা চিত্তাকর্ষক দৃশ্য হলো, পৃথিবী ও চাঁদের মিলিত পরিক্রমা। মনে হবে, একটা ফুটবল আর একটা পিংপং বল নেহাৎই খামখেয়ালিভাবে লাফালাফি করছে। আকাশে দেখা যাবে অসংখ্য তারার মেলা—যেমন আমরা দেখি পৃথিবীর আকাশে। শুধু শুক্র কেন—বুধ, বৃহস্পতি, শনি, নেপচুন বা প্লুটো সব গ্রহ থেকেই একই নক্ষত্র-জগৎ দেখতে পাওয়া যাবে। কারণ গ্রহমণ্ডলীর মধ্যেই দূরত্বের অনুপাতে তারাগুলি রয়েছে আরো অনেক অনেক দূরে।

শুক্রের পালা শেষ করে এবার বুধে পা দেওয়া যাক। সে এক আশ্চর্য জগৎ। চাঁদের অর্ধাংশের সঙ্গে পৃথিবীর যে ধরণের আড়ি, তেমনি বুধের অর্ধাংশ সূর্যের দিক থেকে সারা বছর মুখ ফিরিয়ে থাকে। সুতরাং সূর্য আকাশে স্থির হয়ে ঝুলতে থাকে—নেই দিন-রাত্রির পালা।*

বুধের সূর্য পৃথিবীর সূর্য থেকে ছয় গুণেরও বেশী বড়। আমাদের আকাশে শুক্রের

*সম্প্রতি জানা গেছে বুধের আহ্নিক গতি আছে। বুধ গ্রহটি 59 দিনে নিজের অক্ষের উপর আবর্তিত হয়। আমাদের পৃথিবীর মত ওখানেও সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত হয়।

উজ্জ্বলতায় বুধের আকাশে পৃথিবীকে দেখা যাবে। বুধের কালো মেঘমুক্ত আকাশে শুক্রের দীপ্তি সৌর মণ্ডলীর অপর গ্রহ বা তারার ঔজ্জ্বল্যকে ম্লান করে দেয়।

এবার মঙ্গলে আসা যাক। এখানকার আকাশে সূর্যকে পৃথিবী থেকে দেখা সূর্যের দুই-তৃতীয়াংশ আয়তনে দেখা যাবে। 24 ঘঃ 37 মিঃ অন্তর সূর্যোদয় দেখতে পাওয়া যাবে। মঙ্গলের আকাশে পৃথিবীকে শুকতারা আর সন্ধ্যাতারার ভূমিকাতেই দেখতে পাওয়া যাবে—যেমন আমাদের আকাশে দেখি শুক্রকে। পৃথিবীর চাঁদের কলা পরিবর্তন সেখানকার আকাশে দেখা যাবে। তবে পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশ সেখানে সব সময়ই অদৃশ্য থেকে যাবে। চাঁদকে খালি চোখেই বেশ উজ্জ্বল দেখতে পাওয়া যাবে। মঙ্গলের নিকটতম উপগ্রহ ফোবোস আকারে ছোট (16 কিঃ মিঃ ব্যাস) হলেও খুব কাছে থাকায় তার কলাগুলি স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাবে। ফোবোসের বুকে দাঁড়ালে দেখা যাবে আকাশের 85° জুড়ে আমাদের চাঁদের চেয়ে কয়েক হাজার গুণ বেশী উজ্জ্বল একটা থালা অতি দ্রুত তার কলা বদ্‌লে চলেছে—এটাই হলো মঙ্গলগ্রহ।

মঙ্গল ছেড়ে এবার বৃহস্পতিকে ধরা যাক। বৃহস্পতির আকাশ পরিষ্কার থাকলে সূর্যকে দেখা যাবে আয়তনে আমাদের আকাশের সূর্যের পঁচিশ ভাগ ছোট। পাঁচ ঘণ্টায় দিন সহজেই শেষ হয়ে রাত এসে পড়ে। সেখানে বুধ অদৃশ্য আর মঙ্গলকেও অদৃশ্য বলা চলে। শুক্র আর পৃথিবীকে কেবলমাত্র গোধূলিতে দূরবীনের সাহায্যে দেখা যাবে—তারা সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে আবার অস্ত যায়। তবে শনিকে বেশ উজ্জ্বল দেখাবে।

বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডল অত্যন্ত ঘন আর উঁচু। আলোকরশ্মি ট্যারছাভাবে বায়ুমণ্ডল ভেদ করে বৃহস্পতির বুকে পড়ে; ফলে দৃষ্টিভ্রম ঘটে। অনেকে মনে করেন—বৃহস্পতির বুকে দাঁড়ালে মনে হবে যেন একটা বিরাট গামলার ভিতর দাড়িয়ে আছেন। মাথার উপর বিশাল আকাশ গামলার শেষ প্রান্তে অস্বচ্ছ ধোঁয়াটে পাড়ে শেষ হয়ে গেছে। তবে এই সব কল্পনার সত্যতা সম্পর্কে সঠিক কিছু বলা যায় না।

এখন শনির কথায় আসা যাক। শনির বিখ্যাত বলয়গুলিকে শনি-পৃষ্ঠের সব জায়গা থেকে দেখা যায় না। মেরু থেকে 640° অক্ষাংশ থেকে তারা অদৃশ্য। 50° অক্ষাংশে বলয়গুলি পুরো দেখা যাবে। বলয়গুলির একটি পাশ মাত্র আলোকিত, অন্য দিকটা অন্ধকারে ঢাকা।

শ্রীচঞ্চলকুমার রায়

পারদর্শিতার পরীক্ষা

শারীরতত্ত্ব ও জীববিদ্যা বিষয়ক পাঁচটি প্রশ্ন নীচে দেওয়া হলো। উত্তর দেবার জন্যে মোট সময় 2 মিনিট। ঐ সময়ের মধ্যে 5টি, 4টি, 3টি, 2টি বা 1টি প্রশ্নের উত্তর সঠিক হলে উল্লিখিত বিষয়গুলিতে পারদর্শিতা যথাক্রমে খুব বেশী, বেশী, চলনসই, কম বা খুব কম। কোন প্রশ্নেরই উত্তর ঠিক না হলে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

1. কোন্‌টি ঠিক, বল—

স্বস্থ মানবদেহের রক্তে শ্বেত কণিকা ও লোহিত কণিকার অনুপাত মোটামুটিভাবে

1 : 5

1 : 50

1 : 500

1 : 5000

2. কোন্‌টি শীতল রক্তবিশিষ্ট প্রাণী ?

মানুষ

ছাগল

বানর

সাপ

3. কোন্‌টি ঠিক, বল—

মানবদেহে যে পৃথক অস্থিগুলি নানাভাবে যুক্ত হয়ে আছে, তাদের সংখ্যা মোটামুটিভাবে—

20

200

2000

20000

4. কোন্‌ প্রাণীটি স্তন্যপায়ী নয় ?

তিমি

বাদুড়

উটপাখী

প্ল্যাটিপাস

5. জীবকোষের কোন্ অংশে ক্রোম্যাটিন (Chromatin) দেখা যায় ?

নিউক্লিয়াস

সাইটোপ্লাজম

ক্রোমোজোম

কোষ-আবরণ

(উত্তর— 444 নং পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত ও জয়ন্ত বসু*

* সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9

অ্যালকেমিষ্টদের পরশপাথর

অ্যালকেমি কথাটা এসেছে গ্রীক শব্দ কিমিয়া থেকে—যার অর্থ সোনা তৈরির কৌশল। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্লেটো ও তাঁর শিষ্য অ্যারিস্টটল—এই দুই বিখ্যাত গ্রীক পণ্ডিত প্রচার করেন যে, সকল জড় বস্তুই কয়েকটি মৌলিক ধর্ম বা গুণের বিভিন্ন আনুপাতিক সমাবেশে গঠিত এবং সেই গুণাবলী এক বস্তু থেকে অপর বস্তুতে অপসারিত করা যায়; অর্থাৎ সহজ কথায় কোন রাসায়নিক বা ভৌত প্রক্রিয়ার দ্বারা একটি মৌলিক পদার্থকে অপর একটি মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত করা সম্ভব। প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের এই মতবাদ বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের প্রভাবিত করে এবং তখন থেকেই বিজ্ঞানীদের মনে এই ধারণা গড়ে ওঠে যে, কোনও নিকৃষ্ট ধাতুকে হয়তো রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সোনাতে পরিণত করা সম্ভব হতে পারে। এর ফলে খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীর গোড়ার দিকে পঃ এশিয়া ও ইউরোপে গড়ে ওঠে এক বিজ্ঞানী সম্প্রদায়, যাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—লোহা, সীসা প্রভৃতি নিকৃষ্ট ধাতুকে সোনায় পরিণত করবার কৌশল আবিষ্কার করা। এঁদের বলা হতো অ্যালকেমিস্ট।

অ্যালকেমিস্টদের মতে, সোনাই হলো সকল ধাতুর শেষ পরিণতি। লোহা, সীসা, তামা, পারদ প্রভৃতি বিভিন্ন ধাতু ভূগর্ভে সৃষ্ট হয়, বৃদ্ধি পায় ও প্রাকৃতিক নিয়মে পরিণত অবস্থায় সোনায় রূপান্তরিত হয়। এই ভ্রান্ত ধারণার বশে অ্যালকেমিস্টরা ভাবতে শুরু করেন যে, কোন কৌশলে যদি তাঁরা প্রাকৃতিক এই রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করতে পারেন, তবে অতি অল্প সময়ে পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত ধাতুকে সোনায় পরিণত করা সম্ভব হবে। অ্যালকেমিস্টদের এই মতবাদ আজ হাস্যকর মনে হলেও তাঁদের এই সোনা তৈরির প্রচেষ্টার

মধ্য দিয়েই রসায়নবিদ্যার বহু তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। অ্যালকেমিস্টরা আবিষ্কার করেন সালফিউরিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড—যেগুলি রাসায়নিক গবেষণার অপরিহার্য অঙ্গ। গন্ধক ও পারদের বিভিন্ন যৌগ এবং সোনাকে দ্রবীভূত করবার একমাত্র দ্রাবক অ্যাকোয়া রিজিয়া (Aqua Regia)—এক ভাগ HNO_3 ও তিন ভাগ HCl-এর মিশ্রণ। দু-একটি সঙ্কর ধাতু, কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক পদার্থও এই সময় আবিষ্কৃত হয়। আজকাল আমরা যে এত রকমের ফুলের নির্যাস ও আতর ব্যবহার করি, সেগুলির অধিকাংশই অ্যালকেমিস্টদের দান। অবশ্য কিছু সংখ্যক অ্যালকেমিস্ট রাসায়নিক গবেষণায় উৎসাহী না হয়ে তন্ত্রমন্ত্র এবং ঝাড়ফুঁকের সাহায্যেই সোনা তৈরির স্বপ্ন দেখতেন। তাঁরা পরশপাথরের (Philosopher's stone) অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন এবং প্রত্যেকেই নিজস্ব মতবাদ প্রচার করে লোকের মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করতেন।

সে যুগে রাজারা সোনার লোভে অ্যালকেমিস্টদের সাহায্য করতেন। কথিত আছে, সম্রাট দ্বিতীয় চার্লস-এর শয়নকক্ষের তলায় অ্যালকেমির একটি গুপ্ত পরীক্ষাগার ছিল। রোজার বেকন, নিউটন, অ্যালবার্টাস ম্যাগনাস প্রমুখ বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও দার্শনিকেরাও অ্যালকেমির চর্চায় উৎসাহী ছিলেন।

অ্যালকেমি-চর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল মিশর, সিরিয়া, পারস্য, আরব, চীন ও ইউরোপের ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে। ভারতবর্ষে অ্যালকেমির চর্চা প্রায় হয় নি বলা যায়—কারণ প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের মতবাদ এবং গ্রীক দর্শন ছিল অ্যালকেমি চর্চার ভিত্তিস্বরূপ। যে কারণেই হোক, ভারতের বিজ্ঞানীরা সে যুগে ঐ গ্রীক দর্শন ও বিজ্ঞানে বিশ্বাসী ছিলেন না। অন্যান্য দেশগুলিতে কিন্তু খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত কয়েক শত বছর ধরে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অ্যালকেমিস্টদের প্রতিপত্তি অব্যাহত ছিল। তবে জনসাধারণ ক্রমশঃ তাদের সন্দেহের চোখে দেখতে সুরু করে। কারণ অ্যালকেমির চর্চা কেবল বিজ্ঞানীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে ক্রমশঃ প্রতারকদের হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল। ফলে জনসাধারণের মনে রসায়নবিদ্যার প্রতি সন্দেহের উদ্রেক হয় এবং অ্যালকেমির চর্চা প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়। এই সময় খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে প্যারাসেলসাস নামে একজন রসায়নবিদ প্রচার করেন যে, অ্যালকেমিস্টরা এতদিন কিছুটা ভ্রান্ত পথে চালিত হয়েছেন, অ্যালকেমি-চর্চার প্রকৃত উদ্দেশ্য—বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধের ঔষধ প্রস্তুত করা—স্বর্ণোৎপাদন করা নয়। প্যারাসেলসাসের প্রভাবে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে অ্যালকেমিস্টরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন। অল্প সংখ্যক বিজ্ঞানী তখনও কৃত্রিম সোনা তৈরির জন্যে গবেষণা চালিয়ে যান, কিন্তু অধিকাংশ অ্যালকেমিস্টদেরই কয়েক শতাব্দীর নৈরাশ্যের ফলে অ্যারিস্টটলের মতবাদের উপর আস্থা কমে আসে এবং তাঁরা চিকিৎসা-রসায়ন বা আয়েট্রো কেমিস্ট্রিতে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। এরপর থেকে বিভিন্ন রোগের ঔষধ প্রস্তুতি, নতুন নতুন রাসায়নিক যৌগের গুণাগুণ নির্ণয় ও সেগুলিকে মানুষের উপকারে লাগাবার প্রচেষ্টাই

ছিল অ্যালকেমিস্টদের প্রধান কাজ। অবশেষে সপ্তদশ শতাব্দীতে আয়ার্ল্যাণ্ডের বিজ্ঞানী রবার্ট বয়েল মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের প্রভেদ বুঝিয়ে দেন এবং মৌলিক পদার্থের সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নির্দেশ করেন। ফলে অ্যারিষ্টটলের বহু বিতর্কিত চতুর্মৌলিক মতবাদ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারেন যে, কোনও ভৌত বা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মৌলিক পদার্থের রূপান্তর সম্ভব নয়। এর পর সোনা তৈরির প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় এবং রসায়ন-বিজ্ঞান অনেকটা আধুনিক রূপ লাভ করে।

অবশ্য আজ এই বিংশ শতাব্দীতে ইলেট্রন তত্ত্ব আবিষ্কার হওয়ায় প্রাচীন অ্যালকেমিস্টদের স্বপ্ন আমাদের কাছে অসম্ভব বা অবাস্তব মনে হবার কোনও কারণ নেই। আমরা জানি, মৌলিক পদার্থের পরমাণুতে আছে প্রধানতঃ প্রোটন, ইলেকট্রন ও নিউট্রন কণিকা। এর মধ্যে প্রোটনের সংখ্যা পদার্থের মৌলিকত্ব বজায় রাখে, অর্থাৎ কোনও মৌলিক পদার্থের পরমাণুতে যদি প্রোটনের সংখ্যা কমানো বা বাড়ানো যায়, তবে সেটা অন্য এক মৌলিক পদার্থে পরিণত হবে। যেমন—একটা সোনার পরমাণুতে প্রোটন আছে 79 আর একটা পারদের পরমাণুতে প্রোটন আছে 80, এখন যদি কোনও উপায়ে পারদের পরমাণু থেকে একটা প্রোটন কমিয়ে দেওয়া যায়, তবে সেটা সোনার পরমাণুতে পরিণত হবে। এইভাবে বর্তমানে আবিষ্কৃত সাইক্লোট্রন, বিভাট্রন, কস্‌মোট্রন প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে মৌলিক পদার্থের রূপান্তর ঘটানো সম্ভব হচ্ছে। এই সব যন্ত্রের সাহায্যে আমরা কৃত্রিম উপায়ে সোনাও পেতে পারি। এথেকে মনে হতে পারে যে, এর ফলে সোনার মূল্যও বোধ হয় খুব কমে যাবে। কিন্তু তা হবে না, কারণ এই পদ্ধতিতে সোনা তৈরি করা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য এবং এই ব্যয় উৎপন্ন সোনার মূল্যের চেয়ে অনেক বেশীই হবে। সুতরাং অ্যালকেমিস্টদের পরশপাথর আজ আমাদের হাতে এলেও আর্থিক দিক দিয়ে লাভবান হবার সম্ভাবনা নেই।

বুলবুল বন্দ্যোপাধ্যায়

মুক্তার কথা

মুক্তার সঙ্গে মানুষের পরিচয় প্রাচীন কাল থেকেই। বস্তুতঃ প্রাচীন কাল থেকেই মুক্তাকে অলঙ্কার হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। ভারতের প্রাচীন অথর্ববেদে ও সুপ্রাচীন মিশরীয় সভ্যতায় মুক্তার উল্লেখ দেখা যায়।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, জুলিয়াস সিজার তাঁর প্রিয়পাত্রী সারভিলিয়াকে একটি দামী মুক্তা উপহার দিয়েছিলেন, যার দাম ছিল প্রায় পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড। সৌন্দর্যের রাণী ক্লিওপেট্রা একটি মুক্তা গলাধঃকরণ করেছিলেন, যার দাম ছিল প্রায়

আশি হাজার পাউণ্ড। টাভার্নিয়ার নামে এক পর্যটক একটি আশ্চর্য সুন্দর মুক্তা এক-শ' আশি হাজার পাউণ্ড মূল্যে পারস্যের সম্রাটকে বিক্রয় করেছিলেন। মুক্তা সম্বন্ধে আরও বিস্ময়কর কাহিনীর সন্ধান ইতিহাসে পাওয়া যায়। তাছাড়া ভারতের মুঘল বাদশা সাজাহানের মণিমুক্তার ভাণ্ডারের কথা কে না জানে?

মুক্তার জন্মকথা—সমুদ্রে ছোট বড় নানা জাতের ঝিনুক পাওয়া যায়। তার মধ্যে এক জাতীয় বড় ঝিনুকের ভিতর মুক্তা জন্মায়। এই ঝিনুকের নাম শুক্তি (Meleagrina)। এটা মোলাস্কা বা শম্বুক পর্বের অন্তর্গত পেলিসাইপোডা (Pelecypoda) শ্রেণীর প্রাণী। ঝিনুকের দেহের দু-পাশে শক্ত খোলস থাকে। সমান দুটি পার্শ্বীয় অংশে বিভক্ত এই খোলসটি ঝিনুকের কোমল দেহটাকে আবৃত করে রাখে। খাদ্য-গ্রহণ করবার সময় মাঝে মাঝে প্রাণীটিকে ঐ শক্ত খোলসটির কিছুটা খুলতে হয়। সে সময় কোন রকমে যদি কোন কঠিন কণা তার ভিতরে ঢুকে যায়, তবে সেটা তার নরম দেহে কাঁটার মত বিঁধতে থাকে। তখন সেই শুক্তি তার দেহ থেকে এক প্রকার রস নির্গত করে এবং কণাটির চতুর্দিকে সেই রসের প্রলেপ দিয়ে কণাটিকে সহনীয় করে নেয়। তারপর শুক্তির দেহের ভিতর কণাটি ক্রমাগত রসের প্রলেপে মোটা হতে থাকে। যখন শুক্তি মারা যায়, তখন তার দেহের শক্ত খোলকটি আপনা থেকেই শিথিল হয়ে যায় এবং তার দেহের ভিতর থেকে শক্ত ডেলাটি বেরিয়ে এসে সমুদ্রতলে পড়ে থাকে। ঐ ডেলাটির রং হয় অদ্ভুত সুন্দর—লাল, নীল, হলদে, সাদা প্রভৃতি ঝকঝকে রঙে সে যেন সূর্যের আলোয় জ্বলতে থাকে। এরাই স্বভাবজ খাঁটি মুক্তা।

কিন্তু এই স্বভাবজ মুক্তার দাম অনেক—সাধারণ মানুষের ক্রয়-সীমার বাইরে। কিন্তু সাধারণ ঘরের মেয়েদেরও ইচ্ছা হয় মুক্তার মালা পরবার। কাজেই প্রয়োজন হলো অপেক্ষাকৃত সস্তাদরের মুক্তার। বাজারে বের হলো নকল মুক্তা। কিন্তু এর মধ্যে কতকগুলি একেবারেই নকল—পুতি অথবা কাচগোলকের উপর নানা প্রকার রঙের প্রলেপ দিয়ে এগুলি তৈরি করা হয়, কিন্তু কিছুদিন বাদেই এর উপরের রং উঠে যায়।

বহুদিনের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে আর একটি উপায়ে মানুষ কৃত্রিম মুক্তা উৎপাদনে আসল মুক্তার নিকটবর্তী হতে সক্ষম হয়েছে। এই মুক্তার নাম কালচার্ড বা কর্ষিত মুক্তা। ডুবুরীরা খুঁজে বের করে সমুদ্রের তলদেশে কোন্ গোপন স্থানে ঝাঁকে ঝাঁকে শুক্তি বাস করে। তারপর বছরের যে সময় সেই স্থানের সমুদ্র অপেক্ষাকৃত শান্ত থাকে, সে সময়ে বেছে বেছে তারা শুক্তি সংগ্রহ করে আনে এবং শুক্তির মধ্যে একটি সূক্ষ্ম প্রক্রিয়ার সাহায্যে শক্ত কণা ঢুকিয়ে শুক্তিগুলিকে তাদের স্বস্থানে ছেড়ে দেয়। মুক্তা-গবেষকগণ জানেন যে, কতদিনে শুক্তির দেহের রস দিয়ে ঐ কঠিন কণিকাগুলিকে

ঘিরে প্রলেপের পর প্রলেপ জমে তৈরি হবে একটি সুগোল ও সুদৃশ্য মুক্তা। হিসাবমত নির্দিষ্ট সময় পরে শুক্তিগুলকে তুলে এনে তার ভিতর থেকে বের করে নেওয়া হয় কর্ষিত মুক্তা।

কিন্তু কর্ষিত মুক্তার চাষে বাধা অনেক। সময় সময় টাইফুন নামে যে প্রচণ্ড ঝড় ওঠে, তার প্রবল প্রকোপে সমুদ্র অশান্ত হয়ে ওঠে। অনেক সময় ঝড়ের দাপটে কর্ষণ-করা শুক্তির ঝাঁক নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কখনো কখনো মড়ক লেগে শুক্তিগুলি মরে যায়। ফলে এই সব ক্ষেত্রে মুক্তা-ব্যবসায়ীদের অনেক ক্ষতি হয়। তাছাড়া সমুদ্রে মুক্তার চাষে ডুবুরীদের প্রাণহানির সম্ভাবনাও থাকে প্রচুর।

এই সকল অসুবিধা দূরীকরণের জন্যে জাপানী মুক্তা-গবেষকগণ এক নূতন পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন। কয়েক বছর পূর্বে জাপানের কাশিকোজিমার মুক্তা-গবেষণাগারে গবেষক কুওয়াতালি ও তাঁর সহকর্মীরা আরও সহজে কর্ষিত মুক্তা সৃষ্টি করবার এক উপায় উদ্ভাবন করেছেন। তাঁরা বড় বড় কাচের চৌবাচ্চা তৈরি করে তাতে সমুদ্রের জল পূর্ণ করে প্রথমে ঐ চৌবাচ্চায় শুক্তির আহার্য এক প্রকার সামুদ্রিক উদ্ভিদ উৎপন্ন করেন। তারপর সেখানে ছেড়ে দেন এক ঝাঁক শুক্তি। প্রতিদিন চৌবাচ্চায় সমুদ্রের জল বদ্‌লে দিতে হয়। তা না হলে শুক্তিগুলি মরে যাবার সম্ভাবনা প্রচুর। ক্যালসিয়াম, অ্যামোনিয়া প্রভৃতি শুক্তির বৃদ্ধির অনুকূল রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করা হয় তাদের সুস্থ সবল ও দীর্ঘায়ু করতে। তারপর উপযুক্ত সময়ে শুক্তির দেহাবরণে অতি সূক্ষ্ম অস্ত্রোপচার করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় একটি কঠিন কণিকা। এই কণিকা তাদের দেহে সর্বদাই অস্বস্তি জাগায়। তখন তাদের দেহ থেকে প্রচুর রস নির্গত হয়ে কণিকাটিকে প্রলেপের পর প্রলেপ দিয়ে ঘিরে ফেলতে থাকে। অস্ত্রোপচারের পর শুক্তিগুলিকে আবার চৌবাচ্চার জলে ছেড়ে দেওয়া হয়। তারপর নির্দিষ্ট সময় পরে তাদের তুলে দেহের ভিতর থেকে মুক্তা সংগ্রহ করে নেওয়া হয়।

কর্ষিত মুক্তা দুষ্প্রাপ্য স্বভাবজ মুক্তার প্রায় সমকক্ষ। কিন্তু এর দাম স্বভাবজ মুক্তা অপেক্ষা অনেক কম। স্বভাবজ মুক্তার সঙ্গে কর্ষিত মুক্তার তফাৎ শুধু রঙের ঔজ্জ্বল্যে। কারণ, স্বভাবজ মুক্তার ক্ষেত্রে কণিকাটির উপর শুক্তি তার সারাজীবন ধরে রস নিঃসরণ করায় প্রলেপটি হয় অনেক পুরু। কর্ষিত মুক্তায় ঐ প্রলেপ অপেক্ষাকৃত কম পুরু হওয়ায় রঙের বাহারও হয় কম। তবুও মূল্যের দিক দিয়ে সাধারণের নাগালের মধ্যে থাকায় কর্ষিত মুক্তার চাহিদা খুব বেশী।

শ্রীশঙ্করলাল সাহা

লাক্ষার কথা

সভ্যতার বিভিন্ন পর্যায়ে লাক্ষার বিভিন্ন ব্যবহার আজও অনেকেরই অজানা। এই পদার্থটি মানুষের কাজে লেগে আসছে প্রাচীনকাল থেকেই। মহাভারতে পঞ্চ পাণ্ডবদের হত্যা করবার জন্যে দুর্যোধনের যতুগৃহে অগ্নিসংযোগের পরিকল্পনায় লাক্ষা ব্যবহারের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মোগল দরবারে আসবাবপত্রের পালিশ হিসাবে লাক্ষা ব্যবহারের কথা মোগল যুগের গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত হয়েছে। খৃঃ পূঃ 1200 শতকেও আর্যগণ কর্তৃক ভারতে লাক্ষা ব্যবহারের কথা জানা যায়। ভারতে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বকালে ইউরোপে লাক্ষার ব্যবহার প্রচলিত হয়। তখন অবশ্য আসবাবপত্রের পালিশ তৈরি করবার জন্যেই প্রধানতঃ লাক্ষা ব্যবহার করা হতো।

লাক্ষার ইতিবৃত্ত থেকে এই পদার্থটি যে কি—অনেকেরই তা জানবার কৌতুহল হওয়া স্বাভাবিক। লাক্ষা হলো একটি কীটজাত রেজিন জাতীয় পদার্থ। এক বিশেষ ধরণের কীটের শরীর থেকে নির্গত রস জমাট বেঁধে লাক্ষার সৃষ্টি হয়। এই কীট-গুলিকে বলা হয় লাক্ষাকীট। ইংরেজীতে এদের বলা হয় Laccifer lacca। এই লাক্ষাকীট পলাশ, কুল প্রভৃতি বৃক্ষের নরম শাখায় আশ্রয় গ্রহণ করে এবং এই কীট-জাত রস জমাট বেঁধে বেশ কিছুটা কঠিন লাক্ষায় পরিণত হয়। যে সব বৃক্ষে এই লাক্ষাকীট আশ্রয় গ্রহণ করে, সেই সব বৃক্ষগুলিকে বলা হয় আশ্রয়দাতা বৃক্ষ। অসংখ্য কীট এক জায়গায় একত্রে আশ্রয় নেয় বলেই ভারতীয় শব্দ 'লাখ' থেকে লাক্ষা নামের উৎপত্তি। এক পাউণ্ড লাক্ষা তৈরি করবার জন্যে প্রায় 17,000 থেকে 90,000 লাক্ষাকীটের প্রয়োজন।

পৃথিবীতে খুব অল্প কয়েকটি স্থানেই লাক্ষা উৎপন্ন হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—ভারত, থাইল্যাণ্ড ও ব্রহ্মদেশ। ভারতের মধ্যপ্রদেশ ও বিহারেই সবচেয়ে বেশী লাক্ষা উৎপন্ন হয়। ভারত হলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লাক্ষা উৎপাদন কেন্দ্র।

প্রাকৃতিক লাক্ষাকে আজকাল রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে বিশুদ্ধ পর্যায়ে আনা সম্ভব হয়েছে বলে এর প্রয়োগও হচ্ছে বিভিন্ন শিল্পে; যেমন—গ্রামোফোনের রেকর্ড তৈরির কাজ, চীনামাটির বাসনপত্র ও খেলবার তাসের মসৃণতা সম্পাদন, বিদ্যুৎ-অপরিবাহী পদার্থ নির্মাণ এবং অন্যান্য বহুবিধ কাজে লাক্ষার ব্যবহার হয়ে থাকে।

সুনীল সরকার

উত্তর (পারদর্শিতার পরীক্ষা)

1. 1 : 500
2. সাপ
3. 200
4. উটপাখী
5. নিউক্লিয়াস

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন : 1. বিভিন্ন পাখী বিভিন্ন রঙের হয়ে থাকে—এই রঙেব উৎস কি ?

চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়, কামারহাটি

প্রশ্ন : 2. জমির উর্বরতা কিসের উপর নির্ভর করে ?

সন্দীপ হাজরা ও দিলীপ বসু, গোবরডাঙ্গা

উত্তর : 1. বিভিন্ন পরিবেশে বিচিত্র রং ও আকৃতির পাখী আমাদের সকলেরই চোখে পড়ে। পাখীর গায়ের বং সাধারণতঃ তার পালকের রঙের উপরই নির্ভরশীল। পাখাদের পালকে এই রঙের উৎপত্তি নিয়ে বিজ্ঞানীরা অনেক গবেষণা করেছেন এবং অবশেষে এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন যে, এই রংগুলির পিছনে সক্রিয় রয়েছে কতকগুলি রাসায়নিক রঞ্জক দ্রব্য। এই রাসায়নিক দ্রব্যগুলির কোনটি পাখীদের দেহের অভ্যন্তরে সৃষ্ট হয়, আবার কোনটি বা পাখীর খাদ্যদ্রব্য থেকে আহৃত হয়।

সাধারণভাবে পাখীর পালকের মধ্যে যে সব রং থাকে, তাদের বলা হয় বাইক্রোম। এগুলি আবার তিন রকমের—মেলানিন, ক্যারোটিনয়েড ও পরফাইরিন। এদের এক একটির উপস্থিতিতে পাখীর পালকের রং বিশেষ বিশেষ ধরণের হয়ে থাকে। মেলানিনজাতীয় রঞ্জক দ্রব্যের উপস্থিতিতে পাখীর পালকের রং হয় সাধারণতঃ হাল্কা হলুদে থেকে বাদামী, ঘন বাদামী ও কালো। ক্যারোটিনয়েডজাতীয় রঞ্জক দ্রব্যের উপস্থিতিতে পাখীর পালকের রং হয় হলুদে, কমলা অথবা লাল। পরফাইরিনজাতীয় রঞ্জক পদার্থের উপস্থিতিতে পালকের রং সবুজ, গোলাপী অথবা উজ্জ্বল লাল রঙের হয়ে থাকে। মেলানিনজাতীয় রঞ্জক পদার্থ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী রঙের সৃষ্টি করে। অনেক সময় পাখীর পালকের রং পরিবর্তন চোখে পড়ে। এর মূলে রয়েছে রঞ্জক পদার্থসমূহের রাসায়নিক পরিবর্তন।

পাখীর পালকে রঙের উৎপত্তি নিয়ে এখনও বিশদভাবে গবেষণা চলছে। আমরা ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই এই বিষয়ে আরও অনেক কিছু জানতে পারবো।

উত্তর : 2. জমির উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষমতা প্রধানতঃ জমির উর্বরতার উপর নির্ভর করে। উর্বরতা ছাড়া জমির উৎপাদিকা শক্তি যথোচিত জলসেচন, জলবায়ু ও মাটির নীচে স্থায়ী জলস্তরের গভীরতা ইত্যাদির উপরও নির্ভরশীল।

জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্যে আমরা সাধারণতঃ সার প্রয়োগ করে থাকি। উদ্ভিদের পুষ্টির জন্যে নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরাস, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, জল ইত্যাদি অধিক মাত্রায় ও চুন, লোহা, ম্যাগনেশিয়াম, গন্ধক প্রভৃতি অল্প মাত্রায় প্রয়োজন। এই সমস্ত প্রয়োজনীয়

উপাদান উদ্ভিদকে সারের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়। বর্তমানে প্রাকৃতিক সারের সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিক সার, যথা—নাইট্রোজেন সার, ফস্‌ফরাস সার, পটাস সার ও মিশ্র সার ইত্যাদির প্রয়োগও খুব বেড়ে গেছে। প্রাকৃতিক সারের মধ্যে গোবর, পচা পাতা, ছাই ইত্যাদি অন্যতম। রাসায়নিক সারের প্রয়োগে জমির উর্বরতা আপাতঃ বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু এই সারের ক্রমাগত ব্যবহারে জমির উৎপাদিকা শক্তি কমে যায়। এই কারণে রাসায়নিক সার খুব সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত। সার প্রয়োগের ফলে শুধুমাত্র যে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায় তা নয়, এর ফলে শক্ত মাটি নরম হয় আবার বেলে মাটি দৃঢ় সংবদ্ধ হয়।

সার প্রয়োগ জমির উর্বরতা বৃদ্ধির মূল কথা হলেও আরও অনেক আনুষঙ্গিক ব্যাপারের উপর এটা নির্ভর করে। জমিতে আগাছা জন্মালে এরা জমি থেকে খাদ্য গ্রহণ করে, এর ফলে জমি অনুর্বর হয়ে পড়ে। এই কারণে জমি থেকে আগাছা তুলে ফেলা দরকার। উদ্ভিদের বীজ বপনের আগে জমি ভালভাবে কর্ষণ করলে মাটি ঝুরঝুরে হয়ে যায় এবং জল, হাওয়া ইত্যাদি প্রবেশের পথ পায়। এর ফলে শস্যের ফলনও বাড়ে। একই জমিতে পর পর একই শস্যের চাষ করলেও জমির উর্বরতা হ্রাস পায়। বিভিন্ন উদ্ভিদ ধ্বংসকারী কীট-পতঙ্গের প্রভাবে শুধুমাত্র জমির ফসলই নষ্ট হয় না, জমির উর্বরতাও কমে যায়। এই কারণে ওষুধ প্রয়োগে কীট-পতঙ্গের আক্রমণ প্রতিরোধ করা দরকার। এগুলি ছাড়াও জমিতে জল দাঁড়াবার ফলে জমির ক্ষয় হয় ও জমি অনুর্বর হয়ে পড়ে।

ধানের চাষে নাইট্রোজেন খুবই প্রয়োজনীয়। একই জমিতে বার বার ধান চাষ করলে জমিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ হ্রাস পায়। সে জন্যে ঐ জমিতে শিমজাতীয় উদ্ভিদ, যথা—ছোলা, কলাই, বরবটি ইত্যাদি চাষ করে জমিতে নাইট্রোজেনের সমতা বজায় রাখা হয়।

মাটির অম্লত্ব ও ক্ষারত্বের উপর বিভিন্ন ফসলের ফলন নির্ভর করে। যে সব জমির মাটি সামান্য পরিমাণে অম্লধর্মী, সে সব জমিতে ধান, গম, আলু ইত্যাদির ভাল ফলন হয়। আবার সামান্য ক্ষারধর্মী জমিতে টোম্যাটো, বীট ইত্যাদি ভাল জন্মায়। মাটিতে অম্ল অথবা ক্ষারের পরিমাণ বেশী হলে শস্যের ভাল ফলন হয় না। এই কারণে 2-1 বছর অন্তর অম্লাত্মক মাটিতে চুন প্রয়োগ করে ও ক্ষারাত্মক মাটিতে জলসেচ ও গন্ধক ইত্যাদির প্রয়োগের দ্বারা মোটামুটিভাবে মাটিকে নিরপেক্ষ অবস্থায় রাখতে চেষ্টা করা হয়।

শ্যামসুন্দর দে *

* ইনস্টিটিউট অব রেডিও-ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-9

বিবিধ

পৃথিবীর কক্ষপথে তিনজন সোভিয়েট মহাকাশচারী

মস্কো থেকে রয়টার ও এ. পি. কর্তৃক প্রচারিত খবরে প্রকাশ—সোভিয়েটের স্বয়ংক্রিয় মহাকাশ গবেষণাগার স্যালিউটকে গত 19ই এপ্রিল পৃথিবীর কক্ষপথে পাঠানো হয়। সেদিন থেকেই সেটি অবিরাম পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে চলছে।

6ই জুন মস্কো থেকে সোভিয়েট সংবাদ প্রতিষ্ঠান টাস জানিয়েছে, স্যালিউট-এর সঙ্গে মিলিত হবার জন্তে তিন মহাকাশচারী—কর্নেল দব্রোভলস্কি, ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার ভল্কভ এবং টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার ভিক্টর পাটাসায়েভ—সোয়ুজ-11 মহাকাশযানে চড়ে মহাকাশে পাড়ি দিয়েছেন।

এর আগে সোয়ুজ-10 গত 24শে এপ্রিল স্যালিউট-এর সঙ্গে মিলিত হয়ে যুক্তভাবে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছে।

যাত্রার পূর্ব মুহূর্তে চলতি অভিযানের অধিনায়ক দব্রোভলস্কি এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, সোয়ুজ-10-এর তুলনায় তাঁদের কাজ হবে আরও ব্যাপক ও আরও জটিল। পৃথিবীর কক্ষপথে যে যন্ত্রাগারটি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, তাঁরা সেটির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে যুক্তভাবে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যা সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবে এবং সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্য নিয়ে মহাকাশে এই সকল গবেষণা চলবে। সোয়ুজ-10 মহাকাশযান যে কাজ সুরু করেছিল, তার দ্বিতীয় পর্যায় শেষ করবার দায়িত্ব নিয়ে তাঁরা মহাকাশে যাচ্ছেন।

সোয়ুজ-10 যখন মহাকাশে পাড়ি দিয়েছিল, তখন মস্কোর প্রায় সকলেই আশা করেছিলেন, এক বা একাধিক মহাকাশচারী স্যালিউটে চড়ে বসবেন এবং সেটাই হবে সোভিয়েটের মহাকাশ-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার পরম সাফল্য। কিন্তু 48 ঘণ্টার মধ্যে সোয়ুজ-10 পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করে।

প্রত্যাবর্তনের আগে অবশ্য দুটি মহাকাশযান পরস্পরের সঙ্গে গাঁথা অবস্থায় বার কয়েক পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছিল। কিন্তু মহাকাশচারীরা স্যালিউটে চড়ে বসবার চেষ্টা করেছেন বলে শোনা যায় নি।

টাস অবশ্য এবারও বলেছে যে, সোয়ুজ-10 যে কাজ আরম্ভ করেছিল, সোয়ুজ-11 তা চালিয়ে যাবে।

আটলান্টিক মহাসাগরে মোতায়েন সোভিয়েট বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীর তিনখানা জাহাজ সোয়ুজ-11-র গতিবিধির দিকে নজর রাখছে।

পরবর্তী খবরে প্রকাশ—7ই জুন মস্কো থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে, সোয়ুজ-11-এর আরোহী তিনজন মহাকাশচারী যন্ত্রাগার স্যালিউটে চড়ে বসেছেন।

গত এপ্রিল মাস থেকে স্যালিউট টেলিস্কোপ, স্পেকট্রোস্কোপ ও অন্যান্য নানাবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নিয়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে চলছিল।

সোভিয়েট সংবাদ প্রতিষ্ঠান টাস ঘোষণা করেছে, মহাকাশে বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের নিয়ে একটি গবেষণাগার চালু হলো। মহাকাশ-যানে করে পৃথিবীর কক্ষপথে প্রদক্ষিণরত একটি গবেষণাগারে উঠে বসা এবং সেখানে বসে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবার চেষ্টা এই প্রথমবার সফল হলো।

সোয়ুজ-11-র তিনজন মহাকাশচারীর মৃত্যু

মস্কো থেকে টাস কর্তৃক প্রচারিত সংবাদে প্রকাশ যে, 30শে জুন ভোরে রুশ মহাকাশযান

সোয়ুজ-11-কে পৃথিবীতে নামিয়ে আনলে দেখা যায়—তিন জন মহাকাশচারী দব্রোভলস্কি, ভলকভ ও পাটাসায়েভ মারা গিয়েছেন। এঁদের মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে মস্কোর 2রা জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ—পৃথিবীর আবহমণ্ডলে পুনঃপ্রবেশের সময় রক্ত ডেলা বেঁধে রক্ত-চলাচলে ব্যাঘাত সৃষ্টির ফলেই মহাকাশচারীদের মৃত্যু ঘটেছে বলেই স্থানীয় কমিউনিষ্ট মহলের অনুমান।

পৃথিবীর কক্ষপথে সোভিয়েট-যান

বোচাম (পশ্চিম জার্মেনী) থেকে ইউ. পি. আই. কর্তৃক প্রচারিত সংবাদে প্রকাশ—বোচাম মানমন্দিরের কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন 22শে জুন সকালে এক মহাকাশযান কক্ষপথে উৎক্ষেপণ করেছে। সোয়ুজ মহাকাশ গবেষণা প্রকল্পের সঙ্গে এটি জড়িত। এই মহাকাশযান থেকে যে সঙ্কেত ধ্বনি ধরা পড়েছে তাতে বোঝা যায় যে, যানটি এখন কক্ষপথে পৃথিবী পরিক্রমণ করছে।

স্যালিউটের গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা

মস্কো থেকে টাস কর্তৃক প্রচারিত সংবাদে প্রকাশ—সোভিয়েট ইউনিয়নের মহাকাশ গবেষণাগার স্যালিউটের তিনজন আরোহী 22শে জুন তাঁদের গবেষণাগারটিকে জ্যোতির্বিদ্যা-সংক্রান্ত এমন সব গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার উদ্দেশে চালিয়ে নিয়ে যান, যাতে নক্ষত্র সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডার বৃদ্ধি পাবে।

সোয়ুজ-11-এর আরোহী তিনজন—জর্জি দব্রোভলস্কি, ভ্লাদিস্লাভ ভল্‌কভ ও ভিক্টর পাটাসায়েভ—তাঁদের যন্ত্রগুলিকে দুটি নক্ষত্রের দিকে ঘুরিয়ে নক্ষত্র দুটি যে ধরণের আলো সৃষ্টি করে, তার সুন্দর ছবি তোলেন।

একটি নক্ষত্র হচ্ছে আলফা-লিরে—আকাশের দ্বিতীয় উজ্জ্বলতম নক্ষত্র, আর একটি অপেক্ষাকৃত স্বল্পালোক নক্ষত্র—জিটা-উর্সা মেজর নক্ষত্র-পুঞ্জের একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্র।

মহাকাশে চারাগাছ

মস্কো থেকে সোভিয়েট সংবাদ সংস্থা টাস জানিয়েছে যে, সোভিয়েট টেলিভিশন দর্শকেরা প্রদক্ষিণরত মহাকাশ স্টেশন স্যালিউটে দুটি চারাগাছ দেখেছেন। চারাগাছ দুটি মহাকাশে ভারশূন্য অবস্থায় গজিয়েছে এবং পাতা ধরেছে।

স্যালিউটের একটি কক্ষে গ্রীনহাউসটি অবস্থিত। একটি পাত্রে থলের করে বিভিন্ন গাছের বীজ মহাকাশে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

চাঁদের বয়স

বোম্বাই থেকে ইউ. এন. আই. কর্তৃক প্রচারিত খবরে প্রকাশ—গবেষণায় জানা গেছে যে, চাঁদের বয়স 450 কোটি বছরের কাছাকাছি—প্রায় পৃথিবীর বয়সের সমান। বোম্বাই শহরের একজন বিজ্ঞানী ডক্টর দিনকর পি. খারকার একথা বলেছেন।

ডক্টর খারকার মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে চাঁদ সম্পর্কে গবেষণা করছেন।

প্রধান সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী



বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের ত্রয়োবিংশ প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু (বাম দিক হইতে), অনুষ্ঠানের সভাপতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ সেন, প্রধান অতিথি বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পর্ষদের প্রধান অধিকর্তা ডক্টর আত্মা রাম এবং বিশিষ্ট অতিথি কলিকাতাস্থিত বাংলাদেশ কূটনৈতিক মিশনের প্রধান জনাব এম. হোসেন আলি।

প্রতিষ্ঠা-দিবস সংখ্যা

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

চতুর্বিংশ বর্ষ | অগাষ্ট, 1971 | অষ্টম সংখ্যা

নিবেদন

গত 28 জুলাই, 1971 পরিষদের নিজস্ব ভবনের বক্তৃতা-কক্ষে এক মনোরম পরিবেশে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের ত্রয়োবিংশতিতম প্রতিষ্ঠা-দিবসের অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানের বিশদ বিবরণাদি পত্রিকার বর্তমান সংখ্যার অন্যত্র প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ্‌ ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিগণের উপস্থিতি আমাদিগকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। এই উপলক্ষে তাঁহাদের প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

বর্তমানে বিজ্ঞান-শিক্ষার সর্বস্তরে মাতৃভাষাকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করিবার চেষ্টা দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতেছে। ইহাতে বিজ্ঞান পরিষদের মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষাদানের বহুল প্রচারিত নীতিরই যৌক্তিকতা প্রমাণিত হইয়াছে এবং নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, ইহা পরিষদের পরিকল্পনাসমূহের সার্থক রূপায়ণে অবিচল নিষ্ঠা ও দৃঢ় প্রতীতীর সহিত অগ্রসর হইবার প্রেরণা যোগাইবে।

পরিষদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য এবং গত বৎসরের কার্যবিবরণী বর্তমান সংখ্যায় 'কর্মসচিবের নিবেদনে' বিবৃত হইয়াছে।

মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানবিষয়ক তথ্যাদি পরিবেশনে বিজ্ঞান পরিষদ যে ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত যথাসাধ্য কাজ করিয়া যাইতেছে—এই কথা সকলেই অবগত আছেন, তথাপি প্রতি বৎসরই পরিষদের উদ্দেশ্য এবং কর্মপদ্ধতির বিষয় জনসাধারণকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া কর্তব্য বলিয়া মনে করি।

এই উপলক্ষে পরিষদের উদ্দেশ্য সর্বপ্রকারে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিবার জন্য আমরা ইহার ভবিষ্যৎ কর্মসূচীতে সর্বস্তরের জনগণের সহযোগিতা ও আনুকূল্য কামনা করিতেছি।

আর্যভট, কোপার্নিকাস ও গ্যালিলিও

প্রিয়দারঞ্জন রায়

জ্যোতির্বিজ্ঞানের তিনজন অগ্রণী মহারথীর অবদানের বর্ণনা বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্ আর্যভট হলেন এঁদের মধ্যে পূর্ববর্তী। পোলাণ্ডদেশীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী কোপার্নিকাস এবং বিশ্ববিখ্যাত ইটালিয়ান জ্যোতির্বিজ্ঞানী গ্যালিলিও যথাক্রমে তাঁর হাজার ও বার-শ' বছরের পরবর্তী। অথচ এই তিনজনকেই জ্যোতির্বিজ্ঞানের পুরোধা ও প্রতিষ্ঠাতা বললে বিশেষ অত্যুক্তি হয় না। এই প্রসঙ্গে গ্রীক জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিপার্কাস (খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী) এবং টলেমীর (খৃষ্টির দ্বিতীয় শতাব্দী) অবদানও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পাটলিপুত্র নগরের নিকটস্থ কুসুমপুরে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে আর্যভটের জন্ম ও কার্যকাল নির্ধারিত। মাত্র 23 বছর বয়সে (499 খৃষ্টাব্দে) তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আর্যভটীয়' রচনা করেন। তাঁরই অনুপ্রেরণায় ও পরিচালনায় পাটলিপুত্র নগরে ঐ সময়ে জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং গণিতশাস্ত্রের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর বিশিষ্ট অবদানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

1. সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর আবর্তনের ধারণা

আর্যভটীয় গ্রন্থে গতিশীল বস্তুমাত্রেরই আপেক্ষিক গতির ধারণা দেখতে পাই।

অনুলোমগতির্নৌস্থঃ পশ্যত্যচলং বিলোমগং যদ্বৎ।
অচলানি ভানি তদ্বৎ সমপশ্চিমগানি লঙ্কায়াম্॥

অর্থাৎ, পূর্বদিকে গতিযুক্ত নৌকায় আসীন ব্যক্তি নদীর উভয় পার্শ্বস্থ তটবর্তী অচল বৃক্ষাদি যেমন পশ্চিমগামী দেখেন, তেমনই লঙ্কাতে অচল নক্ষত্রসমূহকে সমবেগে পশ্চিম দিকে ধাবমান দেখা যায়।

এই বৈজ্ঞানিক তথ্যকে ভিত্তি করেই তিনি সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর আবর্তনের গতি সিদ্ধান্ত করেন। তথাপি তিনি তাঁর আর্যভটীয় গ্রন্থের যাবতীয় গণনায় পৃথিবীকেন্দ্রিক সূর্যের গতির ধারণা অব্যাহত রেখেছেন। এথেকে মনে হয় যে, উভয় ক্ষেত্রেই গতির আপেক্ষিকতা-হেতু গণনার কোন ব্যতিক্রম ঘটে না—সম্ভবতঃ এই তাঁর ধারণা ছিল। দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য এই কথাটি তাঁর 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি' গ্রন্থে পরিস্ফুট-ভাবে প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, আইনস্টাইন প্রবর্তিত বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের (Special relativity theory) অঙ্কুর আর্যভট ও ভাস্করাচার্যের ধারণার মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে। গ্রীক দার্শনিক হীরাক্লিদিজ খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে পৃথিবীর অক্ষের উপরে তার দৈনিক আবর্তনের কথা লিখে গেছেন এক প্রকার কল্পনা থেকে। হীরাক্লিদিজের কিছু পরে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে অ্যারিস্টার্কাস অব সামোস সর্বপ্রথম সূর্যকেন্দ্রিক পৃথিবীর আবর্তনের কথা ঘোষণা করেন। পৃথিবীর অক্ষের উপরে দৈনিক আবর্তন—তাঁর এই পরিকল্পনার বিশেষত্ব ছিল। এসব মতামত বেশীর ভাগই কাল্পনিক, সুতরাং এদের সঠিক মূল্যায়ন করা যায় না। আর্যভটের বহু শতাব্দী পরে জ্যোতির্বিজ্ঞানী কোপার্নিকাস (1473-1543) সূর্যকেন্দ্রিক পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহের আবর্তনের সিদ্ধান্ত প্রচার করেছেন বিশিষ্ট তথ্যের উপরে নির্ভর করে এবং আপেক্ষিক

গতির ধারণা থেকে। কিন্তু তাঁর গ্রন্থের মুখবন্ধে লিখেছেন, কোন নিগূঢ় কারণে (সম্ভবতঃ তৎকালীন ধর্মযাজকদের অসন্তোষের আশঙ্কায়) ধারণাটিকে বাস্তব সত্য বলে বিশ্বাস করতে পারেন নি।

2. পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি

ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্‌গণের মধ্যে আর্যভট, ব্রহ্মগুপ্ত এবং ভাস্করাচার্য বিভিন্ন প্রকারের গতির বর্ণনা ও তাদের কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে পতনশীল বস্তুর গতি পৃথিবীর আকর্ষণজনিত এবং সেই গতি ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে প্রতিরোধ করা সম্ভব বলে উল্লেখ করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হয়েছে যে, পতনশীল বস্তুকে হাত দিয়ে ধরে রাখা যায়, কিম্বা কোন আশ্রয় বা অবলম্বনের সাহায্যে তার পতন নিবারণ করা চলে। গ্রীক জ্যোতির্বিদ্‌ টলেমী বহু পূর্বে মাধ্যাকর্ষণ ও মহাকর্ষণ শক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে আভাস দিয়ে গেছেন। গ্রহগণের যুগ্মবৃত্তাকারে (Epicycle) আবর্তনের কল্পনায় বোঝা যায় যে, আর্যভট মহাকর্ষণ শক্তি সম্বন্ধেও অবহিত ছিলেন।

আর্যভটকে ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের পথিকৃৎ ও প্রতিষ্ঠাতা বললে অত্যুক্তি হয় না। তাঁর গ্রন্থে পূর্ববর্তী বা ভিন্ন দেশীয় কোন জ্যোতির্বিদের সিদ্ধান্তের ঋণের লক্ষণ আমরা দেখতে পাই না। ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানে আর্যভটের স্থান গ্রীক জ্যোতির্বিজ্ঞানে টলেমীর স্থানের সঙ্গে তুলনা করা চলে। পরবর্তী কালের ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা শুধু আর্যভটের সিদ্ধান্তসমূহকেই সংশোধিত করেছেন বলা চলে। এঁদের রচনার মধ্যে বিশেষ কোন মৌলিক চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায় না। গণিতশাস্ত্রেও আর্যভটের অবদান অতুলনীয় বলা চলে। এক্ষেত্রেও তাঁকে পথিকৃৎ হিসেবে গণ্য করা যায়।

কোপার্নিকাস (1473-1543)

মিকোলা কোপার্নিগ, ল্যাটিন নিকোলাস, কোপার্নিকাস পোলাণ্ডের পোমেরানিয়া প্রদেশের অন্তর্গত ভিশ্চুলার তীরবর্তী থর্ন নামক স্থানে 1473 খৃষ্টাব্দের 19শে ফেব্রুয়ারী এক সম্ভ্রান্ত ধনীবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই তাঁর জ্যোতিষ ও



কোপার্নিকাস

গণিতে গভীর অনুরাগ ছিল। তিনি ইটালিতে বিদ্যাশিক্ষা করেন। তাঁর মতবাদের একটি সংক্ষিপ্ত সার 'Commentariolus' প্রথম প্রকাশিত হয় 1529 খৃষ্টাব্দে এবং মূল ও সম্পূর্ণ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে 1543 খৃষ্টাব্দে।

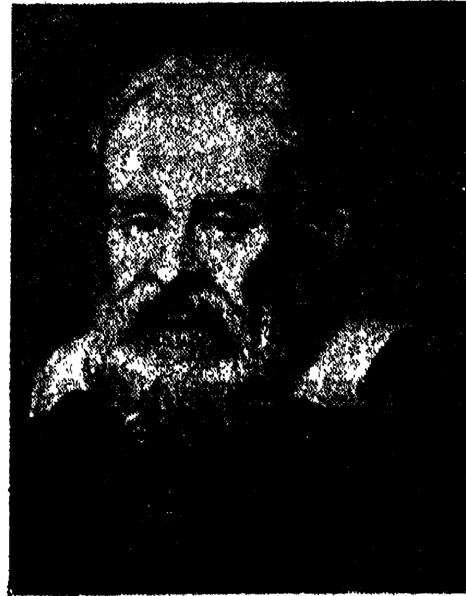
সম্প্রতি পোলাণ্ড দেশীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী কোপার্নিকাসের পঞ্চম জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসবের আয়োজন চলেছে। তিনি প্রথমে সূর্যকেন্দ্রিক পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহের আবর্তনের ধারণাকে ভিত্তি করে জ্যোতির্বিজ্ঞানের যাবতীয় গণনা করে গেছেন। এর ফলে গ্রহগণের অতিকেন্দ্রিক বিষম গতির এক সন্তোষজনক সমাধান পাওয়া যায়।

পরবর্তীকালে কেপ্‌লারের গ্রহগণের উপবৃত্তাকার পথে আবর্তনের সিদ্ধান্তের সাহায্যে এই গণনা আরও সূক্ষ্মভাবে নির্ধারিত হয়। কোপার্নিকাস আর্যভটের মত গতিশক্তির আপেক্ষিকতা তথ্যের উপর ভিত্তি করেই জ্যোতিষ্কগণের সূর্যকেন্দ্রিক আবর্তনের ধারণা করেন। আর্যভট তাঁর গণনায় পৃথিবীকেন্দ্রিক ধারণাই বলবৎ রেখেছিলেন। কিন্তু কোপার্নিকাস সূর্যকেন্দ্রিক সিদ্ধান্তকে অবলম্বন করেই তাঁর যাবতীয় গণনা করায় অধিকতর নির্ভরযোগ্য ও সন্তোষজনক ফলাফল লাভ করেছিলেন। এখানে কোপার্নিকাসের অবদান অধিকতর মূল্যবান বলে স্বীকার করতে হয়। এই কারণেই তাঁকে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের জন্মদাতা বললে অত্যুক্তি হয় না। সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর আবর্তনের ধারণার ফলে কোপার্নিকাস অয়নচলনের প্রকৃত কারণ নির্দেশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি বিভিন্ন গ্রহ, উপগ্রহ ও চন্দ্রের সম্বন্ধে সূর্যকেন্দ্রিক ধারণার ভিত্তিতে অনেক আলোচনা করেন। পূর্ববর্তী জ্যোতির্বিদ্‌দের সিদ্ধান্ত থেকে তাঁর সিদ্ধান্তের অনেক উৎকর্ষের প্রমাণ পাওয়া যায়। কোপার্নিকাসের মতবাদে পৃথিবী নিজের অক্ষের উপরে ঘূর্ণায়মান এবং একদিনে একটি আবর্তন সম্পূর্ণ করে ও পৃথিবীর চারদিকে চন্দ্র বৃত্তাকার পথে আবর্তনরত। চন্দ্রসমেত নিজের অক্ষের উপরে আবর্তনশীল পৃথিবী যে সূর্যের চারদিকে আবর্তনরত—কোপার্নিকাসের এই মতবাদের সত্যতা পরবর্তী কালে গ্যালিলিও দুরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করেন। পর্যবেক্ষণের ফলে মহাকাশে শুক্রগ্রহে চন্দ্রের মত কলার অস্তিত্ব আবিষ্কার করেই তিনি এই সত্যতা সমর্থন করেছিলেন। পৃথিবীকেন্দ্রিক সূর্য ও গ্রহগণের আবর্তনের মতবাদে শুক্রগ্রহের এরূপ পরিপূর্ণ কলার অস্তিত্ব সম্ভব হয় না।

তা সত্ত্বেও কোপার্নিকাসের মতবাদের সঙ্গে অনেক নতুন আবিষ্কৃত তথ্যের অমিল দেখা যায়। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, কেপ্‌লার কর্তৃক মহাকাশে গ্রহগণের গতি নির্ধারণ। কোপার্নিকাসের গ্রহগণের বৃত্তাকার বা যুগ্মবৃত্তাকার আবর্তনের পরিবর্তে তাদের উপবৃত্তাকার পথে আবর্তনের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করে কেপ্‌লারএর সংশোধন করেন এবং নিউটন দেখালেন যে, গ্রহগণের উপবৃত্তাকার পথে আবর্তনের কারণ, গ্রহদের পারস্পরিক আকর্ষণ (মহাকর্ষণ) শক্তি।

গ্যালিলিও (1564-1642)

1564 খৃষ্টাব্দের 15ই ফেব্রুয়ারী পিসায় গ্যালিলিও গ্যালিলি এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গণিতশাস্ত্র এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। মাত্র 25 বছর বয়সেই তিনি পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন।



গ্যালিলিও

তিনি কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক গ্রহগণের আবর্তনের পরিকল্পনাকে দুরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে মহাকাশ পর্যবেক্ষণ করে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন।

উন্নত ধরণের দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণ ও মহাকাশ পর্যবেক্ষণে তার প্রয়োগ জ্যোতির্বিজ্ঞানে গ্যালিলিওর একটি অক্ষয় অবদান। পদার্থবিদ্যায় তাঁর বহু উচ্চাঙ্গের আবিষ্কার বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে অপূর্ব সম্পদ হিসাবে চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকবে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর অন্যবিধ বিশেষ অবদান হচ্ছে, বৃহস্পতির চারটি উপগ্রহের আবিষ্কার, কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে 36টি নক্ষত্রের পর্যবেক্ষণ, ছায়াপথে অসংখ্য নক্ষত্রের অস্তিত্বের প্রমাণ, যুগ্ম নক্ষত্রের আবিষ্কার, চন্দ্রের কলঙ্কের কারণ আবিষ্কার, সূর্যপৃষ্ঠে সৌরকলঙ্কের অবস্থিতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ ইত্যাদি।

কোপার্নিকাসের প্রবর্তিত সূর্যকেন্দ্রিক গ্রহগণের আবর্তনের মতবাদ সমর্থনের জন্যে 1633 খৃষ্টাব্দে ধর্মযাজকদের বিচারালয়ে তাঁকে অভিযুক্ত করা হয় এবং তিনি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। স্বাধীনভাবে জ্ঞান সাধনার জন্যে গ্যালিলিওর আত্মদান বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা।

জরা

শ্রীদেবব্রত নাগ*

'জন্মিলে মরিতে হইবে'—একথা স্বতঃস্বীকার্য। জন্ম থেকে ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধি এবং পরিণামে মৃত্যু—এই ঘটনাকে একটি একমুখী প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া বলা যায়। কিন্তু আজকাল মানুষ এই একমুখী প্রক্রিয়ার গতিরোধ করে চির-যৌবন লাভের কামনা পোষণ করে আসছে এবং হাজার হাজার বছর ধরে এই রহস্যের অনুসন্ধান মানুষকে অনেক নতুন তথ্য যুগিয়েছে সন্দেহ নেই। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায়, যেমন—আণবিক জীববিদ্যা, প্রাণ-রসায়নবিদ্যা এবং শারীরবিদ্যায় যে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে, তা চিরযৌবন লাভের রহস্য সন্ধানে অনেক নতুন পথের নিশানা দেবে।

জরা ও দেহভিত্তিক পরিবর্তন

জন্মগ্রহণ করবার পর প্রাণীরা বৃদ্ধি এবং ক্ষয়—এই দুটি বিপরীত প্রণালীর মধ্য দিয়ে চলতে থাকে। মানুষের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ 25 বছর বয়স পর্যন্ত বিভিন্ন দেহগ্রন্থি ক্রমশঃ পরিণতি লাভ করতে থাকে। সে সময় কর্মক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। তারপর 35 বছর বয়সে বৃদ্ধি এবং কর্মক্ষমতা উভয়ই স্থিতিশীল হয়ে যায়। এরপর বিভিন্ন দেহগ্রন্থির প্রাণশক্তি এবং কর্মক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে। ইদানীং আরও কিছু নতুন তথ্য পাওয়া গেছে। কোন কোন বৈজ্ঞানিকের ধারণা, 28 বছর বয়সে বৃদ্ধি এবং কর্মক্ষমতা উভয়ই স্থিতিশীল হয়ে যায় এবং তারপরই ক্ষয় সুরু হতে থাকে। বয়সের সীমারেখা যাই হোক না কেন, এটা জানা গেছে যে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের রক্ত-সঞ্চালন ক্ষমতা, মূত্রাশয়ের পরিস্রাবণ ক্ষমতা, বিভিন্ন পেশীর কর্মক্ষমতা এবং দেহের আরও অন্যান্য সাম্যবস্থায় ক্রমশঃ ব্যাঘাত ঘটতে থাকে। দেহের বিভিন্ন গ্রন্থির বৃদ্ধি এবং কার্যক্ষমতাও বিভিন্ন সময়ে কমে যেতে সুরু করে। কেবল তাই নয়, দেহের জীবাণু প্রতিরোধ এবং ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থা থেকে আরোগ্য লাভ করবার ক্ষমতাও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে কমে যেতে থাকে। দেহের

* চারুচন্দ্র কলেজ, কলিকাতা

সমস্ত ক্ষমতা লোপ পেলে মৃত্যু অবধারিত; অর্থাৎ যে কোন দেহরোগের আরোগ্যলাভ অসম্ভব হলে তবেই মৃত্যু হয়। অপঘাত মৃত্যু বাদ দিলে সমস্ত প্রাণীর জন্ম থেকে মৃত্যুর বিভিন্ন ধাপগুলি প্রায় একই ধারায় অতিক্রান্ত হয়। জরার দেহভিত্তিক নানা রকম ব্যাখ্যা হয়েছে। সাধারণভাবে জরা (Aging) হলো এমন একটি জৈবিক প্রণালী, যা প্রাণীদের রোগাক্রান্ত হবার প্রবণতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করে।

জরাসংক্রান্ত গবেষণা

জরা সংক্রান্ত গবেষণাকে মূলতঃ তিনটি ভাগে আলোচনা করা চলে।

1. জৈবিক অর্থাৎ জরার আণবিক, প্রাণ-রাসায়নিক এবং দেহভিত্তিক পরিচয়গুলি সঠিক-ভাবে অনুসন্ধান করা এবং যে যে প্রণালীর সাহায্যে জরা প্রতিরোধ করা যায়, তা ভাল ভাবে জানা।

2. রোগ সম্পর্কিত অর্থাৎ বৃদ্ধকালে রোগাক্রমণের কারণ এবং আরোগ্য লাভের উপায় সম্পর্কে অনুসন্ধান করা।

3. সমাজ এবং মনস্তত্ত্ব সম্পর্কিত অর্থাৎ অবসরপ্রাপ্ত এবং বৃদ্ধ লোকেদের নানান সমস্যা জানা এবং কিভাবে তাদের সমাজের কাজে লাগানো যায়, তা পরীক্ষা করে দেখা।

জরা রোধের যে কোন প্রচেষ্টার সুরুতেই কয়েকটি প্রশ্নের আলোচনা করা প্রয়োজন বলে মনে হয়। প্রথমটি হলো, কোন বিশেষ কারণে বা কিসের প্রভাবে জরার সূত্রপাত? দ্বিতীয়টি হলো প্রাণীর জীবনকাল কি কি বিশেষ কারণের উপর নির্ভরশীল? তৃতীয়টি হলো, একই এবং বিভিন্ন প্রাণীর জীবনকালে তারতম্য হবার মূল-গত কারণ কি?

প্রাণ-রাসায়নিক পর্যবেক্ষণ

জরাসংক্রান্ত বহুমুখী গবেষণা সত্ত্বেও এর সর্বজনগ্রাহ্য কোন কারণ খুঁজে পাওয়া এখনও সম্ভব হয় নি। দেখা গেছে—হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক এবং করোটি যে সকল কোষ দিয়ে গঠিত, তাদের বিভাজন একটি নির্দিষ্ট বয়ঃসীমা পর্যন্ত ঘটে এবং তারপর বন্ধ হয়ে যায়। তাই Szilarard-এর (1959) মতে, জরা হলো Post-mitotic কোষের ক্রোমোজোমস্থ জিনের (Gene) পরিবর্তন।

এরপর জৈবরসায়নবিদ্ Curtis (1961) পরীক্ষাগারে ইঁদুরের উপর রঞ্জেনরশ্মি ফেলে দেখতে পেলেন, ইঁদুরের সাধারণ আয়ু রঞ্জেনরশ্মির প্রভাবে কমে যায়, এমন কি—মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি গ্রন্থিগুলির কোষের ক্রোমোজোমের নানা রকম পরিবর্তন ঘটে। রঞ্জেনরশ্মির পরিমাণ আরও বাড়ালে ইঁদুরের আয়ু আরও কমতে দেখা গেছে। যদিও বিভিন্ন রাসায়নিক পরিবর্তক (Chemical mutagens), যা ক্রোমোজোমকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে, তা ব্যবহার করে পরি-বর্তকের পরিমাণের অনুপাতে আয়ু কমতে দেখা যায় নি। এর সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয় নি।

Hyflick (1961) দেখতে পান যে, মানুষের Diploid embryonic কোষগুলি পরীক্ষা-নলে উপযুক্ত পরিবেশে জন্মাবার (Culture) ব্যবস্থা করলে 50 ± 10 Generation পর্যন্ত বিভাজন হবার পর সেগুলি ধ্বংস হয়ে যায়। সুতরাং কোষের একটি নির্দিষ্ট আয়ুকাল আছে। এর কারণ মনে হয়, ক্রমাগত পরিব্যক্তি (Mutation) ঘটবার ফলে ক্রোমজোমের বিভাজন ক্ষমতা লোপ পায়।

জিনের পরিব্যক্তি সম্পর্কিত বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে এখনও জানা যায় নি—কিসের প্রভাবে এই পরি-ব্যক্তি ঘটে এবং কিভাবে প্রত্যেকটি প্রাণীর জীবনকাল স্থিরীকৃত হয়। Orgel-এর (1963) মতে, প্রোটিনকে

দু-ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি হলো, যে সব প্রোটিন কোষ গঠনে (যেমন—কোলাজেন, কেরোটিন ইত্যাদি) এবং পাচন-প্রক্রিয়ায় (যেমন—জৈব অনুঘটক) অংশ গ্রহণ করে। আর দ্বিতীয়টি হলো, যে সব প্রোটিন অন্য প্রোটিন সংশ্লেষণে অংশ গ্রহণ করে; যেমন—RNA-পলিমারেজ, অ্যামিনো অ্যামাইল পরিবাহক RNA-সিন্থেটেজ ইত্যাদি। যদি প্রথম প্রকৃতির প্রোটিনে কোন রকম ত্রুটি দেখা দেয়, যেমন—কোন একটি জৈব অনুঘটকের একটি অ্যামিনো অ্যাসিড বদলে গেলে জৈব অনুঘটকটির সক্রিয়তা আংশিক বা পুরাটাই নষ্ট হয়ে যায়। যদিও এই ত্রুটি কখনও কখনও সংশোধন করে দেওয়া যায়। সামান্য ত্রুটিযুক্ত প্রোটিন বা ভ্রমাত্মক প্রোটিনের পরিমাণ খুব সামান্য থাকায় ঐ প্রোটিনের ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়াগুলি খুব সামান্যই হবার কথা। যদিও দ্বিতীয় প্রকৃতির প্রোটিন যেমন একটি ভ্রমাত্মক RNA-পলিমারেজ কোষে দেখা দিলে সেটি বহু সংখ্যক ভ্রমাত্মক পরিবাহক-RNA এবং ভ্রমাত্মক Ribosomal-RNA তৈরি করবে। আবার ঐ ভ্রমাত্মক RNA-গুলি প্রোটিন সংশ্লেষণে অংশ গ্রহণ করে বহু সংখ্যক ভ্রমাত্মক প্রোটিন এবং ভ্রমাত্মক জৈব অনুঘটক তৈরি করবে; অর্থাৎ ত্রুটির পরিমাণ কোষের বিভিন্ন খাতে বেড়েই যাবে, যতক্ষণ না কোষের সমস্ত ত্রুটিমুক্ত পদার্থগুলি থেকে ভ্রমাত্মক পদার্থগুলি বেশী হয়। এর ফলে কোষের জীবনকাল এবং সক্রিয়তা ক্রমশঃ লোপ পেয়ে কোন এক সময় পুরাপুরি শেষ হয়ে যায়।

Holliday (1968) উপরিউক্ত অনুমানের উপযুক্ত তথ্য দিতে সক্ষম হলেন। সাধারণ অ্যামিনো অ্যাসিড ব্যবহার না করে কয়েকটি সমজাতীয় অ্যামিনো অ্যাসিডের উপস্থিতিতে Podospora নামক উদ্ভিদটিকে বাড়তে দিলেন। দেখা গেল ঐ অবস্থায় Podospora-র জীবনকাল সাধারণ অবস্থা থেকে অনেক কমে গেছে। এমন কি, পুরনো Podospora আক্রান্ত Podospora-র সঙ্গে জন্মাতে দিলে সাধারণ অবস্থা থেকে আরও দ্রুত প্রথমটির মৃত্যু ঘটে। এই ধরণের পরীক্ষা অ্যামিবার ক্ষেত্রেও করে দেখা গেছে। এই পরীক্ষা থেকে মনে হয় আক্রান্ত কোষের সাইটোপ্লাজমে হয়তো এমন কোন ভ্রমাত্মক প্রোটিন আছে, যা সাধারণ উদ্ভিদকে ধ্বংস করে দিতে পারে।

সুইস বিজ্ঞানী Verzar কোলাজেন নামক অধিক আণবিক ওজনসম্পন্ন প্রোটিনের উপর কাজ করে দেখালেন যে, কোলাজেন প্রোটিন অণুগুলির মধ্যে সংযোগ বন্ধনী বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে। বিভিন্ন কোষের মধ্যেকার ফাঁকা স্থানে ঐ প্রোটিনগুলি জমতে থাকে। ফলে কোষের প্রয়োজনীয় আহার কোষাভ্যন্তরে সহজে সরবরাহ হতে পারে না। ঐ কারণে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কোষের পুষ্টির অভাব দেখা দেয়। Verzar-এর মতে, কোষের মৃত্যু ঘটে অনাহারে।

এছাড়াও Harman, Burnet প্রমুখ বিজ্ঞানীরা আরও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে জরার কারণ বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করেছেন। ইদানীং যদিও জরার কারণ হিসাবে প্রজনন-সঙ্কেত জিনের উপরই বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

জরা এবং প্রজনন-সঙ্কেত জিনের সম্পর্ক

ভারতীয় বিজ্ঞানী M. S. Kanungo-এর (1969) মতে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে জিনের পরিবর্তন হয়ে থাকে। জিনে ত্রুটি বা পরিবর্তন দেখা দিলে নতুন প্রোটিন বা ভ্রমাত্মক প্রোটিনের সৃষ্টি হতে পারে। তিনি দেখিয়েছেন, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ইঁদুরের বিভিন্ন গ্রন্থির কোষে অবস্থিত কিছু কিছু জৈব অনুঘটকের সক্রিয়তা বিভিন্ন হারে বাড়ে বা কমে।

পরীক্ষার উপাদান হিসাবে ল্যাক্‌টিক ডিহাইড্রোজিনেজ বা সংক্ষেপে LDH নামক জৈব অনুঘটকটিকে তিনি বেছে নিয়েছেন। এর কারণ হলো—

1. LDH-এর আণবিক গঠন-প্রকৃতি এবং এর সংশ্লেষণে অংশ গ্রহণকারী প্রজনন-সঙ্কেত মোটামুটি জানা গেছে।

2. শর্করাজাতীয় পদার্থ থেকে পেশী সঞ্চালনের প্রয়োজনীয় শক্তির মূলে LDH অনেকটা দায়ী। শর্করাজাতীয় পদার্থ প্রথমে অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে এবং পরে অক্সিজেনের উপস্থিতিতে ভেঙে কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং জলে পরিণত হয়। অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে শর্করাজাতীয় পদার্থ ধাপে ধাপে বিভিন্ন জৈব অনুঘটকের সাহায্যে বিক্রিয়ার প্রায় শেষ সীমায় পাইরুভিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। অক্সিজেনের উপস্থিতিতে পাইরুভিক অ্যাসিড কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং জলে পরিণত হয়। কিন্তু অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে LDH পাইরুভিক অ্যাসিডকে ল্যাক্‌টিক অ্যাসিডে পরিণত করে। এই বিক্রিয়া থেকে যে শক্তি নির্গত হয়, তা পেশী-সঞ্চালনে ব্যবহৃত হয়।

3. LDH আসলে পাঁচ রকমের। এগুলিকে বলা হয় সম-জৈবঅনুঘটক (Isozyme)। প্রত্যেকটিই পাইরুভিক অ্যাসিডকে ল্যাক্‌টিক অ্যাসিডে পরিণত করে, যদিও ওগুলির মধ্যে সক্রিয়তার তারতম্য যথেষ্ট লক্ষণীয়।

প্রতিটি LDH অণু চারটি প্রোটিন শৃঙ্খলের সমন্বয়ে গঠিত। দু-রকমের প্রোটিন শৃঙ্খল পাওয়া গেছে—H এবং M। H এবং M এককগুলির মধ্যে সমন্বয়ের ফলে H_4, H_3M_1, H_2M_2, H_1M_3 এবং M_4—এই পাঁচটি LDH জৈব অনুঘটক পাওয়া যায়। বিভিন্ন গ্রন্থির কোষে পাঁচটি LDH-এর পরিমাণগত পার্থক্যও দেখা গেছে। H_4-LDH অনুঘটকটি প্রধানতঃ যে সব কোষে অক্সিজেনের চাহিদা বেশী, যেমন—হৃৎপিণ্ড এবং মস্তিষ্কোষে বেশী থাকে। M_4-LDH কিন্তু যে সব কোষে অক্সিজেনের চাহিদা কম অর্থাৎ Skeletal muscle-এ বেশী থাকে। হৃৎপিণ্ডে যেটি বেশী থাকে, তাকে সংক্ষেপে H একক এবং যেটি পেশীতে বেশী থাকে, তাকে M একক দিয়ে সংক্ষেপে প্রকাশ করা হয়। জানা গেছে H এককটির সংশ্লেষণের মূলে যে জিনটি আছে, তা M এককটির জিন থেকে ভিন্ন। কেবল তাই নয়, অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে পাইরুভিক অ্যাসিডকে ল্যাক্‌টিক অ্যাসিডে পরিণত করতে M_4-LDH, H_4-LDH অপেক্ষা অনেক বেশী সক্রিয়। বিভিন্ন বয়সের ইঁদুরের হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক এবং পেশীকোষের সংখ্যা গুণে দেখা গেছে যে, জন্মের 10 সপ্তাহ পরে ঐ গ্রন্থিগুলির কোষ-বিভাজন বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং কোষ-বিভাজন বন্ধ হয়ে গেলে মৃত্যু পর্যন্ত ঐ গ্রন্থিগুলির কোষ-সংখ্যা প্রায় একই থেকে যায়—লিভারে যদিও কিছু শতাংশ কোষের ভাঙা-গড়া সব সময়ই চলতে থাকে। সুতরাং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, Skeletal muscle-এ যদিও আর নতুন কোষ জন্মলাভ করে না, কিন্তু লিভারে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে কিছু সংখ্যক নতুন কোষ জন্মলাভ করায় সেখানে পুরনো এবং নতুন—দু-রকমের কোষই পাওয়া যায়। উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ হলো—বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে M_4-LDH প্রায় সমস্ত কোষেই H_4-LDH-এর তুলনায় কমতে থাকে। হয়তো শর্করাজাতীয় পদার্থ থেকে যে শক্তি পেশী-সঞ্চালনে প্রয়োজন, তা M_4-LHD-এর অভাবহেতু লোপ পেতে থাকে। বৃদ্ধ বয়সে পেশী-সঞ্চালন ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার এটাই হয়তো মূল কারণ। মস্তিষ্ক এবং হৃৎপিণ্ডে অক্সিজেনের চাহিদা বেশী, তা আগেই বলা হয়েছে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে এই সব গ্রন্থিতে M_4-LDH-এর পরিমাণ সবচেয়ে বেশী কমে যায়। সুতরাং বৃদ্ধকালে অক্সিজেনের অভাবে ঐ গ্রন্থিগুলি বেশী

ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হয়তো Heart এবং Brain failure-এর মূলে উপরিউক্ত কারণটি অন্যতম।

এখন জানা গেছে, যে জিনটি M_4-LDH সংশ্লেষণে অংশ গ্রহণ করে, তা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে অধিক পরিমাণে দমিত থাকে; অর্থাৎ যে জিনগুলি পাঁচটি বিভিন্ন LDH সম-অনুঘটক সংশ্লেষণে অংশগ্রহণ করে, সেই জিনগুলি বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে কতটা প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত থাকে, তার উপর নির্ভর করবে বিভিন্ন কোষে অবস্থিত বিভিন্ন LDH-এর পরিমাণ এবং সক্রিয়তা।

LDH ছাড়া আরও কয়েকটি, যেমন—ম্যালেট ডিহাইড্রোজিনেজ (MDH), কোলিন এস্টারেজ (ChE), টাইরোসিন অ্যামিনো ট্র্যান্সফারেজ (TAT), আরজিনেজ প্রভৃতি জৈব-অনুঘটকগুলির ক্ষেত্রেও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ওগুলির সক্রিয়তা বিভিন্ন গ্রন্থিতে ভিন্ন হারে বাড়ে বা কমে। এসব অনুঘটকগুলি সম্পর্কে পরীক্ষা সবে সুরু হয়েছে।

জরা থেকে রেহাই পাবার পথ আজও অজানাই রয়ে গেছে। আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতি হয়তো এই পথের নিশানা দেবে। জরা হয়তো বা রোধ করা যাবে। কিন্তু জরা সমস্যার সমাধান মানুষকে আরও বহু সমস্যার জালে ঘিরে ফেলবে সন্দেহ নেই। ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যা পৃথিবীতে শান্তির চেয়ে অশান্তিই হয়তো ডেকে আনবে। এত সব অনিশ্চয়তা থাকা সত্ত্বেও মানুষ জরার কারণ জানতে এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছে কেন? বৈজ্ঞানিকদের ধারণা—জরা রোধ হয়তো বা মানুষকে সুস্থ জীবনযাপনে সাহায্য করবে। প্রাণীকে মরতে দেওয়া হবে না—এমন ধারণা পোষণ করা নিশ্চয়ই উচিত হবে না।

সমুদ্রের অভিযান

শ্রীশচীনাথ মিত্র*

সমুদ্র-অভিযান নয়—সমুদ্রের অভিযানের যুগে আমরা বাস করছি; অর্থাৎ সমুদ্র বিজয়ী বীরের মত সদর্পে পৃথিবীর স্থান জয় করে এগিয়ে আসছে এবং সমুদ্রের আয়তনের হচ্ছে ক্রমপ্রসার। এই অভিযানের গতি অবশ্য খুবই ধীর, তবুও একজন মানুষের জীবনেই সমুদ্রের প্রসার ও স্ফীতি নজরে আসবার মত।

এই ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে নূতন নয়। ভূ-ইতিহাসে দেখা যায়, উত্তর আমেরিকার বিশাল স্থলভূমি সমুদ্র বহুবার গ্রাস করেছে আবার ছেড়ে চলে গেছে বহু বার বিজিত সাম্রাজ্যে নিজস্ব ইতিহাস পলিপড়া প্রস্তরের গায়ে নিখুঁতভাবে লিখে রেখে। আমেরিকা ছাড়াও বহু অঞ্চলে সমুদ্রের এই স্থলভাগ বিজয়ের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে একাধিকবার।

বর্তমান সভ্য পৃথিবী আবার এই সমুদ্রের আক্রমণের কবলে। সমুদ্রগুলি আজ অনেকক্ষেত্রেই তটসীমা ছেড়ে এগিয়ে আসছে দেশের মধ্যে। এখনই মহাদেশের উপকূলে অবস্থিত অগভীর সাগরগুলি ভর্তি হয়ে ছাপিয়ে উঠেছে। আজকের বেরেন্ট, বেরিং ও চীন সাগর এইভাবেই জলপূর্ণ হয়েছে। তাছাড়া এখানে-সেখানে দেশের মধ্যস্থিত

* প্ল্যানিং কমিশন, নতুন দিল্লী

সাগর যথা—হুডসন উপসাগর, সেন্ট লরেন্স, বাল্টিক ও সুন্দা সাগরেও সমুদ্রের লোনা জল এগিয়ে এসেছে এবং আটলান্টিকের উপকূলের বহু নদীর মোহানা অঞ্চল আজ গভীর সমুদ্রের নীচে। বর্তমান হুডসন নদী ও সাসকুইহানা নদীর মোহানা অঞ্চল কয়েক শ' বছর আগেও বর্তমান সমুদ্রের মধ্যে বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অতীতকালের অনেক খাল ও তটভূমি আছে কেসাপিক ও দেলাওয়র উপসাগরের তরঙ্গ-উচ্ছ্বাসের নীচে সমাধিস্থ। কোথায় এবং কখন এই তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস শান্ত হবে বলা কঠিন।

গত তুষার-যুগের বরফ মানব-সভ্যতার সুরু থেকেই গলতে সুরু করেছিল, এখনও গলছে এবং আরও বহু কাল ধরে গলবে। হিমালয়ের হিমবাহ-গলা জলে শত শত নদীর পুষ্টি, সে নদীর জলে সমুদ্রের পুষ্টি আর পুষ্টির তুলনায় বাষ্পীভবনের পরিমাণ কম হওয়ায় সমুদ্রের ক্ষতি বহু গুণ কম। বাষ্পের জল আবার জমে সমুদ্রের বুকে—নদীনালা বেয়ে পৃথিবী-ধোয়া জল আবার তারই কাছে ফিরে আসে। হিমালয়, আল্পস, আন্দিজে এই ঘটনা ঘটছে, ঘটছে পৃথিবীর হাজার হাজার হিম-শৈল থেকে। উত্তরে গ্রীনল্যাণ্ডের তুষার গলছে, সাইবেরিয়ার বরফ গলছে, ক্যানাডায় থ (Thaw) হচ্ছে। মোট ফল, সমুদ্রের হচ্ছে স্ফীতি। তার পরিধির মধ্যে জল-সঙ্কুলান হচ্ছে না। আজ যদিও কোনও রকমে এঁটে যায় আগামীকাল আর আঁটবে না। পৃথিবীর আবহাওয়া গত প্লেইস্টোসিন তুষার যুগের শীতলতা থেকে শেষ প্রহরে উষ্ণ থেকে উষ্ণতর হতে চলেছে। বরফ তাই গলছে। যত গলছে, তত জমছে না। তাই জল বেড়েই চলেছে।

পারমাণবিক বিস্ফোরণে আবহাওয়া আরও পরিবর্তিত হয়ে উষ্ণ হয়ে উঠছে। রাশিয়া আজ বরফ গলিয়ে জমি তৈরি করছে। সাইবেরিয়ার জমাট-বাঁধা তুষার তাদের বিজ্ঞানের কুঠারের আঘাতে ছিন্নমূল হয়ে নেমে পড়ছে সাগরে সাগরে। প্রশান্ত মহাসাগর, বাল্টিক, আর্কটিকে হিমবাহ গলে উপকূল ছাপিয়ে জল এগিয়ে আসছে অন্য দেশের উপর। রুশ বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টার ফলে সেখানকার মেরু-তুষার অন্য দেশের উপকূলে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে।

এমন ঘটনা যে পৃথিবীতে বহু বার ঘটেছে, তা আগেই বলা হয়েছে। এই ঘটনা আবার ঘটছে, তাই আমাদের সভ্যতার আশঙ্কা। আশঙ্কা বিশেষতঃ উপকূলবর্তী দ্বীপবাসীদের, যারা নীল জলের তাড়া খেয়ে পাহাড়ে চড়তে জায়গা পাবে না। নীল মৃত্যু 'সুনামি' (Tsunamis) এক বিধ্বংসী তরঙ্গ-প্লাবন—যা কয়েক ঘন্টায় 80-100 ফুট উঁচু হয়ে দেশে প্রবেশ করে ধ্বংস ও হাহাকারের চূড়ান্ত ইতিহাস সৃষ্টি করে রেখে যায়। সেই সুনামির দেশ—জাপানের তাই ভয়। সুমাত্রা, বোর্ণিও ও অন্যান্য পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জেরও এই ভয়।

বর্তমান পৃথিবীর তাপমাত্রা আরও কিছু বৃদ্ধি পেলেই যা তুষার গলবে, তাতে প্রশান্ত মহা-সাগরের জল 100 ফুট উঁচু হবার সম্ভাবনা যথেষ্ট প্রবল। সেই তাপমাত্রায় বর্তমান আটলান্টিকের তীরের সমস্ত বাণিজ্য কেন্দ্র, নগর, শহর সব কিছু সমুদ্রের নীচে বিলীন হয়ে যাবে। সে সমুদ্রের জল এসে আপালেসিয়ান পর্বতমালার পায়ে আছাড় খেয়ে পড়বে—আছাড়-খাওয়া জলের ফেনায় আপালেসিয়ানের চারদিক সাদা হয়ে যাবে, আর মেক্সিকো উপসাগর ও মিসি-সিপি নদীর পার্শ্ববর্তী নীচু অঞ্চল জলের নীচে প্রহর গুণবে।

বরফ যদি আরও বেশী গলে?—তারও সম্ভাবনা আছে—তা হলে? সমুদ্রের জল উঁচু হবে 600 ফুট কি আরও অনেক বেশী—আমেরিকা মহা-দেশের পূর্ব উপকূল মানব-সভ্যতার ইট-কাঠ-ঐতিহ্য নিয়ে অগাধ জলের নীচে নেমে যাবে ফসিল হয়ে থাকবার জন্যে। উত্তুঙ্গ আপালেশিয়ান অসীম সমুদ্রের মাঝে পর্বতসঙ্কুল দ্বীপপুঞ্জে পরিণত হবে।

আর্কটিক সমুদ্র ও হাডসনের জল এসে ক্যানাডাকে আবৃত করবে। আর মধ্য-ইউরোপ, আরব, পারস্য, ভারত, চীন ও সোভিয়েটের বিরাট অঞ্চল জুড়ে আর্কটিক, আটলান্টিক, ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের সংঘাত চলবে—আর সে সংঘাতে সৃষ্ট ঢেউ সাদা ফেনা হয়ে ছিটিয়ে পড়বে আল্‌প্‌স ও হিমালয়ের বিস্তৃত পর্বতের গায়ে।

আমাদের চিরপরিচিত পৃথিবীর এই রূপ আমাদের কাছে অচিন্তনীয়—জ্ঞানের বাইরে। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যাবে এমন ঘটনা বহু বার ঘটেছে, তার পরে ওলট-পালট হয়ে গেছে পৃথিবীর রূপ, স্থল-ভাগের পরিধি ও বিস্তার। এই পরিবর্তন এখনও চলছে।

আটলান্টিকের তলদেশ ফুঁড়ে গজিয়ে উঠেছে বারমুডা দ্বীপ, উঠেছিল চিররুক্ষ এসসেনসন দ্বীপ। 1830 সালে এক অগ্ন্যুৎপাতের সঙ্গে সিসিলি ও আফ্রিকার মাঝখানে ভূমধ্য-সাগরে এক দ্বীপ হঠাৎ জেগে ওঠে সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে দু-শ' ফুট উঁচু মাথা তুলে। তার পরে কয়েক বছরে সে দ্বীপটি অগাধ জলের নীচে নেমে গেছে।

অষ্ট্রেলিয়া থেকে দু-হাজার মাইল পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগরে চিরপরিচিত ফালকান দ্বীপ 1913 সালে হঠাৎ ডুবে হারিয়ে যায় অতল সমুদ্রের তলায়। 1949 সালে কয়েক দিনের জন্তে পৃথিবী-পৃষ্ঠে দেখা দিয়ে আবার লুকিয়ে পড়ে জলের নীচে।

1883 সালের 27শে অগাষ্ট সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 1400 ফুট উঁচুতে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে-থাকা ক্রাকাতোয়া কয়দিনের অগ্ন্যুৎপাতে ফেটে চৌচির হয়ে সমুদ্রের কয়েক হাজার ফুট গভীরে নেমে যায়। সে দিনটি ছিল মানুষের ইতিহাসে একটি বিস্ময়কর আতঙ্কের দিন। আতঙ্ক ছিল বিস্ময়কর ক্রাকোতোয়ার জলে ফেটে চৌচির হয়ে লুপ্ত হয়ে যাবার কাহিনীর মধ্যে। আতঙ্ক জেগেছিল যখন ক্রাকোতোয়ার দ্বারা আক্রান্ত সমুদ্রজল তপ্ত হয়ে শত ফুট উঁচু ঢেউয়ের মত ফণা তুলে সুন্দা দ্বীপপুঞ্জের শত শত গ্রামের উপর দিয়ে ছুটে গিয়েছিল ধ্বংসের প্লাবন ডেকে। কয়েক লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ঘটিয়েছিল এক-দিনে এই সুনামি—জাপানী অর্থ যার নীল মৃত্যু।

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে সৃষ্ট তরঙ্গ ছাড়াও বরফগলা জলের তরঙ্গ পৃথিবীকে আক্রমণ করে কবলিত করেছে। সবচেয়ে বড় প্লাবন ঘটেছিল 10 কোটি বছর আগে ক্রিটেশাস যুগে। তখন সমুদ্রজল উত্তর আমেরিকাকে গ্রাস করেছিল উত্তর, দক্ষিণ এবং পূর্ব দিক থেকে এবং ঐ অঞ্চল জুড়ে এক আন্তর্দেশীয় সমুদ্র ছিল, যা চওড়ায় 1000 মাইল আর আর্কটিক থেকে মেক্সিকো উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। তার পর ক্রমে পূর্ব দিকের মেক্সিকো উপসাগর থেকে নিউ জারসি পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো এই সমুদ্র। জল বাড়তে বাড়তে বর্তমান উত্তর আমেরিকার অর্ধেকের বেশীই এই সমুদ্রের অধিকারে চলে গেল।

এই সময়ে পৃথিবীব্যাপী প্লাবন ঘটে এবং বর্তমান বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ জলের নীচে লোপ পায়। শুধুমাত্র কয়েকটি উত্তুঙ্গ পর্বতশিখর ছাড়া দক্ষিণ ইউরোপের কোনও স্থলভাগ সে সময়ে জলের উপরে দেখা যেত না। এই সমুদ্র আফ্রিকায় প্রবেশ করে বালুকণার পলিমাটি ফেলে। এই বালুকণা বিধৃত অঞ্চলেই পরে সৃষ্টি হয় উষর মরু প্রান্তর সাহারার। সুইডেন, রাশিয়া, সাইবেরিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল, ভারতের কিছু অংশ, জাপান ও অষ্ট্রেলিয়া এই সমুদ্রের কবলে পড়ে যায়। আর এই সময়ে দক্ষিণ আমেরিকার সুউচ্চ আন্দিজ পর্বত তখন সবেমাত্র জন্মলাভ করে সমুদ্রের গভীর অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসবার সুযোগের অপেক্ষায় ছিল।

ঠিক এই রকমের বিস্তৃত প্লাবন ঘটেছিল আরও আগে ডেভোনিয়ান, সিলুরিয়ান ও অর্ডো-

ডিভিনিয়ান (40 কোটি বছর আগেকার) যুগে। বিভিন্ন যুগে বিচিত্র জল ও স্থল বিন্যাসের মাঝে হয়েছিল এই জলপ্লাবন। সেই সকল প্লাবনের ধারণা পূর্বোল্লিখিত ক্রিটেশাস যুগের প্লাবনের ধারণা থেকে পাওয়া যাবে।

হিমালয়ের 20,000 ফুট উচ্চতায় সামুদ্রিক চুনাপাথর এবং জীবাশ্ম এক অতীত সমুদ্রের স্বাক্ষরিত ইতিহাস বহন করে। এই সমুদ্রের জল ছিল উষ্ণ এবং পরিষ্কার। দক্ষিণ ইউরোপ এবং উত্তর আফ্রিকা থেকে সুরু করে দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া পর্যন্ত ছিল এই সমুদ্রের বিস্তার। 5 কোটি বছরের স্বাক্ষরিত ইতিহাস বহন করে হুমুলাইট—যার দেহাস্থিতে গঠিত পাথর হিমালয়ে কয়েক হাজার ফুট উচ্চতায় দেখা যায়। মিশরীয়েরা এই পাথর কেটে স্ফিংক্স তৈরি করেছিল, পিরামিডের ইমারত তুলেছিল।

ইংল্যাণ্ডের ডোভার থেকে সুরু করে ডেনমার্ক, জার্মেনী হয়ে রাশিয়া পর্যন্ত সমুদ্রজাত চুনাপাথর বিস্তৃত। এই চুনাপাথর পূর্বোল্লিখিত ক্রিটেশাস যুগের প্লাবনের সময় পলি পড়ে সৃষ্ট হয়েছিল।

আচমকা ঝাঁপ দিয়ে পড়া নির্ঝর নায়াগ্রার সৃষ্টি হয়েছিল সেই সিলুরিয়ান যুগে (অর্থাৎ প্রায় 33 কোটি বছর আগে)। উত্তর থেকে আর্কটিক সাগর চুপিসারে দক্ষিণের দেশ দেখবার জন্যে চলে এসেছিল ঐ সময়ে। তার তীর ছিল নীচু আর জল ছিল স্ফটিক স্বচ্ছ, ফলে খুব কম কাদামাটিই দেশের মধ্যে বহন করে নিয়ে যেতে পেরেছিল। শুধু ক্যালসিয়াম ও ম্যাগ্‌নেসিয়াম কার্বনেটে গঠিত ডলোমাইট পাথর সৃষ্টি হলো এর জলের নূন জমে এবং বর্তমান ক্যানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের ধার দিয়ে খাড়াই সৃষ্টি করলো। তার পরে কেটে গেছে লক্ষ লক্ষ বছর। দক্ষিণ দেশ দেখে আর্কটিক আবার উত্তরে ফিরে গেছে। এই খাড়াইয়ের উপর দিয়ে বরফগলা জল ঝাঁপ দিয়ে পড়তে সুরু করলো সুদীর্ঘকাল ধরে। কঠিন ডলোমাইটের নীচে নরম প্রস্তরীভূত কাদামাটি ক্ষয়ে ক্ষয়ে সুড়ঙ্গপথ সৃষ্টি করে এগিয়ে চললো ভূ-অভ্যন্তরে, উপরে ডলোমাইটের এক আবরণস্তর রেখে। তার পরে এক সময়ে ধ্বসে পড়লো উপরের ডলোমাইটের ছাদ নীচের গহ্বরে। তার ফলে বরফগলা জলের স্রোতপথে এক গভীর খাদের সৃষ্টি হলো। গড়িয়ে চলা নদী এই খাদে ঝাঁপ দিয়ে দিয়ে এগিয়ে চললো। পৃথিবীতে এক বিস্ময় সৃষ্টি করলো এই সুউচ্চ নায়াগ্রা জলপ্রপাত।

সমুদ্র-উচ্ছ্বাসের সময় সমুদ্র-স্রোতও পরিবর্তিত হয় এবং এমনও প্রমাণ আছে যে, নিরক্ষীয় অঞ্চলের তাপ এই সমুদ্র-স্রোতই উত্তরে বয়ে নিয়ে গিয়ে আবহাওয়া উষ্ণ করে তুলেছিল, বরফ গলিয়ে মাটি বের করেছিল। ক্রিটেশাস যুগে দারুচিনি, লরেলগুল্ম, ডুমুর ইত্যাদি গাছ প্রচুর পরিমাণে গ্রীনল্যাণ্ডে জন্মায়, তা থেকে গ্রীনল্যাণ্ডের অতীত উষ্ণ আবহাওয়া সম্বন্ধে ধারণা করা যায়।

ভূতত্ত্ববিদ্‌দের মতে পৃথিবীর ইতিহাসের প্রধান অধ্যায়গুলি তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথম পর্যায়ে দেখা যায় মহাদেশগুলি উঁচু, দেশের ক্ষয় বেশী এবং সমুদ্রগুলি নিজেদের নীচু স্থানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখা যায় মহাদেশগুলি সবচেয়ে নীচু এবং সমুদ্র তটভূমির সীমারেখা অতিক্রম করে তাদের গ্রাস করছে। তৃতীয় পর্যায়ে পৃথিবীর স্থলভাগ সমুদ্রের অধীনতা থেকে বেরিয়ে এসে মাথা উঁচু করে তোলে।

পৃথিবীর সমুদ্রের এই সীমালঙ্ঘন ও স্থলজয়ের ইতিহাস খুঁজে দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়ে বিখ্যাত ভূ-বিজ্ঞানী সুকার্ট একদিন এই বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীর মানুষকে জানালেন—আমরা এখন নূতন পর্যায়ের সুরুতে বাস করছি। পৃথিবীর দেশগুলি এখন অতীতের চেয়ে অনেক বেশী উঁচু এবং

সর্বাপেক্ষা মনোরম। কিন্তু নূতন পর্যায়ের সমুদ্র-গ্রাস ইতিমধ্যেই সুরু হয়ে গেছে, বিশেষতঃ উত্তর আমেরিকায়।

নীল সমুদ্রের সফেন তরঙ্গ ছুটে আসছে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে। পৃথিবীর সমুদ্র আজ বুঝি ফুলে ফুঁসে উঠছে একটু একটু করে বছরের পর বছর। এই তরঙ্গ যখন আরও উঁচু হবে? পৃথিবীর পুরনো ইতিহাসের পাতা আবার উল্টে এগিয়ে আসবে—পুনরাবৃত্তি ঘটবে ঘটনার? সভ্য মানুষ কোন্ অস্ত্রবলে সেই তরঙ্গ রুখবে?

ভারতের মন্দির-নগরী

শ্রীঅবনীকুমার দে*

ভারতের মন্দির-নগরী সম্বন্ধে পূর্বে এক প্রবন্ধে (জ্ঞান ও বিজ্ঞান—জুন, 1971) বলা হয়েছিল যে, দক্ষিণ ভারতের এক শ্রেণীর মন্দির-নগরীর ক্ষেত্রে মন্দিরের চারদিকে ক্রমে ক্রমে নগরীকে সম্প্রসারিত করা হতো। এই প্রকারের মন্দির-নগরীর উদাহরণ হলো—শ্রীরঙ্গম ও মাদুরা।

শ্রীরঙ্গম

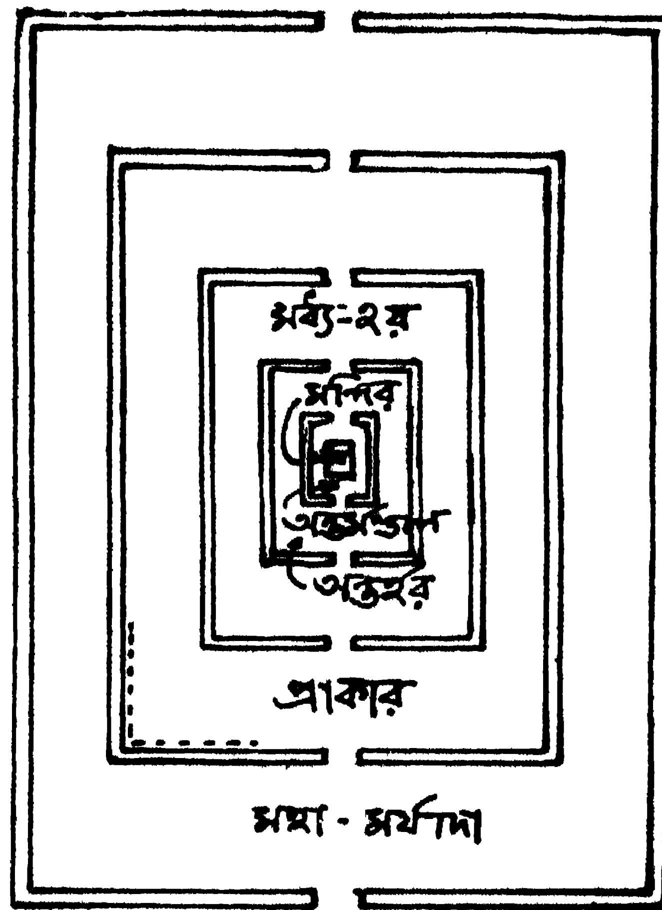
ত্রিচিনাপল্লী জংশন স্টেশন থেকে পাঁচ-ছয় মাইল উত্তরে কাবেরী নদীর ব-দ্বীপের অগ্রভাগে শ্রীরঙ্গম দ্বীপ অবস্থিত। কাছেই কাবেরী নদী ও উঁচু উঁচু নারিকেল গাছের সারি থাকায় এই জায়গাটির দৃশ্য খুবই মনোরম। এখানের শ্রীরঙ্গনাথজীর মন্দির ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও বিত্তশালী মন্দির। শৈবদের কাছে যে রকম চিদাম্বরমের মন্দির পবিত্র, বৈষ্ণবদের কাছে শ্রীরঙ্গমের মন্দিরও সেই রকম পবিত্র।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীতে এই নগরীর প্রথম পত্তন হয়েছিল। কয়েক শতাব্দী ধরে এই রাজ্যের উত্থান-পতন হওয়া সত্ত্বেও এই নগরীর নন্দ্যাবর্ত পদ্ধতিতে প্রথম পরিকল্পিত ও নির্মিত নগর-বিন্যাস আজও সুরক্ষিত আছে।

155 একর জমির উপর নগরীটি নির্মিত। সর্বপ্রথম শুধু মন্দিরের পত্তন করা হয়েছিল। পরে মন্দিরের চত্বরগুলি যোগ করা হয়। মন্দিরকে ঘিরে মোট সাতটি চত্বর আছে। প্রথম চারটি চত্বর দেবতাদের জন্য নির্দিষ্ট ও পরের তিনটিতে মন্দিরের কাজে নিযুক্ত লোকেদের বাসস্থান আছে। সবচেয়ে বাইরের চত্বর এক হাজার গজ দীর্ঘ ও আট শত গজ প্রশস্ত। বাইরের চত্বরগুলি কালক্রমে দোকান ও বাজারে পরিণত হয়েছে। পুণ্যার্থী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের গৃহগুলিও এইখানে অবস্থিত। চতুর্থ চত্বরটি 412 গজ দীর্ঘ ও 283 গজ প্রশস্ত। এই চত্বরে এক হাজার স্তম্ভবিশিষ্ট একটি বৃহৎ মণ্ডপ আছে। এখান থেকে ভিতরের দিকে প্রধান মন্দির সুরু হয়েছে। এই চত্বরের প্রবেশ দ্বারগুলির উপর তিনটি গোপুরম আছে। এদের মধ্যে পূর্বদিকের গোপুরম সবচেয়ে বড় ও সুন্দর। কোনও কোনও গোপুরমের উচ্চতা 150 থেকে 160 ফুট। ভিতরের চত্বরে প্রধান দেবতা শ্রীরঙ্গনাথজী ও তাঁর অর্ধাঙ্গিনীর মন্দির ও অন্যান্য সহগামী দেবতাদের মন্দির আছে। এই পবিত্র মন্দিরের উপরের বিমান স্বর্ণ-নির্মিত। মূল বিগ্রহের মূর্তিতে শ্রীভগবান পঞ্চফণাবিশিষ্ট শেষনাগের উপর বিশ্রাম করছেন। এই মন্দিরের রত্ন-সংগ্রহ অদ্বিতীয়।

* নগর ও আঞ্চলিক পরিকল্পনা বিভাগ, বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবপুর।

প্যাট্রিক গেডিস শ্রীরঙ্গম নগরীর ক্রমোন্নয়ন ও সম্প্রসারণের যে বিবরণ লিখে গেছেন, তাথেকে জানা যায় যে, অতি প্রাচীনকালে এই দ্বীপের ও এর গ্রামগুলির মাঝে একটি স্থানীয় দেবস্থান ছিল। ক্রমে এই দেবস্থানে একটি মন্দির তৈরি হলো এবং এর চত্বরে সশিষ্য সাধুরা বাস করতে লাগলেন। ক্রমে এই চত্বরের বাইরে আরও বাড়ী, শস্যাগার ইত্যাদি তৈরি হলো। সমস্ত জায়গাটিকে আরও বড় একটি প্রাচীর (কেন্দ্রস্থল থেকে তৃতীয় প্রাচীর) দিয়ে ঘেরা হলো। এই প্রাচীরের মধ্যে দক্ষিণ দিকে প্রবেশদ্বার রাখা হলো। ক্রমশঃ এই ঘেরা জায়গার ভিতরে ও বাইরে আরও মন্দির, গৃহ, শস্যাগার ইত্যাদি তৈরি হতে লাগলো। প্রাচীরের বাইরের দিকে অপেক্ষাকৃত বড় ও সুপ্রশস্ত নতুন নতুন গৃহ তৈরি হলো। আরও নতুন নতুন মন্দিরও তৈরি হলো। অনেক কাল পরে এর উত্তর পূর্ব দিকে এক হাজার স্তম্ভবিশিষ্ট একটি মণ্ডপ তৈরি হলো। এই চত্বরের বাইরের দিকে একটি নতুন আয়তাকার প্রাচীর তৈরি করা হলো। প্রাচীরের মধ্যে তিনটি গোপুরম নির্মিত হলো। এইগুলির মধ্যে পূর্বদিকের গোপুরমটি সবচেয়ে বড়। এই প্রাচীরের বাইরে চারদিকে একটি নতুন রাস্তা তৈরি করা হলো। সম্ভবতঃ রথ টেনে নিয়ে যাবার জন্যে এই রাস্তাটি ব্যবহৃত হতো। এই রাস্তার অপর দিকে বাসগৃহ রাখা হলো। আয়তাকার জায়গা জুড়ে বিস্তৃত এই বাসগৃহগুলির বাইরের দিকে আর একটি প্রাচীর তৈরি করা হলো। এই প্রাচীরে উত্তর,



মন্দিরের চত্বর বিন্যাস

দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম দিকে চারটি অপেক্ষাকৃত ছোট প্রবেশদ্বার রাখা হলো। ক্রমশঃ এই প্রাচীরের বাইরে নগরী আরও সম্প্রসারিত হলো। সম্প্রসারিত নতুন নগরের রাস্তাঘাটগুলি আগেকার রাস্তাঘাটগুলির সঙ্গে সমান্তরাল ও আনুষ-ভাবে বিন্যস্ত। রাস্তাঘাটের এই বিন্যাসের আকৃতি দাবার ছকের মত দেখতে। রথ টেনে নিয়ে যাবার জন্যে নতুন রাস্তা তৈরি হলো। এই রাস্তার দু-পাশে নতুন নতুন গৃহ নির্মিত হলো। নগরের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে ধনী ও দরিদ্রদের বাসস্থান বিভিন্ন জায়গায় নির্দিষ্ট হলো এবং বিভিন্ন বর্ণের লোকেদের মধ্যে প্রভেদ আরও বেশী হয়ে উঠল। অপেক্ষাকৃত দরিদ্র শ্রেণীর ও নিম্ন বর্ণের লোকেদের বাসগৃহ ঐ প্রাচীরের বৃহৎ প্রবেশদ্বারগুলির বাইরের দিকে, বিশেষ করে দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে রাখা হলো। দক্ষিণের বাজার এলাকায় দক্ষিণ দিকের প্রাচীরসংলগ্ন সরু রাস্তার ধারের উত্তরমুখী গৃহ-গুলি ভেঙে ফেললে আবার ক্ষতিপূরণ দিতে হতো ও ব্যবসা-বাণিজ্যেরও ক্ষতি হতো। সুতরাং এই গৃহগুলিকে রেখে দিয়ে পরিবর্তে পূর্ব ও পশ্চিম দিকের খোলা জায়গায় নতুন বাজারের রাস্তা তৈরি করা হলো। প্রত্যেক বাসগৃহের জমির পরিমাণ আরও বাড়ানো হলো। উত্তর দিকের নতুন রাস্তার দুই ধারে গৃহ নির্মিত হলো। এই নতুন স্থানটির চারদিকে আয়তাকার একটি প্রাচীর তৈরি করা হলো এবং আগেকার গোপুরমগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম দিকে চারটি বড় গোপুরম তৈরির কাজ সুরু করা হলো, কিন্তু এই সম্প্রসারণ কাজের নির্মাতা তিরুমলের অকালমৃত্যুতে এই গোপুরম-গুলির নির্মাণকার্য অসমাপ্ত রয়ে গেল। পরে তাঁর উত্তরাধিকারীদের এই গোপুরমগুলির তৈরির কাজ শেষ করবার মত আগ্রহ ও অর্থ দুই-ই ছিল না।

শ্রীরঙ্গমের কাছে প্রায় এক মাইল পূর্ব দিকে জম্বুকেশ্বরের ভগবান শিবের অপেক্ষাকৃত ছোট মন্দির-নগরী একই রীতিতে নির্মিত। মন্দিরের তিনটি প্রাচীরের বাইরের দিকে রথ চলবার রাস্তা আছে। এই রাস্তাগুলির ধারে ধারে বিভিন্ন বর্ণের লোকদের বাসগৃহ আছে। এই সবগুলি ঘিরে আর একটি উঁচু প্রাচীর ও তাতে চারটি গোপুরম আছে। এই চতুর্থ প্রাচীরের চার দিকে আর একটি রাস্তা আছে।

মাদুরা

মাদ্রাজ শহরের 350 মাইল দক্ষিণে মাদুরা শহর অবস্থিত। তামিল ভাষায় এর নাম মাদুরাই বা উৎসব-নগরী। এখানকার মীনাক্ষী দেবীর মন্দিরকে কেন্দ্র করে সমকেন্দ্রীয় ভাবে নগরটি গড়ে উঠেছিল এবং ক্রমে ক্রমে সম্প্রসারিত হয়েছিল। সর্বতোভদ্র পদ্ধতি অনুযায়ী নগরের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এই মন্দিরের দ্বিতীয় চত্বরে মীনাক্ষীদেবীর মন্দির ও প্রথম চত্বরে তাঁর স্বামী সুন্দরের মন্দির আছে।

প্রথমে নগরের চারদিকে প্রশস্ত প্রাচীর ছিল। পরে এই প্রাচীর ভেঙে ফেলা হয়েছে। মন্দিরের বাইরের প্রাচীরের সঙ্গে সমান্তরাল ও সমকেন্দ্রীকভাবে মন্দিরকে বেষ্টন করে নগরের রাস্তাগুলি বিন্যস্ত ছিল। এই রকম তিনটি বেষ্টন-কারী রাস্তার নিদর্শন এখনও পাওয়া যায়। এদের মধ্যে বাইরের দিকের রাস্তাটি জায়গায় জায়গায় ভগ্ন। এই রাস্তাগুলি অনেক জায়গায় পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকায় রাস্তাগুলির মধ্যে মধ্যে যে সব সঙ্কীর্ণ স্থান হয়েছে, সেই সব জায়গায় গৃহাদি আছে। মন্দিরের চারদিকের প্রাচীরে নয়টি গোপুরম আছে। নগরে প্রবেশ করবার অনেক দূর থেকেই এই উঁচু গোপুরম-গুলি দেখা যায়।

মাদুরার অপর একটি নাম কদম্ব বন। পুরাণে

বর্ণিত আছে যে, এই নগর প্রথম নির্মাণের আগে এখানকার রাজাদের রাজধানী ছিল কদম্ব বনের পূর্বদিকে একটি জায়গায়। এই বনের মধ্যে একটি পুষ্করিণী ও তার নিকটবর্তী ভগবান শিবের প্রাচীন মন্দিরের চারপাশের দৃশ্যে মুগ্ধ হয়ে তখনকার রাজা এইখানে নতুন নগর তৈরি করান। কদম্ব বন পরিষ্কার করিয়ে মন্দিরকে কেন্দ্রস্থলে রেখে চারদিকে পর পর যথাক্রমে পদ্মমণ্ডপ (এখানে বেদপাঠ করা হতো), অর্ধমণ্ডপ (এখানে ধর্মীয় উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হতো) ও নৃত্যমণ্ডপ এবং মন্দিরের রন্ধনশালা ও অন্যান্য ছোটখাটো মন্দির তৈরি করা হলো। মন্দিরে প্রবেশ করবার জন্যে সুদৃশ্য গোপুরম তৈরি হলো। এরপর বাজারের রাস্তা, রথ চলবার রাস্তা ও বাসস্থান নির্মিত হলো। চওড়া রাস্তাগুলি থেকে মাঝে মাঝে ছোট ছোট রাস্তা তৈরি করা হলো। নগরের মধ্যে অনেক খোলা জায়গা ও জনসাধারণের সভাস্থল ছেড়ে রাখা হলো। নতুন নতুন পুষ্করিণী খনন করা হলো। ভাল ভাল পুষ্করিণী ও স্রোতস্বিনীকে সংরক্ষণ করা হলো। শাস্ত্রমতে এই দুর্গ-নগরীর চারপাশে প্রাচীর, পরিখা ইত্যাদি তৈরি করা হলো। নগরের উত্তর-পূর্ব দিকে রাজপ্রাসাদ তৈরি হলো। এক্ষেত্রে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এই নগর একটু একটু করে পরিকল্পিত ও নির্মিত হয় নি বরং নগরের ভবিষ্যৎ লোকসংখ্যা ও সেই অনুপাতে এর প্রয়োজনীয় আয়তন কত হবে, সে বিষয়েও চিন্তা করা হয়েছিল। নগরের মধ্যে জায়গায় জায়গায় যথেষ্ট খোলা জায়গা ছেড়ে রাখা হয়েছিল এবং নগরে যাতে ভবিষ্যতে ঘন বসতি না গড়ে ওঠে, সেই দিকেও লক্ষ্য রাখা হয়েছিল।

পুরাণে আরও লিখিত আছে যে, এই নগর বহুদিন সমৃদ্ধশালী ছিল। পরে সর্বনাশা বন্যায় সমস্ত নগর ধ্বংস হয়ে যায়। কেবলমাত্র প্রাচীন মন্দির ও তার চারপাশের অল্পস্থান রক্ষা পায়। ক্রমে এই জায়গার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে তখনকার রাজা পুরনো নগরের সীমানার মধ্যেকার জায়গা আবার জরিপ করালেন এবং মন্দিরকে কেন্দ্রস্থলে রেখে আবার নতুন করে নগর নির্মাণ করালেন। সমস্ত সহরটি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ছিল নয় মাইল করে। পাণ্ড্যীয় রাজাদের রাজধানী মাদুরা ছিল সুরক্ষিত দুর্গ-নগরী। দুর্গের চারটি প্রধান প্রবেশদ্বার ছিল এবং এদের উপর ছিল উঁচু বুরুজ। শহরের দক্ষিণ দিকে ছিল প্রধান প্রবেশদ্বার এবং বাইরে যাবার জন্যে শহরের উত্তর দিকে একটি ছোট দ্বার ছিল। উত্তর দিকে প্রবাহিত বৈকালী নদী ছিল শহরের প্রাকৃতিক সীমা। হঠাৎ আক্রমণের হাত থেকে এই নদী শহরকে রক্ষা করতো। যে রকম জমির অবস্থান ও পরিবেশ ছিল, সেই রকম ভাবেই শহর-প্রাচীর তৈরি করা হয়েছিল বলে মাদুরা দুর্গের চারদিকের প্রাচীররেখা ছিল আঁকাবাঁকা। এই প্রাচীর ছিল চওড়া, খুব উঁচু এবং অসমান ভাবে কাটা পাথর দিয়ে তৈরি। শহরের প্রবেশদ্বারগুলিকে যোগকরা প্রধান প্রধান রাস্তাগুলি এত চওড়া ছিল যে, এই সব রাস্তা দিয়ে কয়েকটি হাতী এক সঙ্গে পাশাপাশি চলতে পারতো। প্রধান প্রবেশদ্বারগুলির পাশের প্রাচীরের উপর নানা রকমের অস্ত্রশস্ত্র ও ক্ষেপ-শাস্ত্র লুকিয়ে রাখা হতো। প্রয়োজনের সময় আক্রমণকারী শত্রুর উপর এই সব অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করা হতো। প্রধান প্রবেশদ্বারগুলিতে যবন সৈনিকেরা খোলা তরবারি হাতে পাহারায় নিযুক্ত থাকত।

দুর্গ-প্রাচীরের বাইরে ছিল গভীর পরিখা এবং পরিখার পর চারপাশে ছিল কাঁটাগাছের গভীর জঙ্গল। শহরের চারদিকে এই রকম ঘন বন থাকবার ফলে শত্রুর হাত থেকে শহরকে

রক্ষা করা খুবই সুবিধাজনক হতো। পরিখার মধ্যে নগরের ময়লা জল নিষ্কাশিত হতো।

শহরের বাইরে ছিল পল্লী-অঞ্চল। সেখানে ছায়াপ্রদ গাছ, সেচের জন্যে জলবাহী নালা এবং সবুজ কৃষিক্ষেত্র ছিল। যেখানে শহর শেষ হয়েছিল, সেখান থেকে সুরু হয়েছিল এই পল্লী-অঞ্চল। দরকার হলে ভবিষ্যতে এইখানে শহর-তলী সম্প্রসারণ করা চলতো। এতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিধাও ছিল। কৃষকেরা গ্রামাঞ্চলের কৃষিক্ষেত্রে কৃষিকার্য করতো ও নিকটবর্তী শহরে তাঁদের কৃষিজাত দ্রব্যাদি বিক্রী করতো। এর ফলে তাঁরা কৃষিকার্যে অধিক শক্তি ও উদ্যম নিয়োগ করতে পারতো। পরিখার ময়লা জল সেচের কাজে ব্যবহার করা হতো। এই ব্যবস্থার ফলে সেচের জলও সহজে পাওয়া যেত এবং পরিখার ময়লা জল এইভাবে ব্যবহৃত হবার ফলে শহরের স্বাস্থ্যকর পরিবেশের কোনও ক্ষতি হতো না।

দক্ষিণ দিকে শহরের প্রধান প্রবেশদ্বারের কাছে পরিখার উপর মজবুত সেতু ছিল। পূর্বদিকের প্রবেশদ্বার থেকে কিছু দূরে দুর্গ-প্রাচীরের বাইরে সাধু ও তপস্বীদের বাসের জন্যে প্রশস্ত তপোবন ছিল। পূর্ব দ্বারের অপর দিকে ছিল শহরের পশ্চিম দ্বার। পশ্চিম দিক থেকে ঠাণ্ডা বাতাস এই দ্বার দিয়ে শহরে প্রবেশ করতো। পশ্চিম দ্বারের কাছে প্রাচীরের নিকটে ছিল বারনারীদের বাস-স্থান। তাদের শহরের অন্যান্য অংশে যাতায়াত করতে দেওয়া হতো না। শহরের এই অংশে দুটি প্রশস্ত রাস্তার ধারে নৃত্যশিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ ও শিল্পীদের বাসস্থান ছিল।

এই শহর ছিল বৃত্তাকার। শহরের প্রশস্ত প্রধান প্রধান রাস্তাগুলির দুই পাশে ছিল উঁচু ইমারত। রাজপ্রাসাদের চারধারের রাস্তা ও অন্যান্য রাস্তার ধারে জায়গায় জায়গায় আবর্জনা ফেলবার জন্যে ইঁটের তৈরী ও তার উপর চুনের প্লাষ্টার করা আধার থাকতো।

শহরে দুটি বাজার ছিল। একটিতে দিনের বেলায় বাজার বসতো। অপর বাজারটি রাত্রিবেলায় বসতো ও সারারাত্রি খোলা থাকতো। এই বাজার দুটি কাছাকাছি অবস্থিত হলেও দুটি পৃথক রাস্তার ধারে ছিল। এই বাজার দুটি ছাড়া অন্যান্য রাস্তাতেও রাস্তার ধারে ছোটখাটো ব্যব-সায়ী ও তাঁতীদের ছোট ছোট দোকান ছিল। বড় বাজারে রাস্তার দুই ধারেই দোকান ছিল। এগুলির মধ্যে পাল্কী, গরুর গাড়ী, রথ, সেগুলির চাকা ইত্যাদি তৈরি করবার কারখানাও ছিল। এসব ছাড়া পিতল ও তামার জিনিষ, হাতীর দাঁতের জিনিষ, কাজকর্মের যন্ত্রপাতিও তৈরি হতো। এই বাজারের কাছেই আলাদা আলাদা রাস্তায় স্বর্ণ-ব্যবসায়ী, স্বর্ণ-শিল্পী এবং মূল্যবান পাথরের ব্যবসায়ীদের কারখানা, খাদ্যশস্য, মরিচ, মশলা ইত্যাদির ব্যবসায়ীদের দোকানও ছিল। দোকানের সামনে খোলা জায়গায় এই সব খাদ্য-দ্রব্য রৌদ্রে স্তূপীকৃত করে রাখা হতো। আলো-বাতাসহীন অন্ধকার ঘরে মজুদ থেকে এই সব জিনিষ যাতে খারাপ হয়ে না যায়, সে জন্যে এই রকম ব্যবস্থা ছিল।

ভান্‌জি

চেরা রাজাদের প্রাচীন রাজধানী ভান্‌জি ছিল একটি দুর্গ-নগরী। নগরটি মাদুরার মত একই প্রথায় বিন্যস্ত এবং নগরের পরিখা, প্রাচীর, প্রাসাদ, বাজার, রাস্তাঘাট ইত্যাদি সব কিছুই ছিল।

নগর পরিখার বাইরে ছিল বন, যেখানে নগর রক্ষার কাজে নিযুক্ত সৈনিকেরা বাস করতো। বনের গাছগুলিতে জনসাধারণের হাত দেওয়া নিষিদ্ধ ছিল। দুর্গ-প্রাচীরের বাইরে ছিল পরিখা। রাজপ্রাসাদ, অন্যান্য ইমারত ও জনসাধারণের

বাসগৃহ থেকে পাইপ দিয়ে ময়লা জল প্রধান প্রবেশদ্বারের কাছে পরিখার মধ্যে নিষ্কাশিত হতো। পরিখায় মাছ ছাড়া হতো এবং পদ্মফুল ইত্যাদি জন্মানো হতো। ইট ও পাথর দিয়ে তৈরী দুর্গ-প্রাচীর ছিল মজবুত, চওড়া ও উঁচু। প্রাচীরের উপর আক্রমণকারী শত্রুর উপর নিক্ষেপ করবার জন্তে আক্রমণ ও আত্মরক্ষা করবার অস্ত্র-শস্ত্রাদি, যথা—তীর ও প্রস্তর নিক্ষেপের অস্ত্রশস্ত্র, ক্ষেপণাস্ত্র, গরম তেল, গলিত তামা ও লোহা ইত্যাদি রাখা থাকতো। প্রাচীরের কাছে সৈনিকদের ও প্রবেশদ্বারগুলির কাছে দ্বার-রক্ষীদের বাসস্থান ছিল। তার পরে ছিল সমান্তরালভাবে বিন্যস্ত নগরের সব রাস্তা। এখানে বিভিন্ন পেশার লোকেরা বাস করতো। এই স্থান ও নগরের মধ্যবর্তী অঞ্চলের মধ্যে ছিল প্রধান বাজার। বাজারের অপর দিকে নটি, তাঁতী, স্বর্ণব্যবসায়ী ও মূল্যবান প্রস্তরের ব্যবসায়ীদের বাসস্থান ছিল।

প্রাসাদের চারদিকের চারটি রাস্তার ধারে ব্রাহ্মণ, মন্ত্রী, সৈন্যাধ্যক্ষ ও প্রাসাদ-কর্মচারীরা বাস করতেন। প্রাসাদের পিছন দিকে হস্তী ও অশ্বদের শিক্ষাদানকারীদের বাসস্থান ছিল। এখানে প্রশস্ত রাস্তার ধারে যথেষ্ট খোলা জায়গা ছিল। এখানে হস্তী ও অশ্বদের শিক্ষা দেওয়া হতো। প্রাসাদ, হস্তী ও অশ্বপালকদের বাসস্থানের মধ্যে ছিল রাজপরিবারের ব্যবহারের জন্তে পুষ্করিণী। প্রাসাদের চারদিকে ফুল ও ফলের বাগান, পুষ্করিণী, জনসাধারণের জন্তে হলঘর ও বিশ্রামাগার ইত্যাদি বিন্যস্ত ছিল।

নগরের প্রধান প্রবেশদ্বারগামী রাজপথ ছিল সোজা ও প্রশস্ত। জনসাধারণের জন্তে নির্দিষ্ট বাসস্থানগুলিতে জায়গায় জায়গায় ফলের গাছের নীচে ছিল বেদী। এখানে সাধারণ লোকেরা বসে গল্প করতেন। সাধারণের জন্তে নির্দিষ্ট বাসস্থানের অঞ্চলগুলিতে জায়গায় জায়গায় ত্রিকোণাকার ও আয়তাকার খোলা জায়গা ছেড়ে রাখা ছিল।

উত্তর ভারতের মন্দির-নগরী

উত্তর ভারতের মন্দিরগুলির মধ্যে ভুবনেশ্বর, খাজুরাহো, গোয়ালিয়র, বৃন্দাবন, রাজপুতনা, গুজরাট ও পশ্চিম ভারতের মন্দিরগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভুবনেশ্বর

পূর্ব ভারতের উড়িষ্যার ভুবনেশ্বর ভগবান শিবের একটি মন্দির-নগরী। প্রধানতঃ এটি হিন্দুদেরই মন্দির-নগরী। কলকাতার 272 মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে মাদ্রাজ যাবার প্রধান রেলপথের উপর ভুবনেশ্বর রেল স্টেশন অবস্থিত। কালক্রমে প্রাচীন নগরীর বহু পরিবর্তন হয়েছে। এখন ভুবনেশ্বরে উড়িষ্যার নতুন রাজধানী স্থাপিত হয়েছে।

পুরাতন ভুবনেশ্বরে কলিঙ্গ স্থাপত্যের ভাস্কর্যের বহু নিদর্শন আছে। ভারতের অন্যান্য স্থানের মত এখানেও স্থাপত্য ও কলাশিল্প, ধর্মের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশে আছে।

ভুবনেশ্বরের বৃহৎ লিঙ্গরাজ মন্দির ও তার নিকটবর্তী মন্দিরগুলি সবই ভগবান মহাদেবের পূজার জন্তে তৈরি হয়েছিল। কেশরী বংশের এক রাজা এগুলি তৈরি করিয়েছিলেন। 1872 সালে হাণ্টার গণনা করে দেখেছিলেন যে, ভুবনেশ্বর ও তার আশেপাশে মোট প্রায় চার হাজার ছোট-বড় মন্দির ছিল। এখন কিন্তু নগরে প্রায় একশতটি মাত্র মন্দির আছে। এখনকার মন্দিরগুলির মধ্যে নবম শতাব্দীর নির্মিত মুক্তেশ্বর মন্দির সবচেয়ে সুন্দর।

এই প্রাচীন মন্দির নগরীটি মোটামুটি দুটি প্রধান রাস্তার ধারে লম্বালম্বিভাবে (Linear type) বিন্যস্ত। উত্তর থেকে দক্ষিণ পশ্চিমগামী একটি প্রধান রাস্তার আশেপাশে প্রধান প্রধান মন্দিরগুলি অবস্থিত। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে একত্রে অনেকগুলি মন্দির অবস্থিত আছে। এই অঞ্চলের

আগেই এই প্রধান রাস্তাটি থেকে আর একটি রাস্তা পূব দিকে চলে গেছে। এর কিছু দূরে পরশুরামেশ্বর মন্দির, কেদার-গৌরী ও মুক্তেশ্বর মন্দির নিয়ে কয়েকটি মন্দির অবস্থিত। পূব দিকে আরও কিছু দূরে রাজরাণী মন্দির অবস্থিত। উত্তর-দক্ষিণগামী প্রধান রাস্তাটি সুবিশাল বিন্দু সরোবরের পূব দিক দিয়ে 180 ফুট উঁচু লিঙ্গরাজ মন্দিরের সামনে দিয়ে চলে গেছে। প্রাচীন কালে এখানে এই রাস্তার পূর্ব দিকের অঞ্চলে মন্দিরের কাছাকাছি প্রধানতঃ পুরোহিতদের বাসস্থান ছিল। মন্দিরসংলগ্ন বিন্দু সরোবর এই মন্দির-নগরীর প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ ছিল। লিঙ্গরাজ ও পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মীয় কাজের জন্যে এবং নিকটবর্তী স্থানের স্থায়ী বাসিন্দাদের দৈনিক প্রয়োজনের জন্যে এই সুবৃহৎ বিন্দু সরোবরের জল অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। লিঙ্গরাজ মন্দির ও বিন্দু সরোবরের পশ্চিম দিকে বেতাল দেউল ও প্রাচীন শিশুপাল গড়ের সুরক্ষিত ধ্বংসাবশেষ আছে। এই অঞ্চলে মাঝে মাঝে সাধারণের বাসস্থানও আছে।

খাজুরাহো

মধ্যভারতের ছত্তরপুর জেলার হরপালপুর স্টেশন থেকে 61 মাইল দূরে খাজুরাহো অবস্থিত। এটি ছিল চাণ্ডেলা রাজাদের রাজধানী। এখানকার প্রায় আট বর্গমাইলব্যাপী ধ্বংসস্তূপ দেখে মনে হয় যে, এক সময় এটি একটি বড় শহর ছিল। এখন কিন্তু নিনোরা-তাল বা খাজুরাহো সাগর নামে একটি হ্রদের দক্ষিণ পূর্ব কোণে অবস্থিত খাজুরাহো একটি ছোট গ্রাম মাত্র।

নবম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত রাজপুত উপজাতির চাণ্ডেলারা বুন্দেলখণ্ডে রাজত্ব করেছিলেন। রাজা যশোবর্মণের সময় এঁরা খুব শক্তিশালী হয়েছিলেন। যদিও এই দুর্গ-নগরী অত্যন্ত সুরক্ষিত ও দুর্ভেদ্য ছিল, তবুও 1022 খৃষ্টাব্দে গজনীর মামুদের আক্রমণে এর পতন ঘটে। এরপর থেকেই খাজুরাহোর প্রাধান্য কমে যায়।

1335 খৃষ্টাব্দে পর্যটক ইবন-ই-বটুটা এই স্থানে আসেন। তাঁর লেখা থেকে জানা যায় যে, তখন এখানে প্রায় এক মাইল লম্বা একটি হ্রদ ছিল। এর ধারে অনেকগুলি মন্দির ছিল। এই মন্দিরগুলিতে বিগ্রহ স্থাপিত ছিল। হ্রদের মধ্যস্থলে তিনটি গম্বুজ ও প্রত্যেক কোণে একটি করে গম্বুজাকৃতি সৌধ ছিল। তাঁর লেখা থেকে সমসাময়িক শহরের আর কোনও বিবরণ পাওয়া যায় না।

এই প্রাচীন নগরটি প্রধানতঃ উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত ছিল। অন্যান্য মন্দির-নগরীর মত এরও একই রকমের বৈশিষ্ট্য ছিল। ধ্বংসস্তূপ থেকে অনুমান করা যায় যে, নগরের বেশীর ভাগ বসতি ছিল উত্তর দিকের অংশে। নিনোরা-তালের পাশাপাশি অংশ প্রশাসনিক, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পসংক্রান্ত কেন্দ্র ছিল বটে, কিন্তু এই ইমারতগুলিকে প্রাধান্য দেওয়া হয় নি। মনে হয়, বাণীগঞ্জ যাবার রাস্তার ধারে প্রাচীন রাজপ্রাসাদ অবস্থিত ছিল, কিন্তু সঠিকভাবে এর কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নি। প্রধান প্রধান মন্দিরগুলির বেশীর ভাগই রাস্তা দিয়ে যুক্ত ছিল। উত্তর দিকে পুরনো রাস্তার দুই ধারে অবস্থিত মন্দিরগুলি তিনটি সমষ্টিতে বিভক্ত। এই স্থানটির পশ্চিম দিকে প্রধান হিন্দুমন্দিরগুলি অবস্থিত। এদের মধ্যে কাণ্ডারীয় মহাদেব মন্দির সবচেয়ে উঁচু ও সুন্দর। এই স্থানের দক্ষিণ দিকে প্রাচীন নিনোরা-তাল। এটির দক্ষিণ পূর্বে আর একটি বৃহৎ পুষ্করিণীর ধারে খাজুরাহো গ্রাম ও তার দক্ষিণ দিকে জৈন মন্দিরগুলি অবস্থিত। এই মন্দিরগুলির মধ্যে আদিনাথ পার্শ্বনাথের মন্দির সবচেয়ে বড় ও সুন্দর। এই

স্থানটির দক্ষিণাংশেও কয়েকটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে।

950 থেকে 1050 খৃষ্টাব্দের মধ্যে তৈরী খাজুরাহোর মন্দিরগুলি মন্দির-স্থাপত্যকলার এক অপূর্ব নিদর্শন। এদের সৌন্দর্য ও সুনিপুণ ভাস্কর্য ভারতের অন্যান্য মন্দিরগুলির তুলনায় অনেক উৎকৃষ্ট। এখানকার মন্দিরগুলির একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। মন্দিরগুলি উঁচু চত্বরের উপর অবস্থিত। অন্যান্য জায়গার মন্দিরের মত চারদিকে প্রাচীর ঘেরা নয়। এখানে প্রথমে মোট 85টি মন্দির ছিল, কিন্তু এখন মাত্র কুড়িটি মন্দির অবশিষ্ট আছে।

জৈন মন্দির-নগরী

জৈনদের মন্দির-নগরীকে তীর্থ বলা হয়। এই মন্দির-নগরীগুলি বিশেষ কোনও রীতি অনুযায়ী বিন্যস্ত ছিল না। প্রধানতঃ পাহাড়ের উপর সমতল স্থানে মন্দির স্থাপনা করা হতো। কোনও কোনও তীর্থে কয়েক শত পর্যন্ত মন্দির ছিল। এই সব তীর্থে কেবলমাত্র মন্দিরই ছিল, কোনও লোক এখানে বাস করতো না। রাত্রিতে এই সব তীর্থ জনমানবশূন্য হয়ে যেত। কেবলমাত্র কয়েকজন রক্ষী ছাড়া আর কেউই রাত্রিবেলায় এই সব তীর্থে থাকতো না।

মাউণ্ট আবু

মাউণ্ট আবু জৈন মন্দির-নগরীর একটি বিশিষ্ট নিদর্শন। 1032 খৃষ্টাব্দে তৈরী এখানকার দিলওয়ারা মন্দিরের ভাস্কর্য ভারতবিখ্যাত। এই মন্দির সাদা মার্বেল পাথরের তৈরি। এর গম্বুজাকৃতি ছাদের ভিতরের দিকে সাদা মার্বেল পাথরে সূক্ষ্ম ও অতি মনোহর জালির মত কাজ করা আছে।

জৈনদের ধর্মীয় নগরগুলি সাধারণতঃ উঁচু পাহাড়ের উপর অবস্থিত হতো। মাউণ্ট আবুর দুটি মন্দির কাছাকাছি দুটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। মন্দির দুটির দক্ষিণ ও পশ্চিমে নীচু জমিতেও আরও নীচে 'নাকি হ্রদ'-এর ধারে বসবাসের স্থান আছে। ইংরেজ আমলে এই জায়গাটি সামরিক ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহৃত হতো। এখানকার পুরনো অংশগুলির প্রচুর সংস্কার ও পরিবর্তন করা হয়েছে। এখানকার পুরনো নগরী-বিন্যাসের বিশেষ কিছু বিবরণ পাওয়া যায় না।

সর্প-দংশনের চিকিৎসায় গাছগাছড়া

শ্রীঅবনীভূষণ ঘোষ

সর্প-দংশনের চিকিৎসা প্রসঙ্গে অনেককেই বলতে শুনি—মন্ত্রের কথা। মন্ত্রের কথা না হয় বাদ দিলাম, কিন্তু দ্রব্যগুণ ? দ্রব্যগুণ তো অস্বীকার করবার উপায় নেই! সত্যই এমন কেউ নেই, যে দ্রব্যগুণের কথা অস্বীকার করবে। কিন্তু ব্যাপারটা সেখানেই শেষ হয়ে যায় না। দ্রব্যের অন্তর্নিহিত গুণ এক কথা, আর দ্রব্যের রহস্যময় অলৌকিক গুণ আর এক কথা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শেষোক্ত অর্থেই দ্রব্যগুণ শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সেখানেই আপত্তি।

প্রচলিত ভেষজ দ্রব্যের মধ্যে গাছগাছড়াই প্রধান। বিভিন্ন গাছগাছড়ার নানা ধরণের রোগ সারাবার ক্ষমতা আছে। বস্তুতঃ আয়ুর্বেদশাস্ত্র গড়ে উঠেছে ভেষজ উদ্ভিদের গুণাগুণের উপর ভিত্তি করে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে—এমন কোন গাছ জানা আছে কিনা, যা সর্পবিষ নিবারক ক্ষমতা রাখে ? আয়ুর্বেদে উক্ত এবং সাধারণ্যে প্রচলিত বহু গাছের পক্ষে এই দাবী করা হয়। এই দাবীর পিছনে কোন সত্য আছে কি ? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার আগে আমাদের দেশে সাপ ও সর্প-দংশনকে ঘিরে যে রহস্যময়তা বিরাজ করছে, তার একটু আভাস দিই। সাধারণ লোকের কাছে—এমন কি, অনেক শিক্ষিত লোকের কাছেও সাপ একটি রহস্যময় জীব। সে জন্যে তার চিকিৎসাও হওয়া উচিত রহস্যময়। গাছগাছড়া দিয়ে চিকিৎসা করলে কি হবে, ঐ গাছগাছড়া কেউ পেয়েছেন হিমালয় থেকে আগত কোন সন্ন্যাসীর কাছ থেকে, কারও গাছগাছড়া স্বপ্ন-প্রদত্ত, কোন গাছগাছড়া বংশপরম্পরায় প্রাপ্ত—কোন্ সে অতীতে তা জানা গিয়েছিল, আজ তা রহস্যাবৃত। সর্পবিষ নিবারক গাছগাছড়ার সন্ধান পাওয়ার ব্যাপারে কেউ কেউ অবশ্য একটু বাস্তব ঘেঁষা কথাও বলে থাকেন। সাপে ও নেউলে লড়াই বেঁধেছিল। ঐ ব্যক্তি লক্ষ্য করলেন, লড়াইয়ের ফাঁকে ফাঁকে নেউলটি পাশের ঝোপে ঢুকে একটি গাছের শিকড় খেয়ে আসছে। শিকড়টি খাওয়াতে সাপ ছোবল দেওয়া সত্ত্বেও নেউলটির কিছু হচ্ছিল না। সেই গাছের শিকড় তিনি সংগ্রহ করে রেখেছেন। সমাজে মানসিক ব্যাধিপ্রবণ লোক থাকে। আধপাগলা বলে সাধারণতঃ এরা পরিচিত। রহস্যময়তা এদের আকর্ষণ করে। অনুরূপ অনেক ব্যক্তিকে—সর্পাঘাত চিকিৎসার ওষুধের সন্ধান পেয়েছে বলে দাবী করতে দেখেছি। তবে এরা গাছটির নাম প্রকাশ করতে চায় না। সর্পবিষ নিবারক গাছের সন্ধানে এদের কথায় বিশ্বাস করে অনেক বারই বেশ নাজেহাল হয়েছি।

সর্পাঘাতে মৃত্যু আকস্মিকভাবে হয়ে থাকে। সে জন্যে এই মৃত্যু খুবই বেদনাদায়ক। অসহায় মানুষ অগাধ জলে কুটো ধরবার প্রয়াস পায়। কেউ জোর করে বা কৌশল দেখিয়ে কোন গাছের সর্পবিষ নিবারক ক্ষমতা আছে বললে তার কথা সত্য বলে লুফে নিতে মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা যায়, ভেষজটি যে যথাযোগ্যভাবে পরীক্ষিত হওয়া দরকার, তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। সর্প-দংশনের জড়ি-বুটি বিক্রি বেদেদের পয়সা রোজগারের একটি বড় উপায়। বেদেদের কেউ সর্পাহত হলে তারা কেন ঐ জড়িবুটি ব্যবহার করে না ? এই প্রশ্নের উত্তরে তারা সাফাই দেয়, যার

জড়িবুটি, তার আধিব্যাধিতে তা কার্যকর হয় না।

এখন আমাদের মূল কথায় ফিরে আসা যাক—কোন গাছগাছড়ার সর্পবিষ নিবারক ক্ষমতা আছে কিনা? দুভার্গ্যবশতঃ এর উত্তর হচ্ছে—না। আজ পর্যন্ত এমন কোন ভেষজ উদ্ভিদ জানা যায় নি, যা সর্পবিষ নিবারণ করতে পারে। বোম্বাইয়ের হফ্‌কিন্স ইনস্টিটিউটের দু-জন বিশিষ্ট গবেষক—মাসঘর ও কেয়স—সর্পবিষ নিবারক বলে গণ্য বিভিন্ন আয়ুর্বেদ গ্রন্থে উক্ত এবং সাধারণ্যে প্রচলিত তিন শতাধিক ভেষজ উদ্ভিজ্জ ও বিচিত্র উপকরণে গঠিত প্রায় দুই শত সংমিশ্রণ প্রাণী-দেহে পরীক্ষা করে দেখেছেন, কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রেই তাঁরা নিরাশ হয়েছেন। সংশ্লিষ্ট উদ্ভিদের যে অংশ সর্পবিষ নিবারক বলে কথিত, গবেষকদ্বয় তা নিয়েই পরীক্ষা করেছেন। সাধারণতঃ গাছটির মূলের কথাই বলা হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে গাছটির বীজ, ফুল, ফল, পাতা, ছালের কথাও বলা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই সব পরীক্ষা যেমন জটিল, তেমনি ব্যয়সাধ্য। কিন্তু বিশিষ্ট গবেষকদ্বয় অতি ধৈর্যের সঙ্গে নিরলসভাবে পরীক্ষাগুলি চালিয়ে গেছেন—সর্পদষ্ট ব্যক্তিদের চিকিৎসার যদি কোন সুবিধা হয়। কিন্তু দুভার্গ্যবশতঃ তাঁরা কোন উদ্ভিদেরই সর্পবিষ নিবারক ক্ষমতা দেখতে পান নি। সাধারণের অবগতির জন্যে তাঁদের পরীক্ষিত কয়েকটি উল্লেখ্য উদ্ভিদের নাম দিলাম: সর্পগন্ধা বা ছোট চাঁদড় (Rauwolfia serpentina), ঈষর মূল (Aristolochia indica), দ্রোণপুষ্পী বা দণ্ডকলস (Leucas linifolia), অপরাজিতা (Clitoria ternatea), পাতাল-গরুড় (Corallocarpus epigoea), অপামার্গ (Achyranthes aspera), পুনর্নবা (Boerhaavia diffusa), আয়াপান (Eupatorium ayapana), মুথা (Cyperus rotundus), পলাশ (Butea frondosa), মনসা-সিজ (Euphorbia nerllfolia), কুম্ভী (Careya arborea).

একটি কথা এখানে স্মরণ করা যেতে পারে—সর্পবিষ দেহের রক্তের সঙ্গে মিশে সক্রিয় হয়। সুতরাং সর্পবিষ নিবারক গুণ আছে বলে গণ্য ভেষজটি সর্পদষ্ট ব্যক্তির রক্তে সরাসরি মিশ্রিত হওয়া কাম্য। মুখবিবর দিয়ে গৃহীত কোন ভেষজ হজম হয়ে রক্তে মিশ্রিত হবার আগেই সর্পবিষ তার কার্য সমাধা করতে পারে—সর্পাহত ব্যক্তিটি মারা যেতে পারে। অথচ সর্পবিষ নিবারক ক্ষমতা আছে বলে গণ্য অধিকাংশ গাছগাছড়াই মুখ দিয়ে গ্রহণের ব্যবস্থা রয়েছে। পরন্তু কর্ণ-কুহর, নাসা-ছিদ্র ও চক্ষু-গোলকেও ঐ সব ভেষজ দেবার ব্যবস্থা আছে। ইদানীং অবশ্য কেউ কেউ চিরাচরিত ব্যবস্থা পরিবর্তন করে সর্পক্ষত স্থানেই ভেষজটি লাগাবার কথা বলে থাকেন।

কেবল আমাদের দেশে নয়—পৃথিবীর অন্যত্র যে কোন সর্পসঙ্কুল অঞ্চলে কোন কোন উদ্ভিদকে সর্পবিষ নিবারক বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। কেন এরূপ মনে করা হয়, তার জন্যে কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক। আজকের মত অতীতের মানুষ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তত উন্নত ছিল না। সত্যাসত্য নির্ণয়ে তাদের প্রধান সম্বল ছিল অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতা সব সময়ে অভ্রান্ত হয় না। তাছাড়া আদিম মানবসুলভ চিন্তাধারাও প্রাচীন মানুষকে প্রভাবিত করেছিল। কোন দুটি বস্তুর সাদৃশ্য দেখলে আদিম মানুষ ভেবে নিত, ঐ দুই বস্তুর মধ্যে কোন না কোন ভাবে গূঢ় সম্পর্ক আছে—আজও কোন কোন মানুষ তাই ভেবে নেয়। ঈষর মূল চলমান সাপের চেহারার মত স্পষ্টতঃ আঁকা-বাঁকা; তাই সর্পবিষ নিবারক গুণ আছে বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। মনসা-সিজের আকারে সর্পাবয়বের সাদৃশ্য আছে। তাই তার মূলও সর্পবিষ নিবারক। উষ্ণমণ্ডলীয় আমেরিকা সর্পসঙ্কুল অঞ্চল। এখানকার কৃষ্ণ অহি-মূল (Cimicifuga

racenosa) সর্পবিষ নিবারক ক্ষমতাসম্পন্ন বলে গণ্য করা হয়, এরও মূলের আকৃতি চলিষ্ণু সাপের মত।

তবে একটি কথা। কোন কোন গাছগাছড়ার সর্পবিষ নিবারক ক্ষমতা আছে—এরূপ ভাবার পিছনে বাস্তব-ঘেঁষা যুক্তিও থাকতে পারে এবং আছেও। অতীতে মারাত্মক বিষধর সাপের দংশনে দেহে মৃত্যুকারক মাত্রায় বিষ প্রবেশ করলে মরণ ছিল অবধারিত, তার কোন চিকিৎসাই ছিল না। তবে সাপ দংশন করেছে বা করে নি, এই ভয়ে ভীত মানুষের দেহে কোন কোন ক্ষতিকারক লক্ষণ প্রকাশ পায়। অতীতে এদের ক্ষেত্রে ঐ সব গাছগাছড়া সাহায্য করতো—কার্যতঃ সাহায্য করতো বলে মনে করা হতো। কারণ এসব কোন কোন গাছের ঘর্মকারক, কোন কোন গাছের মূত্রকারক ক্ষমতা আছে; কোনটা বলকারক, কোনটা বা আরামদায়ক গুণসম্পন্ন।

এখনও একটি প্রশ্ন রয়ে যায়। সর্পবিষ নিবারক বলে গণ্য এই গাছগাছড়ার সাহায্যে আজও অনেক গুণিন সর্প-দংশনে প্রায় মৃত—এমন কি, মৃত ব্যক্তিকেও নাকি বাঁচিয়ে তুলছে, প্রত্যক্ষদর্শীরা এরূপ বিবরণ দেন। আমিও শুনেছি অনেক এই বিবরণ। প্রত্যক্ষদর্শীরা মিথ্যা কথা বলেন না। মৃত ব্যক্তি অবশ্য আর ফিরে আসে না। তবে "মৃত" বলে গণ্য বক্তি বেঁচে ওঠে—বেঁচে ওঠে গাছ-গাছড়ার সাহায্য ব্যতিরেকেই। আমাদের স্মরণ রাখা দরকার, বিষধর সাপ—এমন কি মারাত্মক বিষধর সাপ দংশন করলেই মানুষ মরতে বাধ্য নয়। মারাত্মক বিষধর সাপে দংশন করেছে, কিন্তু ঠিকমত দংশন করতে পারে নি। ঠিকমত দংশন করতে না পারায় মৃত্যুকারক মাত্রায় বিষ সর্পাহত ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করতে পারে নি। এমনও হতে পারে, সে সময় দংশক সাপটির বিষগ্রন্থিতে মৃত্যুকারক পরিমাণ বিষই ছিল না। নানা কারণে তা ঘটতে পারে। এসব ক্ষেত্রে বাহ্যতঃ ক্ষতিকারক লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লোকটি নিজের অন্তর্নিহিত জীবনীশক্তির জোরে—কখনও কখনও বা সামান্য সেবা-শুশ্রূষায় বেঁচে ওঠে। অপরপক্ষে এমন ঘটনাও দেখা যায়, বিষহীন সাপে কাউকে দংশন করেছে—হয়তো তাকে দংশন করতেও পারে নি, কিন্তু সাপে দংশন করেছে, এই ভয়েই লোকটি জ্ঞান হারিয়েছে। নিছক ভয়ে আপাত-দৃষ্টিতে যে মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে, তা আমরা সাধারণ লোক বুঝি না। এসব ক্ষেত্রেও রোগী শেষ পর্যন্ত নিজের অন্তর্নিহিত জীবনীশক্তির জোরে অথবা সামান্য সেবা-শুশ্রূষায় বেঁচে উঠতে পারে। গুণিনেরা দাবী করে, গাছগাছড়ার সাহায্যেই বেঁচে উঠেছে।

হ্যালোজেনগোষ্ঠীর আবিষ্কার

অরূপ রায়

মৌলিক পদার্থ নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরাস, আর্সেনিক ইত্যাদির মধ্যে বিভিন্ন রাসায়নিক ও ভৌত ধর্মের সাদৃশ বর্তমান থাকায় এই মৌলগুলিকে সমগোত্রীয় বা এক পরিবারের সভ্য বলা হয়। ফ্লোরিন (At. No. 9), ক্লোরিন (At. No. 17), ব্রোমিন (At. No. 35) ও আয়োডিন (At. No 53)—এই চারিটি মৌলের মধ্যেও ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য বর্তমান। তাই ইহাদেরও সম পরিবারভুক্ত বলা হয়। F, Cl, Br ও I মৌলগুলির লবণ সমুদ্রজলে পাওয়া যায় বলিয়া ইহাদের হ্যালোজেন (Halogen : Halo-sea salt, genas to produce) বলা হয়। তাই ইহাদের গোষ্ঠীকে হ্যালোজেন পরিবার বলে। উল্লেখযোগ্য যে, 100 gms. সমুদ্র জলে 2·6 gms. NaCl লবণ থাকে। হ্যালোজেন গোষ্ঠীর সভ্যদের আবিষ্কার দুই-একজন বৈজ্ঞানিকের দুই-এক দশকের সাধনার ফল নয়, ইহাদের আবিষ্কারের পিছনে বহু বিজ্ঞানীর প্রায় আড়াই শত বৎসরের পরিশ্রমের ইতিহাস জড়িত।

ফ্লোরিন গ্যাসটির রাসায়নিক সক্রিয়তা ও জারণ-ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য। গ্যাসটির আবিষ্কারের পিছনে রহিয়াছে শত বর্ষাধিকব্যাপী গবেষণার কাহিনী। ফ্লোরিন আবিষ্কারের বহু পূর্বেই ইহার যৌগ হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড (HF)-এর সন্ধান পাওয়া যায়। 1771 সালে সুইডিশ বিজ্ঞানী শীলে ফ্লুয়োর্স্পার খনিজকে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডের সহিত পাতিত করিয়া HF অ্যাসিড তৈরি করিতে সক্ষম হন। তিনি উহার নামকরণ করেন ফ্লোর অ্যাসিড। কিন্তু গ্যাসটি যৌগিক কি মৌলিক—তাহা নিরূপণে অসমর্থ হন। অর্ধশতাব্দী পরে শীলের প্রস্তুত গ্যাসটি সম্পর্কে বৃটিশ বিজ্ঞানী স্যার হাম্‌ফ্রে ডেভি 1831 সালে নূতন করিয়া আলোকপাত করেন। ডেভিই প্রমাণ করেন যে, হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিডের ন্যায় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডও হাইড্রোজেন ও অপর একটি মৌলের যৌগ। তিনি মৌলটির নাম রাখেন ফ্লোরিন। কিন্তু ডেভি HF হইতে ফ্লোরিন মৌল অবস্থায় আলাদা করিতে ব্যর্থ হন। তাঁহার পরবর্তী বৈজ্ঞানিকগণ কর্তৃক ফ্লোরিন আবিষ্কারের চেষ্টাও বিফলতায় পর্যবসিত হয়। কারণ ফ্লোরিন প্রস্তুতিতে বাধা প্রচুর যথা—

1) ফ্লোরিন সর্বোচ্চ ইলেকট্রো-নেগেটিভ মৌল বলিয়া ইহা একটি তীব্র জারক পদার্থ। সুতরাং HF-কে জারিত করিয়া ফ্লোরিন প্রস্তুত সম্ভব নয়।

2) HF-এর জলীয় দ্রবণ তড়িৎ-বিশ্লেষিত করিলে অ্যানোডে উৎপন্ন ফ্লোরিন জলের সহিত বিক্রিয়া করিয়া অক্সিজেন ও জল উৎপন্ন করে। $2F_2+2H_2O=4HF+O_2$, $3F_2+3H_2O=6HF+O_3$.

3) অনার্দ্র HF তড়িৎ-অপরিবাহী, সুতরাং ইহার তড়িৎ-বিশ্লেষণ সম্ভব নয়।

4) ইহা খুব সক্রিয় মৌল বলিয়া প্রস্তুত করিবার পাত্রের সঙ্গেই (যেমন—কাচ, কার্বন, প্ল্যাটিনাম ইত্যাদি) উৎপন্ন ফ্লোরিন বিক্রিয়া করে।

5) ফ্লোরিন ও HF খুব বিষাক্ত।

6) HF অত্যন্ত উদ্বায়ী, ইহার স্ফুটনাঙ্ক 9·5 সে., তাই তড়িৎ-বিশ্লেষণের সময় হিমায়ক পদার্থের (Refrigerant) প্রয়োজন। উপযুক্ত হিমায়ক পদার্থের সেই কালে অভাব ছিল।

এই সকল কারণগুলির জন্ম 1886 সাল পর্যন্ত মৌলরূপে ক্লোরিনের উৎপাদন সম্ভব হয় নাই। 1869 সালে বিজ্ঞানী গোর অনার্দ্র HF-এর সহিত 20% পটাসিয়াম হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড (KHF_2) মিশ্রিত করিয়া উহাকে তড়িৎ-পরিবাহী করিতে সক্ষম হন। 1886 সালে ফরাসী বিজ্ঞানী ময়সাঁ উক্ত অনার্দ্র HF ও KHF_2-এর মিশ্রণ বিশেষভাবে প্রস্তুত যন্ত্রে তড়িৎ-বিশ্লেষণ করিয়া সর্বপ্রথম মৌল হিসাবে ফ্লোরিন প্রস্তুত করিবার গৌরব লাভ করেন। তিনি তড়িৎ-বিশ্লেষণের পাত্র হিসাবে প্ল্যাটিনাম-ইরিডিয়াম সঙ্কর ধাতু-নির্মিত পাত্র ব্যবহার করেন। সঙ্কর ধাতুটি ফ্লোরিনের দ্বারা অনাক্রান্ত। হিমায়ক দ্রব্য হিসাবে ব্যবহার করেন মিথাইল ক্লোরাইড (CH_3Cl)। এইভাবে দীর্ঘ এক শত বৎসরের অধিককাল চেষ্টার ফলে ফ্লোরিন আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

হ্যালোজেন পরিবারের দ্বিতীয় সভ্য ক্লোরিন। ইহার আবিষ্কারও এক বিরাট ইতিহাস বহন করে। বিজ্ঞানী গ্লবার সপ্তদশ শতাব্দীতে সমুদ্রের জলকে বাষ্পীভূত করিয়া প্রাপ্ত লবণকে গাঢ় H_2SO_4 দ্বারা পাতিত করিয়া একপ্রকার গ্যাস পান। উহার নামকরণ করেন তিনি 'লবণের গ্যাস'। 1772 সালে বৃটিশ বিজ্ঞানী প্রিস্টলী লক্ষ্য করেন যে, গ্যাসটি জলে অত্যন্ত দ্রবণীয় এবং দ্রবণটি অম্লাত্মক। তিনি উহাকে সামুদ্রিক অ্যাসিড বা মিউরিয়াটিক অ্যাসিড বলেন। ইহার দুই বৎসর পরে অর্থাৎ 1774 সালে শীলে ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইডকে মিউরিয়াটিক অ্যাসিড সহযোগে উত্তপ্ত করিয়া একটি ফিকে হরিদ্রাভ সবুজ রঙের গ্যাস পান। মিউরিয়াটিক অ্যাসিডের জারিত পদার্থ মনে করিয়া ইহার নাম দেওয়া হয় অক্সি-মিউরিয়াটিক অ্যাসিড। ফরাসী বিজ্ঞানী ল্যাভয়-সিয়ার বলিলেন—গ্যাসটি একটি অক্সাইড। সহযোগী ফরাসী বিজ্ঞানী বার্থোলে শীলের প্রাপ্ত হরিদ্রাভ সবুজ গ্যাসটি জলের মধ্যে দ্রবীভূত করিয়া সেই দ্রবণে সূর্যরশ্মি ফেলিয়া দেখিলেন যে, দ্রবণ হইতে অক্সিজেন উৎপন্ন হইতেছে। বার্থোলের পরীক্ষায় অক্সিজেন উৎপন্ন হয় সত্য, কিন্তু উহা আসে জল হইতে, শীলের প্রাপ্ত গ্যাস হইতে নয়। 1781 সালে ক্যাভেণ্ডিস প্রথম প্রমাণ করেন, জল হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের যৌগ। বার্থোলে জলকে যৌগ হিসাবে ধরিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন ল্যাভয়সিয়ারের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত। ইহার পর প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর আর কোন উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা গ্যাসটির উপর হয় নাই। 1810 সালে বৃটিশ বিজ্ঞানী হামফ্রে ডেভি ভাবেন—শীলের প্রস্তুত গ্যাসটি যদি প্রকৃতই একটি অক্সাইড হয়, তবে গ্যাসটির মধ্যে কার্বন, সালফার বা ফস্‌ফরাস পোড়াইলে নিশ্চয়ই উহাদের অক্সাইড উৎপন্ন হইবে। তিনি পরীক্ষা চালাইয়া দেখেন যে, কোন ক্রমেই এইভাবে অক্সাইড তৈয়ারী করা যায় না। তিনিই সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন যে, এই তথাকথিত অক্সি-মিউরিয়াটিক অ্যাসিড একটি মৌলিক পদার্থ। সবুজ বর্ণের জন্ম ডেভি ইহার নাম দেন ক্লোরিন (গ্রীক Chloros—ফিকে সবুজ)। তাহার পর তিনি প্রমাণ করেন, মিউরিয়াটিক অ্যাসিড ক্লোরিন ও হাইড্রোজেনের যৌগ এবং নাম দেন হাইড্রোজেন ক্লোরাইড ও উহার জলীয় দ্রবণের নাম দেন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। অতএব ক্লোরিন আবিষ্কারের প্রধান কৃতিত্ব বিজ্ঞানী শীলের এবং ইহাকে একটি মৌলিক পদার্থ হিসাবে প্রমাণিত করিবার গৌরব বিজ্ঞানী ডেভির।

ফ্লোরিন ও ক্লোরিন গ্যাসের আবিষ্কারের ইতিহাস সুদীর্ঘ হইলেও হ্যালোজেন গোষ্ঠীর অপর দুই সভ্যের আবিষ্কারের ইতিহাস খুব দীর্ঘ নয়।

হ্যালোজেন পরিবারের তৃতীয় সভ্যের আবি-ষ্কারের গৌরব বিজ্ঞানী ব্যালার্ডের 1826 সালে। সমুদ্রজল হইতে সাধারণ লবণ (NaCl) কেলাসিত করিয়া লইবার পর যে শেষ দ্রব পড়িয়া থাকে, তাহার মধ্যে ক্লোরিন গ্যাস পরিচালনা করিয়া

তিনি একটি তীব্র গন্ধযুক্ত গাঢ় রক্তিম বর্ণের পদার্থ আবিষ্কার করেন। তীব্র গন্ধের জন্য পদার্থটির নাম হয় ব্রোমিন।

বিজ্ঞানী কুর্তোয়া 1812 সালে চতুর্থ হ্যালোজেন আয়োডিন আবিষ্কার করেন। সামুদ্রিক উদ্ভিদ-ভস্মকে সাধারণতঃ কেল্প বলে। কুর্তোয়া এই কেল্পকে গাঢ় H_2SO_4 অ্যাসিডসহ উত্তপ্ত করিয়া সুন্দর বেগুনী রঙের একপ্রকার গ্যাস পান। বস্তুতঃ ইহাই আয়োডিন। আয়োডিন যে মৌলিক পদার্থ, তাহা প্রমাণ করেন বিজ্ঞানী ডেভি ও গে-লুসাক। ডেভি হাইড্রো-আয়োডায়িক (HI) অ্যাসিডও আবিষ্কার করেন। সুন্দর বেগুনী বর্ণের জন্য মৌলটির নাম হয় আয়োডিন।

হ্যালোজেন পরিবারের আরেকটি মৌলের নাম অ্যাসটেটাইন। ইহা তেজস্ক্রিয়তা উৎপাদক ও অস্থায়ী।

সংক্ষিপ্তভাবে ইহাই হইল হ্যালোজেন পরিবারভুক্ত সভ্যদের আবিষ্কারের কাহিনী।

সঞ্চয়ন

ভারত প্রভৃতি রাষ্ট্রে কৃষি-বিপ্লব

সাম্প্রতিক কালে পৃথিবীর বহু দেশে কৃষিশস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটেছে। নতুন ধরণের ধান ও গম উদ্ভাবিত হওয়ায় এবং উন্নততর পদ্ধতিতে চাষ-আবাদের ফলে নানা দেশে ফসল উৎপাদনের পরিমাণ এরূপ বৃদ্ধি পেয়েছে যে, এরকম বৃদ্ধি এর আগে আর দেখা যায় নি। ভারতের বিহারে খাদ্যাভাব প্রায় লেগেই থাকতো। ঐ রাজ্যে যেখানে পূর্বে প্রতি একর জমিতে 720 পাউণ্ড গম উৎপন্ন হতো, আজ সেখানে এক নতুন ধরণের গম চাষের ফলে 1300 পাউণ্ডেরও বেশী গম উৎপন্ন হচ্ছে। সিংহলে গত দু-বছরে ধান্যোৎপাদন বেড়েছে শতকরা 34 ভাগ। তুরস্কে যেখানে প্রতি একর জমিতে মাত্র 22 বুশেল গম উৎপন্ন হতো, সেখানে বর্তমানে 52 বুশেল গম উৎপন্ন হচ্ছে। পশ্চিম পাকিস্তান ছিল চিরকালের খাদ্যাভাবগ্রস্ত অঞ্চল। সেখানে বাইরে থেকে খাদ্য আমদানী করে এই অভাব মেটাতে হতো। বর্তমানে ঐ এলাকাও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

আমেরিকার রকফেলার ফাউণ্ডেশন এই নতুন ধরণের গম ও ধান উদ্ভাবনে বিভিন্ন দেশের শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে গত পঁচিশ বছরের মধ্যে প্রচুর সাহায্য করেছে। এক্ষেত্রে তাদের বহু অবদান রয়েছে।

ফাউণ্ডেশনের প্রেসিডেন্ট ডাঃ জে. জর্জ হারার তথাকথিত এই সবুজ বিপ্লব সম্পর্কে সম্প্রতি বলেছেন যে, পৃথিবীর নানা দেশের খাদ্যোৎপাদন বহুল পরিমাণে বৃদ্ধির ফলে বিপ্লব ঘটলেও এই দুনিয়ায় এখনও 150 কোটি লোক খেতে পায় না, প্রতিদিনই অপুষ্টির জন্য দশ হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তারপর কোন কোন অঞ্চলে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব রয়েছে। কিন্তু সেই সব অঞ্চলে জনসংখ্যা দিন দিন বেড়েও যাচ্ছে। ফলে খাদ্যাভাব দূর হচ্ছে না, অবস্থা আরও সঙ্গীন হয়ে পড়ছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা, স্থিতিশীলতা বজায় রাখা যে একান্ত কর্তব্য, এই বিষয়ে ঐ সকল অঞ্চলবাসী এবং তাদের সরকার অবহিত না হলে, কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন না করলে অবস্থার আরও অবনতি ঘটবে।

1970 সালে রকফেলার ফাউণ্ডেশনের যে সকল কাজকর্ম হয়েছে, সে বিষয়ে একটি প্রতিবেদন সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। ডাঃ হারার এই প্রতিবেদনেই এই সকল কথা লিখেছেন।

তিনি এই প্রসঙ্গে খাদ্যবন্টন এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ—এই দুটি নিদারুণ সমস্যার কথা স্বীকার করেছেন। কিন্তু তিনি আরও বলেছেন যে, পরবর্তী তিন দশকের মধ্যে দুনিয়ার সকল মানুষের উপযোগী যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্যোৎপাদনের ক্ষমতা বর্তমান পৃথিবীর রয়েছে। তবে তার জন্যে 1970 সালে যে পরিমাণ খাদ্য উৎপন্ন হয়েছে, তার তিন থেকে চারগুণ বেশী খাদ্য উৎপাদন করতে হবে।

সবুজ বিপ্লব ধনীকে আরও ধনী এবং দরিদ্রকে আরও দরিদ্র করেছে—এই অভিযোগ সম্পর্কে ডাঃ হারার বলেছেন যে, পল্লীর প্রগতিশীল বর্ধিষ্ণু কৃষকেরাই প্রথম নতুন বীজ রোপণের এবং নতুন পদ্ধতিতে চাষ করবার সুযোগ নিয়েছে। ছোটখাটো কৃষকেরা পরে তাদের অনুসরণ করেছে। ভারতে প্রায় আড়াই কোটি খামার এই সবুজ বিপ্লবের ফলে উপকৃত হয়েছে। এর মধ্যে শতকরা 62টিতে জমির পরিমাণ ছিল পাঁচ একর অথবা তারও কম।

নতুন পদ্ধতিতে চাষ-আবাদের ফলে পল্লীঅঞ্চলে বেকার সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে বলেও অনেকে বলে থাকেন। ডাঃ হারার এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, সবুজ বিপ্লব নয়, জনসংখ্যা বৃদ্ধিই এই বেকার সমস্যার কারণ। নতুন ধরণের বীজ রোপণের ফলে ভারতের উত্তর প্রদেশে এবং ফিলিপাইনসে কাজকর্মের ক্ষেত্র বহুল পরিমাণে প্রসারিত হয়েছে, ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিমাণ এবং ভোগ্যপণ্যের লেনদেন বেড়ে গেছে। নতুন ধরণের শস্যের চাষে পরিশ্রম অনেক বেশী করতে হয়। তার জন্যে প্রয়োজন হয় উপযুক্ত বীজ, সার, চাষ-আবাদের সাজসরঞ্জাম, উপযুক্ত পরিমাণ কৃষিঋণ ও বন্টন ব্যবস্থার। তারপর ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে সেই অঞ্চলে সমৃদ্ধি আসে, নতুন নতুন কাজ কর্মের সৃষ্টি হয়, ব্যবসা-বাণিজ্য বেড়ে যায়। সুতরাং সবুজ বিপ্লবের ফলে বেকারীর বৃদ্ধি হয় নি, বরং নতুন নতুন কাজ-কর্মের সৃষ্টি হয়েছে।

অনেকে এই প্রসঙ্গে আরও বলে থাকেন যে, এর ফলে বাজারের চাহিদার তুলনায় অতিরিক্ত খাদ্যশস্য সরবরাহ করবার সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। ডাঃ হারার এর উত্তরে বলেছেন যে, এরকম কোন সমস্যার সৃষ্টি হয় নি। ভারত প্রভৃতি রাষ্ট্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধিই আসল সমস্যা। বর্তমানে যে হারে জনসংখ্যা ঐ সকল দেশে বাড়ছে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে দুর্ভিক্ষের কবল থেকে রক্ষা পেতে হলে ঐ সকল দেশে 1985 সালের মধ্যে খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণ শতকরা 80 ভাগ বাড়াতে হবে।

ডাঃ হারার ঐ প্রতিবেদনের উপসংহারে বলেছেন যে, কৃষি-বিপ্লবে সুফল সকলেই যাতে পেতে পারে, তার জন্যে ছোটখাটো কৃষকেরা যাতে অধিকতর পরিমাণে কৃষিঋণ পায় এবং শস্যের বাজার দরের ওঠা-নামার জন্যে তারা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তার ব্যবস্থা করতে হবে এবং কৃষিপণ্যের কেনাবেচা ও বন্টনের সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্র আরও প্রসারিত ও আরও উন্নত করতে হবে। তাছাড়া কৃষি উৎপাদনের নতুন পদ্ধতি নতুন নতুন ক্ষেত্রে প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে, কৃষি সম্প্রসারণে কর্মীদের কাজে লাগাতে হবে, কৃষকদের কঠোর পরিশ্রমী হতে হবে এবং পল্লী অঞ্চলে ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্যে উদ্যোগী হতে হবে।

আমেরিকার মহাকাশ কার্যসূচী

জুলাই (1971) থেকে 1972 সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত অ্যাপোলো 15, অ্যাপোলো 16 এবং অ্যাপোলো 17 আমেরিকার এই তিনটি চন্দ্রাভিযান পরিকল্পনা রূপায়িত হবে বলে স্থির হয়েছে। গত 26শে জুলাই অ্যাপোলো 15 চন্দ্রাভিযান সুরু করেছে এবং আগামী বছরের (1972) মার্চ মাসে অ্যাপোলো 16 এবং ঐ বছরের ডিসেম্বর মাসে সুরু হবে অ্যাপোলো 17-এর অভিযান। এই তিনটি অভিযানের পর চন্দ্রলোকে তথ্যানুসন্ধানী অভিযান চালানোর পরিকল্পনা অ্যাপোলো কার্যসূচীর পরিসমাপ্তি ঘটবে।

তারপরে সুরু হবে মহাশূন্যে গবেষণাগার বা স্কাইল্যাব ও মহাকাশকেন্দ্র বা স্পেস স্টেশন স্থাপনের এবং পৃথিবী ও মহাকাশের মধ্যে যাতায়াতের জন্যে বিশেষ ধরণের মহাকাশযান নির্মাণের প্রস্তুতি, অজানাকে জানবার জন্যে বৃহত্তর মহাকাশ পরিকল্পনার রূপায়ণ।

মহাশূন্যের গবেষণাগার বা স্কাইল্যাব—বর্তমানে আমেরিকার আলাবামা রাজ্যের হান্টসভিলের মার্শাল স্পেসক্লাইট সেন্টারের সুউচ্চ বিশাল ভবনে এই গবেষণাগার নির্মাণের কাজ চলছে। মহাশূন্যের এই গোলাকার গবেষণাগারে বা স্কাইল্যাবে আসবাবপত্র, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম বসানো হচ্ছে।

1973 সালের মার্চ মাসে এই গবেষণাগারটি পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করা হবে। এটি হবে পাঁচ কামরা বিশিষ্ট একটি বেশ বড় বাড়ী। এতে তিনজন মানুষের উপযোগী একটি শয়ন ঘর, একটি রান্না ঘর, একটি স্নানের ঘর এবং একটি বড় গবেষণাগার থাকবে অর্থাৎ মহাশূন্যে বসবাসের এবং কাজ করবার সকল রকম সুযোগ-সুবিধাই এতে থাকবে।

সম্প্রতি সোভিয়েট রাশিয়া স্যালিউট-সয়ুজ 11 কসমোড্রোম নামে যে গবেষণাগারটি পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করেছিল, তার সঙ্গে অনেকেই এই স্কাইল্যাবের তুলনা করে থাকেন। সোভিয়েটের ঐ মহাশূন্যের গবেষণাগারেও বসবাসের এবং কাজকর্ম করবার জন্যে পৃথক পৃথক কামরা ছিল। 40 ফুটের মত জায়গা নিয়েছিল ঐ সকল কামরা এবং বাসগৃহ। গবেষণাগার প্রভৃতি সবকিছু নিয়ে কসমোড্রোমের ওজন 28 টন। কিন্তু স্কাইল্যাবের মোট ওজন 90 টন এবং মহাকাশচারীদের জন্যে তাতে জায়গা থাকবে কসমোড্রোমের তুলনায় তিনগুণ বেশী।

মহাকাশে স্থাপিত কৃত্রিম উপগ্রহের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির সাহায্যে আবহাওয়া সম্পর্কে নানা তথ্য, যেমন—সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা, সমুদ্রে স্রোতের পরিমাণ প্রভৃতি তথ্যাদি পৃথিবীতে সরবরাহ করা হয়। ঐ সকল উপগ্রহের যন্ত্রপাতি ভূগর্ভে সঞ্চিত ধাতব সম্পদ এবং সামুদ্রিক মৎস্যের সন্ধান দিয়ে থাকে। তাছাড়া কৃষি এবং ধনসম্পদ সম্পর্কে নানা তথ্যও ঐ সকল যন্ত্রপাতি পৃথিবীতে সরবরাহ করে। ঐ সকল সাজসরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতি ঐ গবেষণাগার বা স্কাইল্যাবে থাকবে। স্কাইল্যাবের বিজ্ঞানীরা ঐ সকল যন্ত্রপাতির কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখবেন এবং এজন্যে পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলবেন। ঐ সকল যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করে দেখা এবং সংশোধনের পর স্বয়ংক্রিয় কৃত্রিম উপগ্রহে ঐ সকল তথ্যসন্ধানী যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হবে।

পৃথিবীর আবহমণ্ডলের জন্যে অতি শক্তিশালী দূরবীক্ষণের সাহায্যেও সূর্যের সম্পর্কে সঠিক তথ্য ও চিত্রাদি গ্রহণ সম্ভব হয় না। স্কাইল্যাব থাকবে পৃথিবীর আবহমণ্ডলের বহু ঊর্ধ্বে এবং তাতে থাকবে অতি শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্র। ঐ যন্ত্রের

সাহায্যে এই পৃথিবীর শক্তির প্রধান উৎস সূর্য সম্পর্কে বহু তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হবে, আবহাওয়া সৃষ্টিতে সূর্যের প্রভাব এবং পৃথিবীর অবস্থা সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যাবে।

সূর্যের মধ্যে অনন্ত শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে কি প্রক্রিয়ায়? এই তথ্যানুসন্ধানের ফলে তা জানা গেলে পৃথিবীতে সেই প্রক্রিয়ায়ই সস্তায় ও সহজে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা সম্ভব হতে পারে।

ভারশূন্য পরিবেশে গলিত পদার্থসমূহ সমানভাবে ঘনীভূত ও বিস্তৃত হয়ে থাকে। পৃথিবীতে কিন্তু তা হয় না। এখানে বহু রকমের পদার্থের যখন মিশ্রণ করা হয়, তখন ভারী পদার্থসমূহ তলায় এসে জমা হয়। মহাশূন্যে তা হবে না। তাই মহাশূন্যের পরিবেশে নানা বস্তুর নির্মাণ সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হবে।

ভারশূন্য অবস্থায় বেশী দিন থাকলে মানবদেহের উপর কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে, সে বিষয়েও ঐ গবেষণাগারের মহাকাশচারীদের মাধ্যমে অনেক কিছু জানা যাবে। তাদের স্বাস্থ্য ও রোগ সম্পর্কে এর মাধ্যমে যে সকল তথ্য সংগৃহীত হবে, তা ভবিষ্যতে গ্রহান্তর যাত্রার উপযোগী মহাকাশযান নির্মাণের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হবে। এই সকল তথ্যের ভিত্তিতে সুদীর্ঘ গ্রহান্তর যাত্রায় মহাকাশযাত্রীদের স্বাস্থ্যের উপযোগী মহাকাশযান নির্মাণ সম্ভব হবে।

যাত্রীবাহী মহাকাশযান—এছাড়া ছোট যাত্রীবাহী মহাকাশযান নির্মাণেরও পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই সকল যান মহাকাশকেন্দ্র বা স্পেস স্টেশনে ও মহাকাশস্থিত গবেষণাগারে যাত্রী ও গবেষকদের পৌঁছে দিবে। দু-জন চালক, বারোজন যাত্রীকে ঐ সকল মহাকাশযানে পৃথিবীর কক্ষপথ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারবেন। ঐ সকল যান সোজাসুজি রকেটের মত মহাকাশ অভিমুখে উঠে যাবে। তারপর পৃথিবীর সমান্তরালভাবে বিমানের মত চলবে। বিজ্ঞানীরা ঐ সকল যান থেকে গবেষণা চালাতে পারবেন এবং তাদের পক্ষে সাতদিন পর্যন্ত ঐ যানে অবস্থান করা সম্ভব হবে। তারপর তারা পৃথিবীস্থিত গবেষণাকেন্দ্রসমূহে ফিরে আসবেন।

ভবিষ্যতে নানাদিক থেকেই এই সকল যাত্রীবাহী মহাকাশযান খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে। বর্তমানে কোন রকেট বা মহাকাশযানকে একবারের বেশী মহাকাশে প্রেরণ করা যায় না। কিন্তু এই সকল মহাকাশযান একশো বারেরও বেশী পৃথিবী ও মহাকাশের মধ্যে চলাচল করতে পারবে। ফলে মহাকাশযাত্রার খরচ খুবই হ্রাস পাবে। তখন বর্তমানে যা খরচ পড়ে, তার দশভাগের একভাগ খরচে মহাকাশ সফর করে আসা যাবে।

এছাড়া ঐ সকল মহাকাশযানের যে অংশে মালপত্র থাকে, সেই অংশ থেকে স্বয়ংক্রিয় তথ্যসন্ধানী উপগ্রহও মহাকাশে ছাড়া যাবে। এখন পৃথিবী থেকে রকেটের সাহায্যে এই সকল উপগ্রহ মহাকাশে প্রেরিত হয়ে থাকে।

এই সকল মহাকাশযান মহাকাশে বহু রকমের ভূমিকাই গ্রহণ করবে। মহাকাশে পৃথিবী প্রদক্ষিণরত কোন উপগ্রহের ব্যাটারী নষ্ট হয়ে গেলে অথবা যন্ত্রপাতি বিকল হয়ে গেলে ঐ মাল ও যাত্রী চলাচলকারী মহাকাশযান ব্যাটারী বদল করে দিয়ে আসবে, নষ্ট যন্ত্রপাতি সারাবে এবং ইন্ধন ফুরিয়ে গেলে নতুন ইন্ধন সরবরাহ করবে। কেবল তাই নয়, কোন মহাকাশযান অকেজো হয়ে গেলে, মহাকাশে কোন নষ্ট যন্ত্রপাতি সারানো সম্ভব না হলে, সেই মহাকাশযানটিকেও এই চলাচলকারীযান পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। তবে মহাকাশে এর কাজ হবে খেয়াতরীর মত বা ট্যাক্সির মত। এই সকল যান পৃথিবী ও আধাস্থায়ী মহাকাশকেন্দ্রের মধ্যে যাত্রী ও

মাল পারাপার করবে—এই হবে এদের প্রধান ভূমিকা।

ঐ সকল মহাকাশকেন্দ্র বহু বছর ধরে পৃথিবীর কক্ষপথে থেকে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করবে। আর এই সকল যান ট্যাক্সি ও বাসের মত যাত্রী, নানা কাঁচা মাল ও উপকরণ ঐ সকল কেন্দ্রে পৌঁছে দেবে। তারপর ঐ সকল কেন্দ্রে যে সকল গবেষণা হবে, ঐ সকল কাঁচামাল দিয়ে যে সকল উপকরণ তৈরি হবে, সে সকল নিয়ে আসবে পৃথিবীতে।

মহাকাশকেন্দ্র বা স্পেস স্টেশন—মহাকাশের ঘাঁটি বা স্পেস স্টেশনসমূহ গোলাকার বহু অংশ জুড়ে তৈরি হবে। প্রত্যেকটি অংশ হবে একটি বাড়ীর মত। একটি অংশের সঙ্গে আর একটির যোগ থাকবে, যেমন বড় বড় অফিসে থাকে, সঙ্কীর্ণ পথের মাধ্যমে। প্রত্যেকটি অংশকে বলা হবে মডিউল। বিভিন্ন অংশের বা মডিউলের কাজ হবে বিভিন্ন রকম। কোন অংশে হয়তো থাকবে পৃথিবীর সম্পদ-সন্ধানী যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম, কোন অংশে গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কে তথ্য-সন্ধানী শক্তিশালী দূরবীক্ষণ ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি। আর কোন অংশে হয়তো থাকবে ওষুধপত্র, প্লাস্টিক এবং ধাতুনির্মিত নানা উপকরণ ও লেন্স তৈরির কারখানা। সেই কারখানায় ভারশূন্য পরিবেশে বহু নতুন ধরণের জিনিষপত্র তৈরি হবে। রসায়ন, পদার্থ ও জীববিজ্ঞান সম্পর্কে গবেষণার জন্যেও সেখানে পৃথক পৃথক গবেষণাগার থাকবে। আর কোন অংশে থাকবে গ্রন্থাগার, প্রেক্ষাগৃহ ও ব্যায়ামাগার। এক-একটি কেন্দ্র হবে এক-একটি ছোট সহর।

সেখানে কাজকর্ম পালাক্রমে নির্বাহিত হবে। বিজ্ঞানী ও শ্রমিকেরা সপ্তাহান্তে বা ছুটিতে পৃথিবীতে ফিরে আসবেন। যাত্রীবাহীযানই তাদের পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে।

স্কাইল্যাব যে দিন মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হবে, তারপর থেকে অ্যাপোলো পরিকল্পনার নাম আর শোনা যাবে না। তাহলেও অ্যাপোলো পরিকল্পনাই মানুষের মহাকাশ যাত্রার পথ রচনা করেছে বলে মানুষের গ্রহান্তরে প্রথম পদক্ষেপের কাহিনী ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে থাকবে।

বিশ্ব-জ্যামিতি ও মহাকর্ষ-রহস্য

হারেন্দ্রকুমার পাল*

এই সংসারে মাপজোখের অন্ত নেই। বাস্তব জগতের একটা বৈশিষ্ট্য হলো—ঘটনা। নীতিগত ভাবে এটা কল্পনা করা যায় যে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বস্তুবিন্দুর গতির দ্বারাই হয় ভৌত ঘটনার উৎপত্তি এবং তা ঘটে দেশ (Space) ও কাল (Time)-কে আশ্রয় করে। ঘটনা নিরীক্ষণ আমাদের নিত্য কর্ম। ঘটনার কার্য-কারণ সম্বন্ধ খুঁজতে গেলে কোথায় এবং কখন ঘটনা ঘটলো, তা জানতে হবে। সে জন্যে দেশ ও কালের মধ্যে ঘটনার অবস্থানই বর্তমান প্রবন্ধে বিবেচ্য, তার প্রকৃতি নয়।

নিউটনীয় গতি-বিজ্ঞানে 'দেশ' সম্পর্কে জ্ঞান দ্রষ্টা-সাপেক্ষ হলেও 'কাল'-এর জ্ঞানকে দ্রষ্টা-নিরপেক্ষ (Absolute) মনে করা হয়; অর্থাৎ আপেক্ষিক গতিসম্পন্ন বিভিন্ন দ্রষ্টার নিকট ঘটনা সংশ্লিষ্ট কাল-এর প্রতীতিতে কোন পার্থক্য হবে না, যেন সবার ঘড়ি সমান তালেই চলবে। অধিকন্তু একের দৃষ্টিতেও যুগপৎ সংঘটিত ছুটি ঘটনা অন্যের দৃষ্টিতেও যুগপৎ বলেই প্রতীয়মান হবে। এখানে নিউটনের সঙ্গে আইনষ্টাইনের মতবিরোধ আছে।

কারণ আইনষ্টাইন বলেন, আমাদের দেশ ও কাল-এর জ্ঞান সর্বাবস্থায়ই আপেক্ষিক ও অনির্দেশ্য; অর্থাৎ দ্রষ্টার নিজস্ব গতির একটা নিশ্চিত প্রভাব থাকবে দৃষ্ট ঘটনার স্থান ও উপলব্ধিতে। একের দৃষ্টিতে যা নিকটে, অন্যের দৃষ্টিতে তা দূরে—একের দৃষ্টিতে যা সূক্ষ্ম, অন্যের দৃষ্টিতে তা স্থূল—একের কাছে যা অতীত, অন্যের কাছে তা ভবিতব্য—এইরূপ। দর্শনের ব্যাপারে যা অপরিবর্তিত, দ্রষ্টা-নিরপেক্ষ থাকে, তা হলো শুধু দর্শন-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে আলো, তার গতিবেগ c। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ঘটনার দেশ ও কাল পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সূত্রে গ্রথিত। দেশ ও কাল-কে বিযুক্তভাবে গ্রহণ করলে তাদের সম্পর্কে জ্ঞানের ভ্রান্তি আসা অনিবার্য।

মহাবিশ্বের জ্যামিতিক চিত্র আঁকতে গেলে আগে সাধারণ প্রচলিত জ্যামিতি সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। এই জ্যামিতি অনুযায়ী দেশ-এর অভ্যন্তরে কোন বিন্দুর অবস্থান নির্ণয় অথবা নির্দেশ করতে হলে একটা সুনির্দিষ্ট ত্রিমাত্রিক কাঠামোর (Framework) সাহায্য নিতে হয়। কাঠামোর পরিকল্পনা নানা ভাবেই হতে পারে। দে কার্তে (Des Cartes) প্রবর্তিত প্রণালীতে প্রথমতঃ কোন মূল বিন্দু O থেকে পরস্পরের সঙ্গে লম্বভাবে তিনটি নির্দিষ্ট সরল রেখা OX_1, OX_2 ও OX_3 টানতে হয়। এগুলিকে বলা হয়, উল্লেখন-অক্ষ (Axes of reference)। এতে প্রতি দুই অক্ষের দ্বারা রচিত হয় একটি করে সমতল। এভাবে পাই তিনটি সমতল। এই সমতলগুলি থেকে বিবেচ্য বিন্দুর ক্ষুদ্রতম দূরত্ব মেপে নিলেই তার যথার্থ অবস্থানের ধারণা মিলবে। যদি (OX_2, OX_3)-সমতল থেকে ঐ দূরত্ব হয় x_1, (OX_3, OX_1)-সমতল থেকে x_2 এবং (OX_1, OX_2)-সমতল থেকে x_3, তাহলে x_1, x_2, x_3-কে ঐ বিন্দুর স্থানাঙ্ক (Co-ordinates) বলে। এক্ষণে মনে করা যাক, P এবং Q এই দুই বর্ণনাতীত কাছাকাছি বিন্দুর স্থানাঙ্ক যথাক্রমে (x_1, x_2, x_3) এবং $(x_1+dx_1, x_2+$

*পদার্থবিদ্যা বিভাগ, বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড়।

dx_2, $x_3 + dx_3$)। তা হলে ইউক্লিডীয় জ্যামিতির অন্তর্গত পিথাগোরাস-সূত্রানুযায়ী বিন্দু দুটির পারস্পরিক দূরত্ব ds' পাওয়া যাবে নিম্নোক্ত সমীকরণের সাহায্যে—

$$ds^2 = dx_1^2 + dx_2^2 + dx_3^2 \cdots\cdots(1)$$

এই কাঠামোর জন্যে ইউক্লিডীয় জ্যামিতির ধারা এবং সূত্র প্রযোজ্য; তাই একে ইউক্লিডীয় কাঠামো বলে। অতঃপর একে বক্রতাহীন (Flat) বা সরল কাঠামো বলেও অভিহিত করা হবে।

আপেক্ষিক জ্ঞানময় জগৎ যে সত্যকার জগৎ থেকে নিশ্চিতই ভিন্নরূপী, তা না বললেও চলে। এই মন্তব্যকে স্বীকৃতি দিয়েই বিশ্বের যথার্থ স্বরূপ অন্বেষণ করতে হবে। তদনুযায়ী মিনকৌস্কি এক চতুর্মাত্রিক কাঠামোর পরিকল্পনা করেছেন। আইনষ্টাইন একেই তাঁর বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদে অবলম্বন করেছেন। এতে পূর্বোক্ত ইউক্লিডীয় কাঠামোর তিন দেশ-মাত্রার সঙ্গে চতুর্থ আর এক মাত্রা জুড়ে দেওয়া হয়েছে। সেটা হলো 'কাল'। এই কাল-মাত্রা OX_4 অন্য তিন মাত্রার প্রত্যেকের সঙ্গে লম্ব, এরূপ কল্পনা করতে হবে। দেশ ও কাল-মাত্রার সমন্বয়ে গঠিত বলেই একে 'নিরবচ্ছিন্ন দেশ-কাল' (Space-time continum) বলে। মিনকৌস্কি একে আখ্যা দিয়েছেন 'চতুর্মাত্রিক জগৎ'। সত্যের খাতিরে নিরীক্ষিত ভৌত ঘটনাকে এই জগতেই স্থাপন করতে হবে। এতে অবস্থিত প্রতিটি বিন্দু একটি ঘটনা বা ঘটনাংশের প্রতীক; কেন না ঐ বিন্দুর স্থানাঙ্কের দ্বারা তার দেশ ও কাল নির্ণীত হতে পারে। এই ব্যবস্থায় দেশ-মাত্রা ও কাল-মাত্রার জ্যামিতিক ভূমিকায় মৌলিক কোন প্রভেদ নেই। তারা পরস্পরের মধ্যে রূপান্তরসাধ্যও বটে। কাল (t)-কে এক রহস্যময় অঙ্ক $C\sqrt{-1}$ দিয়ে গুণ করলেই দেশ-এ রূপান্তরিত হবে। কাল-এর এক সেকেণ্ড দেশ-এর তিন লক্ষ কিলোমিটারের সমতুল্য। বস্তুতঃ ভৌত ঘটনার জগৎ এই চতুর্মাত্রিক কাঠামোতেই রূপায়িত। তবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই কাঠামো যে কার্যতঃ ত্রি-মাত্রিক দেশ এবং অন্য-নিরপেক্ষ কাল-এ বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়, তার মূলে রয়েছে আলোর অনতিক্রম্য প্রচণ্ড গতিবেগ, $c = 3 \times 10^{10}$সে. মি/সেকেণ্ড, যার তুলনায় অন্যান্য সচরাচর লভ্য গতিবেগগুলি অকিঞ্চিৎকর। গতানুগতিকভাবে মিনকৌস্কি-জগৎকে চতুর্মাত্রিক ইউক্লিডীয় 'দেশ' রূপেও গণ্য করা যায় এবং বলা বাহুল্য এই কাঠামোও সরল। (1)নং সমীকরণের অনুকরণে এক্ষেত্রে পাই,

$$ds^2 = dx_1^2 + dx_2^2 + dx_3^2 + dx_4^2$$
$$= dx_1^2 + dx_2^2 + dx_3^2 - c^2dt^2$$
$$\cdots(2), \text{ যেহেতু } dx^4 = c\sqrt{-1}dt$$

এই ds-কে বলা হয় ব্যবধান (Interval)। স্থির অথবা চলন্ত দ্রষ্টা নির্বিশেষে ব্যবধানে পরিমাপ হবে এক অভিন্ন অঙ্ক, অতএব চরম সত্য।

মিনকৌস্কি-জগৎটা যেন একখানা মানচিত্র। এতে ঘটনা সংঘটিত হয় না; শুধু 'আছে'। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কাল এতে একাধারে বিধৃত। এই ভুবনে জন্ম, মৃত্যু নেই, সবাই শাশ্বত, চিরন্তন। কাল প্রবাহমান, তাই এই জগতে দ্রষ্টা এবং দৃষ্ট সবাই কাল-মাত্রায় আদি, অন্তহীন যাত্রার পথিক। সবাই স্ব স্ব বর্ত্ম অনুসরণ করে চলেছে। এই বর্ত্মের নাম বিশ্ব-রেখা (World-line)। ঘটনার প্রকাশ মানে, দ্রষ্টা এবং ঘটনার বিশ্ব-রেখা-দ্বয়ের অন্তচ্ছেদ। এই পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, এই কথার তাৎপর্য আর কিছু নয়, দ্রষ্টা ঘটনার ভবিষ্যতে প্রবেশ করেছেন, এই মাত্র। বিশ্ব-রেখাসমূহ যথাযথ বিন্যস্ত হলে তাদের অন্তচ্ছেদ বিন্দুগুলিই বিশ্বের সম্পূর্ণ ইতিহাস বহন করবে। তবে কার কাছে, কখন এবং কোথায় সে ইতিহাস প্রকটিত হবে, সে হলো নিছক ব্যক্তিগত এবং আপেক্ষিক ব্যাপার।

প্রত্যেক দ্রষ্টারই নিজ নিজ অভিরুচি অনুযায়ী তার কাঠামো রচনা বা সংস্থাপন করবার স্বাধীনতা

আছে। তবে কেউ-ই নিজের কাঠামোকে অপরের কাঠামোর চেয়ে অধিকতর মৌলিক অথবা নিজের নিরীক্ষণকে অপরের চেয়ে অধিকতর সত্য বলে দাবী করতে পারেন না। দ্রষ্টা স্থির থাকলে স্বভাবতঃ তার কাঠামোও স্থির থাকবে; আর চলমান হলে কাঠামো তার সঙ্গে সঙ্গেই চলবে। মাপজোখ যা, তা ঐ কাঠামোর পটভূমিতেই হবে। এই কারণে ঐ সব পরিমাপ দ্রষ্টার কাছে আপেক্ষিক হতে বাধ্য। কিন্তু কাঠামো স্থির অথবা সমবেগান্বিত (অবশ্য ঘূর্ণনহীন) যা-ই হোক না কেন, প্রতি ক্ষেত্রেই দেখা যাবে, একই প্রাকৃতিক নিয়ম কার্যকরী—এটাই হলো আইনষ্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতা বাদের মূল নীতি। এই নীতির পরিপোষক যাবতীয় কাঠামোকে গ্যালিলিয়ান কাঠামো বলে। দ্রষ্টা নির্বিশেষে অনন্ত সত্য দর্শনের উপায় হলো, দেশের সঙ্গে কাল-কে এবং কালের সঙ্গে দেশ-কে অবিচ্ছিন্নভাবে পরিগ্রহণ করা। অবশ্য ব্যবহারিক জগতে সত্যান্বেষণের মূল্য বা সুবিধা কতটুকু তা স্বতন্ত্র প্রশ্ন।

চতুর্মাত্রিক কাঠামো প্রসঙ্গে গোড়াতেই একটা আপত্তি এই উঠতে পারে যে, এর প্রত্যক্ষ রূপায়ণ বা ধারণা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আপত্তি নিরসনের জন্যে আইনষ্টাইন বলেন—এই অক্ষমতার কারণ, আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির দৈন্য, কাঠামোর কোন মৌলিক ত্রুটি বা অসঙ্গতি নয়। আমরা নিজে ত্রিমাত্রিক জীব বলেই নিরীক্ষিত জগৎকে ত্রিমাত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে অভ্যস্ত; তার চতুর্থ মাত্রা আমাদের চেতনায় ধরা দেয় না, বিচ্ছিন্ন না হয়ে। স্যার অলিভার লজ একস্থলে বলেছেন—আমাদের যা কিছু ইন্দ্রিয়ের পরিস্ফূর্তি, তা নিছক জীবন-সংগ্রামের তাড়নাতেই, দার্শনিক চিন্তার সহায়ক হবার জন্যে নয়।

ইন্দ্রিয়ানুভূতির সীমাবদ্ধতা কি ভাবে পরিপ্রেক্ষিতকে প্রভাবিত করে, তার একটা উদাহরণস্বরূপ মনে করা যাক, একটা কাল্পনিক দ্বিমাত্রিক জীবাণু কোন সমতল ক্ষেত্রের উপর দ্রষ্টারূপে অবস্থিত আছে। ঐ দ্বিমাত্রিক সমতলই তার একমাত্র বিচরণ ক্ষেত্র, তার সম্পূর্ণ জগৎ। এর বাইরে অবস্থিত যে তৃতীয় মাত্রা, অর্থাৎ ঐ সমতলের উপর লম্বা যে দিক, তার সম্বন্ধে জীবাণুর কোন জ্ঞানই নেই। এমতাবস্থায় উপর থেকে কোন বস্তুর পতনের ঘটনা তার নিকট কিরূপ প্রতিভাত হবে? বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এই পতন সম্বন্ধে সে একেবারে অজ্ঞ থাকবে এবং ঘটনাটিকে সমতলের উপর সেই বস্তুর আকস্মিক আবির্ভাব বলেই মনে হবে তার কাছে। এই দর্শন ত্রিমাত্রিক দ্রষ্টার দর্শন থেকে কত ভিন্ন!

নিরবচ্ছিন্ন দেশ-কাল-এ অবাধ পরিক্রমারত যাত্রীর ভ্রমণ-পথকে বিশ্ব-বর্ত্ম (Geodesic) বলে। দেশ-কাল-এ অবস্থিত ক-বিন্দু থেকে খ-বিন্দু অবধি প্রসারিত অসংখ্য পথের কল্পনা করা যেতে পারে। তবু একটি মাত্র পথই হবে সত্যকার পথ। গতি-বিজ্ঞানের বিধানানুসারে সেই পথই হবে বিশ্ব-বর্ত্ম, যার দৈর্ঘ্য স্থির (Stationary)। গণিতের ভাষায় বিশ্ব-বর্ত্মের সমীকরণ হবে $\delta \int ds = 0$ এবং এই ধারণার ভিত্তিতেই যাবতীয় বিশ্ব-বর্ত্মের রূপ উন্মোচিত হতে পারে।

উপরিউক্ত ভূমিকান্তে এবার মহাকর্ষ-তত্ত্বের কথা অবতারণা করা যেতে পারে। কথিত আছে, গাছ থেকে একটি আপেলের মাটিতে পড়বার সাধারণ ক্ষুদ্র একটা ঘটনাই নিউটনকে তাঁর সুবিখ্যাত মহাকর্ষবাদ প্রণয়নে প্রেরণা জুগিয়েছিল। এই তত্ত্বের বক্তব্য হলো—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি দুটি বস্তুকণা একে অন্যকে আকর্ষণ করে। সর্বভূতে বিরাজমান এই আকর্ষণ বলের নাম মহাকর্ষ। এর পরিমাণ সংশ্লিষ্ট কণাদ্বয়ের ভর-

এর সমানুপাতিক এবং তাদের মধ্যস্থ যে দূরত্ব, তার বর্গের বিপরীত অনুপাতে বাড়ে-কমে। মহাকর্ষের এক মৌলিক এবং গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তজ্জনিত উদ্ভূত ত্বরণ (Acceleration) আকৃষ্ট বস্তুর ভর অথবা ভৌত অবস্থার উপর বিন্দুমাত্রও নির্ভর করে না। এখানেই চৌম্বক অথবা বৈদ্যুতিক আকর্ষণের সঙ্গে মহাকর্ষের পার্থক্য। পৃথিবী নামক বস্তুপিণ্ডের আকর্ষণকে মাধ্যাকর্ষণ বা অভিকর্ষ বলে। বস্তুর ওজন মানে, তার উপর এই অভিকর্ষের একটা পরিমাপ ছাড়া অন্য কিছু নয়।

সুপ্রাচীন কাল থেকেই জানা ছিল যে, সৌরগ্রহগুলি সূর্যের চারদিকে নিজ নিজ কক্ষপথে ঘোরে। নিউটনের জন্মের বহু পূর্বেই জ্যোতির্বিদ্ কেপ্‌লার মহাকাশে সৌরগ্রহ-পরিক্রমার নিম্নলিখিত তিনটি নিয়মসূত্র আবিষ্কার করেছিলেন। (1) প্রত্যেক গ্রহের কক্ষপথ হচ্ছে এক উপবৃত্ত (Ellipse), যার একটি নাভিতে থাকে সূর্য। (2) ঐ নাভি (সূর্য) এবং গ্রহ-সংযোগকারী ব্যাসার্ধ-রেখা সমান সময়ে সমান ক্ষেত্রায়তন রচনা করে চলে এবং (3) গ্রহ-পরিক্রমার পর্যায়কালের বর্গাঙ্ক উক্ত উপবৃত্ত-সংশ্লিষ্ট অর্ধ-পরাক্ষের (Semi major axis) ঘনাঙ্কের সমানুপাতিক। নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্ব এই নিয়মত্রয়ের সুষ্ঠু গাণিতিক ব্যাখ্যা প্রদানে সফল হয়েছিল। ফলে এই মতবাদটি পদার্থ-বিজ্ঞানী এবং জ্যোতির্বিদ্ মহলে পরম সমাদরেই সম্বর্ধিত হয়েছিল।

নিউটনের মতে, গ্রহ-পথের বক্রতার জন্যে দায়ী গ্রহের উপর সূর্যের মহাকর্ষ-বল। কেন না, গতি-বিজ্ঞানে তাঁরই প্রদত্ত প্রথম গতিসূত্রে পাই—প্রত্যেক বস্তুই নিজ নিজ অচল কিংবা সমবেগান্বিত এবং সরল রৈখিক গতিশীল অবস্থায় অটুট থাকবে, যদি না কোন বল সে অবস্থার পরিবর্তন সাধনে তাকে বাধ্য করে। অতএব বলের সংজ্ঞা হলো—সেই প্রভাব, যা অচল বস্তুকে সচল করে অথবা সচল বস্তুর গতিতে পরিবর্তন ঘটায়। কাজেই চলন্ত বস্তু তার স্বাভাবিক সরল রৈখিক চলার পথ থেকে বিচ্যুত হলে বুঝতে হবে, এর পশ্চাতে কোন বলের ক্রিয়া রয়েছে। সৌরজগতে গ্রহগুলি আদিতে সরল রেখায় যাত্রা আরম্ভ করেছিল, কিন্তু সূর্যের কেন্দ্রাভিমুখী মহাকর্ষ-বলের টানে পড়েই এলো তাদের ক্রান্তিপথের এই বক্রতা।

বলের অনুপস্থিতিতে বস্তুর স্বকীয় অচল অথবা সমবেগান্বিত সরল রৈখিক গতিশীল অবস্থা সংরক্ষণের যে প্রবণতা, তাকে তার জাড্যধর্ম (Inertia) বলে।

প্রায় দুই শতাব্দী ধরে নিউটনের উপরিউক্ত চিন্তাধারা অবিসম্বাদী সত্য বলে পদার্থ-বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের আসরে একচ্ছত্র আধিপত্যে অধিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু বর্তমান শতকের সূচনায় এতেও সংশয় দেখা দিল। আইনষ্টাইন হলেন সেই প্রথম ব্যক্তি, যাঁর মনে প্রশ্ন জাগলো—এক বস্তু কি অন্য বস্তুকে সত্যই টানে? কেনই বা টানবে? এই কেন-র উত্তর মহাকর্ষ বাদের প্রবক্তা নিউটনের কোন উক্তিতে নেই। মহাকর্ষ যদি নিউটন-প্রদত্ত সংজ্ঞানুযায়ী একটা বল হয়, তা হলে ক্রমবর্ধমান বেগে মাটিতে পড়বার সময় আপেল সত্যই কোন টান অনুভব করে কিনা (যদি তার অনুভব শক্তি থাকতো) কে জানে? সন্দেহ যখন ক্রমশঃ ঘনীভূত হচ্ছিল, তখন তার নিরসনেরও একটা সুযোগ দৈবাৎ এসে গেল। কিংবদন্তী আছে, তাঁরই চোখের সামনে একদা এক রাজমিস্ত্রি কোন বাড়ীর ছাদ থেকে হঠাৎ পড়ে যায়। অমনি আইনষ্টাইন তার কাছে ছুটে গিয়ে শুধালেন—আচ্ছা, তুমি পড়তে পড়তে নীচের দিকে কোন টান অনুভব করেছিলে কি? উত্তর—না। পুনরায় প্রশ্ন করলেন,—তোমার তা হলে, তখন কিরূপ মনে হচ্ছিল? উত্তর—আমার মনে হচ্ছিল, আমি যেন দোলনায় চড়ে আরামেই নীচে

নাবছি। এই জবাবের মধ্যে আইনষ্টাইন তাঁর সন্দেহের সমর্থন খুঁজে পেলেন।

মহাকর্ষ ব্যাপারটা তাহলে আসলে কি? কেমন করেই বা উদ্ভূত? এই জিজ্ঞাসা আইনষ্টাইনের চিন্তায় অশান্ত আবেগে তোলপাড় হতে লাগলো। অবশেষে এর ব্যাখ্যায় তাঁর মানসলোকে উদ্ভাসিত হলো সেই মহাসত্য, যা সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব নামে পরিচিত। এই তত্ত্বে বিশেষ আপেক্ষিকতা বাদের মূল নীতিকেই সম্প্রসারিত অর্থে বলা হয়েছে—কাঠামোগুলির গতিপ্রকৃতি যা-ই হোক না কেন, তারা সকলেই প্রাকৃতিক ঘটনা প্রকাশের জন্যে সমতুল্য। আইনষ্টাইন যথাযথ দৃষ্টান্তের সাহায্যে এটাও দেখিয়ে দিলেন যে, ক্রমবর্ধিষ্ণু বেগে ধাবিত (Accelerated) কাঠামোতে মহাকর্ষ ক্ষেত্রের অনুরূপ ক্ষেত্র আবির্ভূত হয়ে থাকে, যদিও গ্যালিলিয়ান কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে সেটা আদৌ সম্ভব নয়।

এই তত্ত্বের প্রয়োজনে আইনষ্টাইন বললেন, পূর্বোক্ত দেশ-কাল নামধেয় চতুর্মাত্রিক জগৎ সর্বত্র সুষম (Uniform) এবং সরল (Flat) নয়। এই জগতের জ্যামিতিক প্রকৃতি নির্দিষ্ট হবে বস্তুর দ্বারা। কেন না, তার বস্তু-সন্নিহিত অঞ্চলগুলি হবে বক্র। প্রত্যেক বস্তুকে ঘিরে সে জগতে থাকে এক কুব্জতা (Hummock)। বস্তু-সন্নিধানে জগতের যে অংশ, তাকে খাঁটি গ্যালিলিয়ান বলা চলে না এবং তার জন্যে ইউক্লিডীয় জ্যামিতির ধারাগুলি, অর্থাৎ পূর্বোক্ত (1) নং ও (2) নং সমীকরণদ্বয়ও অচল। জগতের এহেন অঞ্চলের জন্যে গাউস (Gauss)-প্রবর্তিত সাধারণ রূপ হবে:—

$$ds^2 = \Sigma g_{ik}\, dx_i\, dx_k, \cdots (3)$$

যেখানে $i = 1, 2, 3, 4$

$k = 1, 2, 3, 4$

এবং g_{ik}—এমন এক গুণাঙ্ক, যা সাধারণভাবে দেশ ও কালের উপর নির্ভরশীল এবং মহাকর্ষ-ক্ষেত্রের পরিচায়ক প্রতিনিধিস্বরূপ। এই সমীকরণে ব্যবহৃত সাংকেতিক চিহ্ন Σ-র তাৎপর্য এই যে, i এবং k-র সর্বপ্রকার সম্ভাব্য মান গ্রহণান্তে উৎপন্ন রাশিসমূহের যোগফল নিতে হবে। এস্থলে উল্লেখ্য, সরল কাঠামোর বেলায় সমীকরণ (3) (2)-তেই রূপান্তরিত হবে।

বস্তু থেকে বহু দূরবর্তী শূন্য অঞ্চলই শুধু সরল, গ্যালিলিয়ান হতে পারে; তখন উপরিউক্ত গুণাঙ্ক g_{ik} দেশ ও কালের উপর নির্ভর না করে ধ্রুবরাশির দ্বারাই সূচিত হবে। প্রকৃত পক্ষে আইনষ্টাইন নিজেই অবশেষে এই অভিমতও ব্যক্ত করেছেন যে—বস্তুবিহীন শূন্যাঞ্চলেও স্বল্পমাত্রায় একটা স্বাভাবিক বক্রত্ব থাকা অসম্ভব নয় এবং এই সর্বব্যাপী সাধারণ বিকৃতির উপরই বস্তুজনিত কুব্জতা সমারূঢ় থাকে আর বস্তু-মাত্রা যত অধিক হবে, তজ্জনিত বিকৃতিও হবে তত বেশী। অবশ্য স্থূলদৃষ্টিতে বিকৃতির পরিমাণ সাধারণতঃ এতই কম যে, ইউক্লিডীয় জগৎ থেকে সত্যকার জগতের পার্থক্য সেখানে সামান্যই।

তবু বক্র জগতের গায়ে বিশ্ব-বর্ত্ম বক্র হলে, তা হবে জ্যামিতিক কারণেই। এতে কোন অস্বাভাবিকতা নেই। সূর্যের বৃহৎ বস্তুপিণ্ডের সন্নিধানে বক্র জগতে আছে বলেই গ্রহগুলির ক্রান্তিপথও হয়েছে বক্র। আর নক্ষত্রসমূহ বহু দূরের জ্যোতিষ্ক, শূন্যাঞ্চল বিহারী; তাই তাদের বিশ্ব-বর্ত্মগুলিও (প্রায়) সরল। অতএব যাত্রাপথের বক্রতা বা সরলতা একই ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত।

নিউটন ও আইনষ্টাইনের দৃষ্টিভঙ্গী তুলনা করলে দেখা যাবে, আইনষ্টাইনের দৃষ্টিভঙ্গীই অধিকতর মৌলিকতার দাবী করে এবং তা কৃত্রিমতা-দোষ থেকেও মুক্ত। বক্র জগতের সমর্থনে আইনষ্টাইন আরও বলেন যে, এই জগতে শুধু বস্তু কেন, আলোক রশ্মিকে পর্যন্ত বস্তু-সন্নিকটে

তার স্বাভাবিক সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে বক্র বিশ্ব-বর্ত্মেই চলতে হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বললেন, সুদূর তারকানিঃসৃত আলোক রশ্মি সূর্যের পাশ দিয়ে পৃথিবীতে আসবার সময় তার সরল রৈখিক পথ থেকে ঈষৎ স্খলিত হয়ে পড়বে। রোমাঞ্চকর উক্তি সন্দেহ নেই, তবু এটা স্পষ্টতঃই নিরীক্ষণসাধ্য ব্যাপার।

এমন বিপ্লবাত্মক একটা মতবাদ পরীক্ষার কষ্টি-পাথরে যাচাই করবার প্রয়োজন অবশ্যই আছে। কেন না, বিজ্ঞানের আসরে এর গুরুত্ব হবে অপরিসীম। এর উপরই নির্ভর করছে আইনষ্টাইন পরিকল্পিত তত্ত্বের যাথার্থ্য। তখন সর্বগ্রাসী প্রথম ইয়োরোপীয় মহাসমরের তাণ্ডব চলেছে। তাই সেই পরীক্ষার জন্যে অনুকূল পরিস্থিতি বর্তমান ছিল না। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, 1919 সালে মহাসমরের অবসানে তার এক চমৎকার সুযোগ উপস্থিত হয়েছিল। সেই বছর 29শে মে, দক্ষিণ আমেরিকা এবং পশ্চিম আফ্রিকায় পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ হবার কথা। পূর্ণগ্রাসের সময় যখন অন্ধকার নেমে আসবে পৃথিবীর বুকে, তখনই সূর্যের সন্নিহিত তারকা-নিঃসৃত আলোক রশ্মির বর্ত্মানুধাবনের প্রকৃষ্ট সময়। রয়েল সোসাইটি এবং রয়েল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির উদ্যোগে দুই বৃটিশ অভিযাত্রীদল তাঁদের নিখুঁৎ প্রস্তুতি নিয়ে জাহাজে করে যথাসময়ে রওনা হলেন। দলে ছিলেন এডিংটন, কটিংহাম, ক্রমেলিন, ডেভিডসন প্রভৃতি ইংল্যাণ্ডের সেরা জ্যোতির্বিদ্গণ। এক দল গেলেন ব্রেজিলের সোব্রাল নামক স্থানে এবং অন্য দল গিনি উপসাগরে অবস্থিত প্রিন্সাইপ দ্বীপে। পূর্ণগ্রাসের বহু-আকাঙ্খিত ঐতিহাসিক লগ্নটি উপস্থিত হওয়ামাত্রই তাঁদের ক্যামেরা ক্লিক্, ক্লিক্ করে উঠলো। তাঁরা সূর্যের আশেপাশে পরিচিত সাতটি তারকার পর পর অনেক ছবিই ক্যামেরার পটে বন্দী করে ফেললেন। ফটোগুলি পরিস্ফুটনের পর মাপজোখ করে দেখা গেল, সত্য সত্যই ঐ তারকাগুলির পরিজ্ঞাত অবস্থানের স্বল্প পরিবর্তন ঘটেছে এবং তার মাত্রাও আইনষ্টাইনের গণনার খুব কাছাকাছি।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, মহাকর্ষ যদি নিউটনের ধারণানুযায়ী বল-ই হয়, তাহলে আলোক-তরঙ্গের গতিপথের উপর তার কোন প্রভাব মোটেই সম্ভব নয়। তবে যদি আলোর স্বীকৃত তরঙ্গ-রূপ মিথ্যা হয় এবং (নিউটনের) কণিকাবাদ অনুযায়ী আলো ভরসম্পন্ন কণিকাসমষ্টির প্রবাহ হয়, তাহলে সূর্যের আকর্ষণ ক্ষেত্রে পড়ে তার গতিপথের কিঞ্চিৎ বিচ্যুতি (বক্রতা) সম্ভব হলেও পরিমাণের দিক দিয়ে তা হবে আইনষ্টাইন-বর্ণিত পরিমাণের অর্ধেক মাত্র। তুলনার জন্যে বিচ্যুতির তাত্ত্বিক ও নিরীক্ষিত হিসাবগুলি যথাক্রমে নিয়ে প্রদত্ত হলো:—

তাত্ত্বিক			নিরীক্ষিত
মহাকর্ষবাদ	আলোর তরঙ্গ-রূপ	—0″0	সোব্রাল অভিযান— 1″98±0″12
	আলোর কণিকা-রূপ	—0″88	প্রিন্সাইপ অভিযান—1″61±0″30
সাধারণ আপেক্ষিকতা বাদ		—1″75	

এভাবে বাস্তব পরীক্ষায় প্রথমতঃ 1919 সালে এবং পরে পুনর্বার 1923 সালে আইনষ্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব সংশয়াতীতরূপে সমর্থিত হলো এবং তৎসঙ্গে এটাও প্রমাণিত হলো যে, মহাকর্ষকে বল মনে করা অনাবশ্যক। বিশ্বের জ্যামিতিক গঠন-সম্পর্কীয় ভ্রান্ত ধারণা থেকেই

এই বলের ধারণার উৎপত্তি। আইনষ্টাইন দেখিয়ে দিলেন যে, নিউটনীয় পদ্ধতিতে জগৎকে ইউক্লিডীয় এবং মহাকর্ষকে বল ধরে গণনায় কেপ্‌লার-সূত্রের যে সিদ্ধান্ত আসে, অবিকল সেই একই সিদ্ধান্তে আসা যায়, ঐ বলকে অস্বীকার করেও কেবলমাত্র মহাকর্ষ-ক্ষেত্ররূপ বক্র বিশ্বের অনুধ্যান থেকেই। বল একক্ষেত্রে বহিরাগত বাহুল্য মাত্র। অধিকন্তু, নয়া পরিকল্পনার মস্ত বড় একটা সুবিধা এই যে, এতে তথাকথিত মহাকর্ষ-বলকে যথাস্থানে প্রেরণের জন্যে ঈথার জাতীয় কোন কাল্পনিক মাধ্যমের আমন্ত্রণ কিংবা 'স্থানান্তরে প্রতিক্রিয়ার সরাসরি আবির্ভাব (Direct action at a distance) অপরিহার্যতা—এরূপ সঙ্কট এড়ানো চলে।

সাধারণ আপেক্ষিকতা বাদের সমর্থনে 1924 সালে অ্যাডাম্‌স্‌ কর্তৃক নিরীক্ষিত অতিকায় নক্ষত্রনিঃসৃত বর্ণালীর উপলোহিত পরিসরণকেও (Redshift) সাক্ষ্যরূপে উপস্থিত করা যায়। এই পরিসরণের হেতু এই যে, সংশ্লিষ্ট আলোক রশ্মিকে উৎস-নক্ষত্রেরই মহাকর্ষ-ক্ষেত্র ভেদ করে আসতে হয় বলে তার শক্তির কিছু অপচয় ঘটে এবং ফলে ফটোন-কম্পাঙ্ক হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। এই ব্যাখ্যা বিতর্কাতীত হলে উক্ত পরিসরণের মাপজোখ থেকে সেই নক্ষত্রের বস্তুমাত্রা সম্পর্কেও জ্ঞান জন্মাতে পারে। নিম্নলিখিত তৃতীয় সাক্ষ্যটি আরো জোরালো। লেভেরিয়ার নামক জ্যোতির্বিদ্‌ লক্ষ্য করেছিলেন যে, সূর্যের নিকটতম গ্রহ বুধের ক্রান্তি-পথ মহাকাশে একেবারে স্থির নয়। তার অনুসূর বিন্দুটি (Perihelion) অতি মন্থর গতিতে—প্রতি শতাব্দীতে প্রায় 43" হারে অগ্রসর হচ্ছে। নিউটনীয় তত্ত্ব এই সমস্যা সমাধানের জন্যে পর্যাপ্ত নয়। একমাত্র সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বই এর সদুত্তর দিতে পারে।

অতএব দেখা যাচ্ছে, যে জগৎ যথার্থতঃ চতুর্মাত্রিক এবং বক্র, তাকে আপন খেয়ালখুশী-মত বা অজ্ঞতাবশতঃ ত্রিমাত্রিক ও সরল ধরে নিয়ে তদুপরি ইউক্লিডীয় জ্যামিতির ধারাগুলি অবাধে প্রয়োগ করে চললে সে ভ্রান্ত পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্তনিচয় নির্ভুল হতে পারে না। বিশ্ব-কাঠামোর প্রকৃত জ্যামিতি এবং আরোপিত মনগড়া জ্যামিতির মধ্যে আছে যে ফারাক বা গরমিল, তাই তথাকথিত বল-রূপে এসে উপস্থিত হয় দ্রষ্টার নিকটে। অধ্যাপক এডিংটন এক স্থলে বলেছেন—বিদ্যালয়ে ইউক্লিডীয় জ্যামিতি শেখার প্রচলন বলেই কি বিশ্বজ্যামিতিকেও ইউক্লিডীয়ই হতে হবে?

সুতরাং বলতে হয়, গ্রহ-পথের বক্রতা কোন বলসঞ্জাত নয়। মহাকর্ষ আসলে অবিচ্ছিন্ন দেশ-কাল-এর গঠনের প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। এটি তার (দেশ-কাল-এর) অন্তরের ব্যঞ্জনা। একতারার অন্তরে যেমন তার নিজস্ব সুরটি প্রচ্ছন্ন থাকে এবং টঙ্কার মাত্রই স্পন্দনের মাধ্যমে ফুটে বেরোয়, মহাকর্ষও তেমনি চতুর্মাত্রিক বিশ্ব-দেহে ওতপ্রোতভাবেই মিশে আছে। বস্তুর উপস্থিতিতে সে দেহে বিকৃতির মাধ্যমে হয় তার প্রকাশ। মহাকর্ষ নিয়মসূত্রে শৃঙ্খলিত, সুতরাং দেশ-কালরূপ বিশ্বের জ্যামিতিও বিশিষ্ট ধরণেরই হতে বাধ্য। সাধারণ আপেক্ষিকতা বাদের শিক্ষা এই যে, বিশ্ব-বর্ত্মকে সরল জগতের গায়ে বক্ররেখা মনে না করে, বক্র জগতের গায়ে সরল রেখারূপে জ্ঞান করাই বিধেয়।

নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে জাড্যনীতির বয়ানেও কিঞ্চিৎ অদলবদল প্রয়োজন। সংশোধিত বক্তব্য হলো—অচল বস্তু অচল থাকবে এবং সচল বস্তু বিশ্ব বর্ত্মেই চলবে ক্রমাগত। জড়তা বস্তুর অপরিহার্য ধর্ম বিধায় কখনো কখনো বস্তু ও জড়তাকে সমার্থবোধক বলেও ধরা যায়। বস্তু বা তার জড়তার কারণেই বিশ্ব-বক্রতার উৎপত্তি আর মহাকর্ষ রূপেই তার অভিব্যক্তি। অতএব বলা যায়, জড়তা ও মহাকর্ষ এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ।

তাদের ভৌত নিয়মাবলীও অভিন্ন। বল-বিজ্ঞানের কোন কোন ব্যাপারে মহাকর্ষকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হলেও বস্তু বা জড়তার উপস্থিতি সর্বত্রই আবশ্যিক। তাই অন্ততঃ গৌণভাবেও আইনষ্টাইনের মহাকর্ষ-সূত্রই বল-বিজ্ঞানের প্রাণকেন্দ্র।

মহাকর্ষকে বিশ্ব-বক্রতারই একটা লক্ষণ বলে গণ্য করা উচিত। আর বস্তুকে মহাকর্ষ ক্ষেত্রে বিকৃতি সৃষ্টিকারীরূপে না দেখে বিকৃতিটাকেই বস্তু জ্ঞান করা আপেক্ষিকতা বাদের নীতি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বস্তু কোন কারণ নয়, একটা উপসর্গ মাত্র। বিশ্বের জ্যামিতিক গঠন-প্রণালীর গুরুত্বই সমধিক। বস্তু গৌণ এবং স্বতন্ত্রভাবে তার কোন অর্থও হয় না। এই কথার তাৎপর্য এই যে, দেশ-কাল-এর জ্যামিতিই মহাকর্ষ ক্ষেত্র রচনা করে এবং ঐ ক্ষেত্র থেকে পৃথক সত্তা হিসাবে বস্তুকে চিন্তা করা যুক্তিযুক্ত নয়। মহাকর্ষ ক্ষেত্রের অনুপস্থিতিতে ($g_{ik}=0$) দেশ-কাল-এর কোন বাস্তব অস্তিত্বই থাকে না। দার্শনিক দে কার্তের চিন্তাধারার সঙ্গে এই উক্তির বেশ মিল দেখা যায়। কেন না, তাঁর ভাবনাতে দেশ ব্যাপ্তি (Extension) ছাড়া কিছু নয় এবং ব্যাপ্তি বস্তুরই বৈশিষ্ট্য। অতএব বস্তু ছাড়া দেশ হয় না; অর্থাৎ শূন্য দেশ অবাস্তব, অলীক কল্পনা। আইনষ্টাইন আরো বলেন—মহাকর্ষ-নিয়মই বিশ্বের মোট বস্তুমাত্রা নিয়ন্ত্রিত করবে। যদি তা-ই হয়, তবে নৈসর্গিক সংবিধানে নিশ্চয়ই এমন একটা সুসঙ্গত ব্যবস্থা থাকা উচিত, যাতে হয়, মহাকর্ষই বস্তু সৃষ্টি করবে, নচেৎ বিশ্বের সমুদয় বস্তু একজোট হয়ে মহাকর্ষের নিয়মাবলী নির্দিষ্ট করবে।

বস্তুর পটভূমিতে বিশ্বের রূপ-রহস্য উদ্‌ঘাটিত হতে পারে না। যেহেতু পরিচিত বস্তুমাত্রই অত্যন্ত জটিল ধরণের সত্তা এবং তার আসল চেহারাও দ্রষ্টার নেপথ্যে বা অগোচরে থেকে যায়। প্রকৃতির লীলাভূমি বস্তু বা বিদ্যুৎ নয়, সেটা মুখ্যতঃ জগতের যে শূন্যাঞ্চলে বস্তু বা বিদ্যুৎ অবস্থিত, সেখানেই নিবদ্ধ। এমতাবস্থায় বিশ্ব-তত্ত্বের চরম, গভীরতম আখ্যানও দুর্বোধ্য এবং তাবার প্রকাশের পক্ষে দুরূহ হতে বাধ্য।

বিশ্ব-বক্রতা সম্বন্ধে আবার দুটি সমান্তরাল চিন্তাধারা বর্তমান। একটির প্রবক্তা হলেন স্বয়ং আইনষ্টাইন এবং অন্যটির ওলন্দাজ জ্যোতির্বিদ্ দ্য সীটার (De Sitter)।

আইনষ্টাইনের মতে, দেশ-কাল-এর শুধু দেশটাই বক্র (গোলাকার), কিন্তু কাল মাত্রা সরল। অতএব আইনষ্টাইন-বিশ্ব এক চতুর্মাত্রিক স্তম্ভ (Cylinder)-স্বরূপ। এতে কাল-এর আদি, অন্ত কল্পনাতীত। পক্ষান্তরে দেশ বা ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তৃতি অনন্ত নয় এবং মজার কথা এই যে, তার কোন কেন্দ্রবিন্দু নেই। ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক বিন্দুর সঙ্গে অবশিষ্টাংশের একই সম্বন্ধ। তার কোন প্রান্ত বা সীমারেখাও নেই। সুতরাং তার পরপারে কি আছে?—এরূপ প্রশ্ন অবান্তর। ব্রহ্মাণ্ড প্রান্তহীন অথচ সসীম, এই স্ববিরোধী উক্তি হেঁয়ালীর মত শোনালেও এতে অসঙ্গতি কিছু নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ফুটবলের দ্বিমাত্রিক, গোলাকার পৃষ্ঠদেশও তো সসীম, তবু সেই পৃষ্ঠতলের কোন প্রান্ত অথবা কেন্দ্রবিন্দু আছে কি? আইনষ্টাইনের গণনায় ব্রহ্মাণ্ডের বস্তুমাত্রা তার সর্বাধিক দূরত্বের সঙ্গে সমানুপাতিক। পর্যবেক্ষণে যতদূর জানা গেছে, ঐ দূরত্ব 10^{18} কিলোমিটারের কম নয়। এতে ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ বস্তুমাত্রা হয় এক ট্রিলিয়ন (10^{18}) সূর্যের সমান, যা জ্যোতির্বিদ্‌দের অনুমিত পরিমাণ থেকে অনেক বেশী। প্রাকৃতিক নিয়মে বিশ্বের কিছু পদার্থ নিত্য লয় হয়ে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে; তাই বিশ্বের সর্বাধিক দূরত্বও ক্রমশঃ কমে আসছে এবং ফলে আইনষ্টাইন-কল্পিত বিশ্ব ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হচ্ছে।

দার্শনিক মাক্ (Mach) বলেন, দেশ-কাল-এর বিস্তার নির্ভর করবে ব্রহ্মাণ্ডের বস্তুসমষ্টির উপর,

অতএব মহাকর্ষ-নিয়মের উপরও বটে। যদি কখনো ঐ বস্তুসমষ্টি বর্জিত হয়, তা হলে তাকে ধারণ করবার জন্যে ব্রহ্মাণ্ডের অতিরিক্ত দেহ-পরিসরও সৃষ্টি হবে। বস্তু না থাকলে ব্রহ্মাণ্ডও টিকতে পারতো না এবং তৎসঙ্গে মহাকর্ষ ও যাবতীয় বস্তু-আশ্রিত ঘটনার সম্ভাব্যতা লুপ্ত হতো। অতএব এখানে দেখতে পাই, আইনষ্টাইন ও মাক্ উভয়ের ভৌত দর্শনই মূলতঃ অভিন্ন। ইতিপূর্বে দেশ-কাল মানচিত্রে বস্তু অবিনশ্বর বলে বর্ণিত হয়েছে, কাজেই সেখানে ব্রহ্মাণ্ডকেও শাশ্বত বলে স্বীকার করতে হয়।

ডু সীটার-কল্পিত বিশ্বের বেলায় কিন্তু দেশ ও কালমাত্রা উভয়েই বক্র, গোলাকার। সুতরাং তার চেহারা হবে অতি-বর্তুলাকৃতি (Hyper-sphere like)। এহেন বিশ্বের প্রধান ধর্ম হলো—মূল বিন্দুতে (Origin) অবস্থিত না থাকলে বস্তু-নিচয় স্বতঃবিকৃষ্ট হয়ে ক্রমাগত দূর হতে দূরান্তরে বিক্ষিপ্ত হতে থাকবে, যদি না পারস্পরিক আকর্ষণ সেগুলিকে একত্রে ধরে রাখে। ফলে এই জগতের পরিধিতেই মাত্র বলয়ের মত বস্তুর অবস্থান সম্ভব, তার অভ্যন্তরে নয়। সচরাচর একে শূন্য-জগৎ বলা হয়। এই জগৎও সসীম। তবে স্বতঃস্ফূর্ত বিকর্ষণের জন্যে বুদ্বুদের মত ক্রমশঃ বিস্ফারিত হচ্ছে। ডপ্‌লার প্রক্রিয়া-ভিত্তিক নক্ষত্র-বর্ণালীর নিরীক্ষিত উপলোহিত পরিসরণ এই সম্প্রসারণের সমর্থনে একটি অকাট্য প্রমাণ। সম্প্রসারণশীল বিশ্বের স্বপক্ষে রাশিয়ান গণিত-বিশারদ ফ্রীড্‌মানও (Friedman) আর একটি তত্ত্ব উপস্থিত করেছেন। ডু সীটার-বিশ্বের কাল-মাত্রা আবদ্ধ বৃত্ত হওয়াতে কোথায় কালের আরম্ভ ও শেষ—জানবার উপায় নেই। কাল-প্রবাহে যাত্রা-বিন্দুতে বার বার প্রত্যাবর্তন, অর্থাৎ ঘটনার পুনরাবৃত্তি সম্ভব। কাল-এর আচরণও অদ্ভুত। যেমন, ঘটনাস্থল দ্রষ্টার দিগন্ত-রেখার যত নিকট-বর্তী হবে, কালের গতি হবে ততই মন্থর এবং পরিশেষে দিগন্তে এলে কাল-প্রবাহ একেবারে থেমে যাবে, যেন সে ঘটনায় কোন সমাপ্তি নেই!

আইনষ্টাইন-কল্পিত বিশ্ব অতিমাত্রায় বস্তুতে ভরপুর, আর ডু সীটার-কল্পিত বিশ্ব প্রায় শূন্যগর্ভ। প্রথমটি সঙ্কোচনশীল, দ্বিতীয়টি সম্প্রসারণশীল। এমতাবস্থায়, বিশ্বের প্রকৃত রূপটা কি? অনেকের ধারণা, বিশ্ব দোদুল্যমান অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে সঙ্কোচন ও সম্প্রসারণশীল।

একথা অনস্বীকার্য যে, বিশ্বের চতুর্মাত্রিক রূপ, ততোধিক তার বক্রতা সাধারণ সহজ কল্পনায় ধরা দেয় না এবং পরিশেষে গণিতের ক্রূর আবর্তে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। এর জ্যামিতিক সমস্যা-গুলি স্বভাবতঃই দুর্দান্ত জটিল; কিন্তু তা বলে সমাধানে ঊর্ধ্বে নয়। সৌভাগ্যের বিষয়—গাউস, রীমান ও খৃষ্টফেল প্রমুখ গণিত-পারঙ্গমেরা অসাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গেই সেগুলির মোকাবেলা করেছেন।

আইনষ্টাইনের মতে, মহাকর্ষ ছাড়াও বলশাস্ত্রে ব্যবহৃত অন্যান্য অনেক অভিধা, যথা—ভর, শক্তি, ভর-বেগ, টান, চাপ প্রভৃতি দেশ-কাল-এর বক্রতা সম্ভূত বিশেষ বিশেষ উপসর্গ, অথবা বক্রতাদ্যোতক বিশেষ বিশেষ গণনাঙ্ক ছাড়া অন্য কিছু নয়। সুতরাং এগুলি মহাকর্ষ ক্ষেত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবেই জড়িত। ভর-সংরক্ষণ ও ভর-বেগ সংরক্ষণ নামক নিউটনীয় বল-বিজ্ঞানের দুই প্রধান নীতি আইনষ্টাইনের মহাকর্ষ-নিয়ম থেকে স্বভাবতঃই এসে পড়ে। তবে এই সংরক্ষণকে চতুর্মাত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে। সুতরাং তা হবে আরো ব্যাপক। ব্যাপক অর্থে, শক্তি-সংরক্ষণ নীতি ও ভর-সংরক্ষণ নীতির অঙ্গীভূত থেকে বিশ্ব-বক্রতার মধ্যেই অভিব্যক্ত রয়েছে। আপেক্ষিকতা বাদে অবশ্য তথাকথিত স্থিতি শক্তির (Potential energy) কোন স্বাভাবিক স্থান নেই।

আদ্যোপান্ত বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, গোটা বলশাস্ত্রটাই, অন্ততঃ তার একটা বৃহদংশ, বিশ্ব-

জ্যামিতির মধ্যে অন্তর্লীন হয়ে আছে। পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে আজ আমরা এক বৈপ্লবিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি। নবতর আলোকে এটাই প্রতিভাত হচ্ছে যে, ঐ বিজ্ঞানের অনেক তথ্য, সূত্র এবং নীতি প্রকারান্তরে আমাদের চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত বিশ্বের গঠন-চিত্রই বহন করে আনছে। অবস্থার চাপে পদার্থবিদ্যাকে আপেক্ষিকতা বাদের ছাঁচে ঢালাই করে নতুনভাবে গড়ে তোলবার একান্ত আবশ্যকতা দেখা দিয়েছে। এটা উপলব্ধি করে বিজ্ঞানীরাও ত্বরিত গতিতে এই ব্যাপারে এগিয়ে চলেছেন। আইনষ্টাইনের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, মহাকর্ষের মতই ইলেকট্রন ও ফটোনের আবির্ভাব এবং বিদ্যুৎ-চৌম্বক ক্ষেত্র-রহস্যও বিশ্ব-জ্যামিতির মধ্যেই নিহিত, যদিও তাত্ত্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিশ্ব-বক্রতার ব্যাপারে বিদ্যুৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রের কোন অবদান নেই। সে যাই হোক, মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, পদার্থবিদ্যা তার স্বাধীন, স্বতন্ত্র সত্তা হারিয়ে ক্রমশঃ বিশ্ব-জ্যামিতির সঙ্গে একাত্ম হতে চলেছে। এটা অগৌরবের নয়—কেন না, যতই এই জ্যামিতির স্বরূপ অবারিত হতে থাকবে, ততই পদার্থবিদ্যার আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য বিশ্ব-ছবিও স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে আমাদের মানসপটে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।

অধ্যাপক পুলিনবিহারী সরকার

রমাপ্রসাদ সরকার*

14ই জুলাই (1971) অধ্যাপক পুলিনবিহারী সরকার পরলোকগমন করেছেন। ডক্টর পুলিনবিহারী সরকার রসায়নক্ষেত্রে একটি স্মরণীয় নাম।

কয়েক বছর আগের কথা। সত্তর বছরের বৃদ্ধ অধ্যাপক সরকার একদিন এক কিলো গম নিয়ে বিজ্ঞান কলেজের লেবরেটরীতে এলেন ছাত্রদের অবাক করে দিয়ে। স্ক্যাণ্ডিয়ামের একটি ভাল বিকারক (Reagent) হচ্ছে ফাইটিক অ্যাসিড। গমের মধ্যে সেই ফাইটিক অ্যাসিডের অস্তিত্ব থেকে অধ্যাপকের ধারণা হয় গমের মধ্যে স্ক্যাণ্ডিয়াম থাকলেও থাকতে পারে। ছাত্রদের উপর নির্দেশ পড়লো গম-বিশ্লেষণের। ছাত্রেরা কিন্তু হচ্ছে-হবে করে বেশ কিছু দিন ব্যাপারটা এড়িয়ে গেলেন। একদিন সকাল দশটায় কলেজে এসে তাঁরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন, বৃদ্ধ অধ্যাপক নিজেই গম নিয়ে উঠেপড়ে লেগেছেন। ছাত্রেরা লজ্জিত হলেন। বেশ কিছুদিন পণ্ডশ্রম করে শেষ পর্যন্ত স্ক্যাণ্ডিয়াম আর পাওয়া গেল না। কিন্তু একটুও বিচলিত না হয়ে অধ্যাপক সহাস্যে বলে উঠলেন—আরে কেমিষ্ট্রিতে অমন হয়েই থাকে।

সত্তর বছর বয়স পর্যন্ত জীইয়ে রাখা এই উৎসাহ-উদ্দীপনার সূচনা কিন্তু অনেক আগে থেকেই। বস্তুতঃ অজৈব রসায়নের জটিল প্রকৃতিকে করায়ত্ত করবার ক্ষমতা অধ্যাপক সরকারের যেন সহজাত ছিল। তাঁর রাসায়নিক-জীবনের প্রথম পর্যায়ে যখন তিনি ফ্রান্সে অধ্যাপক য়ুরবাঁর (Urbain) কাছে গবেষণা করতে যান, তখন য়ুরবাঁ তাঁর হাতে কোন ছকবাঁধা কাজ তুলে দেন নি, তুলে দিয়েছিলেন একখণ্ড খনিজ—থরতাইটাইট।

*রসায়ন বিভাগ, নিউ আলিপুর কলেজ, কলিকাতা-27

স্ক্যানডিয়ামের এই আকরিক থেকে বিশুদ্ধতম স্ক্যাণ্ডিয়াম আহরণ করে তারপর অধ্যাপক সরকারকে নিজের গবেষণা করতে হয়েছিল। শুধু তাই নয়, গবেষণার শেষে তাঁর তৈরি যৌগ পদার্থগুলি থেকে বিভিন্ন উপাদান-ধাতু, প্রধানতঃ স্ক্যাণ্ডিয়াম ও গ্যাডোলিনিয়াম তিনি প্রায় পুরামাত্রায়ই



অধ্যাপক পুলিনবিহারী সরকার

পুনরুদ্ধার করেছিলেন। তরুণ গবেষকের এই নিষ্ঠা এবং দক্ষতায় অধ্যাপক যুরবাঁ সেদিন বিস্মিত না হয়ে পারেন নি।

অথচ ভাবলে অবাক হতে হয়, পরবর্তী কালে ভারতবর্ষে বিশ্লেষণী অজৈব রসায়নের (Analytical Inorganic Chemistry) গোড়াপত্তনকারী অধ্যাপক সরকারের রসায়নবিদ্ হওয়াটাই একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে অঙ্কুরিত হয়েছে। ঝামাপুকুরের মামাবাড়ীতে 1894 সালে তাঁর জন্ম হয়েছিল। ঠাকুর্দা ৺যাদবচন্দ্র সরকার ছিলেন সোনারপুর-যাদবপুর অঞ্চলের প্রচুর ভূ-সম্পত্তির মালিক। অধ্যাপক সরকারের বাবা ৺বসন্তকুমার সরকার অবশ্য তমলুকে গিয়ে বসবাস সুরু করেন। সেখানে তিনি ছিলেন একজন প্রথিতযশা আইনজীবী। ছেলে পুলিনবিহারীও একজন বড় আইনবিশারদ হবে, এই ছিল বাবার ইচ্ছা। পুলিনবিহারীর মা কিন্তু এর ঘোর বিপক্ষে ছিলেন। ছেলের অধ্যয়নশীল নিবিষ্টচিত্ত প্রকৃতির স্বরূপ উপলব্ধি করে তিনি বুঝেছিলেন, অর্থাগমের চেয়ে বিদ্যার্জনেই এই ছেলে বড় হতে পারবে। অধ্যাপক সরকারের পরবর্তী জীবনে তাঁর মায়ের এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়ে উঠেছিল।

বিজ্ঞানব্রতে উদ্বুদ্ধ করতে অধ্যাপক সরকারের ছাত্র-জীবনের পরিবেশের অবদানও বড় কম নয়। আচার্য জগদীশচন্দ্র-প্রফুল্লচন্দ্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত তাঁর অপরাপর সহপাঠীরাও পরবর্তী জীবনে বিজ্ঞানের সেবায় আত্মনিয়োগ করে গেছেন—মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, সত্যেন্দ্রনাথ বসু—এঁরা সবাই ছিলেন তাঁর সমসাময়িক। কৃতিত্বের সঙ্গে এম এস-সি. পাশ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নের অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেবার কিছুদিন পরেই তিনি সহকর্মী হিসাবে পেয়েছিলেন আর একজন নিবেদিতপ্রাণ রসায়নবিদ্‌কে—অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায়। 1916 সালে সেই যে তিনি বিজ্ঞান কলেজের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন, জীবনের শেষ পর্যন্ত তার কোন ব্যতিক্রম ঘটে নি। 1925 থেকে 1928, এই তিন বছর ফ্রান্সে কাটানো ছাড়া 1969 সাল পর্যন্ত বিজ্ঞান কলেজই ছিল তাঁর সাধনক্ষেত্র। 1960 সালে বিভাগীয় প্রধান হিসাবে চাকুরী থেকে অবসর নেবার পরেও 1969 পর্যন্ত তিনি সক্রিয়ভাবে গবেষণা পরিচালনা করেছেন। তার পরেও ছিয়াত্তর বছর বয়স পর্যন্ত বহু বার এই বৃদ্ধ অধ্যাপককে বিজ্ঞান কলেজে দেখা গেছে, রসায়ন-

চর্চার অদম্য উৎসাহ তাঁর বয়সকে হার মানিয়েছিল।

অধ্যাপক সরকার নিজে ছিলেন নিষ্ঠাবান রাসায়নিক, রসায়ন ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। অন্যেরাও রসায়নকে তাঁদের জীবনে নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করবে, এই ছিল তাঁর একান্ত কাম্য। আপাত জ্ঞানান্বেষী হাল্কা স্তরের ছাত্রেরা যাতে রসায়নের দরবারে এসে ভীড় করবার সুযোগ না পায়, সেদিকে ছিল তাঁর সতর্ক দৃষ্টি। এতে অনেক সময়ই তাঁকে সকলের অপ্রিয় হতে হয়েছে, কিন্তু রসায়নের সরস্বতী তাতে খুশীই হয়েছেন। আজ ফার্স্ট ক্লাশ আর ডি-ফিল-এর ছড়াছড়ি সত্ত্বেও সারা দেশে রসায়ন বিদ্যার পঠন-পাঠনের সামগ্রিক মান ও তার ভবিষ্যৎ পর্যালোচনা করলে অধ্যাপক সরকারের অভাব বড় বেশী প্রকট হয়ে ওঠে।

আপাতকঠিন তীক্ষ্ণদৃষ্টি অধ্যাপকের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের আতঙ্ক কাটিয়ে যাঁরা তাঁর নিকটে আসতে পেরেছেন, তাঁদের কাছে কিন্তু অধ্যাপক সরকারের ছাত্রবৎসল মধুর রূপটি অচিরেই ফুটে উঠেছে। যে কোন বিষয়েই হোক, লাইব্রেরীতে গিয়ে হাতড়ানোর আগে ছাত্রেরা প্রথম তাঁর কাছেই যেত যে কোন হদিশ নেবার জন্যে। বিপুল উৎসাহে অধ্যাপক তাঁদের সাহায্য করতেন। কখনো বা নিজেই ছুটে যেতেন লাইব্রেরীতে, সিঁড়ি বেয়ে আলমারীতে উঠে নিজের হাতে বই নামিয়ে পড়তে বসে যেতেন—প্রয়োজন হলে জার্মান বা ফরাসী ভাষা থেকেও তর্জমা করে দিতেন। এমন অনেক দিন গেছে—সন্ধ্যার পরে লেবরেটরী থেকে বেরিয়ে ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে শেয়ালদা পর্যন্ত পৌঁছে সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়েছেন। রাত ন'টা বাজে, দশটা বাজে, ছাত্রেরা উসখুশ করছে—অথচ অধ্যাপকের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলবার এই নেশা তাঁর এমনই প্রবল ছিল যে, অধ্যাপনা থেকে অবসর নেবার পরেও প্রতি বছর সেসনের সুরুতে তিনি একবার করে এম. এস-সি. ক্লাশের ছাত্রদের সঙ্গে আলাপ করতে আসতেন, বুঝতে চাইতেন তাঁদের সুখ-দুঃখের কথা। তমলুকে নিজের গ্রামের কলেজেও তিনি বহু দিন ছাত্রদের পড়ানোর দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছেন, কিম্বা রাস্তার ধারে পানওয়ালাকে চুন-খয়েরের রহস্য বোঝাতে চেয়েছেন, সেও ঐ একই নেশায়।

এই নেশার বৈচিত্র্য উপলব্ধি করাও বড় সহজ কর্ম নয়। যেখানে যা পাওয়া গেছে অবিশ্লেষিত অবস্থায়, তাকেই তিনি বিশ্লেষণ করেছেন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে, তার উপাদানগুলির সঠিক মাত্রা নিরূপণ করেছেন সন্দেহাতীতভাবে। আর এই ব্যাপারে তাঁর কোন বাছবিচারের বালাই ছিল না। কোন এক ডাক্তার পাঠিয়েছেন কয়েক ফোঁটা চোখের জল, কোন জীব-বিজ্ঞানী হয়তো সংগ্রহ করেছেন মাতৃদুগ্ধ। অক্লেশে তাঁদের জিনিষের বিশ্লেষণ করে দিয়েছেন অধ্যাপক সরকার। আমাদের নিত্যখাদ্য আতপ চাল, কাঁচাকলা, মুগের ডাল, পান—এমন কি, উচ্ছে-করলার উপাদানগুলিও তিনি বিশ্লেষণ করে সেগুলির মাত্রা নিরূপণ করেছেন সন্দেহাতীতভাবে। এসব তো গেল খেয়ালী বিজ্ঞানীর কথা। আমাদের দেশের খনিজ ভাণ্ডার থেকে বিভিন্ন মূল্যবান ধাতু নিষ্কাশন করে দেশকে সম্পদশালী করবার পিছনেও অধ্যাপক সরকারের ভূমিকা কম নয়।

বিভিন্ন খনিজ পদার্থ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করে অধ্যাপক সরকার অনুসন্ধান করেছেন—ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, জার্মেনিয়াম প্রভৃতি মূল্যবান ধাতু। এই সব খনিজের তেজস্ক্রিয়তা নির্ণয়, ভূতাত্ত্বিক বয়স নির্ধারণ, সংকেত স্থিরীকরণ—এ সবই ছিল তাঁর গবেষণার অঙ্গ। বস্তুতঃ পক্ষে ভারতবর্ষে খনিজ পদার্থ সম্বন্ধে পারদর্শী রসায়নবিদ্ তখন আর কেউ ছিলেন না। CSIR-এর তদানীন্তন ডিরেক্টর শান্তিস্বরূপ ভাটনগর তাই খনিজ পদার্থের রাসায়নিক প্রকৃতি সম্বন্ধে গবেষণার জন্যে

কলকাতায় একটি জাতীয় গবেষণাগার স্থাপন করে অধ্যাপক সরকারকে তার প্রধান বিজ্ঞানী নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সরকারী আনুকূল্যের দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে পাছে তাঁর গবেষণা ব্যাহত হয়—এই ভেবে অধ্যাপক সরকার এতে রাজী হন নি। উল্লেখ করা যেতে পারে, এই ধরণের একটি জাতীয় গবেষণাগার আজও স্থাপিত হয় নি।

খনিজ পদার্থ ছাড়াও অধ্যাপক সরকারের গবেষণার ক্ষেত্র বিচিত্র এবং বহুমুখী। তেজস্ক্রিয়তার সংক্রমণ নিয়ে গবেষণা থেকে সুরু করে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রায় দু-শ' গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। স্ক্যাণ্ডিয়াম, গ্যাডোলিনিয়াম ইত্যাদি বিরল ধাতুর বিভিন্ন যৌগ, রেনিয়াম-এর প্রকৃতি, বিভিন্ন জটিল যৌগের গঠন, অজৈব যৌগের সমধর্মী কেলাস উৎপাদন—এমন কি, কোন কোন ক্ষেত্রে জৈব যৌগের উপরও তাঁর গবেষণা বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, Analytical Chemistry-তে তাঁর অবদানের জন্তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় স্বর্ণপদক লাভ করেন।

রসায়নের বাইরের কোন কিছুতে অধ্যাপক সরকারের আসক্তি ছিল খুবই কম। সব রকম আলোচনার মধ্যেই ঘুরেফিরে তিনি রসায়নে এসে পড়তেন। শুধু খেলাধূলার ব্যাপারে তাঁর কিছুটা আগ্রহ ছিল—তিনি নিজেও ছিলেন একজন ভাল খেলোয়াড়। টেনিসে সমসাময়িককালে তাঁর জুড়ি মেলা ভার ছিল। বিলাতে থাকবার সময়ও অনেক নামকরা খেলোয়াড়ের সঙ্গে তিনি খেলাধূলা করতেন বলে শোনা যায়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে Analytical Chemistry-র একটি ভাল পঠন-পাঠন কেন্দ্র গড়ে তোলাই ছিল অধ্যাপক সরকারের সারা জীবনের স্বপ্ন। এজন্যে প্রথম থেকেই তিনি উদ্যোগী হয়ে কাজ করেছেন। বিলাতে তিন বছর থাকাকালীন নিজের স্কলারশিপ ও অন্যান্য অর্জিত অর্থ সঞ্চয় করে তিনি বহু মূল্যবান (প্রায় কুড়ি হাজার টাকা, 1929 সালে) যন্ত্রপাতি কিনে এনেছিলেন। নিজের রসায়ন-চর্চার পীঠস্থান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কেই তিনি সেগুলি দান করে গেছেন। তাঁর দান যে যোগ্যপাত্রেই অর্পিত হয়েছে, সেটা প্রতিপন্ন করবার দায়িত্ব তাঁর উত্তরসূরীরা অবশ্যই পালন করবেন আশা করি।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের ত্রয়োবিংশ প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী

গত 28শে জুলাই অপরাহ্ণে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ভবনে 'কুমার প্রথমনাথ রায় বক্তৃতা-কক্ষে' বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান-কর্মী ও বিজ্ঞানানুরাগীদের উপস্থিতিতে পরিষদের ত্রয়োবিংশ প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর সত্যেন্দ্রনাথ সেন, প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পর্ষদের প্রধান অধিকর্তা ডক্টর আত্মা রাম এবং বিশিষ্ট অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন কলিকাতাস্থ বাংলাদেশ কূটনৈতিক মিশনের প্রধান জনাব মহম্মদ হোসেন আলী।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে শ্রীমঞ্জু ভট্টাচার্য কর্তৃক উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশনের পর সভাপতি ও বিশিষ্ট অতিথিদের মাল্যদান করা হয়।

পরিষদের কর্মসচিব ডক্টর জয়ন্ত বসু সমবেত সুধীমণ্ডলীকে স্বাগত অভ্যর্থনা জানান এবং পরিষদের সাংবাৎসরিক কাজের বিবরণ প্রদান করেন ('কর্মসচিবের নিবেদন' দ্রষ্টব্য)।

প্রধান অতিথি ডক্টর আত্মা রাম তাঁর ভাষণে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান প্রচারে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এই ধরণের প্রতিষ্ঠানকে সরকারের পক্ষ থেকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা বাঞ্ছনীয়। এই সাহায্য পাওয়ার তাঁদের নৈতিক অধিকার আছে। দুঃখের বিষয়, সরকারের তরফে সব সময় এই বিষয়ে যথেষ্ট সচেতনতা আছে বলে মনে হয় না। ডক্টর আত্মা রাম দ্ব্যর্থহীনভাবে মন্তব্য করেন, মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান প্রচার ছাড়া শিল্প ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে উন্নয়ন সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে তিনি জাপানের কথা উল্লেখ করেন। ডক্টর আত্মা রাম বাংলাতেই তাঁর ভাষণ প্রদান করেন।

বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু বক্তৃতা প্রসঙ্গে গত 23 বছর যাবৎ জনসাধারণের মধ্যে বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান প্রচারে পরিষদের ভূমিকার বিষয় উল্লেখ করেন এবং যাঁরা পরিষদের কাজে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। ডক্টর আত্মা রামের অভিমত সমর্থন করে তিনি বলেন, মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন ও প্রচার ছাড়া দেশের সত্যকার প্রগতি কখনও সাধিত হতে পারে না। যুদ্ধোত্তর জাপান ও জার্মানীর অভূতপূর্ব উন্নতির মূলে আছে মাতৃভাষার মাধ্যমে ব্যাপক বিজ্ঞান-চর্চা। পশ্চিম বঙ্গে সর্বোচ্চ স্তরেও বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। তিনি নিজে এম. এস-সি. ক্লাসে বাংলায় পড়িয়েছেন এবং তাতে কোন অসুবিধা হয় নি। আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিজ্ঞান শিক্ষায় মাতৃভাষার প্রয়োগ কাম্য। কেন্দ্রে হিন্দী ভাষাভাষীদের প্রাধান্য থাকায় তাঁরা কখনো কখনো হিন্দীকে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। কিন্তু সব আঞ্চলিক ভাষাকেই যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া উচিত।

বাংলাদেশের মুক্তি-সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতির প্রতীক হিসাবে বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষ থেকে অধ্যাপক বসু বাংলাদেশের সাহায্যার্থে জনাব হোসেন আলীর হস্তে 500 টাকা প্রদান করেন। প্রত্যুত্তরে জনাব আলী তাঁর ভাষণে বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন ও মুক্তি-সংগ্রামের পটভূমিকার কথা উল্লেখ করে বলেন, বাংলা-

দেশে পশ্চিম পাকিস্তানের জঙ্গী শাসকগোষ্ঠীর নৃশংস অত্যাচারের মধ্যে বিজ্ঞানের চরম অপপ্রয়োগ ঘটছে। সুতরাং এই ব্যাপারে প্রতিবাদ জানাতে বিজ্ঞানীদেরও একটি বিশেষ ভূমিকা



বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু পরিষদের পক্ষ থেকে কলিকাতাস্থিত বাংলাদেশ কূটনৈতিক মিশনের প্রধান জনাব হোসেন আলীর হস্তে বাংলাদেশের সাহায্যার্থে সংগৃহীত অর্থ প্রদান করছেন।

আছে। তিনি সমবেত বিজ্ঞানীদের নিকট আবেদন জানান, তাঁরা যেন বিশ্বের বিজ্ঞানী-সমাজকে এই বিষয়ে সচেতন করে তোলেন।

সভাপতি ডক্টর সেন তাঁর ভাষণে বলেন, অধ্যাপক বসুর নেতৃত্বে বিজ্ঞান পরিষদ বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানশিক্ষা প্রচলনের যে প্রয়াস করে এসেছেন, আজ তা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে গৃহীত হতে চলেছে। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমি কাউন্সিলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, আগামী বছরে যাঁরা এম. এস-সি.

ক্লাসে ভর্তি হবেন, তাঁরা বাংলা ভাষায় পরীক্ষা দিতে পারবেন। এই প্রসঙ্গে স্নাতকোত্তর শ্রেণীর উপযোগী বিজ্ঞানবিষয়ক বাংলা পাঠ্যপুস্তকের অভাবের কথা উল্লেখ করে তিনি প্রস্তাব করেন, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপকেরা যেন তাঁদের মাতৃভাষায় নিজ নিজ বিষয়ে অন্ততঃ একখানি পাঠ্যপুস্তক রচনা করে এই অভাব দূর করতে সাহায্য করেন। এই বিষয়ে সহযোগিতার জন্তে তিনি সমবেত সুধিগণের নিকট আবেদন জানান। গোঁড়ামি ত্যাগ করে পরিভাষার সমস্যার সম্মুখীন হলে বাংলায় উচ্চস্তরের পাঠ্যপুস্তক রচনায় বিশেষ কোন অসুবিধা হবে না বলে তিনি মনে করেন।

অনুষ্ঠান শেষে বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষ থেকে ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল সভাপতি, বিশিষ্ট অতিথি-বর্গ ও সমবেত সুধীমণ্ডলীকে ধন্তবাদ জ্ঞাপন করেন।

'মহেঞ্জোদারো ও প্রাচীন আর্য সভ্যতা' শীর্ষক আলোচনা

বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী উপলক্ষে অভেদানন্দ অ্যাকাডেমী অব কালচার-এর উদ্যোগে স্বামী শঙ্করানন্দ 31শে জুলাই পরিষদ ভবনে 'মহেঞ্জোদারো ও প্রাচীন আর্য সভ্যতা' সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন এবং এই সঙ্গে সিন্ধু সভ্যতা ও প্রাগৈতিহাসিক বৈদিক বৃহত্তর ভারত সম্পর্কে চিত্রাবলী প্রদর্শিত হয়। এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের ত্রয়োবিংশ প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী উপলক্ষে কর্মসচিবের নিবেদন

মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়, শ্রদ্ধেয় প্রধান অতিথি ডক্টর আত্মারাম মহাশয়, মান্তবর বিশিষ্ট অতিথি জনাব হোসেন আলি, উপস্থিত সভ্যবৃন্দ ও সমবেত ভদ্রমণ্ডলী, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের ত্রয়োবিংশ প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী অনুষ্ঠানে পরিষদের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের স্বাগত অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। আজকের এই সম্মেলনে যোগদান করে আপনারা পরিষদের দেশগঠনমূলক সাংস্কৃতিক প্রয়াসের প্রতি যে শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা প্রদর্শন করেছেন, তার জন্তে আপনাদের জানাচ্ছি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্তবাদ।

এই অনুষ্ঠানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়কে সভাপতিরূপে পেয়ে আমরা বিশেষ আনন্দ ও অনুপ্রেরণা লাভ করছি। অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ সেন একদিকে যেমন একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ অর্থনীতি-বিদ্, অন্তদিকে তেমনি উচ্চ শিক্ষার ধারক ও বাহক হিসাবে তাঁর নাম সুবিদিত। নিয়ত কর্ম ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি যে আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আজকের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন, এজন্তে আমরা তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ। আমরা আশা করি, পরিষদের আদর্শের বাস্তব রূপায়ণের পরিকল্পনাকে কিভাবে অধিকতর সার্থক করে তোলা যায়, সে বিষয়ে নির্দেশ দান করে তিনি আমাদের উৎসাহিত করবেন।

এই সম্মেলনে বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পর্ষদের প্রধান অধিকর্তা ডক্টর আত্মারাম মহাশয়কে প্রধান অতিথিরূপে পেয়ে আমরা অত্যন্ত গৌরব বোধ করছি। বিশিষ্ট বিজ্ঞানসাধকরূপে ডক্টর

আত্মা রামের নাম সুপরিচিত। আবার বিজ্ঞান শিক্ষা ও সাধারণভাবে বিজ্ঞান প্রসারের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিজ্ঞান পরিষদের প্রতি তাঁর যে সহমর্মিতা রয়েছে, তা আমাদের একটি মূল্যবান পাথেয়। পরিষদের কর্ম-প্রচেষ্টাকে কিভাবে আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত করে গড়ে তোলা যায়, সেই সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত মতামত জানতে পারলে আমরা অনুগৃহীত হব।

কলিকাতাস্থিত বাংলাদেশ মিশনের প্রধান জনাব হোসেন আলিকে আমাদের বিশিষ্ট অতিথি রূপে পেয়ে আমরা অত্যন্ত গর্বিত ও উৎসাহিত বোধ করছি। বাংলা ভাষা ও বাংলা সংস্কৃতির জন্যে প্রবহমান যে আন্দোলন বর্তমানে বাংলা দেশের মুক্তি-সংগ্রামের মধ্যে প্রমত্তা পদ্মার রূপ নিয়েছে, তার প্রতিভূ হিসাবে জনাব আলিকে পরিষদের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আদর্শ ও উদ্দেশ্য

দেশের সামগ্রিক উন্নতির জন্যে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞান ও ভাবধারার বিস্তার যে একান্ত আবশ্যক এবং একমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমেই যে তা সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব, এই উপলব্ধি থেকেই বহু খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ্‌দের প্রচেষ্টায় এবং অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সভাপতিত্বে 1948 সালে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসার সাধনই হলো বিজ্ঞান পরিষদের আদর্শ। এই আদর্শ পালনের জন্যে ঐ ভাষায় বিজ্ঞানবিষয়ক সাময়িক পত্রপত্রিকা প্রকাশ ও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাদি প্রণয়ন, বিজ্ঞানের গ্রন্থাগার, পাঠাগার, সংগ্রহশালা প্রভৃতি স্থাপন, বিজ্ঞান প্রদর্শনী, বিজ্ঞান-সম্মেলন এবং বিজ্ঞান-বিষয়ক বক্তৃতা ও আলোচনার ব্যবস্থা প্রভৃতি বিবিধ কর্মপন্থা নির্ধারিত করা আছে। গত 23 বছর যাবৎ পরিষদ এই কর্মপন্থা যথাসাধ্য অনুসরণ করবার কাজে ব্যাপৃত রয়েছে।

কার্য-বিবরণী

আলোচ্য বছরে (1970-71) পরিষদের আদর্শানুযায়ী বিভিন্ন কাজে আমরা কতখানি সাফল্য লাভ করেছি ও কিরূপ প্রতিবন্ধতার সম্মুখীন হয়েছি, সে বিষয়ে পরিষদের বার্ষিক কার্য-বিবরণী এখন আমি সংক্ষেপে বিবৃত করবো।

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা

পরিষদের প্রতিষ্ঠাকাল 1948 সাল থেকেই পরিষদের পরিচালনায় 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নামক মাসিক পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। 'কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর' এর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। বিজ্ঞানের নানাবিধ বিষয়ে প্রবন্ধ ও আলোচনা, বিজ্ঞান সংবাদ, প্রশ্নোত্তর প্রভৃতি বিভিন্ন পর্যায়ে বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্যাদি পত্রিকা-টিতে নিয়মিত পরিবেশিত হচ্ছে। কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তরে 'পারদর্শিতার পরীক্ষা' নামে একটি নূতন বিভাগ সম্প্রতি খোলা হয়েছে। পত্রিকাটির বর্তমান প্রকাশ-সংখ্যা 2300 কপি। নিছক বিজ্ঞানের একটি মাসিক পত্রিকার পক্ষে এই প্রকাশ-সংখ্যা নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর নয়। অধ্যাপক চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার মার্চ '71 সংখ্যা 'রামন-স্মৃতি' সংখ্যারূপে প্রকাশিত হয়েছিল। এই সংখ্যাটিতে অধ্যাপক রামনের বহুমুখী প্রতিভার একটি সম্পূর্ণ চিত্র উপস্থাপিত হয় এবং সংখ্যাটি বিদ্বৎসমাজের বিশেষ সমাদর লাভ করে।

গত পাঁচ বছর যাবৎ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যা বহু মূল্যবান প্রবন্ধ ও আকর্ষণীয় চিত্রের দ্বারা সুসমৃদ্ধ হয়ে নবকলেবরে প্রকাশিত হচ্ছে। এই সংখ্যার বৈশিষ্ট্য ও

উপযোগিতা লক্ষ্য করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ প্রতি বছর এর 1,400 কপি ক্রয় করে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগারে বিতরণের ব্যবস্থা করছেন। এই ব্যবস্থার জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের নিকট পরিষদ কৃতজ্ঞ, কেবল আর্থিক সাহায্যই নয়, পত্রিকাটির প্রচার ও প্রসারেও এরূপ সরকারী আনুকূল্য বিশেষ সহায়ক হয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট থেকে পত্রিকা প্রকাশ খাতে 1948 সাল থেকে প্রতি বছর 3,600 টাকার অর্থসাহায্য পরিষদ পেয়ে আসছে। গত 23 বছরে প্রকাশনের বিভিন্ন স্তরে মূল্য বৃদ্ধির ফলে পত্রিকা প্রকাশনের ব্যয় বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু আমাদের বহু আবেদন সত্ত্বেও বাৎসরিক অনুদানের পরিমাণ এযাবৎ বৃদ্ধি পায় নি। তবে আলোচ্য বছরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিষদকে পত্রিকা খাতে 5.000 টাকার এককালীন অনুদান মঞ্জুর করেছেন। এজন্যে আমরা সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পর্ষদ (C S I R) আলোচ্য বছরে পরিষদকে পত্রিকা প্রকাশনের জন্যে 5,000 টাকা অনুদান দিয়েছেন। এই সহযোগিতার জন্যে ঐ পর্ষদ পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ। আমরা একান্তভাবে আশা করি, পত্রিকাটি গুরুত্ব উপলব্ধি করে এর নিয়মিত প্রকাশ অব্যাহত রাখবার জন্যে এবং বিশেষতঃ এর মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে পর্ষদ বর্তমান বছরে অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করবেন।

শিক্ষাবিষয়ক গবেষণা ও শিক্ষণের জাতীয় সংস্থা (N C E R T) এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আলোচ্য বছরে পরিষদকে যথাক্রমে 2,000 টাকা ও 500 টাকার অনুদান দিয়ে আমাদের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর একটি অর্ধপৃষ্ঠাব্যাপী বিজ্ঞাপন পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যায় পরিবেশিত হয়েছে। যে সকল সংস্থা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে পরিষদের কার্যে সহযোগিতা করছেন, তাঁদের সকলকেই আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

উল্লিখিত সাহায্য সত্ত্বেও পত্রিকাটিকে আরও উন্নত করবার পথে আর্থিক অনটনই প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এজন্যে আপনাদের সকলের নিকট আমাদের আবেদন এই যে, পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি, বিজ্ঞাপন সংগ্রহ, অনুদান প্রাপ্তি প্রভৃতি বিষয়ে আপনারা আমাদের যথাসাধ্য সাহায্য করুন। আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতায় আমরা তাহলে পত্রিকাটিকে আরও শিক্ষাপ্রদ, আরও আকর্ষণীয় এবং আরও জনপ্রিয় করতে পারবো।

বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তক প্রকাশ

লোকরঞ্জক পুস্তক :—বিজ্ঞানবিষয়ক লোকরঞ্জক পুস্তক প্রকাশ ও সেগুলি স্বল্পমূল্যে পাঠকগণকে পরিবেশন করা পরিষদের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের উদ্দেশ্যে এই সব পুস্তক ব্যয়ানুপাতে অতি স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করা হয়ে থাকে। এটা সম্ভব হয় প্রধানতঃ সরকারী অর্থানুকূল্যে। পরিষদ এযাবৎ বিজ্ঞানের মোট 29 খানি পুস্তক প্রকাশ করেছে।

আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, শ্রীজিতেন্দ্রকুমার গুহ কর্তৃক রচিত ও পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত 'মহাকাশ পরিচয়' শীর্ষক পুস্তকটি বর্তমান বছরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেছে। এই পুস্তকটিতে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও মহাকাশ অভিযান সম্পর্কিত বিবরণাদি লিপিবদ্ধ হয়েছে। বার্ষিক 'রাজশেখর বসু স্মৃতি' বক্তৃতায় অধ্যাপক সতীশরঞ্জন খাস্তগীর কর্তৃক প্রদত্ত 'মেঘ ও বিদ্যুৎ' বিষয়ে ভাষণটি পুস্তকাকারে প্রকাশের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে। ঐ বক্তৃতামালায় অধ্যাপক মহাদেব দত্ত কর্তৃক প্রদত্ত 'যোগ সংখ্যা-

রন' শীর্ষক ভাষণটিও শীঘ্রই পুস্তাকাকারে প্রকাশিত হবে। শ্রীদ্বিজেশচন্দ্র রায় কর্তৃক রচিত 'অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন' নামক গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

আলোচ্য বছরে কলিকাতার সুবিখ্যাত প্রতিষ্ঠান ওরিয়েণ্ট লংম্যান্স কোম্পানী পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত লোকরঞ্জক পুস্তকাবলী পরিবেশনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তবে পরিষদের সদস্যগণ যথারীতি 25% কমিশনে পরিষদের দপ্তর থেকে পুস্তকগুলি ক্রয় করতে পারেন।

পাঠ্যপুস্তক :—পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নির্ধারিত পাঠ্যসূচী অনুসারে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের নবম ও দশম শ্রেণীর জন্যে পরিষদ কর্তৃক প্রণীত 'বিজ্ঞান বিকাশ' নামক সাধারণ বিজ্ঞানের একটি পাঠ্যপুস্তক গত দু'বছর যাবৎ প্রচলিত হয়েছে। বিদ্যালয়গুলিতে বিজ্ঞানশিক্ষার মান উন্নত করবার উদ্দেশ্যে এই পুস্তক রচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পুস্তকটি প্রকাশ করেছেন কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ প্রকাশক প্রতিষ্ঠান ম্যাকমিলান কোম্পানী। আনন্দের বিষয়, গত দু'বছরে পুস্তকটির প্রায় 24,400 কপি বিক্রয় হয়েছে এবং বর্তমান বছরে এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বাংলা ভাষায় উচ্চশিক্ষার উপযোগী পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন বা পরিভাষা রচনার প্রচেষ্টার কথা প্রায়শঃ শুনতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞান পরিষদের আদর্শানুগ এই সব প্রচেষ্টায় পরিষদ আনন্দিত এবং বিজ্ঞানবিষয়ক পাঠ্যপুস্তক বা পরিভাষা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সক্রিয় সহযোগিতা করবার জন্যে পরিষদ সর্বদাই আগ্রহী।

গ্রন্থাগার ও পাঠাগার

বিজ্ঞানবিষয়ক বিভিন্ন পুস্তক ও পত্রিকাদি পাঠে জনসাধারণকে সুযোগ দানের উদ্দেশ্যে পরিষদ কর্তৃক একটি গ্রন্থাগার ও একটি পাঠাগার বহুদিন যাবৎ পরিচালিত হচ্ছে, তবে অর্থাভাব ও স্থানাভাবের জন্যে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থাগার বা পাঠাগার স্থাপন করা পূর্বে সম্ভব হয় নি। 1969 সালে পরিষদের নিজস্ব ভবন নির্মিত হবার পর পরলোকগত ব্যারিষ্টার অমরেন্দ্রনাথ বসুর স্মৃতির উদ্দেশ্যে তাঁর পরিবারের দানে পরিষদের পাঠাগারটি গত বছর থেকে 'অমরেন্দ্রনাথ বসু স্মৃতি' পাঠাগাররূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। পাঠাগারটিতে বিজ্ঞানবিষয়ক বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সংবাদপত্রাদি নিয়মিত রাখবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পরিষদের গ্রন্থাগারটিকেও সম্প্রতি নূতনভাবে সজ্জিত করা হচ্ছে।

একথা আমরা সকলেই জানি যে, পাঠ্যপুস্তকের অভাবে অনেক দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্রের উচ্চ শিক্ষার ব্যাঘাত ঘটে। বিজ্ঞানশিক্ষার ক্ষেত্রে এই অসুবিধা দূর করবার জন্যে আগামী বছর পরিষদের গ্রন্থাগারে একটি পাঠ্যপুস্তকের বিভাগ খোলবার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

বক্তৃতা, আলোচনা ও চলচ্চিত্র-প্রদর্শন

গত বছর 19শে জুন পরিষদ ভবনে নবম বার্ষিক 'রাজশেখর বসু স্মৃতি' বক্তৃতায় 'ভারতের কৃষি সমস্যা' শীর্ষক ভাষণ প্রদান করেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য ডক্টর সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায়। 5ই অগাষ্ট, '70 তারিখে ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র 'করোনারী অক্লুশন' সম্পর্কে একটি বক্তৃতা দেন এবং কলিকাতাস্থিত মার্কিন তথ্য কেন্দ্রের (U S I S) সৌজন্যে ঐ বিষয়ে চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। পশ্চিম বঙ্গের বহরমপুর থেকে 'বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা' নামক যে পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে, তার বর্ষপূর্তি উপলক্ষে গত ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত বিজ্ঞানবিষয়ক আলোচনা-সভা ও আলোচনা-চক্রে পরিষদের পক্ষ থেকে বর্তমান বক্তার যোগদান করবার সৌভাগ্য হয়েছিল।

বর্তমান বছরের 16ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতার চিত্তরঞ্জন জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা-কেন্দ্রের অধিকর্তা ডক্টর সন্তোষ মিত্র পরিষদ ভবনে স্লাইড সহযোগে 'ক্যান্সার ও তার প্রতিকার' শীর্ষক একটি লোকরঞ্জক বক্তৃতা প্রদান করেন। মেদিনীপুর জেলার তমলুকের নিকট নাইকুড়ি ঠাকুরদাস ইনষ্টিটিউশনে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের উদ্যোগে এবং বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ও বিড়লা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল অ্যাণ্ড টেক্‌নলজিক্যাল মিউজিয়ামের সহযোগিতায় গত এপ্রিল মাসে তিন দিনব্যাপী যে বিজ্ঞানবিষয়ক আলোচনা-সভা ও বিজ্ঞান-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়,

বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষ থেকে সেখানে অংশ গ্রহণ করেন পরিষদের অন্যতম সহ-সভাপতি অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী, সহযোগী কর্মসচিব শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীশ্যামসুন্দর দে, কার্যকরী সমিতির অন্যতম সদস্য শ্রীশঙ্কর চক্রবর্তী এবং পরিষদের কর্মসচিব হিসাবে বর্তমান বক্তা। সম্প্রতি 16ই জুলাই, '71 তারিখে পরিষদ ভবনে দশম বার্ষিক 'রাজশেখর বসু স্মৃতি' বক্তৃতায় 'সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব' সম্পর্কে ভাষণ দেন খড়্গপুরের ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনলজির অধ্যাপক গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানের জঙ্গীশাহীর নৃশংস বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে এবং বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতি ও সমর্থন জ্ঞাপন করে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে গত 16ই এপ্রিল পরিষদ ভবনে পশ্চিম বঙ্গের বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান-কর্মী ও বিজ্ঞানানুরাগী জনসাধারণের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরিষদের তত্ত্বাবধানে যে বাংলাদেশ সাহায্য তহবিল খোলা হয়, তাতে সংগৃহীত মোট 500 টাকা বাংলাদেশের সাহায্যার্থে আজ কলিকাতাস্থিত বাংলাদেশ মিশনের প্রধান জনাব হোসেন আলির হস্তে অর্পণ করা হবে।

হাতে-কলমে বিভাগ

পরিষদের হাতে-কলমে বিভাগে বিজ্ঞানের সহজ পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বৈজ্ঞানিক মডেল তৈরি প্রভৃতি কাজের জন্যে সুযোগ-সুবিধা আছে। গত এপ্রিল মাসে তমলুকের নিকট নাইকুড়ি ঠাকুরদাস ইনস্টিটিউশনে অনুষ্ঠিত যে বিজ্ঞান-প্রদর্শনীর কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, সেই প্রদর্শনীতে এই বিভাগের পক্ষ থেকে যোগদান করা হয়। বিড়লা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাণ্ড টেক্‌নলজিক্যাল মিউজিয়ামের বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে গত মে মাসে আয়োজিত বিজ্ঞান-প্রদর্শনীতেও উক্ত বিভাগ থেকে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা হয়েছিল। অনিবার্য কারণবশতঃ কিছুকাল যাবৎ বিভাগটি নিয়মিত খোলা রাখা সম্ভব হচ্ছিল না। যাহোক, বর্তমানে বিভাগটির কাজকর্ম আবার স্বাভাবিকভাবে চলতে সুরু করেছে।

পরিষদ ভবন নির্মাণ

1969 সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পরিষদ ভবনের ভূ-গর্ভতল ও প্রথম তলের নির্মাণ-কার্য সমাপ্ত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কুমার প্রমথনাথ রায় চ্যারিটেবল ট্রাষ্ট, পরলোকগত অধ্যাপক নীরেন রায় এবং অন্যান্য শুভেচ্ছার্থীদের দানে এই নির্মাণ-কার্য সম্ভব হয়েছে। এযাবৎ যাঁরা পরিষদের গৃহ-নির্মাণের জন্যে দান করেছেন, তাঁদের সকলকে আমাদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

পরিষদের পরিকল্পিত গৃহের অনুমোদিত নক্সা অনুযায়ী দ্বিতল ও ত্রিতল সুসম্পন্ন করবার জন্যে প্রয়োজন হবে আরও প্রায় 1,25,000 টাকা। এই অর্থ যাতে অবিলম্বে সংগৃহীত হয়, তার জন্যে পরিষদের গৃহ-নির্মাণ তহবিলে মুক্তহস্তে দান করতে আপনাদের নিকট আমরা সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি।

উপসংহার

আধুনিক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য ও উন্নতি বিজ্ঞানের জ্ঞান ও ভাবধারার উপর নির্ভর করে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও শিল্পসমৃদ্ধিই জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের নিয়ামক। সে জন্যে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের আদর্শ নিয়েই বিজ্ঞান পরিষদ তার সাংস্কৃতিক কর্মপ্রচেষ্টাগুলি পরিচালিত করছে। দেশের ভবিষ্যৎ গঠনে পরিষদের মত জনশিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ও কর্তব্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা মনে করি। আর সেই সঙ্গে আমরা নিশ্চিতভাবে এই বিশ্বাস রাখি যে, আপনাদের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতায় পরিষদের ভবিষ্যৎ কর্মপ্রচেষ্টা আরও সুদৃঢ় ও ব্যাপক হয়ে উঠবে এবং পরিষদ অদূর ভবিষ্যতে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত জাতীয় কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে।

আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এইখানে শেষ করছি।

জয়ন্ত বসু
কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

কলিকাতা
28 জুলাই, 1971

পুস্তক-পরিচয়

পরমাণু জিজ্ঞাসা—এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় ও শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশকঃ ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, 17, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ, কলিকাতা-13 ; মূল্যঃ ছয় টাকা।

পরমাণু-বিজ্ঞান বর্তমান সভ্যতার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে বিজ্ঞানের যে প্রগতি আবহমানকাল থেকে চলে আসছে—বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই দ্রুত-গতিতে তার মোড় ফিরে গেছে। এই দ্রুত পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে তেজস্ক্রিয়তা, পরমাণুর নিউক্লিয়াস্ তথা পরমাণু-বিজ্ঞানের বহু যুগান্তকারী আবিষ্কারের সহায়তায়। জটিল সেই সব আবিষ্কারের অন্তর্নিহিত বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণা মানুষের কাছে কিছুটা দুরধিগম্য হলেও এই সব আবিষ্কারের ফলাফল সাধারণ মানুষের কাছে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় উপকরণের মাধ্যমে অতি-পরিচিত হয়ে পড়েছে। আমরা যখন বিদ্যুৎ ব্যবহার করি, তা জলশক্তি থেকে আসছে, না পরমাণুশক্তি থেকে—এসব চিন্তা করি না। কিন্তু বিজ্ঞ ব্যক্তিরা যখন বলেন ভারতের কয়লা সম্পদ ক্রমশঃ ফুরিয়ে আসছে, পরমাণুশক্তির উপরই ভরসা রাখতে হবে, তখন আমাদের একটু ভাবতে হয়। দেশের উন্নয়নে বিজ্ঞানী যন্ত্রবিদ্‌দের সঙ্গে সাধারণ মানুষও বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের চিন্তায় অংশীদার না হলে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব হয় না। তাই অধুনা সব দেশেই সঙ্গীত, কলা বা শিল্পের মত বিজ্ঞান সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হয়ে পড়েছে। বিজ্ঞানের জটিল দিকটা বাদ দিয়ে সাধারণ মানুষের বোধগম্য ভাষায় বিজ্ঞানের প্রচার তাই অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। বিদেশে বড় বড় বিজ্ঞানীরা জনপ্রিয় বিজ্ঞান-সাহিত্য রচনায় যথেষ্ট সময় দেন, মানবসমাজের কল্যাণে সেই সমস্ত রচনার গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান রচনার ইতিহাসও কিছুটা প্রাচীন সন্দেহ নেই—তবু জনসংখ্যার তুলনায় বাংলায় বিজ্ঞানের বই যথেষ্ট নয়। সাধারণের হৃদয়গ্রাহী করে বিজ্ঞানের জটিল তত্ত্ব বাংলায় উপস্থাপিত করা, পরিভাষার দুর্লভতা প্রভৃতি অসুবিধাই এর কারণ বলা যেতে পারে। বর্তমান 'পরমাণু জিজ্ঞাসা' পুস্তকটি বাংলায় বিজ্ঞান-সাহিত্যে একটি উৎকৃষ্ট সংযোজন সন্দেহ নেই, পরন্তু ভাষার লালিত্যে ও রচনাশৈলীর সরসতায় এই বইখানি দুরূহ পরমাণু-বিজ্ঞানের আধুনিকতম সমস্যাগুলিকে সাধারণের কাছে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হবে।

'পরমাণু জিজ্ঞাসা' পুস্তকে বারোটি অধ্যায় রয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে পরমাণু-বিজ্ঞানের অতি প্রাচীন ঐতিহাসিক পটভূমিকাটি আলোচিত হয়েছে। গ্রীক ও ভারতীয় দর্শনে পরমাণু পরি-কল্পনার যে ধাঁচ ছিল, ইতিহাস হিসাবে তার কিছু মূল্য রয়েছে। কিন্তু দর্শনের পরমাণু ও আধুনিক বিজ্ঞানের পরমাণুতে আকাশপাতাল গরমিল। বৈশেষিক দর্শনের একটি সূত্র হলো 'অন্তগ্রাস্ত্যেভ্যো বিশেষেভ্যঃ' অর্থাৎ ক্ষুদ্রতম যে অন্তঃদ্রব্য (পরমাণু সকল) তা কেবল বিশেষ, তা সামান্য হয় না। দার্শনিক মননে একে পরমাণুর অস্তিত্বের আভাস বলা যায়। কিন্তু এখন যে পরমাণু অমিত শক্তির উৎস হয়ে বিশ্বমঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছে, তার সঙ্গে দর্শনের এই পরমাণুর মিল নেই বললেই চলে, তবু এই প্রাচীন ইতিহাস অনেকের কৌতূহল চরিতার্থ করবে। তৃতীয় অধ্যায়ে আধুনিক পরমাণু-বিজ্ঞান ও প্রাচীন কল্পনার মধ্যবর্তীকালের সেতুবন্ধনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের আলোচনায় আধুনিক বিজ্ঞা-

নের গোড়াপত্তন কি করে হলো পাঠকেরা তা অনায়াসে বুঝতে পারবেন।

পরমাণু নয়, পরমাণুর কেন্দ্রীন হলো আসল নায়ক। এর ভূমিকা স্পষ্টতঃ আরম্ভ হয়েছে বেকেরেলের স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কারের পর। চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে তেজস্ক্রিয়তা ও পরমাণু সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা থেকে পরমাণু ও তার কেন্দ্রীন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। চতুর্থ অধ্যায়ে মৌলিক পদার্থের তালিকা বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয়। তেজস্ক্রিয় ও স্বাভাবিক সমস্ত আইসোটোপগুলির বিশদ তালিকা সংযোজনসহ অবশ্যই একটি পূর্ণাঙ্গ পুস্তক রচনার অবকাশ আছে। ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে কি ভাবে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরি করা যায়, ত্বরণ যন্ত্র ও রিয়্যাক্টর প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম কলিকাতায় যে ত্বরণ যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়—ভারতের পরমাণু-বিজ্ঞান গবেষণায় তার অবদান অপরিসীম। ট্রম্বের রিয়্যাক্টর ও কলিকাতায় পরিকল্পিত বৃহত্তর ত্বরণ যন্ত্র ভারতের পরমাণু-বিজ্ঞানের প্রসারে কি ভূমিকা নিয়েছে ও ভবিষ্যতে নেবে—তার ইঙ্গিত দেশবাসীর কাছে সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। এই অধ্যায়গুলিতে তার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রয়েছে। নবম অধ্যায়ে পরমাণু বোমার ভয়াবহতা ও তা থেকে আত্মরক্ষার উপায় সম্পর্কে যে মনোজ্ঞ তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে, তা কেবল সাধারণের কাছে নয়, অনেক বিজ্ঞানীদের কাছেও অজানা ছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, অন্যতম লেখক শ্রী চট্টোপাধ্যায় পরমাণু বোমাজনিত তেজস্ক্রিয়তার পরীক্ষা হাতে-কলমে করেছেন, তাই এই সম্পর্কে তাঁর বিজ্ঞতা আলোচনায় সুপরিস্ফুট হয়েছে। দশম ও একাদশ অধ্যায়ে ভয়াবহ পরমাণুশক্তির মানবহিতে ব্যবহার ও সেই পরিকল্পনায় ভারতের অগ্রগামিতা সম্পর্কে যে আলোচনা রয়েছে, তাতে ভরসা হয়, যে বিজ্ঞানী গোষ্ঠী এই দুরূহ গবেষণায় নিয়োজিত থেকে দেশকে সামগ্রিক উন্নয়নে সচেষ্ট, তাঁদের কাজের সুফল ভারতকে জগৎ সভায় পরমাণু-বিজ্ঞানে একদিন প্রতিষ্ঠিত করবে।

উপসংহারে কেন্দ্রীন সংযোজন প্রক্রিয়ায় হাইড্রোজেন বোমা এবং প্লাজ্মা গবেষণায় এই প্রক্রিয়াকে পরমাণুশক্তি আহরণে নিয়োজিত করা, প্লাজ্মা থেকে সোজাসুজি বিদ্যুৎ আহরণের কিছুটা আভাস দেওয়া হয়েছে। এই সব গবেষণা এখনও এমন সাফল্য নিয়ে আসে নি, যা থেকে ভবিষ্যতের জন্যে কিছু ভরসা পাওয়া যেতে পারে। তবু এই বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনা আর একটু বিশদ হলে চিত্তাকর্ষক হতো সন্দেহ নেই। পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত পরিভাষা ও বিজ্ঞানীদের পরিচয় একটি প্রয়োজনীয় সংযোজন।

বাংলা ভাষায় এরকম স্বচ্ছন্দ ও সাবলীলভাবে লেখা অনেক জটিল তত্ত্বের সমাবেশ রয়েছে—এরকম বই দুর্লভ। লেখকদ্বয় রচনাশৈলীতে যে মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন, তা বাংলায় বিজ্ঞান-সাহিত্যে পথপ্রদর্শক হবে সন্দেহ নেই। পাঠক-সাধারণ তথা বিজ্ঞানীরা বইটি পড়ে যথেষ্ট উপকৃত হবেন। এই ধরণের বই পাঠকের কাছে যতই সমাদৃত হবে, ততই মঙ্গল।

শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়ের লেখা সাহিত্যে সুপরিচিত। বিজ্ঞানের রচনাতেও যে তিনি সমান পারদর্শিনী, এই পুস্তকটি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

বইটিতে 2/1টি ছাপার ভুল লক্ষ্য করা গেল। আশা করি পরবর্তী সংস্করণে সেগুলি সংশোধিত হবে। বইটির প্রচ্ছদপট, বাঁধাই ও রেখাচিত্রগুলি চমৎকার হয়েছে।

সূর্যেন্দুবিকাশ কর*

---

*সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

ডাইনোসোরের অবলুপ্তির কারণ

জীব-বিজ্ঞানীদের মতে আজ থেকে প্রায় 50 কোটি বছর আগে পৃথিবীতে স্থলচর প্রাণীর আবির্ভাব ঘটেছিল, যদিও জলে প্রাণ সৃষ্টি হয়েছিল আরও অন্ততঃ 150 কোটি বছর আগে। বিবর্তন বাদ অনুসারে বিজ্ঞানীরা এই 50 কোটি বছরকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন :—(1) পুরাজীবীয় (Palaeozoic) যুগ, (2) মধ্যজীবীয় (Mesozoic) যুগ এবং (3) নবজীবীয় (Cainozoic) যুগ। পুরাজীবীয় যুগের আয়ু প্রায় 30 কোটি বছর। এই সময়ে ডাঙ্গার জীব বলতে ছিল শক্ত খোলসধারী কাঁকড়াজাতীয় প্রাণী এবং কেঁচোজাতীয় অমেরুদণ্ডী প্রাণী আর ডানাওয়ালা নানা প্রকার পতঙ্গ। আর ছিল ফার্নজাতীয় নানা রকম উদ্ভিদ। এই যুগের শেষের দিকে এবং মধ্যজীবীয় যুগের প্রারম্ভে দেখা দিল সরীসৃপজাতীয় মেরুদণ্ডী প্রাণী। জীবন-সংগ্রামে অমেরুদণ্ডী প্রাণীরা শক্তিশালী সরীসৃপদের কাছে পরাজিত হলো এবং তাদের সংখ্যাও ক্রমে কমতে সুরু করলো। সুরু হলো মেরুদণ্ডী সরীসৃপদের আধিপত্য। প্রথম দিকে এরা ছিল আকারে বেশ ছোট—আধুনিক টিকটিকি বা গিরগিটির কিছু বড় সংস্করণ মাত্র। কিন্তু ক্রমশঃ এদের আকার

ভীষণভাবে বাড়তে লাগলো। ফলে বেশ কিছুকাল পরে এই সব ক্ষুদ্রাকৃতির সরীসৃপজাতীয় প্রাণীরা পরিণত হয় এক শ্রেণীর অতিকায় প্রাণীতে। এরাই ডাইনোসোর নামে পরিচিত। মধ্যজীবীয় যুগে এদেরই ছিল আধিপত্য। এদের মত বিশালাকার বলশালী হিংস্র জীব পৃথিবীতে আর কোনও দিন জন্মায় নি। এই সময়ের উদ্ভিদগুলিও যেন প্রাণীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে উঠেছিল। পৃথিবী জুড়ে ছিল এই বিরাটাকৃতির গাছ আর অতিকায় প্রাণীদের রাজত্ব। কেবল ডাঙ্গাতেই নয়, জলে এবং আকাশেও এই সব দানব-সরীসৃপেরা আধিপত্য বিস্তার করেছিল। এদের মধ্যে পাখীর মত যারা আকাশে উড়ে বেড়াতো, তাদের বলা হতো টেরোড্যাক্‌টিল। মধ্যজীবীয় যুগ চলেছিল প্রায় 10 থেকে 12 কোটি বছর ধরে। এই যুগের শেষের দিকে স্তন্যপায়ী জীবের আবির্ভাব ঘটে। এর পর থেকেই তাদের প্রাধান্য বিস্তার সুরু হয়। স্তন্যপায়ী জীবের আবির্ভাবের কিছুকাল বাদেই অর্থাৎ মধ্যজীবীয় যুগের শেষভাগ থেকেই ডাইনোসোরেরা ক্রমশঃ পৃথিবী থেকে অদৃশ্য হতে থাকে। 100 ফুট লম্বা ডিপ্লাডোকাস বা জাইগান্টোসোরাস, উড়ন্ত টেরোড্যাক্‌টিল ও আর্কিওপ্‌টেরিক্স, অতিকায় মাছ ইক্‌থিওসোরাস, যাদের দাপটে পৃথিবী টলমল করতো, সকলেই পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে গেল। জীবজগতে এতবড় দুর্ঘটনা আর ঘটে নি। ডাইনোসোরদের আবির্ভাব ছিল যেমন বিস্ময়কর ঘটনা, অবলুপ্তিও তার চেয়ে কিছু কম নয়। প্রাগৈতিহাসিক জীবেরা কেন পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে গেল, এই সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত। আজ পর্যন্ত এই বিষয়ে বিজ্ঞানীরা যতগুলি কারণ দেখিয়েছেন, সেগুলিকে ছয় ভাগে ভাগ করা যায়—(1) প্রাকৃতিক বিপর্যয়, (2) জলবায়ু, (3) রোগ, (4) খাদ্যের স্বল্পতা, (5) স্তন্যপায়ীদের আবির্ভাব, (6) প্রাকৃতিক নির্বাচন।

(1) অনেকে মনে করেন প্রাকৃতিক দুর্যোগই সরীসৃপদের অবলুপ্তির প্রধান কারণ; অর্থাৎ ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, নতুন জলভাগ বা স্থলভাগের জন্ম—এ সবই ঐ দুর্ঘটনার জন্যে দায়ী। এই মতবাদ বহু-প্রচলিত হলেও এর বিপক্ষে অনেক যুক্তি দেখানো যায়। প্রথমতঃ ভূ-বিজ্ঞানীদের মতে—ভূ-কম্পন, অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি দুর্যোগের সম্ভাবনা বর্তমানের তুলনায় সে যুগে বেশী ছিল—একথা বলা যায় না। কাজেই এর ফলে সারা পৃথিবীর সরীসৃপ-জগৎ ধ্বংস হওয়াও অসম্ভব। অবশ্য এর মধ্যে পৃথিবীর স্থলভাগ ও জলভাগের প্রচুর পরিবর্তন হয়েছে এবং বহু নতুন পর্বত, সমুদ্র ও মহাদেশের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এই সম্পর্কে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, ভূপৃষ্ঠের কোনও পরিবর্তনই হঠাৎ আসে না। তার প্রস্তুতি চলে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে। কাজেই সরীসৃপেরা যে ধীরে ধীরে এই পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারে নি—একথা মনে করবার কোনও কারণ নেই। তাছাড়া এই সমস্ত দুর্যোগ সব যুগেই সমান ছিল। অপেক্ষাকৃত দুর্বল পুরাজীবীয় যুগের প্রাণীরা এই সব বিপর্যয়ের মধ্য দিয়েও তাদের বংশধারা অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। আজকের চিংড়ি, কাঁকড়া, মাকড়সা, কেন্নো, ফড়িং এদেরই উত্তর

পুরুষ। সুতরাং কেবল প্রাকৃতিক বিপর্যয়ই ডাইনোসোর গোষ্ঠীর অবলুপ্তির একমাত্র কারণ নয়।

(2) এরপর জলবায়ু। মধ্যজীবীয় যুগের শেষের দিকে ডাইনোসোরদের বিলুপ্তির সময়ে পৃথিবীর উষ্ণযুগ শেষ হয়ে আসছিল এবং আসন্ন হিমযুগের প্রস্তুতি চলছিল। কিন্তু এই হিমযুগ আসবার আগেই ডাইনোসোরেরা পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে, খুব বড় রকমের জলবায়ুর পরিবর্তন তাদের সহ্য করতে হয় নি। তাছাড়া বর্তমানে রবডার্ভ প্রমাণ করেছেন যে, শীতল-রক্তের প্রাণীদের মস্তিষ্কেও তীক্ষ্ণ অনুভূতিশীল তাপকেন্দ্র বর্তমান আছে। সুতরাং পৃথিবীর জলবায়ু ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হতে সুরু করলেও সে যুগের সরীসৃপদের খুব একটা অসুবিধা হবার কথা নয়।

(3) আমরা জানি, অনেক সময় সংক্রামক ব্যাধিঘটিত মড়কের ফলে বহু জীব ধ্বংস হয়। সে যুগের ডাইনোসোরেরাও যে অনেক রোগে আক্রান্ত হতো, একথা জানা যায় তাদের জীবাশ্ম থেকে। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে, মধ্যজীবীয় যুগের শেষের দিকে যে স্তন্যপায়ী জীবদের আবির্ভাব হয়, তারাও নিশ্চয়ই এই সব রোগের হাত থেকে মুক্তি পায় নি। সুতরাং সে যুগে যদি পৃথিবীতে সত্যই কোনও সাংঘাতিক মড়কের সৃষ্টি হতো, তবে তার ফলে স্তন্যপায়ী জীবেরাও লুপ্ত হয়ে যেত। কাজেই রোগ-জীবাণুর আক্রমণে কেবল সরীসৃপ শ্রেণী বিলুপ্ত হয়ে গেল—এই মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়।

(4) অনেকে বলেন, পৃথিবীতে খাদ্যের অভাব ঘটায় অতিকায় প্রাণীরা জীবনধারণ করতে পারে নি। একথা সত্য যে, ফার্নজাতীয় গাছের অভাবে ডাইরোসোরেরা কোষ্ঠবদ্ধতা রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। ডাঙ্গার প্রাণীদের পক্ষে খাদ্যের অপ্রাচুর্য দেখা দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু এই অভাব ছিল পৃথিবীর কয়েকটি অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। পৃথিবীর সমস্ত সরীসৃপদের কাছে এটা মারাত্মক হয়ে ওঠে নি। তাছাড়া সমুদ্রের অধিবাসী ইক্‌থিওসোরাস, প্লেসিওসোরাস প্রভৃতি সরীসৃপদের খাদ্য হিসাবে মাছ বা জলজ উদ্ভিদের কিছুমাত্র অভাব ঘটে নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের সংখ্যা দ্রুত হারে কমতে সুরু করেছিল।

(5) কোন কোন জীব-বিজ্ঞানী বলেন, স্তন্যপায়ী জীবদের সঙ্গে সরীসৃপেরা এঁটে উঠতে পারে নি বলেই তাদের পতন। যেমন, পুরাজীবীয় যুগের শেষভাগে সরীসৃপেরা পতঙ্গদের পরাস্ত করে পৃথিবী দখল করেছিল। আবার কারও কারও মতে, স্তন্যপায়ীরা সরীসৃপদের ডিম খেয়ে ফেলতো বলেই সরীসৃপদের জন্মের হার ভীষণভাবে কমে যায়।

প্রথমতঃ মধ্যজীবীয় যুগের শেষ ভাগে যখন স্তন্যপায়ী প্রাণীর প্রথম আবির্ভাব ঘটে, তখন তারা ছিল নিতান্তই দুর্বল। যদিও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে তারা যতটা খাপ খাওয়াতে পেরেছিল, সরীসৃপেরা তা পারে নি। তবুও ক্ষুদ্রাকৃতি স্তন্যপায়ীদের কাছে অতিকায় সরীসৃপদের হেরে যাবার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। বরং বর্তমানে প্রমাণ পাওয়া

গেছে যে, স্তন্যপায়ীরা পাহাড়ের গুহা প্রভৃতি আশ্রয় করে কোন রকমে ডাইনোসোরদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করে বেঁচে থাকতো। দ্বিতীয় কথা—এখনও বনে-জঙ্গলে বিভিন্ন জন্তু একে অপরের ডিম খেয়ে ফেলে। কিন্তু তার জন্যে কোনও জীববংশ লুপ্ত হয়ে যায় না। তাছাড়া ইক্‌থিওসোরাস ও এই জাতীয় আরও সরীসৃপদের সরাসরি বাচ্চা হতো; ডিম পাড়বার প্রয়োজন ছিল না। তাছাড়া সে যুগের বিশালাকৃতির টেরোড্যাক্টিলেরা দলবেঁধে তাদের ডিম পাহারা দিত বলে জানা গেছে। কাজেই সরীসৃপদের বিলুপ্তির জন্যে স্তন্যপায়ীদের আক্রমণ আংশিক দায়ী হলেও পুরাপুরি নয়।

(6) আধুনিক বিজ্ঞানীদের মতে, জীবের বিবর্তনের নিয়ম অনুযায়ী স্বাভাবিক ভাবেই ডাইনোসরদের অবলুপ্তি ঘটেছে। বাইরের কোনও কারণ এর জন্যে দায়ী নয়। বিজ্ঞানী উড্‌ওয়ার্ড বলেন যে, জাতি হিসাবে তাদের জীবনীশক্তিতে ঘুণ ধরেছিল বলেই তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। মধ্যজীবীয় যুগের শেষ ভাগে সরীসৃপদের মধ্যে কয়েকটি অস্বাভাবিক লক্ষণ দেখা যায়, যেমন—অতি বৃদ্ধি, পাখ্‌নার আকারে মেরুদণ্ডের বিস্তার, দন্তহীনতা প্রভৃতি। বিজ্ঞানীরা বলেন, পিটুইটারী এবং হর্মোন-নিঃসারক অন্যান্য গ্রন্থি-গুলির কর্মকারিতায় বিশৃঙ্খলার জন্যেই এরূপ ঘটেছিল। এর ফলে ক্রমে সরীসৃপদের প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পায় ও তারা দ্রুত অবলুপ্তির পথে এগিয়ে চলে। প্রত্যেক প্রাণীর জীবনে যেমন শৈশব-যৌবন-বার্ধক্য আছে, তেমনি আছে জাতির জীবনে। বংশ-বৃদ্ধির অক্ষমতা ডাইনোসোর গোষ্ঠীর বার্ধক্যের নিদর্শন। ডারউইনের মতবাদ অনুসারে প্রাকৃতিক নির্বাচনে অধিকতর সক্ষম স্তন্যপায়ী প্রাণীদের আবির্ভাবের ফলে পৃথিবীতে সরীসৃপদের প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছিল। ফলে প্রাকৃতিক নিয়মে তাদের জাতিগত জীবনে এলো বার্ধক্য; অর্থাৎ ডাইনোসোরদের অবলুপ্তি কোনও অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়, বিবর্তনের স্বাভাবিক নিয়মেই এটা ঘটেছে। বর্তমান বিজ্ঞানীমহলে এই মতবাদেরই প্রাধান্য দেখা যাচ্ছে।

শ্রীচন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়

পারদর্শিতার পরীক্ষা

বুদ্ধির সমস্যা সমাধানে তুমি কত পারদর্শী, তা বোঝবার জন্যে নীচে 5টি প্রশ্ন দেওয়া হলো। উত্তর দেবার জন্যে মোট সময় 8 মিনিট। প্রতিটি প্রশ্নে 20 করে নম্বর আছে। যে প্রশ্নগুলির দু'টি ভাগ রয়েছে, তাদের প্রত্যেকটি ভাগে 10 নম্বর। তোমার পারদর্শিতার পরিমাণ এইভাবে বুঝতে পারবে—80 বা তার বেশী নম্বর পেলে পারদর্শিতা খুব বেশী, 60 বা 70 পেলে বেশী, 40 বা 50 পেলে চলনসই, 20 বা 30 পেলে কম আর 20-এর নীচে পেলে খুবই কম।

1. ফাঁকা ঘর দু'টিতে এমন সংখ্যা বসাও, যা আগেকার সংখ্যাগুলির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

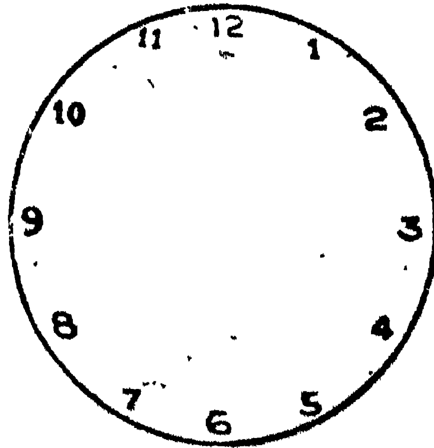
4	5	3	6	
19	21	17	25	

2. —চিহ্নিত স্থানে কোন্ অক্ষর উপযোগী ?

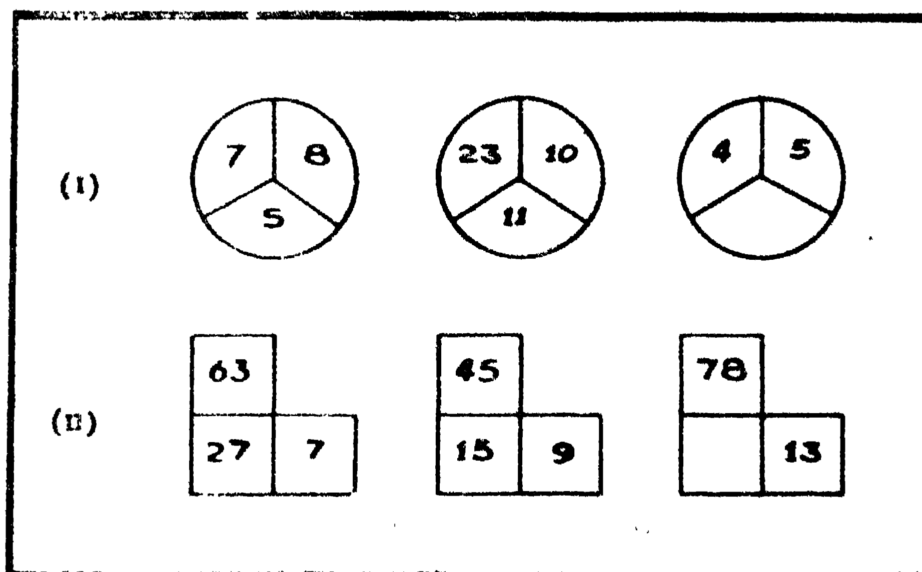
(i) গ জ ড — ব

(ii) ক ছ — ধ ম

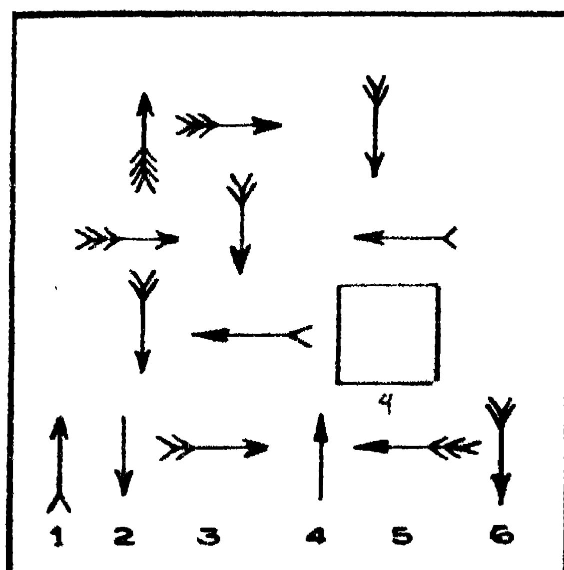
3. নীচের ঘড়ির ছবিটিকে এমন 6টি ভাগে ভাগ করতে হবে, যাতে প্রত্যেক ভাগের 2টি সংখ্যার যোগফল একই হয়।



4. প্রথম দু'টি ছবির সংখ্যাগুলির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ফাঁকা ঘরে সঠিক সংখ্যা বসাও।



5. 1 থেকে 6 পর্যন্ত নম্বর দেওয়া যে তীর-চিহ্নগুলি রয়েছে, সেগুলির মধ্যে কোন্‌টি ফাঁকা ঘরে বসবার পক্ষে উপযোগী ?



(উত্তর—509নং পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত ও জয়ন্ত বসু*

*সাহা ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9

আম

আমাদের দেশের ফলের মধ্যে আমকে অত্যুৎকৃষ্ট ফল বললে অত্যুক্তি হয় না। এজন্যেই আমকে বলা হয় অমৃত ফল। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আম বিভিন্ন নামে পরিচিত। দক্ষিণ ভারতের তামিলভাষী লোকেরা আমকে বলে মাঙ্গা। এই মাঙ্গা থেকে আমের ইংরেজী নাম ম্যাঙ্গো হয়েছে, কিন্তু অনেকের ধারণা, মালয়ের লোকেরা আমকে মাঙ্গা বলে এবং এথেকেই আমের ইংরেজী নাম হয়েছে ম্যাঙ্গো। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীরা বলেন আমের আসল জন্মভূমি ভারত নয়, মালয় দ্বীপপুঞ্জ।

সাধারণ বৃষ্টিপাত হয় অথচ জল দাঁড়ায় না এবং বালির ভাগ কম—এরূপ জমিই আম গাছের পক্ষে উপযোগী। আমাদের দেশে হাজারেরও বেশী বিভিন্ন জাতের আমগাছ আছে। এই গাছগুলি দুই ভাবে অর্থাৎ বীজ ও কলম থেকে জন্মলাভ করে। বীজ গাছের আমগুলি সাধারণতঃ আকারে ছোট, আঁটি বড় এবং তাতে আঁশের অংশ বেশী, কিন্তু কলমী গাছের আমগুলি আঁশশূন্য এবং তাদের আঁটি পাৎলা হয়ে থাকে। অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে এর ব্যতিক্রমও আছে।

অনুমান করা হয়, আলেকজেণ্ডারই প্রথম (খৃঃ পূঃ 327) সিন্ধু-উপত্যকায় আমের বাগান লক্ষ্য করেছিলেন। চীনা পর্যটক হুয়েন সাং (খৃঃ 633-45) আমের সঙ্গে পরিচিত হন এবং তিনিই বিদেশে আম রপ্তানী করবার চেষ্টা করেন। তবে পর্তুগীজ, ইংরেজ ও ফরাসীরা পৃথিবীর নানা দেশে আম চালান দিতেন এবং তারাই পৃথিবীর নানা দেশে আমগাছ জন্মাবার ব্যবস্থা করেন। ভারত ছাড়াও বর্তমানে অষ্ট্রেলিয়া, ব্রহ্মদেশ, ফিলিপাইন, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, ব্রেজিল, মেক্সিকো, মিশর প্রভৃতি দেশে আম উৎপন্ন হয়, কিন্তু ভারতবর্ষের আমের মত এত সুস্বাদু ও ভাল জাতের আম পৃথিবীর আর কোথাও উৎপন্ন হয় না। এই কারণে ভারত থেকে প্রতি বছর প্রচুর আম বিদেশে রপ্তানী হয় এবং ভারতীয় আমের অনুরাগীর সংখ্যা বিদেশে দিন দিন বেড়েই চলেছে।

সংস্কৃত সাহিত্যে আমের অনেক নাম আছে। তার মধ্যে কয়েকটি হলো—রাজকীয়, আম্র, রসাল, মধুদূত, অতি-সৌরভ, কোকিলবধূ প্রভৃতি। আমাদের দেশের আধুনিক কলমী আমের সঙ্গে রাজা-বাদশা, বিভিন্ন দেশ ও উৎপাদকের নাম জড়িয়ে আছে, যেমন—মালদা, সিঙ্গাপুরী, বারমাসী, দোফসলা, বৈশাখিয়া, শ্রাবণা, সিরাজদ্দৌল্লা, জাহাঙ্গীর প্রভৃতি।

আমের মধ্যে ল্যাংড়া খুব সুস্বাদু এবং ল্যাংড়া অনেক জাতের আছে, যেমন—ল্যাংড়া হাজিপুর, ল্যাংড়া মীরাট, ল্যাংড়া পাটনা প্রভৃতি। কিন্তু সবচেয়ে উৎকৃষ্ট হলো বেনারসী ল্যাংড়া। ফজলী আম আকারে বড় এবং ওজনে প্রায় এক থেকে দেড় কিলোগ্রাম

পর্যন্ত হয়। এক সময় দেড় কিলোগ্রাম থেকে পাঁচ কিলোগ্রাম পর্যন্ত এক-একটি আম মালদহে পাওয়া যেত। পশ্চিম বঙ্গে মালদহ ও মুর্শিদাবাদেই ফজলীর ফলন হয় বেশী। শোনা যায়, আবুল ফজলের নাম থেকেই ফজলী নামের উৎপত্তি।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, মুঘল সম্রাট আকবর বিহারে দ্বারভাঙ্গা অঞ্চলে বিখ্যাত লাখ-বাগ বা লক্ষ আম গাছের বাগান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী'তে সেই যুগের আমের সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। সেকালের নবাব-বাদশাহরা আম খেতে খুবই পছন্দ করতেন এবং বড় বড় আমের বাগান তৈরি করিয়েছিলেন।

কাঁচা ও পাকা আম আমাদের শরীরের পক্ষে বিশেষ হিতকর এবং নানান স্নেহজ পদার্থে সমৃদ্ধ থাকে। কাঁচা আমের মধ্যে থাকে জলীয় পদার্থ-80%, কার্বোহাইড্রেট-10·2%, প্রোটিন-4·7%, লৌহ-4·5%, অন্যান্য খনিজ পদার্থ-4%, ক্যালসিয়াম 1%, আর পাকা আমের মধ্যে জলীয় পদার্থ ও প্রোটিনের ভাগ কাঁচা আম অপেক্ষা একটু বেশী থাকে। পাকা আমে থাকে—জলীয় পদার্থ-86%, কার্বোহাইড্রেট-9·6%, প্রোটিন 6%, লৌহ-3%, অন্যান্য খনিজ পদার্থ-3%, ক্যালসিয়াম-2%। তাছাড়া আমের মধ্যে ভিটামিন-এ ও সি বেশ পর্যাপ্ত পরিমাণে এবং ভিটামিন-বি সামান্য পরিমাণে থাকে।

কাঁচা আম দাঁতের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর এবং বায়ু, বাত ও পিত্ত বৃদ্ধি করে, কিন্তু পাকা আম সুস্বাদু, পুষ্টিকর, লঘুপাক ও বলকারক। তাছাড়া অম্ল, পিত্ত ও ক্ষয় রোগীদের পক্ষেও আম খুব উপকারী এবং রক্তের নানাবিধ রোগ দূরীকরণের ক্ষমতা আমের আছে।

গ্রীষ্মকালে রৌদ্র লেগে বা লু লাগবার ফলে জ্বর হলে কাঁচা আম পুড়িয়ে তার সঙ্গে নুন মাখিয়ে খেলে লু-এর প্রভাব আস্তে আস্তে চলে যায় অথবা কাঁচা আম পুড়িয়ে বা সিদ্ধ করে সমস্ত শরীরে মাখলেও লুয়ের প্রভাব কেটে যায়। মধুর সঙ্গে আম ভক্ষণ করলে ক্ষয়রোগ, প্লীহা ও বাতের রোগ সারে এবং কচি আমের সঙ্গে জাম পাতার রস পান করলে আমাশয় শীঘ্র আরোগ্য হয়। বহুমূত্র রোগীদের পক্ষে আম একটি ভাল ফল। রৌদ্রে শুকানো কাঁচা আমের পুরনো আমসী খেলে আমাশয়ে উপকার পাওয়া যায়। শিশুদের আমাশয় রোগে আমের আঁটির শাঁসের প্রলেপ নাভির চতুষ্পার্শ্বে দিলে সুফল পাওয়া যায়। সামান্য মাত্রায় আমে আঁটির শাঁসের সঙ্গে মধু মিশিয়ে খেলে বমি বন্ধ হয়। এছাড়া আমের আরও অনেক উপকারক গুণ আছে।

আশিষ রায়চৌধুরী

উত্তর

(পারদর্শিতার পরীক্ষা)

1. উপরের ঘরে 2 এবং নীচের ঘরে 9।

[উপরের লাইনের পর পর সংখ্যাগুলির মধ্যে পার্থক্য যথাক্রমে +1, −2, +3। সুতরাং এর পরের পার্থক্যটি হবে −4 এবং সংখ্যাটি হবে 6−4=2।

নীচের লাইনের পর পর সংখ্যাগুলির মধ্যে পার্থক্য যথাক্রমে +2, −4, +8। সুতরাং পরের পার্থক্যটি হবে −16 এবং সংখ্যাটি হবে 25−16=9]

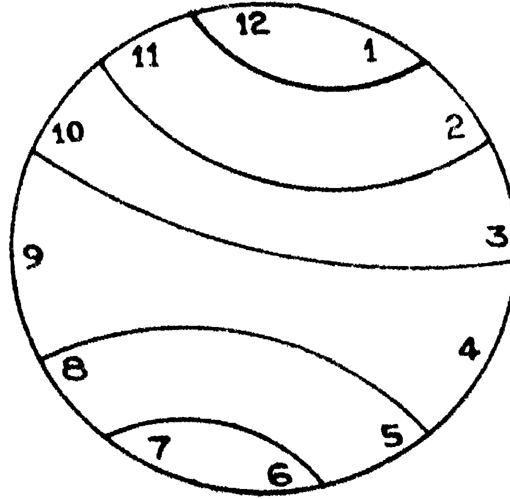
2. (i) দ

[গ, জ, ড ও ব হচ্ছে ব্যঞ্জনবর্ণের তালিকায় যথাক্রমে 1ম, 2য়, 3য় ও 5ম লাইনের মাঝের অক্ষর। 4র্থ লাইনের মাঝের অক্ষর হলো দ। এটাও লক্ষণীয় যে, পর পর অক্ষরগুলির মধ্যে 4টি করে অক্ষরের ব্যবধান থাকছে।]

(ii) ড

[ক, ছ, থ ও ম হচ্ছে ব্যঞ্জনবর্ণের তালিকার যথাক্রমে 1ম লাইনের 1ম অক্ষর, 2য় লাইনের 2য় 2য় অক্ষর, 4র্থ অক্ষর ও 5ম লাইনের 5ম অক্ষর। 3য় লাইনের 3য় অক্ষর হলো ড। এটাও লক্ষণীয় যে, পর পর অক্ষরগুলির মধ্যে 5টি করে অক্ষরের ব্যবধান থাকছে।]

3.



[প্রত্যেকটি ভাগের 2টি সংখ্যার যোগফল 13।]

4. (i) 3

[প্রথম ছবিটিতে (7+8)/3=5 ; দ্বিতীয় ছবিটিতে (23+10)/3=11 ; সুতরাং তৃতীয় ছবিটির ফাঁকা ঘরে হবে (4+5)/3=3।]

(ii) 18

[প্রথম ছবিটিতে (63/7)×3=27 ; দ্বিতীয় ছবিটিতে (45/9)×3=15 ; সুতরাং তৃতীয় ছবিটির ফাঁকা ঘরে হবে (78/13)×3=18।]

5. 4

[উপরের দুটি লাইনের প্রত্যেকটিতেই পর পর তীর-চিহ্নগুলি ঘড়ির কাঁটার গতির অভিমুখে (Clockwise) 90 ডিগ্রী করে ঘুরে গেছে ; তাছাড়া তাদের পালকের সংখ্যা কমেছে একটি করে। এই দু'টি বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তৃতীয় লাইনের ফাঁকা ঘরে 4 নম্বরের তীর চিহ্নটি বসবে।]

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন 1. : মকরধ্বজ কি ?

তড়িৎকুমার চক্রবর্তী, জলপাইগুড়ি

প্রশ্ন 2. : টি. এন. টি. কি ?

ডলি তলাপাত্র, শ্যামল চক্রবর্তী, মুর্শিদাবাদ

উত্তর 1. : মকরধ্বজ হচ্ছে একটা আয়ুর্বেদীয় ঔষধ। প্রাচীন কাল থেকেই মুমূর্ষু রোগীকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে মধুর সঙ্গে মেড়ে মকরধ্বজ খাওয়াবার প্রথা প্রচলিত আছে।

রাসায়নিকভাবে মকরধ্বজ হচ্ছে মারকিউরিক সালফাইড। মকরধ্বজ তৈরি করবার সময় প্রথমে ছোট ছোট সোনার পাত ও পারদ একসঙ্গে পিষে নিয়ে অ্যামালগাম তৈরি করা হয়, পরে এই অ্যামালগামের সঙ্গে গন্ধক মিশিয়ে আবার পিষে নেওয়া হয় এবং শেষে পদার্থটিকে উর্ধ্বপাতিত করা হয়। উর্ধ্বপাতনের সাহায্যে পাওয়া পদার্থ টাই মকরধ্বজ।

এই ভাবে প্রাপ্ত মকরধ্বজে সোনার উপস্থিতি সম্পর্কে দ্বিমত আছে। কেউ কেউ ভাবেন, ছোট ছোট সোনার পাত উর্ধ্বপাতনের সময় পাত্রের নীচে থেকে যায়। ফলে মকরধ্বজে সোনার অনুপস্থিতিই স্বাভাবিক। তবে সে ক্ষেত্রে সোনার পাত পারদ ও গন্ধকের রাসায়নিক মিলনের ক্ষেত্রে অনুঘটকের কাজ করে থাকে। আবার কেউ বা মনে করেন, মকরধ্বজে সোনার উপস্থিতি থাকে এবং সোনার এই উপস্থিতি পারদের রোগ নিরাময় ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেয়।

পারদের সঙ্গে গন্ধকের পরিমাণ কম বা বেশী করে বিভিন্ন ক্ষমতার মকরধ্বজ তৈরি করা হয়ে থাকে। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা-পদ্ধতিতে বিভিন্ন ক্ষমতার মকরধ্বজ বিভিন্ন রোগ নিবারণের কাজে প্রয়োগ করা হয়। হৃদ্‌রোগ, যক্ষ্মা, পেটের রোগ, জ্বর প্রভৃতি রোগে মকরধ্বজ বেশ কার্যকরী। বিভিন্ন রোগের বেলায় মকরধ্বজকে মধু ও নানা রকম অনুপানের সঙ্গে মেড়ে নিয়ে রোগীকে খাওয়ানো হয়।

উত্তর 2. : ট্রাইনাইট্রোটলুইন কথাটার সংক্ষিপ্ত নাম হচ্ছে টি. এন. টি.। এর রাসায়নিক সঙ্কেত হচ্ছে $C_6H_2(CH_3)(NO_2)_3$। কয়লা থেকে প্রাপ্ত কোলটারজাতীয় পদার্থের সঙ্গে নাইট্রিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় টি. এন. টি. তৈরি করা হয়। বিস্ফোরক পদার্থ হিসাবেই টি. এন. টি. সবচেয়ে বেশী কাজে লাগে।

শ্যামসুন্দর দে*

---

* ইনস্টিটিউট অব রেডিও-ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-9

বিবিধ

দশম বার্ষিক 'রাজশেখর বসু স্মৃতি' বক্তৃতা

গত 16ই জুলাই (1971) বৈকাল সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ভবনের 'কুমার প্রমথনাথ রায় বক্তৃতা-কক্ষে' বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত দশম বার্ষিক 'রাজশেখর বসু স্মৃতি' বক্তৃতা প্রদান করেন খড়্গপুরের ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেক্‌নোলজির অধ্যাপক গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়। বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল 'সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব'। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

খাদ্যশস্যের রেকর্ড ফলন

1970-71 সালে 10 কোটি 50 লক্ষ মেট্রিক টন থেকে 10 কোটি 60 লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হবে।

এটা সর্বকালের রেকর্ড। এই সব শস্যের অধিকাংশই ধান, বাজরা, ভুট্টা ও গম। গত বছরের উৎপাদন ছিল 9 কোটি 95 লক্ষ মেট্রিক টন। গত বছরের চেয়ে এই বছর উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রকের বার্ষিক রিপোর্টে এই তথ্য জানা গেছে।

অন্যান্য ফসলের উৎপাদনের হিসাব দিতে গিয়ে রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, 1970-71 সালে আখের (গুড়ের হিসাবে) উৎপাদন গত বছরের মতই হবে—1 কোটি 34 লক্ষ মেট্রিক টন। গত বছর তৈলবীজের উৎপাদন হয়েছিল 76 লক্ষ মেট্রিক টন। এই বছর বেশ কিছু বেশী হবে বলে আশা করা যায়। তুলা ও পাটের ক্ষেত্রে রিপোর্টে স্বীকার করা হয়েছে যে, ফলন আশানুরূপ বৃদ্ধি পায় নি।

গত বছর পাট উৎপন্ন হয়েছিল সাড়ে 56 লক্ষ গাঁট, 1970-71 সালে তা কমে হয়েছে 49 লক্ষ 10 হাজার গাঁট।

অ্যাপোলো-15-এর মহাকাশচারীদ্বয়ের চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ

26শে জুলাই তিনজন আমেরিকান মহাকাশ-চারী কর্ণেল স্কট (অধিনায়ক), জেমস্ আরউইন ও মেজর ওয়ার্ডেন অ্যাপোলো-15 মহাকাশযানে চড়ে চন্দ্রাভিমুখে যাত্রা করেন।

30শে জুলাই স্কট ও আরউইন চান্দ্রযান ফ্যালকন-এ চড়ে চাঁদের অ্যাপেনাইন-হ্যাডলী রিলে এলাকায় অবতরণ করেন এবং 15 ঘণ্টা বিশ্রাম করেন। 31শে জুলাই ফ্যালকন থেকে স্কট ও আরউইন চাঁদে পদার্পণ করেন। মেজর ওয়ার্ডেন চাঁদের কক্ষপথে মূলযানটি চালান। অ্যাপেনাইন হচ্ছে 13 হাজার ফুট উঁচু পর্বত এবং হ্যাডলী রিলে হচ্ছে 60 মাইল দীর্ঘ বিশুষ্ক নদীখাত। চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণকারী মহাকাশ-চারীদ্বয় চন্দ্রপৃষ্ঠে মোটর গাড়ীতে চড়ে ঘুরে বেড়ান। মোটরে চড়বার আগে তাঁরা কিছুক্ষণ হেঁটে ঘুরে বেড়ান।

ভ্রম সংশোধন ঃ

জ্ঞান ও বিজ্ঞানের জুন '71 সংখ্যায় পুস্তক-পর্যালোচনায় প্রকাশিত 'চল যাই চাঁদের দেশে' পুস্তকের প্রকাশকের নাম 'অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশি কোং প্রাইভেট লিঃ'-এর পরিবর্তে 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ' হবে।

শোক-সংবাদ

অধ্যাপক পুলিনবিহারী সরকার

14ই জুলাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ঘোষ অধ্যাপক ও খ্যাতনামা বিজ্ঞানী অধ্যাপক পুলিনবিহারী সরকার 77 বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি দীর্ঘদিন অন্ত্রের রোগে ভুগছিলেন। স্বর্গতঃ অধ্যাপক সরকার আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের খুব প্রিয় ছাত্র ছিলেন। আজীবন নিষ্ঠাবান শিক্ষাব্রতী হিসাবে তিনি শিক্ষা জগতে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

রসায়নে এম. এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে রসায়নের লেক্‌চারার নিযুক্ত হন। 1925 সালে তিনি ইউরোপে যান এবং সরবন বিশ্ববিদ্যালয়ে (প্যারিস) অধ্যাপক জি. য়ুরবাঁর তত্ত্বাবধানে স্ক্যাণ্ডিয়াম, গ্যাডোলিনিয়াম ও ইউরোপীয়াম সম্পর্কে গবেষণা করেন।

1946 সালে ডক্টর সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের স্যার রাসবিহারী ঘোষ প্রোফেসর নিযুক্ত হন এবং 1952 সালে তিনি বিভাগীয় প্রধান হন। 1960 সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অ্যানালিটিক্যাল কেমিস্ট্রিতে তাঁর অবদানের জন্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে স্যার পি. সি. রায় স্বর্ণপদক দেন। তিনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রাক্তন সদস্য ছিলেন।

ডক্টর বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রাক্তন সদস্য ও মার্কিন প্রবাসী রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক ডক্টর বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় গত 7ই জুলাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপিতে হঠাৎ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র 41 বছর এবং তিনি তাঁর বৃদ্ধ পিতামাতা, স্ত্রী ও বোনেদের রেখে গেছেন।

ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় 1953 সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিশুদ্ধ রসায়নশাস্ত্রে এম এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং 1956 সালে অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায়ের অধীনে অজৈব রসায়নশাস্ত্রে গবেষণা করে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি যাদবপুরে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স-এ কিছু-



ডক্টর বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

কাল গবেষণা করেছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের করনেল এবং ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি কয়েক বছর গবেষণা ও অধ্যাপনা করেন। সর্বশেষে 1967 সাল থেকে মিসিসিপির অ্যালকর্ন এগ্রিকালচারাল অ্যাণ্ড মিকানিক্যাল কলেজে রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপকরূপে তিনি কাজ করেন। বাংলাভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ে একজন সুলেখক হিসাবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত 'অ্যাণ্টিবায়োটিক্স', বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত 'সুবাস ও সুরভি' প্রভৃতি একাধিক লোকরঞ্জক বিজ্ঞান গ্রন্থের তিনি রচয়িতা। এছাড়া, এদেশের সাময়িক পত্র-পত্রিকাতেও তিনি বিজ্ঞান বিষয়ে লিখতেন।

প্রধান সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

বিষয়-সূচী

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন সত্যজিৎ রায়

শারদীয়

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

চতুর্বিংশ বর্ষ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, 1971 নবম-দশম সংখ্যা

আমাদের কথা

আবার শরৎ আসিয়াছে। সেই সঙ্গে এই রাজ্যে আসিয়াছে প্লাবন, মানুষের দুঃখ-দুর্দশা বাড়িয়া গিয়াছে বহু গুণ। হৃতসর্বস্ব আর্ত নর-নারীর হাহাকারে রাজ্যের আকাশ-বাতাস আজ ভারাক্রান্ত। দুর্যোগের ঘনকৃষ্ণ মেঘ দিগন্ত ছাইয়া ফেলিতেছে; তথাপি আমরা পুরাতন প্রথা অনুসরণ করিয়া শরতের স্মারক বর্তমান শারদীয় সংখ্যাটি প্রকাশ করিলাম। 'মেঘ দেখে কেউ করিসনে ভয়, আড়ালে তার সূর্য হাসে'—আজ মানবতা বিপন্ন, তাই আশা হয় নব মানবতার অভ্যুদয় সমাসন্ন।

আমরা বাংলাভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান-শিক্ষার জন্য ব্রতী হইয়াছি। ওপার বাংলার মানুষ বাংলাভাষাকে বুকের রক্ত ঢালিয়া নূতন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, প্লাবন প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্বিপাকজনিত ক্ষয়-ক্ষতি, দানবীয় হিংসার রক্তলোলুপ যুদ্ধোন্মাদনা—কোন কিছুই আজ মানুষের অগ্রগতিকে রুদ্ধ করিতে পারিতেছে না। প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি, চরম আত্মত্যাগের প্রস্তুতির সঙ্গে বিজ্ঞানশক্তির শুভ সম্মিলন হইলে মানুষের অসাধ্য কিছুই থাকিতে পারে না। সে চন্দ্রলোক জয় করিয়াছে, গ্রহান্তরে যাত্রার পথ সুগম করিতেছে, বংশানুক্রম নিয়ন্ত্রণের রহস্য আজ তাহার অধিগত-প্রায়। দিকে দিকে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা।

বিজ্ঞানের এই আনন্দযজ্ঞে আজ সবার নিমন্ত্রণ। বিদেশী ভাষা আর যাহাতে বিজ্ঞান-ভাণ্ডার ও আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যবধানের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর হইয়া না দাঁড়ায়—তাহারই উদ্দেশ্যে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এর প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। সেই প্রচেষ্টা বিশেষ ভাবে প্রকাশ পায় শারদীয় সংখ্যার মধ্যে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে লোকরঞ্জক প্রবন্ধ, সচিত্র সংবাদ ইত্যাদি সন্নিবেশিত করিয়া বর্তমান সংখ্যাটিকেও পাঠক-সাধারণের নিকট সবিশেষ আকর্ষণীয় করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে। এই প্রচেষ্টা কিছুমাত্র সফল হইলে আমাদের সকল শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

জিন-প্রযুক্তিবিদ্যা ও মানুষের ভবিষ্যৎ

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসাক ও শ্রীজগৎজীবন ঘোষ*

বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জিন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান ছিল সীমিত। জিনের প্রকাশ তো দূরের কথা, জিনের প্রকৃতি সম্পর্কেই কোন সঠিক ধারণা ছিল না। কিন্তু বিগত কয়েক দশকে জিন সম্পর্কে বিপুল ও বিস্ময়কর তথ্যাদি আমাদের হাতে এসেছে। এখন গবেষণাগারে চিনির বোতলের পাশে 'জিনের বোতল' আমাদের মনে কোন সাড়াই জাগায় না। যেহেতু জীবকোষের প্রতিটি বিক্রিয়ার জন্যে একটি করে এনজাইম দরকার এবং এনজাইমের প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে জিনেরই উপর নির্ভর করে, তাই জীবকোষ তথা প্রাণীর উপর জিনের প্রভাব অপরিসীম। সাধারণতঃ জিন বংশপরম্পরায় প্রায় অবিকৃতভাবেই বাহিত হয়। সুতরাং যদি কোন কারণে জিনের কোন পরিবর্তন হয়, তবে ঐ পরিবর্তিত জিনও অবিকৃতভাবেই বংশপরম্পরায় বাহিত হয়ে থাকে। আর এই পরিবর্তন যদি কোন রোগের কারণ হয়, তবে সে রোগ বংশপরম্পরায় চলতে থাকে। যেহেতু এতদিন জিন ছিল ধরাছোঁয়ার বাইরে, সেহেতু জিনবাহিত রোগেরও কোন প্রতিকার ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি প্রাকৃতিক উৎস থেকে জিনের পৃথকীকরণ, জিনের নিয়ন্ত্রিত পরিব্যাক্তি এবং জিনের কৃত্রিম সংশ্লেষণের ফলে আমাদের জ্ঞান যে স্তরে এসে পৌঁচেছে, তাতে জিনের পরিবর্তনের মাধ্যমে জিনবাহিত রোগ সারাবার সম্ভাবনা বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে। জিন-প্রযুক্তিবিদ্যার এটাই হলো এক শ্রেষ্ঠ অবদান।

জিন-এনজাইম এবং জিন-প্রোটিনের সম্পর্ক

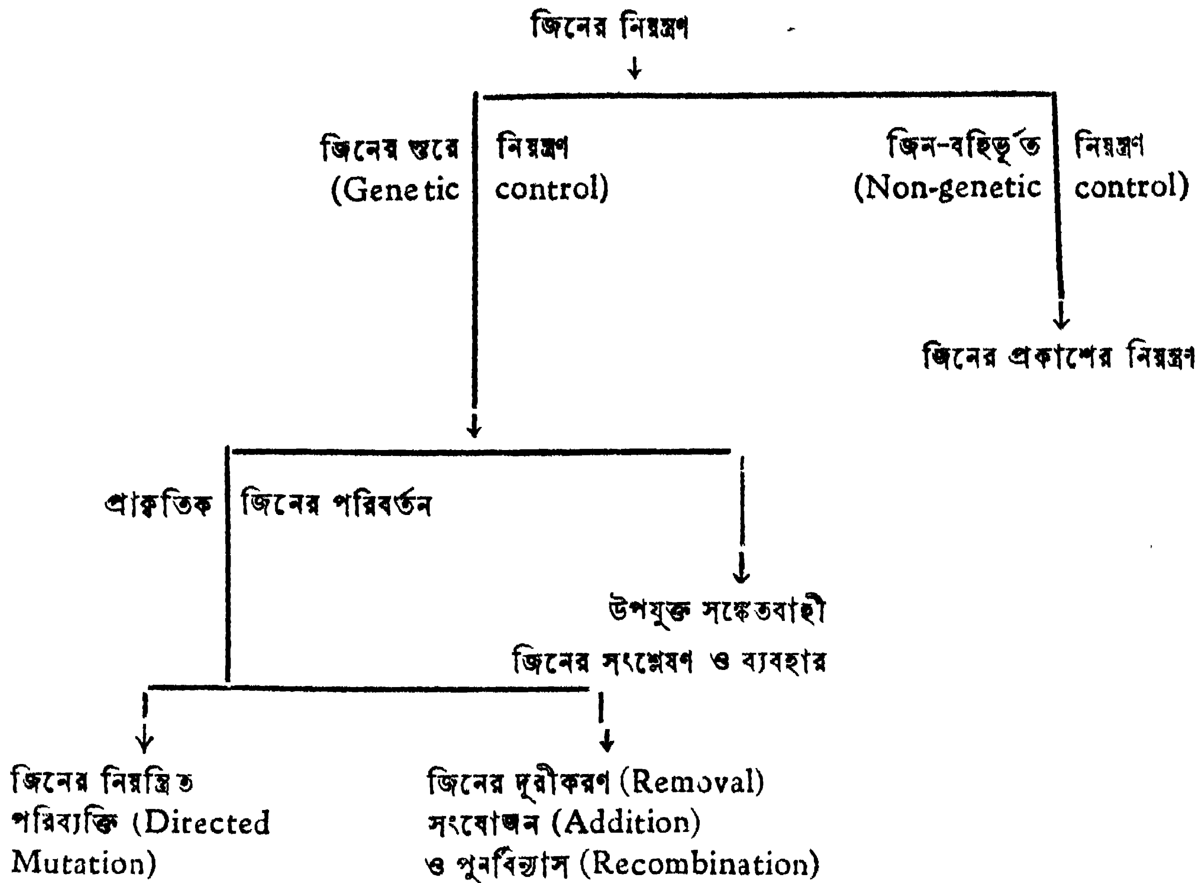
জীবকোষের যাবতীয় প্রক্রিয়াই সরাসরি জিনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কোষের নিউক্লিয়াসে প্রথমে জিন থেকে তৈরি হয় বার্তাবাহী আর-এন-এ (Messenger RNA)। অতঃপর এই আর-এন-এ নিউক্লিয়াস থেকে যায় সাইটোপ্লাজমে এবং সেখানে একাধিক রাসায়নিক ক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি হয় প্রোটিন বা এনজাইম।

পরিবহন
জিন ———→ আর-এন-এ ———→ আর-এন-এ ——— প্রোটিন বা এনজাইম
(নিউক্লিয়াস) (সাইটোপ্লাজম)

কোন কোষের জিন মোট যে সঙ্কেত বহন করে, তার অতি সামান্য অংশ প্রোটিন তৈরির কাজে লাগে। প্রাণিদেহের সব অপ্রজননশীল (Somatic) কোষের জিনের দৈর্ঘ্য, অর্থাৎ মোট সঙ্কেতের পরিমাণ এক। কিন্তু একটা বিশেষ ধরণের কোষে জিনের একটা বিশেষ অংশ প্রোটিন তৈরির কাজে লাগে।

যদি জিন থেকে প্রোটিন পর্যন্ত দীর্ঘ প্রক্রিয়ার কোথাও কোন ত্রুটির ফলে প্রোটিন তৈরি না হয় বা ভুল প্রোটিন তৈরি হয়, তবে রোগ দেখা দেয়। এই প্রকার জিনবাহিত বা বংশগত রোগ দূর করবার জন্যে জিনের সঙ্কেত এবং জিনের প্রকাশের নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন এবং নিম্নলিখিত বিভিন্ন উপায়ে তা করা যেতে পারে—

*প্রাণরসায়ন বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-19



জিনের স্তরে নিয়ন্ত্রণ

(ক) জিনের দূরীকরণ, সংযোজন ও পুনর্বিন্যাস—

ব্যাক্টিরিয়ার ক্ষেত্রে ক্রোমোসোমের বাইরেও বাড়তি জিন (Accessory genetic elements) থাকে এবং এই সব জিন কোষের সংস্পর্শের সময় কোষ থেকে কোষান্তরে স্থানান্তরিত হয়। বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ এই ধরণের জিনের দ্বিত্বকরণ (Replication) বন্ধ করতে পারে এবং তার ফলে এই সব জিন বিলুপ্ত হয়ে যায়। প্রোটোজোয়ার এই ধরণের জিন আছে। যদি মানুষের ক্ষেত্রেও এই ধরনের জিন থাকে এবং এই জিনগুলি বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্যে দায়ী হয়, তবে তাদের মাধ্যমে জিনবাহিত বৈশিষ্ট্যের নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

বিশেষ কোন ব্যাক্টিরিয়ার DNA উপযুক্ত অবস্থায় অন্য কোন ব্যাক্টিরিয়ার সংস্পর্শে এলে ঐ DNA ব্যাক্টিরিয়ার কোষে প্রবেশ করে গ্রাহক-কোষকে পরিবর্তিত করতে পারে। যদি প্রবেশকারী DNA-এর সঙ্গে গ্রাহক-কোষের DNA-এর কোন বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য থাকে, তবে গ্রহক-কোষে প্রবেশকারী DNA-এর ধর্ম দেখা দেয়। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় Transformation। সাধারণ অবস্থায় এই প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত পরিবর্তিত কোষের সংখ্যা খুবই কম, কারণ প্রবেশকারী DNAতে সব সময়েই নানা ধরণের জিন থাকে। কিন্তু প্রাকৃতিক উৎস থেকে বিশুদ্ধ জিন পাওয়া গেলে এই প্রক্রিয়ার উন্নতিসাধন করা যেতে পারে।

ভাইরাসকে মোটামুটি দু-ভাগে ভাগ করা যায়। কতকগুলি ভাইরাস আক্রান্ত কোষকে মেরে ফেলে, কিন্তু অন্য এক প্রকার ভাইরাস আক্রান্ত কোষের কোন ক্ষতি করে না। এক্ষেত্রে ভাইরাসের জিন ও আক্রান্ত কোষের জিন পাশাপাশি প্রকাশিত হয়। ভাইরাসবাহিত সঙ্কেত পাওয়ার ফলে

কোষের মোট সঙ্কেতের পরিমাণ বেড়ে যায়। এই ঘটনাকে বলা হয় Transduction। সম্প্রতি এমন অনেক ভাইরাস পাওয়া গেছে, যেগুলি প্রাণিকোষে প্রবেশ করে কোষের সঙ্কেতের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। মাছির ক্ষেত্রে ভাইরাসের মত এক প্রকার 'Infective particle' পাওয়া গেছে, যা মাছির CO_2-এর প্রতি সংবেদনশীলতা বাড়িয়ে তোলে। এরা মাছির দেহে প্রবেশ করে সোজা জনন-গ্রন্থিতে গিয়ে প্রজননশীল কোষকে আক্রমণ করে। ফলে মাছি একবার আক্রান্ত হলে এই ধর্ম বংশানুক্রমে চলতে থাকে।

Transformation ও Transduction পরীক্ষা চালানো হয়েছে ব্যাক্টিরিয়ার সাহায্যে। ব্যাক্টিরিয়ার সঙ্গে মানুষের কোষের তফাৎ এই যে, মানুষের কোষের মত ব্যাক্টিরিয়ার কোন স্পষ্ট নিউক্লিয়াস নেই এবং মানুষের কোষে প্রতিটি ক্রোমোসোম এক জোড়া করে থাকে, কিন্তু ব্যাক্টিরিয়ার ক্ষেত্রে প্রতিটি জিনই একটি করে আছে। তাই মানুষের ক্ষেত্রে যদি কোন জিনগত পরিবর্তন করতে হয়, তবে সমধর্মী এক জোড়া বা দুটি ক্রোমোসোমেরই পরিবর্তন প্রয়োজন। সুতরাং মানুষের ক্ষেত্রে অপ্রজননশীল কোষের চেয়ে প্রজননশীল কোষের (Germ cells) পরিবর্তন অনেক বেশী সুবিধাজনক।

সাম্প্রতিক কালে কিছু কিছু ভাইরাস পাওয়া গেছে, যেগুলি মানুষের কোষকে আক্রমণ করে কোন ক্ষতি করে না, বরং আক্রান্ত কোষের মোট সঙ্কেতের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। এই ধরণের ভাইরাসকে কখনও কখনও Passenger virus বলা হয়। Shope Papillpma virus একটি পর্যটক ভাইরাস। এই ভাইরাস কোন লোককে আক্রমণ করলে তার রক্তে আর্জিনিন নামক অ্যামিনো অ্যাসিডের পরিমাণ কমে যায়। এর কারণ হলো এই ভাইরাসটি রক্তে আর্জিনেজ (Arginase) এনজাইমটির পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়, কিন্তু অন্য কোন ক্ষতি হয় না। রক্তে আর্জিনিন বেশী হলে মানসিক অপটুতা (Mental retardation) এবং অন্যান্য শারীরিক ও মানসিক অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়। এই ধরণের রোগীকে শোপ ভাইরাসের সাহায্যে রোগমুক্ত করা যেতে পারে। আরও আশার কারণ এই যে, শোপ ভাইরাস আক্রমণের দীর্ঘ কুড়ি বছর পরেও আক্রান্ত ব্যক্তির অঙ্গে সাধারণের তুলনায় কম আর্জিনিন থাকে।

(খ) জিনের নিয়ন্ত্রিত পরিব্যক্তি—ব্যাক্টিরিয়ার ক্ষেত্রে জিনের পরিবর্তনকে বাইরে থেকে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কিন্তু ব্যাক্টিরিয়ার DNA-এর কোন কোন অংশকে অতি সহজেই পরিবর্তিত করা যায়। এই সব অংশকে বলা হয় Hot Spot। এই সব অংশগুলির প্রকৃতি এখনও ভালভাবে জানা যায় নি। এগুলির প্রকৃতি জানা গেলে বাইরে থেকে বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জিনকে ইচ্ছামত পরিবর্তন করা যেতে পারে।

প্রতি কোষেরই জিনের দ্বিত্বকরণ একটা বিশেষ সময়ে হয় এবং এই সময়ে জিনের রূপান্তরিত হবার ক্ষমতা (Mutability) বেড়ে যায়। দ্বিত্বকরণ জিনের একপ্রান্ত থেকে আরম্ভ হয় এবং অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত চলে। তাই কোন একটা বিশেষ জিনের দ্বিত্বকরণের সময় রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহারের মাধ্যমে একমাত্র ঐ জিনকে রূপান্তরিত (Mutation) করা যায়।

রূপান্তরকারী পদার্থের ক্ষমতা দু-ভাবে বৃদ্ধি করা যেতে পারে। প্রথমতঃ ঐ পদার্থের অণুর সঙ্গে যদি এমন কোন প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম অণু জুড়ে দেওয়া যায়, যার জিনের একটা বিশেষ অংশের প্রতি আসক্তি আছে, তবে রূপান্তরকারী পদার্থের ক্ষমতা বহু গুণ বেড়ে যায়। অ্যাক্টিনোমাইসিন জাতীয় পদার্থগুলি DNA-এর গুয়ানিন-সমৃদ্ধ অংশের সঙ্গে যুক্ত হয়। দ্বিতীয়তঃ রূপান্তর-

কালীন পরিবেশের নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ জিনকে পরিবর্তন করা যেতে পারে। কোন কোন পদার্থের DNA-এর প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। Repressor ও Antibiotic এই ধরণের পদার্থ। দ্বিত্বকরণের সময় এই সব পদার্থের উপস্থিতি DNA-এর উপর রূপান্তরকারী পদার্থের (Mutagen) ক্রিয়াকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। এই কাজে Purine বা Pyrimidine জাতীয় পদার্থের Antibody-কে ব্যবহার করা যেতে পারে।

এই পদ্ধতির সাহায্যে জিনে বর্তমান সঙ্কেতের পরিবর্তন করা সম্ভব। কিন্তু কোন বিশেষ সঙ্কেতের অনুপস্থিতি যদি কোন রোগের কারণ হয়, তবে এই রূপান্তরের মাধ্যমে সে রোগের নিরাময় সম্ভব নয়। বিজ্ঞানী হলডেনের ভাষায় বলতে গেলে, "জিনের রূপান্তরের মাধ্যমে মানুষকে কখনই দেবদূত করা সম্ভব নয়, কারণ নৈতিকতা ও পাখার জন্য প্রয়োজনীয় দুটি জিন মানুষের নেই।"

(গ) সঙ্কেতবাহী জিনের কৃত্রিম সংশ্লেষণ ও ব্যবহার—জিনের নিয়ন্ত্রিত রূপান্তর এখনও নিছক তত্ত্বীয় স্তরেই সীমাবদ্ধ। জিনবাহিত রোগের প্রকৃতি অতি বিচিত্র এবং সংখ্যায়ও নেহাৎ কম নয়। এখন ব্যবহারযোগ্য একমাত্র পদ্ধতি হলো Tranduction-এর সাহায্যে জিনের পরিবর্তন। কিন্তু প্রকৃতিতে এত বিভিন্ন জিনবাহিত রোগের জন্য এত বিচিত্র ধরণের ভাইরাস না পাওয়াই স্বাভাবিক। তাই সম্প্রতি জীববিজ্ঞানীরা কৃত্রিম সঙ্কেতের (Synthetic code) উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আণবিক জীব-বিজ্ঞানের গত দশ বছরের আবিষ্কারের ফলে ইচ্ছামত DNA বা RNA তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। বিজ্ঞানী হরগোবিন্দ খোরানা বিশেষ প্রোটিনের জন্যে প্রয়োজনীয় সঙ্কেতবাহী জিন গবেষণাগারে সংশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

বিশেষ প্রক্রিয়ায় কৃত্রিম উপায়ে সংশ্লেষিত সঙ্কেত আক্রমণকারী ভাইরাসের সঙ্কেতের সঙ্গে যোগ করে দেওয়া যায়। এই পরিবর্তিত ভাইরাস স্বাভাবিকভাবেই কোষকে আক্রমণ করে এবং আক্রান্ত কোষে কৃত্রিম সঙ্কেতও প্রোটিন তৈরির কাজে লাগে। Shope virus-এর DNA চক্রাকার, সুতরাং এই ভাইরাসের DNA-এতে কৃত্রিম সঙ্কেত যোগ করবার পর স্বাভাবিক আক্রমণ ক্ষমতা (Infective power) ফিরিয়ে আনবার জন্যে রৈখিক DNA-কে চক্রাকার DNA-তে রূপান্তরিত করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানী কর্ণবার্গ (Kornberg) Polynucleotide ligase এবং Kinase ব্যবহার করেছেন। সম্প্রতি বিজ্ঞানী J M Burnett Simian Virus (Sa-F) নামক একটি ভাইরাস খুঁজে পেয়েছেন, যার DNA রৈখিক এবং এই ভাইরাস মানুষের কোষকে আক্রমণ করতে পারে। সুতরাং এই DNA-কে আর চক্রাকার করবার কোন প্রয়োজন নেই, সঙ্কেত যোগ করবার পর সরাসরি এই ভাইরাসকে ব্যবহার করা যেতে পারে।

জিন-বহির্ভূত নিয়ন্ত্রণ

সরাসরি জিনের সঙ্কেতের পরিবর্তন না করে জিনের প্রকাশের পরিবর্তন অনেক সহজ। তবে এই পদ্ধতিতে প্রোটিনের গুণগত পরিবর্তন করা সম্ভব নয়, এতে যে পরির্তন হবে তা হলো পরিমাণগত। জিন থেকে RNA কিম্বা RNA থেকে প্রোটিন—এই দুই স্তরেই জিনের প্রকাশের নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

যদি কোষে কোন অপ্রয়োজনীয় প্রোটিন তৈরি হয়, তবে বিশেষ Repressor-এর সাহায্যে ঐ প্রোটিনের জিনকে অকেজো করে প্রোটিন তৈরি বন্ধ করা যায়। যদি কোন কোষে বিশেষ কোন সঙ্কেত অপ্রকাশিত থাকে, তবে বিশেষ প্রকাশক অণুর (Inducer) সাহায্যে ঐ সঙ্কেতকে প্রকাশিত

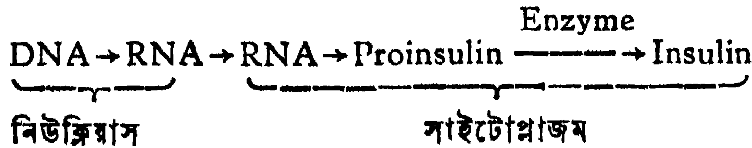
করা যেতে পারে। প্রকাশক অণু Repressor-এর সঙ্গে বিক্রিয়া করে Repressor-কে অকেজো করে দেয়।

RNA-র সঙ্কেতকে প্রোটিনে পরিণত করতে একাধিক এনজাইমের প্রয়োজন হয়। যদি কোন প্রোটিন বেশী পরিমাণে তৈরি হওয়ার ফলে কোন রোগের সৃষ্টি হয়, তবে RNA থেকে প্রোটিন তৈরির জন্যে প্রয়োজনীয় এনজাইম-গুলির যে কোন একটির অ্যান্টিবডি ব্যবহার করে প্রোটিন তৈরির কাজ ব্যাহত করা যেতে পারে।

কোন কোন ক্ষেত্রে জিন বা RNA-তে কোন ভুল না থাকলেও ভুল প্রোটিন তৈরি হয়। এর কারণ হলো, প্রতিটি অ্যামিনো অ্যাসিডকে বিক্রিয়ার স্থানে বহন করবার জন্যে এক-একটি পরিবাহী RNA-র (Transfer RNA) প্রয়োজন হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবাহী RNA ভুল অ্যামিনো অ্যাসিডকে বহন করে নিয়ে যায়।

সম্প্রতি Suppressor gene নামক এক প্রকার জিনের সন্ধান পাওয়া গেছে, যার পরিবর্তনের মাধ্যমে পরিবাহী RNA-এর পরিবর্তন করে সঠিক প্রোটিন তৈরি করা যায়।

আমাদের জীনে মোট যে পরিমাণ সঙ্কেত আছে, তার 5-শতাংশ বা আরও কম অংশ প্রকাশিত হয়। প্রকাশযোগ্য জিন থেকে যে RNA তৈরি হয়, তার অংশবিশেষ নিউক্লিয়াস থেকে সাইটোপ্লাজমে পরিবাহিত হয়। আবার যেটুকু RNA সাইটোপ্লাজমে এসে পৌঁছয় তারও সবটুকু প্রোটিন তৈরির কাজে লাগে না। আমাদের শরীরের প্রতিটি কোষেই ইনসুলিন তৈরির সঙ্কেত আছে, কিন্তু Pancreas-এর বিশেষ এক ধরণের কোষেই ইনসুলিন তৈরি হয়। তার কারণ, ভ্রূণাবস্থায় কোষ-বিভাজনের সময় বিশেষ প্রক্রিয়ায় অন্যান্য সব কোষে ইনসুলিন তৈরির সঙ্কেত চাপা পড়ে থাকে। ইনসুলিন তৈরির কাজ নিম্নোক্ত কয়েকটি স্তরে হয়ে থাকে।



যদি কোন কারণে Pancreas-এর ইনসুলিন তৈরির ক্ষমতা কমে যায় বা নষ্ট হয়ে যায়, তবে রক্তে ইনসুলিনের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যায়। এটাই বহুমূত্র রোগের (Diabetes) কারণ। বহুমূত্র রোগ হবার নিম্নোক্ত কারণগুলির যে কোন একটিই যথেষ্ট।

(1) DNA থেকে RNA তৈরির ব্যর্থতা

(2) RNA থেকে Proinsulin তৈরির ব্যর্থতা

(3) Proinsulin থেকে Insulin তৈরির ব্যর্থতা

(4) Insulin-কে জীবকোষের ভিতর থেকে বাইরে পরিবহনের জন্যে প্রয়োজনীয় এনজাইমের অনুপস্থিতি।

যদি কোন উপায়ে কোষের ইনসুলিন তৈরির সঙ্কেতকে প্রকাশিত করা যায়, তবে বহুমূত্র রোগ সারানো অসম্ভব হবে না। কর্টিজোনের প্রভাবে যকৃৎ কোষ (Liver Cell) Tryptophan pyrrolase এবং Tyrosine-α-Ketoglutarate transaminase নামক দুটি নতুন এনজাইম তৈরি করতে পারে। কিন্তু ইনসুলিনের সঙ্কেতকে প্রকাশিত করবার মত কোন পদার্থ আজ পর্যন্ত জানা যায় নি।

জিন-প্রযুক্তিবিদ্যা ও সমাজ

আজকের দিনের নব জাতকের মধ্যে প্রায় চার শতাংশের মধ্যে কোন না কোন জিনবাহিত রোগের স্পষ্ট লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়। তাছাড়া

প্রত্যেকের মধ্যেই আরও কয়েকটি ক্ষতিকর জিন অপ্রকাশিত থাকে। যদিও আণবিক জীব-বিজ্ঞানে গবেষণার ফলে জিন সম্পর্কে অনেক তথ্য আমাদের হাতে এসেছে, তবুও মানুষের ক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত এই জ্ঞানের বিশেষ কিছু প্রয়োগ হয় নি। বর্তমানে অনেক বিজ্ঞানী জিনের নিয়ন্ত্রিত পরিব্যক্তির কথা ভাবছেন। তবে এই পদ্ধতির অসুবিধা এই যে, রূপান্তরকারী পদার্থ সব জিনকেই সমানভাবে প্রভাবিত করে। ফলে ভাল জিনের ক্ষতিকর জিনে রূপান্তরিত হওয়া এবং ক্ষতিকর জিন থেকে ভাল জিন তৈরি—এ দুই-ই সমানভাবে সম্ভব। তাছাড়া আমাদের পরিবেশ ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে। যে জিন এক পরিবেশে ক্ষতিকর, সেই জিনই অন্য পরিবেশে বিশেষ উপযোগী হয়ে পড়ে। সুতরাং আজকের দিনে জিনের নিয়ন্ত্রিত পরিবর্তনের মাধ্যমে যে জাতি তৈরি হবে, সে জাতি আগামী দিনের পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে চলতে পারবে কিনা—সে কথা হলফ্ করে বলা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। অনেক সময়েই মনীষীদের মধ্যে পরস্পরবিরোধী ধর্মের সমন্বয় দেখা যায়। তাঁদের পরস্পরবিরোধী ধর্মের সঙ্গে মনীষার কতটা সম্পর্ক, তা আজও জানা নেই। সমাজের চোখে খারাপ, এমন কোন ধর্মের পরিবর্তন করতে গিয়ে আমরা যদি আজ মনীষাকেও নষ্ট করে ফেলি—তবে সে দায়িত্ব কার? তখন সমাজকেই ভেবে ঠিক করে নিতে হবে, কাকে সে অগ্রাধিকার দেবে, সে কাকে চায়—'তথাকথিত অসামাজিক, কুৎসিত বেটোফেন, না সামাজিক হরিপদ কেরাণী?' এতদিন পর্যন্ত মানুষই ছিল তার বিবর্তনের একমাত্র নিয়ন্ত্রা, কিন্তু আজ মানুষ এমন এক স্তরে এসে পৌঁচেছে, যখন সে নিজেই নিজের বা ভবিষ্যৎ বংশধরদের ধর্ম নিয়ন্ত্রণে সক্ষম।

শেষ কোথায়? কি আছে শেষে?

কিন্তু কল্যাণের চেয়েও ক্ষতি করবার জন্যে জীব-বিজ্ঞানের অপব্যবহার ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। যুদ্ধের কাজে রসায়ন ও জিন-বিজ্ঞানকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে আমরা ভিয়েৎনামে নিষ্পত্রকারী পদার্থের (Defoliant) ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করেছি। জিনের অপব্যবহারের ফল হবে এর চেয়েও অনেক বেশী ভয়ঙ্কর ও স্থায়ী। প্রথম মহাযুদ্ধ ছিল রাসায়নিক যুদ্ধ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ছিল পদার্থ-বিজ্ঞানের যুদ্ধ, হয়তো তৃতীয় মহাযুদ্ধ হবে জীব-বিজ্ঞানের যুদ্ধ। কিন্তু মনে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে—তারপর চতুর্থ কোন মহাযুদ্ধের জন্যে মানবজাতি বেঁচে থাকতে পারবে কি? হয়তো বা কোন এক অজানা 'যুদ্ধ ভাইরাস' মানবজাতিকে নিঃশব্দে ও ধীরে ধীরে প্রকৃতির বুক থেকে মুছে দেবে।

বিজ্ঞানীরা প্রায় সকলেই এই প্রশ্নে নীরব। যাঁরা মুখ খোলেন, তাঁদের কথার সারমর্ম হলো (সেন্ট অগাষ্টিনের ভাষায়)—"If you do not ask me, I know; if you ask me, I know not." আজ তাই শুধুমাত্র বিজ্ঞানই যথেষ্ট নয়—বিজ্ঞান মানুষের হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়, কিন্তু ব্যবহারের পথ শেখায় না। আজ তাই Power-ই যথেষ্ট নয়, আজ প্রয়োজন Wisdom-এর মানবজাতির জন্যে Biology-ই যথেষ্ট নয়, আমাদের প্রয়োজন Humanistic Biology-র, যা গবেষণালব্ধ জ্ঞানকে মানবিকভাবে ব্যবহারের পথ শেখায়।

বেতার টেলিফোনি ও ব্রডকাস্টিং-এর আদি পর্ব

সতীশরঞ্জন খাস্তগীর*

বেতার টেলিফোনি ও ব্রডকাস্টিং-এর জন্যে প্রয়োজন—অবিচ্ছিন্ন (Continuous) ও সমান বিস্তারের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ। বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গের সাহায্যে বিশেষ সার্কিটের ব্যবস্থায় পর-পর ক্রম-বিলীয়মান বিদ্যুতের ঢেউ পাওয়া যায়, সেই ব্যবস্থার নাম হলো স্পার্ক-ট্রান্সমিটার। স্পার্ক-ট্রান্সমিটারের বিলীয়মান বিদ্যুৎ-তরঙ্গ দিয়ে শুধু সংকেত পাঠানোই সম্ভব—তা দিয়ে বেতারে কথাবার্তা বা ব্রডকাস্টিং চলে না। 1903 সনে ডেনমার্কের বিজ্ঞানী Poulsen আর্ক-বাতি জ্বালিয়ে অবিচ্ছিন্ন ও সমবিস্তারের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ উৎপাদন করবার এক অভিনব ব্যবস্থা করেন। এই ভাবে নির্মিত প্রেরক-যন্ত্রকে আর্ক-ট্রান্সমিটার বলা হয়। এর দু-বছর আগে ইংল্যাণ্ডের Duddell এই ব্যবস্থার সূচনা করেছিলেন। ডাইনামো যন্ত্রের সাহায্যেও অবিচ্ছিন্ন ও সমবিস্তারের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছিল—তবে এই তরঙ্গের স্পন্দনাঙ্ক অপেক্ষাকৃত কম। এই প্রসঙ্গে Alexanderson ও Goldsmidt প্রভৃতি এঞ্জিনিয়ারদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর পর 1904 সনে বিখ্যাত বিজ্ঞানী Fleming কর্তৃক থার্মিয়নিক (Thermionic) ভাল্‌ভের প্রবর্তন হয়। ভাল্‌ভের সাহায্যে বেতার প্রেরক-যন্ত্রে যখন সমবিস্তারের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ অবিচ্ছিন্ন ভাবে পাওয়া সম্ভব হলো, তখন শুধু প্রেরক-যন্ত্র নয়, গ্রাহক-যন্ত্র ও বেতার-সম্পর্কিত অন্যান্য অনেক ব্যবস্থায় থার্মিয়নিক ভাল্‌ভ নানাভাবে আশ্চর্য কাজে লেগেছে। সে জন্যে সেকালে একে বেতার-জগতে 'আলাদীনের প্রদীপ' বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না।

ভাল্‌ভ প্রবর্তনের আগে থেকেই বেতার-টেলিফোনির আরম্ভ হয়। 1900 সনে আমেরিকার বিজ্ঞানী Fessenden এক মাইল দূর পর্যন্ত বিনাতারে কথাবার্তা চালাতে সক্ষম হয়েছিলেন। 1907 সনে তিনিই আবার ডাইনামোর সাহায্যে সমবিস্তারের অবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ-তরঙ্গ উৎপাদন করে তার সাহায্যে কথা ও গান এক শত মাইল পর্যন্ত পাঠিয়েছিলেন। প্রায় একই সময়ে জার্মেনীর Telefunken Co, নাউয়েন (Nauen) থেকে বার্লিন—এই বিশ মাইল পর্যন্ত আর্ক-ট্রান্সমিটারের সাহায্যে বিনাতারে কথাবার্তা চালিয়েছিলেন। 1913 সনে এই কোম্পানীই আবার ডাইনামো ব্যবহার করে সাড়ে পাঁচ-শ' মাইল বিনাতারে কথাবার্তা পাঠিয়েছিলেন। 1912 সনে Vanni নামে একজন ইটালীয় বিজ্ঞানী এক নূতন ধরণের সময়ানুবর্তী স্পার্ক-ট্রান্সমিটার ব্যবহার করে রোম থেকে ত্রিপোলি—এই ছয় শত পঁচিশ মাইল পর্যন্ত বেতারে কথাবার্তা চালাতে সক্ষম হয়েছিলেন। এখানে বলা দরকার যে, ভাল্‌ভের সাহায্যে সমবিস্তারে অবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ-তরঙ্গ পাওয়া যেমন খুব সহজ হয়ে গেল, তেমনি মাইক্রোফোনের সামনে কথা বললে বা গান গাইলে, তাতে ধ্বনির জোর অনুযায়ী মাইক্রোফোন সার্কিটে যে অতি ক্ষীণ বিদ্যুতের প্রবাহ হয়, তা ভাল্‌ভের সাহায্যে বহু সহস্র গুণ বিবর্ধন করাও সম্ভব হলো। এই ভাবে ভাল্‌ভের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বেতার-টেলিফোনি ও ব্রডকাস্টিং-এর উন্নতি হয়েছে।

1913 সনে জার্মান বিজ্ঞানী A. Meissner, ভাল্‌ভের সাহায্যে সর্বপ্রথম অবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ-

*বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন।

তরঙ্গ উৎপাদন করেন। Meissner-এর এই প্রেরক-যন্ত্রের সাহায্যে এক বছরের মধ্যেই মার্কোনি অ্যাণ্ড কোম্পানী পঞ্চাশ মাইল পর্যন্ত বিনাতারে কথাবার্তা প্রেরণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইউরোপে প্রথম মহাযুদ্ধের দু-বছরের মধ্যেই 1916 সনে, ভাল্‌ভের সাহায্যে বেতার ও গ্রাহক-যন্ত্র নির্মাণ করে আমেরিকার Arlington থেকে Honolulu পর্যন্ত প্রায় পাঁচ হাজার মাইল দূরত্বে কথাবার্তা সম্ভব হয়েছিল। 1923 সনে যুক্তরাষ্ট্রের লং আইল্যাণ্ডের Rocky point থেকে উত্তর লণ্ডনের South Gate-এ প্রেরক ও গ্রাহক-যন্ত্রে বহু শক্তিসম্পন্ন ভাল্‌ভের সাহায্যে আমেরিকা থেকে বক্তৃতা হেড-ফোন বা লাউড-স্পীকারে খুব স্পষ্টভাবে শোনা গিয়েছিল।

1924 সনে ইংল্যাণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে বেতার-টেলিফোনিতে সর্বপ্রথম যোগাযোগ হয়। ইংল্যাণ্ডের Cornwall ও Poldhu-তে মার্কোনি অ্যাণ্ড কোম্পানীর প্রেরক-কেন্দ্র থেকে বেতারে যে কথাবার্তা হয়, তা অস্ট্রেলিয়ার Sydney-তে বেশ ভালই শোনা যায়। 1926 সনে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার দু-দিক থেকেই বেতারে কথাবার্তা চালাবার ব্যবস্থা সুরু হয়। এই ব্যবস্থায় ইংল্যাণ্ডের Rugby-তে ও আমেরিকার Rocky point-এ প্রেরক ও গ্রাহক-যন্ত্র চালু রাখা হয়। 1933 সনে যখন লণ্ডন শহরে Post Office International Telephone Exchange প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন থেকেই মিশর, ভারতবর্ষ, যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, আরজেন্টাইন, ব্রেজিল প্রভৃতি দেশ এবং ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে বেতার টেলিফোনি নিয়মিতভাবে আরম্ভ হয়। এই গেল বেতার টেলিফোনির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

এবার রেডিও-ব্রডকাস্টিং-এর ইতিহাস অতি সংক্ষেপে দেওয়া যাক। মার্কোনি অ্যাণ্ড কোম্পানী Essex-এ Chelmsford নামক স্থানে যে বেতার প্রেরক-কেন্দ্র স্থাপন করেন, 1920 সনে সেই কেন্দ্র থেকেই ইংল্যাণ্ডে সর্বপ্রথম নিয়মিতভাবে রেডিও-ব্রডকাস্টিং আরম্ভ হয়। এই বছরেই ডেনমার্কের Hague-স্টেশন থেকে নিয়মিত রেডিও-প্রোগ্রাম সুরু হয়। এই বছরেই যুক্তরাষ্ট্রের Westnghouse Electric Co. সর্বপ্রথম Pittsburg থেকে রেডিও-ব্রডকাস্টিং-এর নিয়মিত ব্যবস্থা করেন। এর পর থেকেই 'আমেরিকা, ইউরোপ ইংল্যাণ্ডের অনেক স্থানে ব্রডকাস্টিং কেন্দ্র স্থাপিত হয়। 1923 থেকে 1926 সন পর্যন্ত বৃটিশ ব্রডকাস্টিং কোম্পানীর পরিচালনায় ইংল্যাণ্ডের বড় বড় স্থানে ব্রডকাস্টিং-কেন্দ্র ও অন্যান্য কতকগুলি স্থানে ধ্বনি-সম্প্রসারণ* কেন্দ্র (Relay centre) প্রতিষ্ঠিত হয়। এর আগে ইংল্যাণ্ডে মার্কোনি অ্যাণ্ড কোম্পানী কর্তৃক চালিত ব্রডকাস্টিং-স্টেশন ছিল মাত্র দুটি—চেম্‌সফোর্ড ও লণ্ডন। 1927 সনে বৃটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন (B. B. C.) নামে অন্য এক কোম্পানী রয়াল চার্টার নিয়ে গ্রেট-বৃটেন ও উত্তর আয়ল্যাণ্ডে রেডিও-ব্রডকাস্টিং-এর ভার নেন। ইংল্যাণ্ডে যেমন বি. বি. সি. আমেরিকায় তেমনি এন. বি. সি. (National Broadcasting Co.) ও Columbia Broadcasting System। ইউরোপের বড় বড় শহরেও এই সময় অনেক বেতার-কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। 1932 সনের ডিসেম্বর মাসে বৃটিশ সাম্রাজ্যের জন্যে এক নূতন বেতার-প্রতিষ্ঠান বি. বি. সি-র পরিচালনায় আরম্ভ হয়। তখন থেকেই Daventry স্টেশন থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের জন্যে নিয়মিতভাবে গান-বাজনা, বক্তৃতা, ঘোষণা ইত্যাদি চলে আসছে।

ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম রেডিও-ব্রডকাস্টিং আরম্ভ হয় মাদ্রাজ শহরে। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর

*ঢাকা বেতার কেন্দ্রের ভূতপূর্ব অধিকর্তা ডক্টর অমূল্যচন্দ্র সেন, রেডিও-ব্রডকাস্টিং ও রিলের (Relay) বাংলা করেছিলেন—ধ্বনি-বিস্তার ও ধ্বনি-সম্প্রসারণ।

রেডিও ক্লাব 1924 সনে নিয়মিতভাবে মাদ্রাজ থেকে রেডিও-প্রোগ্রাম পাঠাতে সুরু করেন। এই সময়ে কয়েকজন বেসরকারী বেতার-বিজ্ঞানীর চেষ্টায় কলিকাতা ও বোম্বাই শহর থেকেও নিয়মিতভাবে রেডিও-ব্রডকাস্টিং আরম্ভ হয়। 1927 সনে ইণ্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানী স্থাপিত হয়, ভারতবর্ষে সুনিয়মিত-ভাবে রেডিও ব্রড্‌কাস্টিং এই বছর থেকেই সুরু হয় বলা চলে। বোম্বাই ও কলিকাতাই ছিল এই কোম্পানীর প্রেরক-কেন্দ্র। 1926-27 সনে স্বর্গীয় অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের লেবরেটরিতে একটি বেতার-প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা করেন। এই বেতার কেন্দ্রটির সাংকেতিক নাম (Call sign) ছিল 2CZ। নিয়মিতভাবে অধ্যাপক মিত্রের গবেষক ছাত্রগণ এই বেতার কেন্দ্রটি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেন। এই বেতার-কেন্দ্র থেকে গান-বাজ্‌না, বক্তৃতা প্রভৃতি পৃথিবীর সর্বত্র খুব স্পষ্টভাবেই গৃহীত হতো। কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের এই বেতার প্রেরক কেন্দ্রটি প্রায় দুই বছর বেশ ভাল ভাবেই চলেছিল। 1930 সনে রেডিও-ব্রডকাষ্টিং ভারত গভর্নমেন্টের অধীনে আনীত হয় এবং Indian State Broadcasting Service নামে কলিকাতা ও বোম্বাই থেকে বেতার-অনুষ্ঠান চলতে থাকে। 1936 সনে বি. বি. সি-র মিঃ কার্ক (H. L. Kirke) নামে একজন অভিজ্ঞ কর্মচারী ভারত গভর্নমেন্টের নির্দেশে ভারতবর্ষে আসেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে বি. বি. সি.-র সুদক্ষ রেডিও-এঞ্জিনিয়ার মিঃ গয়ডার-এর (C. W. Goyder) তত্ত্বাবধানে ভারতবর্ষে প্রথমে বড় বড় নয়টি স্থানে বেতার-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর পরে অবশ্য ভারতবর্ষের ছোট-বড় নানা স্থানে উচ্চশক্তি-সম্পন্ন বেতার কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। 1936 সনে Indian State Broadcasting Service নাম বদ্‌লে All India Radio নাম দেওয়া হয়। 1930-1938 সন পর্যন্ত মাদ্রাজ কর্পোরেশন মাদ্রাজ বেতার কেন্দ্রটি নিয়মিতভাবে চালিয়ে এসেছিলেন। 1938 সন থেকে অল ইণ্ডিয়া রেডিও মাদ্রাজ রেডিও-স্টেশনের ভার গ্রহণ করেন।

ভারত গভর্ণমেন্টের তত্ত্বাবধান ছাড়াও বরোদা, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর, হায়দরাবাদ ও গোয়ালিয়র—এই কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যেও বেতার-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বৃটিশ ভারতের অন্যান্য স্থানেও বেতার কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। এদের মধ্যে এলাহাবাদের Experimental Station, দেরাদুন ব্রডকাষ্টিং অ্যাসোসিয়েসন ও লাহোর Y. M. C. A. ব্রডকাস্টিং স্টেশন উল্লেখযোগ্য।

চীন, জাপান, শ্যাম প্রভৃতি প্রাচ্য দেশের বড় বড় শহরগুলিতেও বহু বেতার-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইউরোপের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বেতার-বিজ্ঞান ও টেক্‌নোলজির প্রভূত উন্নতি হয়েছে। আধুনিক কালের দূরেক্ষণ বা Television কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠের এক স্থান থেকে বহু দূরে অবস্থিত অন্য স্থানে রেডিও-ব্রডকাস্টিং ও টেলিভিসন এবং অন্যান্য অনেক আশ্চর্য টেক্‌নোলজি সম্ভব হয়েছে। বেতার-বিজ্ঞানের অতি দ্রুত প্রগতি বিজ্ঞান-জগতে বিস্ময়কর নব নব আবিষ্কারের সম্ভাবনা এনেছে সন্দেহ নেই।

আফ্রিকার তৈলপ্রদায়ী পাম গাছ

বলাইচাঁদ কুণ্ডু

তাল, নারিকেল, সুপারি প্রভৃতি শাখাবিহীন একবীজপত্রী গাছগুলিকে ইংরেজীতে palm বা palm tree বলা হয়। এই সকল গাছের মধ্যে নারিকেল গাছ ভারতবর্ষ ও অন্যান্য অনেক দেশে প্রভূত পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়। নারিকেল গাছকে কেরালা প্রদেশবাসিগণ কল্পবৃক্ষ বলেন। এর ফলের শাঁস থেকে মূল্যবান তৈল, খইল ও ছোব্‌ড়া থেকে খুব মজবুত আঁশ পাওয়া যায়। তাছাড়া পাতা ও কাণ্ড নানা দরকারী কাজে লাগে। নারিকেল তৈল আমাদের দেশে বহু কাজে, বিশেষতঃ রন্ধন ও প্রসাধনের জন্যে প্রচুর পরিমাণ ব্যবহৃত হয়। নারিকেল ফলের কাঠিন অন্তস্ত্বকের বাইরের ছোব্‌ড়া থেকে যে তন্তু পাওয়া যায়, তা দিয়ে নারিকেল দড়ি, সতরঞ্চি, পাপোশ প্রভৃতি নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্য উৎপন্ন হয়। কচি নারিকেলের (ডাবের) মধ্যে যে জল থাকে, তার ভৈষজ্য গুণাবলী সর্বজনবিদিত। বাংলাদেশের জনসাধারণ ডাবের জল খুবই আগ্রহসহকারে পান করেন।

ভারতবর্ষে নারিকেলের সকল প্রকার উন্নতি সাধনের জন্যে কেরালার কেন্দ্রীয় নারিকেল গবেষণা কেন্দ্রে নানাবিধ উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে বহুদিন থেকেই গবেষণা চলছে।

নারিকেল গাছ সম্বন্ধে বিশদভাবে আরো অনেক কিছু বলা যেতে পারে। আলোচ্য প্রবন্ধে নারিকেল গাছের মত তৈলপ্রদায়ী আফ্রিকা-দেশীয় পাম গাছ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করবো।

দেশের লোকসংখ্যা প্রভূত বৃদ্ধি পাবার ফলে নারিকেল তৈলের চাহিদাও খুব বেড়েছে। সে জন্যে এই তৈলের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে ও সাধারণ লোকের ক্রয়-ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। অবশ্য ভারতবর্ষে নারিকেলের চাষ বাড়াবার চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু আশাপ্রদভাবে চাষ বাড়ে নি। নারিকেল ব্যতীত Elaeis guinensis বা oil palm আর



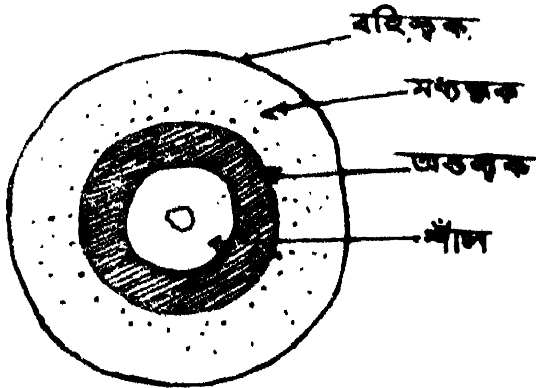
1নং চিত্র
অয়েল পাম গাছ

এক প্রকার তৈলপ্রদায়ী গাছ। এই পাম গাছ চাষের অনেক সুবিধা আছে। এতে বীজের শাঁস (Kernel) ছাড়া ফলের মধ্যত্বক

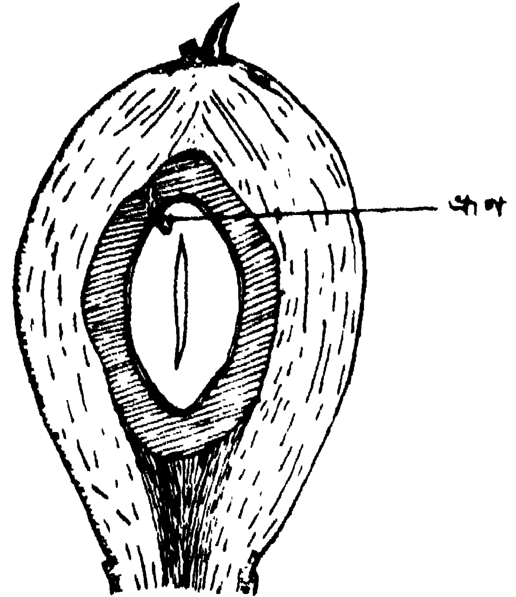
(Mesocarp) থেকেও প্রচুর তৈল পাওয়া যায়। এজন্যে একরপ্রতি তৈলের উৎপাদন নারিকেলের চেয়ে অনেক বেশী।

Elaeis guinensis—একে সাধারণতঃ আফ্রিকা দেশীয় তৈল উৎপাদনকারী পাম গাছ বলা হয়। এই গাছ দেখতে অনেকটা নারিকেল ও খেজুর গাছের মত। এর কাণ্ড প্রায় খেজুর গাছের মত (1নং চিত্র)। পশ্চিম আফ্রিকার সমুদ্র-কূলের জঙ্গল ও কঙ্গো নদীর অববাহিকা অঞ্চলে

এই পাম গাছের ফল নারিকেলের মত বড় হয় না। ফলগুলি অনেক ছোট, বৃন্তহীন—2·5 থেকে 5 সেন্টিমিটার লম্বা ও 2 থেকে 4 সেন্টিমিটার ব্যাসবিশিষ্ট। ফলগুলি ডিম্বাকার এবং শীর্ষদেশ বেশ তীক্ষ্ণ। বিভিন্ন উপজাতির ফলগুলি হলুদ, লাল, কমলা বা উজ্জ্বল কালো রঙের হয়ে থাকে। এক-একটি কাঁদিতে অনেকগুলি করে ফল ধরে এবং একটি মাত্র গাছ থেকে বছরে প্রায় 3000-4000 ফল (ওজনে প্রায় 30/40 কিলোগ্রাম) পাওয়া যায়।



2 (ক) নং চিত্র



2 (খ) নং চিত্র

অয়েল পাম গাছের ফলের প্রস্থচ্ছেদ ও লম্বচ্ছেদ। অন্তত্বক ও শাঁসের মধ্যে যে পাত্‌লা আবরণ দেখা যাচ্ছে, তা বীজ-ত্বক (Seed coat)।

এই গাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। তৈল উৎপাদন-কারী পাম গাছের স্বাভাবিকভাবে উৎপন্ন জঙ্গল আফ্রিকার পূর্বদিকে উগাণ্ডা ও টাঙ্গানিকা পর্যন্ত বিস্তৃত। তাছাড়া দক্ষিণ আমেরিকার বৃটিশ গায়না, ব্রেজিল, পেরু, ভেনেজুয়েলা এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জেও এই গাছ স্বাভাবিকভাবে জন্মায়। বর্তমানে আফ্রিকা মহাদেশের পশ্চিম উপকূলের প্রায় সকল দেশেই এবং মালয় ও ইন্দোনেশিয়ায় এর প্রচুর চাষ হয়ে থাকে।

2নং (ক ও খ) চিত্রে আড়াআড়ি ও লম্বভাবে কর্তিত ফলের আকৃতি দেখানো হয়েছে। ফলগুলি Drupe বা Stony fruit বলে পরিচিত। ফলত্বকে তিনটি স্তর আছে। বহিস্ত্বক বা ছাল পাত্‌লা ও অন্তত্বক (Shell বা Stone) অত্যন্ত শক্ত ও কাঠিন, মধ্যত্বক মাংসল। এই মধ্যত্বক থেকে প্রচুর তৈল পাওয়া যায়। তাছাড়া বীজের শাঁস থেকেও তৈল পাওয়া যায়।

পাম তৈল—আন্তর্জাতিক বাজারে মধ্যত্বক

থেকে পাওয়া তেলকে palm oil ও বীজের শাঁস থেকে পাওয়া তেলকে palm kernal oil বলা হয়। এই দুই প্রকার তেলের ব্যবহার-বিধি অনেকটা এক রকমের হলেও এদের প্রকৃতি ও স্বাভাবিক গুণ ভিন্ন প্রকারের। পৃথিবীর বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ তৈলের মধ্যে palm oil এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। এটি রন্ধনের কাজ ব্যতীত বাতি, সাবান ও টিনপ্লেট শিল্পে ব্যবহৃত হয়। Palm kernel বা শাঁসের তেল নারিকেল তেলের সমজাতীয় এবং রন্ধনের কাজ, প্রসাধন ও সাবান তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়।

পাম তৈলে প্রচুর পরিমাণে ক্যারোটিন (Carotine) থাকে। এটি একমাত্র উদ্ভিজ্জ তৈল, যা থেকে ভিটামিন A পাওয়া যায়। এজন্যে পাম তৈল উৎকৃষ্ট পর্যায়ের কড্‌লিভার অয়েলের সমজাতীয় এবং মাখন থেকেও অনেক উচ্চ গুণসম্পন্ন। শাঁসের তৈল সাদা বা একটু হল্‌দে রঙের হয়। এর স্বাদ ও গন্ধ প্রায় নারিকেল তেলের মত এবং নারিকেল তেলের সমস্ত গুণ এতে আছে। উভয় রকমের তৈল থেকে, বিশেষতঃ পাম তৈল থেকে প্রচুর margarine বা কৃত্রিম মাখন তৈরি হয়। ইউরোপীয় দেশসমূহে, বিশেষতঃ হল্যাণ্ড ও জার্মেনীতে এজন্তে এর খুবই চাহিদা।

এক একর জমিতে উৎপন্ন নারিকেল গাছ থেকে বছরে 250 থেকে 350 কিলোগ্রাম তৈল পাওয়া যায়। সমপরিমাণ জমির অয়েল পাম গাছ থেকে 700 থেকে 1700 কিলোগ্রাম পাম অয়েল পাওয়া যায়। তাছাড়া শাঁস থেকেও প্রায় সমপরিমাণ তৈল পাওয়া যায়। যে কোন্ তৈলবীজ থেকেও একর প্রতি অনেক বেশী তৈল অয়েল পাম গাছ থেকে উৎপন্ন হয়।

শাঁস থেকে তৈল নিষ্কাশনের পর যে খইল পাওয়া যায়, গবাদি পশুর খাদ্য হিসাবে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তা প্রচুর ব্যবহৃত হয়। খেজুর বা নারিকেল গাছের মত এদের কাণ্ড বা অপরিণত পুষ্পগুচ্ছ থেকে যে রস নিষ্কাশিত করা হয়, পশ্চিম আফ্রিকায় তাথেকে এক প্রকার মদ ও চিনি প্রস্তুত হয়। পাতা থেকে ঝুঁড়ি ও ঝাড়ু এবং পাতার ডাঁটার গোড়া থেকে যে আঁশ পাওয়া যায়, সেগুলি গদি, কুশন ইত্যাদির জন্যে ব্যবহৃত হয়। ফলের অন্তস্ত্বক (Shell) খোদাই করে নানাবিধ সৌখীন দ্রব্য তৈরি হয়। এর কয়লায় (Charcoal) নারিকেল shell-এর কয়লার সমস্ত গুণ আছে।

অয়েল পাম গাছের উপজাতি

ফলের আকৃতি ও গঠন অনুযায়ী (3নং চিত্র) পাম অয়েল গাছের তিনটি প্রধান উপজাতি আছে :—

(1) ডুরা (Dura)—এর অন্তস্ত্বক অত্যন্ত পুরু। এই উপজাতিও দুই প্রকারের হয়—আফ্রিকার ডুরা—এদের মধ্যস্ত্বক পাত্‌লা, অন্তস্ত্বক পুরু ও শাঁস বেশী। ডেলি ডুরা (Deli dura)—এদের ফলের আকৃতি অপেক্ষাকৃত বড়, আফ্রিকান ডুরা থেকে মধ্যস্ত্বক অনেক বেশী। এই জাতীয় ডুরা পামের চাষ সাধারণতঃ মালয় প্রভৃতি দেশে হয়।

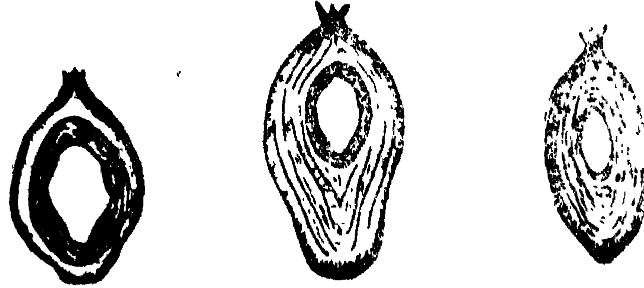
(2) টেনেরা (Tenera)—এদের ফল অনেক বড় ও অন্তস্ত্বক অনেক পাত্‌লা।

(3) পিসিফেরা (Pisifera)—এদের ফল অপেক্ষাকৃত ছোট। ফলের ত্বক পুরু হয়, কিন্তু অন্তস্ত্বক খুবই পাত্‌লা। এজন্তে এদের অন্তস্ত্বকহীন (shellless) বলা হয়।

3নং চিত্রে তিন জাতীয় ফলের মধ্যস্ত্বক, অন্তস্ত্বক, (Shell) ও শাঁসের (Kernel) শতকরা ভাগ দেখানো হয়েছে।

বর্তমান কালে প্রায় অধিকাংশ দেশেই টেনেরা জাতীয় পাম গাছের চাষ সমধিক প্রচলিত,

কারণ এরূপ পাম থেকে সর্বাধিক পরিমাণ তেল পাওয়া যায়। আফ্রিকান বা ডেলি ডুরা ও পিসিফেরার সংমিশ্রণে এক সঙ্কর (Hybrid)



3নং চিত্র

বামে—আফ্রিকান ডুরা, মধ্যে—টেনেরা, দক্ষিণে—পিসিফেরা
45-40-15 75-15-10 92-0-88

তিন প্রকার গাছের ফলের আকৃতি ও বিভিন্ন অংশ। সংখ্যাগুলির দ্বারা বিভিন্ন অংশের বহিস্ত্বকসহ মধ্যত্বক, কঠিন অন্তস্ত্বক ও শাঁসের শতকরা হার দেখানো হয়েছে।

পাম গাছ কৃষি-বিজ্ঞানীরা উৎপাদন করেছেন। এর গুণাবলী অনেকটা টেনেরার মত। আজকাল এই গাছের চাষ অনেক জায়গায় হচ্ছে।

তৈল পাম চাষের উপযুক্ত আবহাওয়া

এই গাছ সাধারণতঃ গ্রীষ্মপ্রধান দেশসমূহে জন্মায়। এদের চাষ করবার জন্যে নিম্নলিখিত আবহাওয়া আবশ্যক।

(1) বৃষ্টিপাত—সারা বছর সমভাবে বণ্টিত 1250 থেকে 3000 মিলিমিটার (50 থেকে 120 ইঞ্চি) বৃষ্টিপাত। 3 মাসের বেশী অনাবৃষ্টি বা খরা হলে গাছের বৃদ্ধি স্বাভাবিক হয় না।

(2) উষ্ণতা (Temperature)—24°-28° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা গাছের সুষ্ঠু বৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল। উষ্ণতা 18°C-এর নীচে বা 32°C-এর উপরে হলে গাছের ক্ষতি হয়।

(3) বাতাসের আর্দ্রতা (Humidity)—যে সব দেশে বাতাসের আর্দ্রতা বেশী, সেখানে এই গাছ ভালভাবে জন্মায়। এই আর্দ্রতা অন্ততঃ 75 শতাংশ হওয়া আবশ্যক।

(4) সূর্যালোক—বারো মাস সমভাবে বণ্টিত বছরে অন্ততঃ 1500 ঘণ্টা সূর্যালোক গাছের বৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল।

নিম্ন অম্লতাযুক্ত (p-H 8-0 থেকে 6-0) দোআঁশ মাটিতে এই গাছ ভালভাবে জন্মায়। বেলেমাটি বা কঙ্করময় মাটিতে এই গাছ জন্মাতে পারে, তবে বৃদ্ধি আশানুরূপ হয় না। যে সব স্থানে বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত কম বা বারো মাস সমভাবে বণ্টিত হয় না, সে সব স্থানে মাটির জলধারণ ক্ষমতা বেশী থাকলে চাষের ক্ষতি হয় না।

তৈলপ্রদ প্রচুর ফল উৎপাদন করে বলে এই পাম গাছ মাটি থেকে অধিক পরিমাণে নাইট্রোজেন ও ফস্‌ফরাসঘটিত উদ্ভিদ-খাদ্য শোষণ করে। এই কারণে প্রতি বছর গাছগুলিতে যথেষ্ট পরিমাণ জৈব বা অজৈব বা উভয় প্রকার সার প্রয়োগ করা আবশ্যক।

অয়েল পামের চাষ

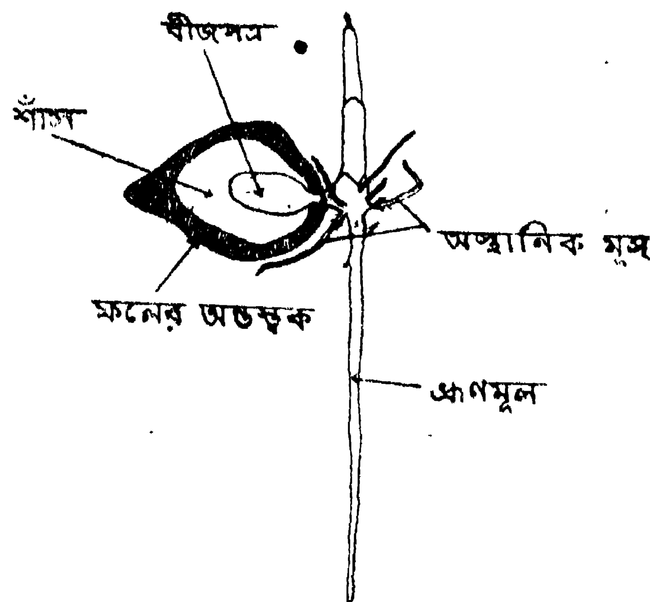
এই জাতীয় গাছের চাষ নারিকেল চাষের মত নয়। নারিকেল ফল (ছোব্‌ড়াসহ) লাগিয়ে তা-

থেকে অঙ্কুরোদ্গমের ব্যবস্থা করা হয়। অয়েল পাম গাছের বীজ (ফলের কাঠিন অন্তস্ত্বকসহ) পাকা ফল থেকে সংগ্রহ করে বীজতলায় লাগানো হয়। সেখানে দু-তিন মাসের মধ্যে বীজগুলির অঙ্কুরোদ্গম হয় (4নং চিত্র)। 6 থেকে 12 মাসের চারাগুলি যখন 25 থেকে 50 সেন্টি-মিটার লম্বা হয়, তখন সেগুলি তুলে নিয়ে অন্য স্থানে রোপণ করা হয়। প্রত্যেক গাছের জন্যে বেশ বড় গর্ত করে তাতে সার দিতে হয়। একটি গাছ থেকে অপর গাছের দূরত্ব সাধারণতঃ 8 থেকে 10 মিটারের মত রাখা হয়। মধ্যে মধ্যে গর্তগুলির চারধারে যথেষ্ট সার দিতে হয়। নিয়মিত সার প্রয়োগ করলে ফলনও বেশী হয়।

এই গাছের পাতা নারিকেল গাছের পাতার মত কাণ্ড থেকে স্বাভাবিকভাবে পড়ে যায় না। খেজুর গাছের মত পাতাগুলিকে মধ্যে মধ্যে কেটে দিতে হয়। 4 থেকে 6 বছর বয়স হলে গাছগুলিতে ফল ধরতে আরম্ভ করে এবং 25-30 বছর ধরে খুব ফল দেয়। তার পর থেকে ফলন কমতে থাকে।

তৈল উৎপাদনের পরিমাণ

সম্প্রতি আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে এই গাছের চাষের অনেক উন্নতি হয়েছে। আগে হেক্টর প্রতি 1 টন তৈল উৎপন্ন হতো, এখন দেখা যাচ্ছে যে, উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে ফলের ত্বক থেকে 3 থেকে 4 টন পাম অয়েল উৎপন্ন হতে পারে। সাধারণতঃ ফলের মধ্যত্বক থেকে 15-16 শতাংশ তৈল উৎপন্ন হয়। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলেও নব উদ্ভূত সঙ্কর জাতীয় গাছের ফলের মধ্যত্বক থেকে 20 থেকে 23 শতাংশ তৈল পাওয়া সম্ভব হয়েছে। নিম্নে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের তৈলের উৎপাদনের পরিমাণ দেখানো গেল।



4নং চিত্র

অয়েল পাম বীজের অঙ্কুরোদ্গম। ফলের কঠিন অন্তস্ত্বকের দ্বারা বীজটি আবৃত। চিত্রে অন্তস্ত্বক ও শাঁস (Kernel বা Endosperm)-এর মধ্যে যে পাতলা বীজত্বক আছে, তা দেখানো হয় নি

পাম তৈলের উৎপাদন-পরিমাণ 1000 মেট্রিকটন

	পাম অয়েল						শাঁসের তৈল					
	1948 -49	1958 -59	1959 -60	1960 -61	1961 -62	1962 -63	1948 -49	1958 -59	1959 -60	1960 -61	1961 -62	1962 -63
আফ্রিকা	800	930	910	890	900	860	750	870	840	820	800	730
দূর প্রাচ্য	163	218	210	233	241	250	39	54	53	57	59	61
ল্যাটিন আমেরিকা	...	21	22	...	...	...	100	150	150	160	180	190
মোট উৎপাদন	963	1169	1142	1123	1141	1110	889	1074	1043	1037	1039	981

উপরে 1962-63 সাল পর্যন্ত উৎপাদনের পরিমাণ দেখানো হয়েছে। গত কয়েক বছরে উন্নত ধরণের চাষের ফলে উৎপাদনের পরিমাণ অনেক বেড়েছে। দুঃখের বিষয় বর্তমান উৎপাদনের পরিমাণের সংবাদ আমার কাছে নেই। 1966 সালে লেখক ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে ভ্রমণকালে পেরু ও ব্রেজিলে অয়েল পাম চাষের উন্নতির জন্যে সরকারী প্রচেষ্টা দেখে এসেছেন। এই গাছের চাষ খুবই লাভজনক। ঐ সব দেশের সরকার ফরাসী ও ডাচ বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করে চাষের উন্নতির ব্যবস্থা করেছেন। তাছাড়া ঐ সব দেশে চাষ বাড়াবার চেষ্টাও হচ্ছে।

ভারতে অয়েল পাম চাষের সম্ভাবনা

প্রায় 40 বছর আগে এই পাম গাছ ভারতের আবহাওয়ায় জন্মাতে পারে কিনা, তা দেখবার জন্যে বিভিন্ন বোটানিক গার্ডেনে আনীত হয়েছিল এবং এই গাছের চাষ লাভজনক হয় কিনা, তা দেখবার জন্যে কেরালার কয়েকটি স্থানে পরীক্ষামূলকভাবে চাষের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বোটানিক গার্ডেনসমূহে রোপিত গাছগুলির বৃদ্ধি ভালভাবে হয়েছে এবং ফলের উৎপাদনও ভাল হয়েছিল। কিন্তু এর চাষ তখন লাভজনক বলে মনে হয় নি। তখনকার কর্তৃপক্ষের ধারণা হয়েছিল যে, দেশে নারিকেল তৈল যথেষ্ট সুলভ ও সহজলভ্য—এই কারণে বিদেশ থেকে আনীত এই গাছের চাষের চেষ্টার আবশ্যক নেই। এই কারণে ঐ প্রকল্প পরিত্যক্ত হয়।

40 বছর আগে দেশের লোকসংখ্যা অনেক কম ছিল। তৎকালে উৎপন্ন নারিকেল তৈল সুলভ ও সহজলভ্য ছিল। বর্তমানে দেশের লোকসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধির ফলে নারিকেল তৈলের উৎপাদন কিছু বাড়লেও তা সুলভ নয়। সিংহল থেকে আমদানী করেও দেশের চাহিদা মেটানো যাচ্ছে না। এই কারণে এখন থেকে আফ্রিকা দেশীয় এই পাম গাছ চাষের চেষ্টা আবার করা আবশ্যক। ভারতের কয়েকটি স্থানে এই গাছ চাষ করবার উপযুক্ত আবহাওয়া আছে। বর্তমান অয়েল পামের চাষের যে সব উন্নতি হয়েছে, তা অনুসরণ করলে ভারতে এই গাছের চাষ সফল ও লাভজনক হবে। দেশে বিভিন্ন খাদ্যবস্তুর উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে নানা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করি, সরকার শীঘ্রই পাম অয়েল চাষের একটি প্রকল্প চালু করে এই খাদ্যতৈল, তথা সাবান তৈরির উপযুক্ত ও প্রসাধনে ব্যবহৃত তৈলের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করবেন।

অপরাধ-বিজ্ঞানে সনাক্তকরণ

জীমূতকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

অপরাধ তদন্তের প্রাথমিক প্রয়োজনই হচ্ছে, অপরাধী ও সন্দেহভাজন ব্যক্তির সঠিক পরিচয় নির্ণয় করা—তাকে উপযুক্ত ভাবে সনাক্ত করা। কারণ এর দ্বারাই সম্ভব হয় সংঘটিত কোন অপরাধের সঙ্গে সম্ভাব্য অপরাধীর অপ্রাপ্ত যোগ-সূত্র নির্ধারণ করা, যা অপরাধ তদন্তের মূল কথা।

সঠিক ব্যক্তি পরিচয় নির্ণয় (Personal identificatin) তাই অপরাধ তদন্তে অপরিহার্য। এর দ্বারা শুধু যে প্রকৃত অপরাধী ধরা পড়ে তাই নয়, নির্দোষ ব্যক্তিও নিষ্কৃতি পায়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে সারা পৃথিবীর পুলিশ আজ ক্রমেই বেশী করে নির্ভর করছে বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির সাহায্যে ভ্রান্তি ও ত্রুটিমুক্ত সনাক্তকরণ বা অভ্রান্ত পরিচয় নির্ণয়ের উপর।

এই উদ্দেশ্যে প্রথম সুসংবদ্ধ প্রচেষ্টা করেন আলফানসো বার্টিলোন (Alfanso Burtillon), যিনি অ্যানথ্রোপোমেট্রি (Anthropometry) নামক এক পদ্ধতির উদ্ভব করেন। এই প্রথা মূলতঃ নির্ভর করতো অপরাধীর শারীরিক মাপজোখের ভিত্তিতে প্রস্তুত বিস্তৃত তথ্যতালিকার উপর—যা সন্দেহ-ভাজন ব্যক্তির অনুসন্ধানে কাজে লাগানো হতো। গত শতকের শেষ অবধি সারা পৃথিবী জুড়ে ছিল এই পদ্ধতির প্রচলন। কিন্তু এই পদ্ধতিতে বিস্তর ভুলভ্রান্তি ধরা পড়তো। তাছাড়া সব ক্ষেত্রে এটা প্রয়োগ করাও সম্ভব হতো না।

এই সময়ে ফটোগ্রাফিও ততটা উৎকর্ষ ও কার্যকারিতা লাভ করে নি, যার দরুণ ফটোগ্রাফির তথ্য-প্রমাণকেও নস্যাৎ করে দেওয়া চতুর অপরাধীর পক্ষে খুব অসম্ভব ছিল না।

এই অবস্থার প্রতিকারে বিশ্বব্যাপী পুলিশ কর্তৃক নিয়মিত অপরাধ তদন্তের কাজে প্রচলিত হলো আঙ্গুল-ছাপের (Finger print) ভিত্তিতে সনাক্ত-করণ প্রথা। এই শতকের গোড়া থেকে এটাই সারা পৃথিবীতে গৃহীত হয়েছে এক অবিসংবাদিত তদন্তসহায়ক রূপে। আদি আঙ্গুল-ছাপ পদ্ধতিতে ক্রমে ক্রমে এসেছে অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন। ঐ সংযোজন ও সংস্করণের কাজ এখনো শেষ হয়ে যায় নি। বর্তমানেও আঙ্গুল-ছাপই অপরাধ তদন্তের অন্যতম প্রধান নির্ভরযোগ্য উপাদান।

অপরাধ তদন্তে উত্তরোত্তর উন্নত বৈজ্ঞানিক কলা-কৌশল প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি সনাক্ত-করণ সমস্যাও বেশী করে মনোযোগ আকর্ষণ করছে। দেখা গেছে যে, আঙ্গুল বা আলোকচিত্র সব সময় সুলভ না হওয়ায় অপরাধী বা অপরাধের ঘটনা অথবা দুর্দৈবে কবলায়িত ব্যক্তিদের সঠিক পরিচয় নির্ধারণ অনেক সময় বেশ দুরূহ সমস্যারূপে দেখা দেয়। আর ভুল সনাক্তকরণ বা পরিচয় নির্দোষ ব্যক্তির পক্ষে বিস্তর দুর্ভোগ ও বিপদের কারণ হতে পারে।

তাই এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজে শুধু প্রচলিত পদ্ধতির উপর নির্ভর না করে থেকে চললো নিত্য নতুন উপায় উদ্ভাবন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং অনেকগুলিতে আশাতীত সাফল্য লাভ করা গেল।

পরিচয়জ্ঞাপক সরঞ্জাম বা আইডেনটিটি কিট্ (Identity Kit)

আলোকচিত্র গ্রহণ যদিও অপরাধ তদন্তে প্রচুর সাহায্য করে থাকে, তথাপি এর ত্রুটিও রয়েছে কম নয়। ভুল সনাক্তকরণের সম্ভাবনাও এতে রয়েছে। অবশ্য ভিডিও (Video) টেপ-

রেকর্ডার পদ্ধতিসহ টেলিভিশন এই ফটোগ্রাফির কাজে যুক্ত হওয়ায় অপরাধীর পরিচয় সংক্রান্ত তথ্য সুষ্ঠুতরভাবে গ্রহণ ও সংরক্ষণের চেষ্টা হচ্ছে। এই সব তথ্য আদালতে প্রমাণ হিসাবে গ্রাহ্য হচ্ছে ও পুলিশ বিভাগে অপরাধী সনাক্তকরণের (Identification parade) গতানুগতিক অনুষ্ঠানের বদলে এই পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। এই পদ্ধতি যদিও বর্তমানে বেশ কিছুটা ব্যয়সাধ্য, তথাপি এর দ্বারা বিপুল পরিমাণ তথ্য-প্রমাণ সঞ্চিত করে রাখা সম্ভব। দেখা গেছে, উদ্দিষ্ট ব্যক্তির পরিচয় নির্ণয়ের কাজে প্রতি মিনিটে প্রায় 66,000 আলোকচিত্রের অনুসন্ধান ও পরীক্ষা এর দ্বারা করা সম্ভব। অধিকন্তু এর সাহায্যে কোন ফটোগ্রাফের অতি উৎকৃষ্ট নকল বা কপি দ্রুত প্রস্তুত করে বিশেষ টেলিফোন লাইন বা বেতারের মাধ্যমে নিমেষে স্থানান্তরে পাঠানো সম্ভব। বহু দূরের ষ্টেশনেও তার মারফৎ পাঁচ মিনিটেরও কম সময়ে এই ফটোবার্তা পাঠানো সম্ভব। এছাড়া এই ফটোবার্তাকে সুসংবদ্ধ স্থায়ী নথি বা তথ্যরূপে সংরক্ষণ করা সম্ভব, যাতে দরকারমতই তা ব্যবহার করা চলে। বিদেশে পুলিশ সংস্থা এখন তাদের কাজে এই সব আধুনিক পদ্ধতি বেশী করে ব্যবহার করছেন।

সাম্প্রতিক ফটোগ্রাফির সরঞ্জামের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য হচ্ছে, ইনফ্রারেড-রে ক্যামেরা, যার সাহায্যে রাতের অন্ধকারে ফ্লাশগানের সাহায্য ছাড়াই লুকিয়ে থাকা বা পলায়মান অপরাধীর ফটো তোলা বা সন্ধান পাওয়া সম্ভব।

তাছাড়া আলোকচিত্রের ভিত্তিতে ব্যক্তি পরিচয়জ্ঞাপক তথ্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি প্রচলিত হয়েছে আইডেনটিটি কিট্ সিস্টেম বা সনাক্তকরণ সরঞ্জামের ব্যবহার। এতে কাজে লাগানো হয় একই জিনিষের—যেমন মানুষের মুখের কতকগুলি স্বচ্ছ সারিবদ্ধ বহিরাবণ খোলসকে (Overlays)। এই বহিরাবণ খোলস-গুলিই মানুষের মুখের বিভিন্ন অংশের এক-একটি নমুনা। 6টি থেকে 9টি এমন বহিরাকৃতির যুক্ত খোলস মিলে তৈরি হয় এক একটি সম্পূর্ণ মুখাকৃতির নমুনা—কোন ক্যামেরা বা শিল্পীর সাহায্য ছাড়াই।

এই ভাবে কয়েক মিনিটের মধ্যেই গড়ে তোলা যায় কোন মানুষের সম্পূর্ণ মুখাবয়ব, যার সাহায্যে তদন্তকারী অফিসার সন্দেহভাজন অপরাধীকে ধরে ফেলতে সক্ষম হন।

হাতের আঙুল ও পায়ের ছাপ

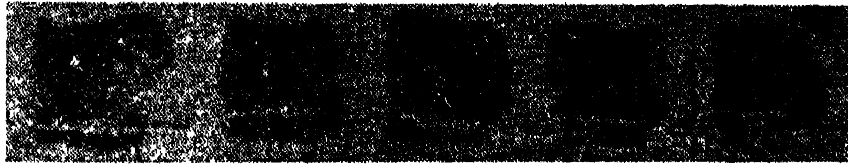
হাতের আঙুল-ছাপ ও তার শ্রেণী বিচারের বিশেষ মৌলিক উন্নতি কিন্তু হয় নি, যদিও বিভিন্ন দেশের সংগ্রহশালায় রক্ষিত বহু লক্ষ আঙুল-ছাপ বাছাই ও পরীক্ষার কাজে সুবিধার জন্যে চালু হয়েছে নানা উপশ্রেণী বিভাগ। এখনকার সমস্যা হচ্ছে, অনেক বেশী সংখ্যক আঙুলের ছাপের তালিকা-ভুক্তি করা ও তাদের ভিতর থেকে যথাসম্ভব দ্রুততা ও নির্ভুলতার সঙ্গে উদ্দিষ্ট কোন আঙুল-ছাপ সম্পর্কে অনুসন্ধান চালানো। টেলিভিশন ভিডিও-টেপ (Vision+odeo) শোনা ও দেখা যায়, এমন ফিতা সঞ্চালিত টেলিভিশন পদ্ধতির সাহায্যে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যসহ প্রতিটি আঙুলের ছাপ নথিভুক্ত করে রাখা সম্ভব হয়েছে। পাঁচ লক্ষের উপর আঙুল-ছাপ সংরক্ষণ ও সর্বদা ব্যবহারের কাজে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। আঙুল-ছাপের শ্রেণী বিচার, বাছাই ও তল্লাসীর কাজে কম্পিউটারের সাহায্য নেবার চেষ্টাও করা হয়েছে এবং তদনুযায়ী আঙুল-ছাপের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক ডেটা প্রোসেসিং বা ইলেকট্রনিক পন্থায় তথ্য সাজাবার ব্যাপারে এযাবৎ সাফল্য লাভ হয়েছে অসামান্য।

টেলিফোন মারফৎ আঙুল-ছাপের কপি পাঠানো আজকাল সব অগ্রসর দেশে প্রচলিত

হচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে উপযুক্ত সাজসরঞ্জামও বিভিন্ন জায়গা থেকে পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। নতুন ফটো-টেলিগ্রাফি পদ্ধতিতে প্রতি ইঞ্চিতে 200 লাইন পর্যন্ত পরিষ্কারভাবে গ্রহণ ও প্রেরণ করা যাচ্ছে। রেডিও প্রেরণ পদ্ধতিতে খরচা একটু বেশী, কিন্তু কার্যকারিতাও সেই সঙ্গে বেশী। সে যাই হোক, এই সব পদ্ধতিতে আঙুলের ছাপ অল্প সময়ের মধ্যে দীর্ঘ দূরত্বে পাঠিয়ে সত্বর অনুসন্ধান ও পরীক্ষা চালানো সম্ভব হয়েছে। শিল্পবিজ্ঞানে উন্নত দেশগুলিতে ইতিমধ্যেই এই পদ্ধতির যথেষ্ট প্রচলন হয়েছে।

অনেক গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে এবং কয়েকটি পদ্ধতিও প্রচলিত হয়েছে। পেরিফটো-গ্রাফি ক্যামেরার সাহায্যে এখন যে কোন ছোট বৃত্তাকার বস্তুর উপর পরিপূর্ণ আঙুল-ছাপের ছবি গ্রহণ সম্ভব।

চামড়ার খাঁজ (Ridges) সহ অনাবৃত পায়ের ছাপ বা পাদুকা-ছাপের ও হাতের আঙুলের ছাপের পাশাপাশি মূল্যবান ভূমিকা রয়েছে ব্যক্তির পরিচয় নির্ধারণে—অর্থাৎ সনাক্তকরণে। কারো ব্যবহার করা পায়ের জুতা আজকাল বিশেষভাবে কাজে লাগছে তুলনামূলক বিচারের ভিত্তিতে সনাক্তকরণের কাজে।



পুলিশের নথীভুক্ত আঙুল-ছাপের এক সারির প্রতিলিপি।

কঠিন ও জটিল পরিস্থিতিতে আঙুল-ছাপ উদ্ধারের জন্যেও নানা কৌশল উদ্ভাবিত হচ্ছে; যেমন—আক্রান্ত, আহত বা মৃত ব্যক্তির গায়ের চামড়ার উপর থেকে অপরাধীর বা মৃতের আঙুল-ছাপ উদ্ধারের জন্যে ইলেকট্রনোগ্রাফি কৌশলের ভিত্তিতে রঞ্জেন-রশ্মি প্রয়োগের এক পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। এই পদ্ধতিতে আহতের বা মৃতের গায়ের চামড়া বা আঙুলের মাথার উপর সীসার গুঁড়া ছড়িয়ে দিয়ে রঞ্জেন-রশ্মির সাহায্যে উপযুক্ত ছবি নেওয়া হয়। আবার একই উপায়ে বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ায়ও কাগজের উপর ছড়িয়েদেওয়া ধাতব গুঁড়ার সাহায্যে দু-বছর পর্যন্ত সময়ের ব্যবধানেও আঙুলের ছাপ উদ্ধার করা যায়।

গলিত, বিদগ্ধ ও শুকিয়ে যাওয়া (Mummified) দেহ থেকে হাতের আঙুলের ছাপ গ্রহণ সম্পর্কে

আঙুল-ছাপ ও পায়ের ছাপ ছাড়াও আজকাল মানুষের অন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, যেমন—কান এমন কি, ঠোঁটও ব্যক্তিবিশেষকে সনাক্তকরণের ব্যাপারে অপরাধ তদন্তে খুব কাজে লাগছে।

বিশেষ করে কান—কানের নক্সা নাকি মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অপরিবর্তনীয়। সম্প্রতি কানের 12টি অংশের এক তুলনামূলক বিচার-পদ্ধতি প্রস্তুত হয়েছে। এই পদ্ধতি অনুযায়ী কানের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য ও তার প্রামাণ্য সব তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে, যাতে কানের তুলনামূলক মিল বা প্রভেদ ধরা পড়ে। তবে বিষয়টি এখনও অধিকতর গবেষণাসাপেক্ষ।

অপরাধ তদন্তে ঠোঁটের ছাপের এক অভিনব প্রয়োগের কথা শোনা গেছে সম্প্রতি জাপান থেকে। চা বা পানীয়ের পেয়ালায় আমরা সবাই চুমুক দিয়ে থাকি। সেই পেয়ালায় যদি

দৈবাৎ অপরাধীর ঠোঁটের ছাপ লেগে যায়, তবে তা অপরাধীর পক্ষে প্রায় মৃত্যুপরোয়ানার সামিল হতে পারে।

দু-জন বিশিষ্ট জাপানী দন্তচিকিৎসক ডাঃ কাজুও সুজুকী এবং ডাঃ ইয়াসুৎসুচিহাশি সম্প্রতি আঙ্গুলের ছাপের মত মানুষের ঠোঁটের ছাপেরও এক শ্রেণী বিভাগ বের করেছেন—যা ব্যক্তি-বিশেষকে সনাক্তকরণে আঙ্গুলের ছাপের মতই অভ্রান্ত বলে তাঁরা মনে করেন। এই শ্রেণী বিভাগ প্রস্তুত হয়েছে ঠোঁটের উপরের চামড়ার খাঁজকাটা ধরণের (Ridge pattern) মোট পাঁচটি সুস্পষ্ট নমুনার উপর নির্ভর করে। তাঁরা নমুনা হিসাবে প্রায় 1000 পাঁচমিশালী লোক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। এদের মধ্যে ছিল প্রায় 15 জোড়া অভিন্ন আকৃতির যমজ লোক। গবেষকদ্বয় দেখেছেন, এদের প্রত্যেকেরই ঠোঁটের ছাপ অন্যের চেয়ে স্বতন্ত্র ও চিনে বের করবার মত।

গত জানুয়ারী মাসেই (1971) টোকিও শহরে সংঘটিত এক রাহাজানিতে অপরাধী সচিত্র ম্যাগাজিনের ছবির গায়ে ঠোঁটের চুম্বন চিহ্ন রেখে যায়। তদন্তকালে সুজুকী সেই ঠোঁটের ছাপের সাহায্যে পুলিশকে খুঁজে বের করতে সাহায্য করে সেই ঠোঁটের ছাপের অধিকারী অপরাধীকে। শেষ অবধি তার অপরাধ প্রমাণিত হয় ও সাজা হয়ে যায়।

পুলিশের কাজে ঠোঁটের ছাপ-বিজ্ঞানের মূল প্রবক্তা হচ্ছেন আমেরিকার লস এঞ্জেল্‌স্‌-এর পুলিশ বিভাগের ভূতপূর্ব অপরাধ-বিজ্ঞানী লেফটেন্যান্ট লী জোন্‌স, যিনি 1954 সালে কোন এক মোটর দুর্ঘটনায় আহত জনৈকা নারীর ঠোঁটের ছাপের উপর নির্ভর করে দুর্ঘটনার জন্যে দায়ী ড্রাইভারকে খুঁজে বের করতে সক্ষম হন। গাড়ীর গায়ে পাওয়া আহত নারীর ঠোঁটের ছাপ ছিল তদন্তের প্রধান সূত্র। অবশ্য এই বিষয়টি আরও গবেষণাসাপেক্ষ।

মৃত্যুর পরে মৃত ব্যক্তিকে ঠিকমত সনাক্ত করা অনেক সময়ই বেশ কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। মাটির নীচে পুঁতে ফেলা বা কবর দেওয়া খণ্ডবিখণ্ড গলিত বিকৃত শবের দেহাবশেষ বা কঙ্কালের অংশবিশেষ পরীক্ষা করে তার আসল পরিচয় উদ্‌ঘাটন প্রায়ই অপরাধ তদন্তের একটি অত্যাবশ্যকীয় অথচ দুরূহ অঙ্গ।

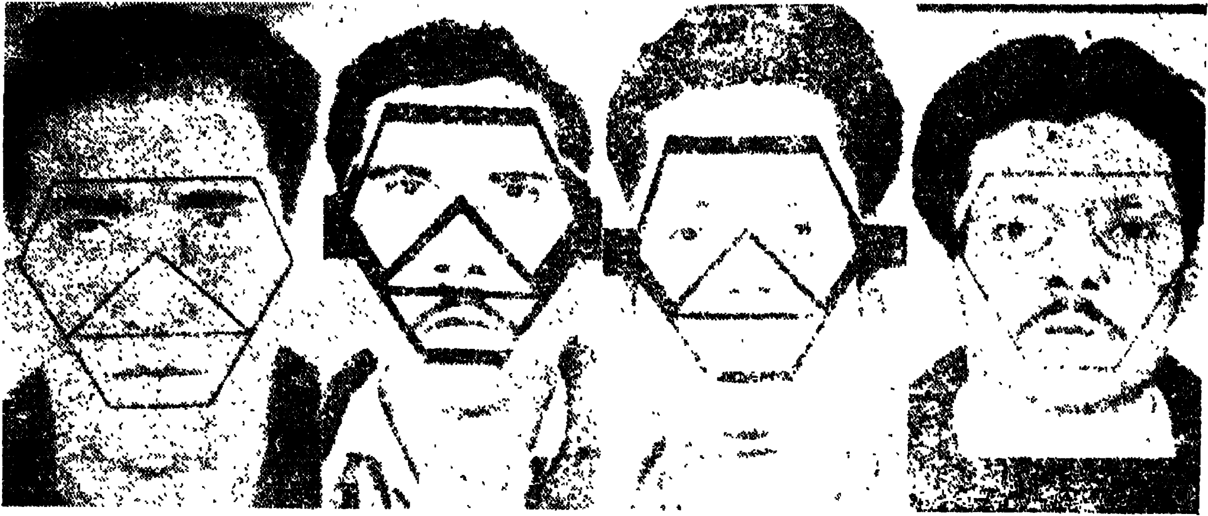
চিকিৎসা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক মূল বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতির ফলে এই ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা অভ্রান্ত রায় পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। নিহতের বয়স সঠিকভাবে নির্ধারণে করোটির অংশবিশেষ কার্নিয়াল ষ্ট্যাচার (Carnial statures) পরীক্ষা, ব্যাপক হতাহতের ক্ষেত্রে দেহের ফিমার (Femur) হাড়ের মজ্জায় লাল ও হলুদে অংশের পরীক্ষা এবং এছাড়া ডায়াফিসিস (Diaphysis) হাড়ের টুক্‌রা পরীক্ষা—এসব হচ্ছে কয়েকটি সাম্প্রতিক অনুসৃত পদ্ধতি। এছাড়া সম্ভাব্য ইস্‌ট্রোমেট্রিক বা বলকারক চেতনা সঞ্চার পদ্ধতির সাহায্যও এই ব্যাপারে অধিকতর ফল লাভের চেষ্টা করা হচ্ছে।

মস্তিষ্কের করোটির হাড়ের সঙ্গে মৃতের ফটোগ্রাফ সুপারইমপোজিশন পদ্ধতিতে—একটার উপর অন্যটা রেখে—মিলিয়ে তুলনামূলক বিচারের দ্বারা মৃতের সনাক্তকরণ একটা পরীক্ষিত সফল কৌশল। মৃতদেহকে রঞ্জেন-রশ্মির দ্বারা পরীক্ষা করে সেই ফটো—মৃতের জীবিতাবস্থার কোন সময় চিকিৎসাকালীন গৃহীত—কোন রঞ্জেন-রশ্মির ফটোর সঙ্গে তুলনামূলক পরীক্ষা করে অনেক সময় মৃতদেহ সনাক্তকরণের মূল্যবান সূত্র পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

এছাড়াও আছে আর এক বিচিত্র পদ্ধতি যার নাম ফটো-রোবট পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে কোন ব্যক্তিবিশেষকে যে চেনে বা চোখে দেখেছে, এমন কোন ব্যক্তির শুধু মাত্র স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে তার সাহায্যে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির চেহারার বৈশিষ্ট্য

সঙ্কলিত করে একটা সম্ভাব্য আকৃতি দান করা হয় বিভিন্ন নমুনার সংগৃহীত ফটোগ্রাফ থেকে মিলিয়ে। এই ভাবে প্রস্তুত ছবির সাহায্যে সহজেই উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে চিনে বের করা বা সনাক্ত করা সম্ভব।

ফরেনসিক ওডোনটোলজি (Forensic-odontology) বা অপরাধ তদন্তসম্পর্কিত দন্ত-সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তুলনামূলক বিচারের দ্বারা শেষ অবধি প্রমাণিত হয় যে, এই কামড় অপরাধীরই দাঁতের কামড়। বিভিন্ন মানুষের দাঁতে থাকে বিভিন্ন রকমের বৈশিষ্ট্য বা বিকৃতি ; যেমন—কারো দাঁতে থাকে হয়তো সোনা বা রূপার ঝালাই, কারো দাঁত কৃত্রিম বা বাঁধানো, কারো কোন দাঁত নেই বা দাঁতে পোকাধরা বা অন্য রোগ—যার দ্বারা



ফটো-রোবট পদ্ধতিতে প্রস্তুত আলোকচিত্র। সর্ববামের চিত্রটিতে মুখের মূল আদলের নক্সা চিহ্নিত হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ছবিতে (বাম দিক থেকে) মুখাকৃতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সমন্বিত করে সম্ভাব্য আকৃতিটি তৈরী করবার চেষ্টা করা হয়েছে। সর্ব দক্ষিণের চিত্রটি এই প্রচেষ্টার ফল। এর দ্বারা উদ্দিষ্ট লোককে বের করা সম্ভব।

বিজ্ঞান ব্যক্তি চেনায় বিশেষ সাহায্য করছে। এই বিজ্ঞানে দাঁতের উৎপত্তি ও অভিন্নতা বিচার করা হয় পরীক্ষা ও গবেষণার সাহায্যে।

কয়েকটি গুরুতর নরহত্যা মামলায় ফটোগ্রাফের সাহায্যে—সুপারইমপোজিশন পদ্ধতিতে অর্থাৎ একটির উপর আর একটি রেখে মিলিয়ে ব্যক্তি-বিশেষের দাঁতের সনাক্তকরণ সম্ভব হয়েছে এবং তা আদালতে অপরাধীর বিরুদ্ধে নির্ভরযোগ্য তথ্য-রূপে স্বীকৃত হয়েছে। সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের একটি হত্যা মামলায় নিহতের দেহে তিনটি দাঁতের কামড়ের চিহ্নই ছিল হত্যার প্রধান প্রমাণ। নিঃসন্দেহে বোঝা যায়, কোন্ দাঁতের মালিক কে বা কোন্ কামড় কার মুখের দাঁতের। শুধু যে আসল অপরাধী এতে ধরা পড়ে তাই নয়, ভুল বা সন্দেহবশতঃ ধৃত নির্দোষ ব্যক্তিও এর দ্বারা রেহাই পেয়ে যায়। এই তুলনামূলক দাঁতের পরীক্ষায় দাঁতের রঞ্জেন-রশ্মির চিত্র বা সাধারণ আলোকচিত্র খুব অভ্রান্তভাবে কাজে লাগে।

কৃত্রিম দাঁত প্রস্তুতকারকের বিশেষ চিহ্ন (Trade বা manufacturing marks) দিয়ে দাঁত ও সেই সঙ্গে দাঁতের মালিককে চিনে বের করা সম্ভব। বাস্তবিক পক্ষে এখন দাঁতের দ্বারা

সনাক্তকরণ পদ্ধতি এতদূর সঠিক ও নির্ভরযোগ্য হয়ে উঠেছে যে, আজকাল বহু দেশের যাত্রী বিমান সংস্থা ও পুলিশ বিভাগে তাদের কর্মীদের দাঁতের বিধিসম্মত পূর্ণ বিবরণ সংরক্ষণ করছেন, যাতে দরকারমত তা সনাক্তকরণের কাজে লাগানো যায়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, যে দাঁত আগে শুধুমাত্র ব্যক্তিবিশেষের আনুমানিক বয়স নির্ধারণের কাজে ব্যবহৃত হতো, তা আজকাল ব্যক্তি সনাক্তকরণের অন্যতম এক নির্ভরযোগ্য অবলম্বন।

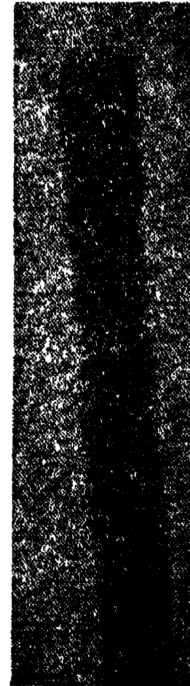
জৈব নির্যাস ও চুল

মানুষের দেহের জৈব নির্যাসের মধ্যে ব্যক্তির পরিচয় নির্ধারণে যে জিনিষের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তা হচ্ছে দেহের রক্ত। অবশ্য বর্তমানে রক্ত শুধু কোন জিনিষের অস্তিত্বের চেয়ে অনস্তিত্ব প্রমাণ করতেই বেশী সক্ষম, অর্থাৎ নেতিবাচক (Negative) প্রমাণ হিসাবেই রক্তের তথ্যমূল্য অকাট্য। সচরাচর এ, বি ও ও—রক্তের এই তিনটি শ্রেণী বিভাগের দ্বারা ব্যক্তিবিশেষকে তার দেহের রক্তের প্রকৃতি অনুযায়ী এ, বি, এ+বি এবং ও—এই চারটি আলাদা শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। তাই অপরাধ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই শ্রেণী বিভাগের উপযোগিতা ও প্রয়োগক্ষেত্র সীমাবদ্ধ।

সম্প্রতি রক্তের স্বরূপ বিচারে অন্য ভিত্তিতে রক্তের শ্রেণী বিভাগ প্রচলিত হয়েছে ; যেমন—এম এন (M N) ও আর এইচ (R H) বিভাগ। এগুলি অপরাধসংক্রান্ত নিয়মমাফিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। সর্বাধুনিক জৈব রসায়নিক ও রোগ প্রতিষেধক (Biochemical and Immunological) পদ্ধতিতে ব্যক্তিবিশেষের রক্তের গঠন, উপাদান ও বিস্তারিত বৈশিষ্ট্য নিয়ে গবেষণা চলছে। একটি বিবরণে জানা যায় যে, এর দ্বারা শেষ অবধি হয়তো 5 কোটি লোকের মধ্যেও যে কোন এক বিশেষ উদ্দিষ্ট ব্যক্তির দেহের রক্তের বিশেষ উপাদানের ভিত্তিতে—তাকে বেছে বের করা সম্ভব হবে। রক্তের শ্রেণী বিভাগের পদ্ধতিতেও হয়েছে প্রভূত উন্নতি এবং তাকে অপরাধ-বিজ্ঞানের কাজে বিশেষ উপযোগী করে তোলা হয়েছে।

বাস্তবিক পক্ষে আজকাল শুধুমাত্র কয়েকটি ছোট রক্তেভেজা আঁশ বা চুলের সাহায্যেই রক্ত-বিশেষজ্ঞ পারেন রক্তের সঠিক শ্রেণী বলে দিতে।

একই পদ্ধতিতে চামড়া, মাংসপেশীর আঁশ, শুক্র, লালা বা থুথুর সাহায্যেও ক্ষেত্রবিশেষে রক্তের শ্রেণী নির্ণয় করা সম্ভব। বৈদ্যুতিক ও তেজস্ক্রিয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি আজকাল অপরাধ-বিজ্ঞান



মানুষের মাথার চুল বহু গুণ পরিবর্ধিত আকারে। লক্ষণীয় ভিতরের কালো রঙের মূল শাঁস (Medula), যার বাইরে আছে আর একটি আবরণ।

সংক্রান্ত রক্ত বিচার-বিশ্লেষণের প্রায় অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর দ্বারা আসল অপরাধী নির্ণয় যেমন সম্ভব, তার চেয়ে বেশী সম্ভব নির্দোষ

ব্যক্তিকে সন্দেহের আওতা থেকে যত শীঘ্র সম্ভব অব্যাহতি দান।

বহু বছরের গবেষণার ফলে মানুষের মাথার চুল ব্যক্তির পরিচয় নির্ণয়ে, তথা সনাক্তকরণে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। চুলের চিরাচরিত গঠন ও বয়স বিচার ছাড়াও সম্প্রতি চুলের সাহায্যে মানুষের লিঙ্গ নির্ণয় এবং রক্তের মত মানুষের চুলেরও শ্রেণী বিভাগ করবার প্রয়াস করা হয়েছে। উপরিউক্ত কৌশল ছাড়াও নিউট্রন অ্যাকটিভেশন অ্যানালিসিস পদ্ধতিতে পারমাণবিক বিশ্লেষণের সাহায্যে সন্দেহভাজন ব্যক্তির চুল ও অপরাধসংক্রান্ত ঘটনায় প্রাপ্ত চুল নিয়ে তুলনামূলক পরীক্ষার দ্বারা উভয়ের অভিন্নতা নির্ণয় করা হয়ে থাকে।

তেজস্ক্রিয় বিশ্লেষক কৌশলে নির্ধারিত চুলের নানা অতি সূক্ষ্ম মৌল উপাদানের লেশ, যেমন—ম্যাঙ্গানিজ, সোডিয়াম, ক্লোরিন, আয়রন কোবাল্ট, নিকেল প্রভৃতির সাহায্যে অপচয় বা বিকৃতি না ঘটিয়ে চুলের তুলনামূলক সূক্ষ্ম বিচার ও বিশ্লেষণ সম্ভব। বিষয়টি যথেষ্ট সম্ভাবনাময়।

হস্তাক্ষর

ব্যক্তিবিশেষের হাতের লেখায় তার নিজস্ব রীতি ও বৈশিষ্ট্যের বিচারই হচ্ছে হস্তলিপি বিশারদের পরীক্ষার ভিত্তি। এক্ষেত্রেও যথেষ্ট সফলতা লাভ করা গেছে—বস্তুনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে পাওয়া সূত্রকে বিধিবদ্ধভাবে ব্যবহার করে। আজকাল হস্তলিপির তুলনামূলক বিচারে, একের সঙ্গে অন্যের অভিন্নতা নির্ণয়ে, জ্যামিতিক মাপজোখের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। হস্তলিপি সংক্রান্ত তথ্যকে বিভিন্ন ভাষার বর্ণমালার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা ও বিচার করা হয়েছে, যাতে এই কৌশল বিশ্বের সর্বত্র সমানভাবে কার্যকরী হয়।

ইচ্ছাকৃতভাবে হাতের লেখা বদ্‌লানো বা গোপন করা ছাড়াও আছে বয়োবৃদ্ধি, রোগ, মত্ততা বা মানসিক উত্তেজনাজনিত হস্তাক্ষরের রূপ পরিবর্তিত হবার সমস্যা। এই ব্যাপার নিয়েও গবেষণা চলেছে এবং সাফল্য লাভ করা গেছে অনেকটা। যেমন একই লোকের ইচ্ছাকৃত দুই সম্পূর্ণ বিপরীত ঢঙের লেখাতেও নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে মূল ঐক্যসূত্র। উভয় লেখায় এই সূক্ষ্ম সাদৃশ্য সাধারণের চোখে ধরা না পড়লেও বিশেষজ্ঞের চোখে ধরা পড়বেই।

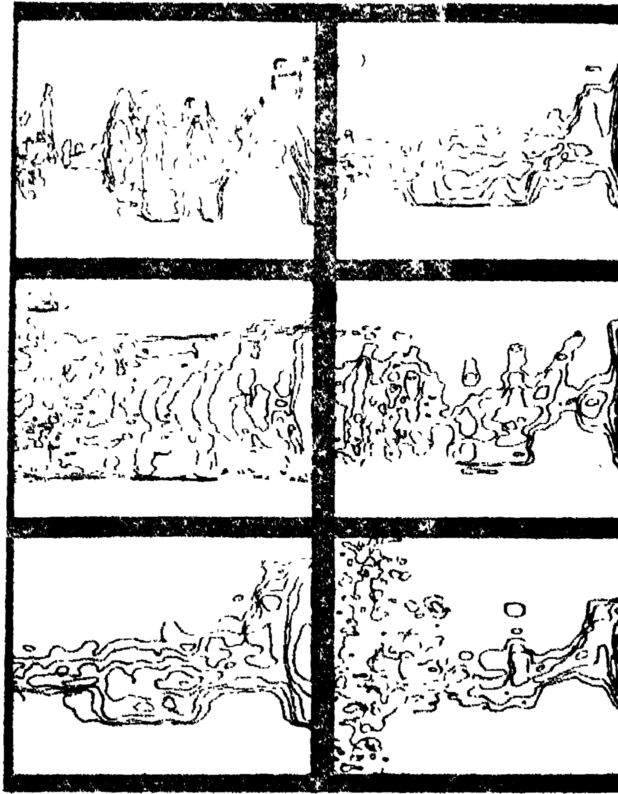
এছাড়া জালিয়াতি বা অন্য উদ্দেশ্যে তুলে-ফেলা বা মুছে ফেলা হাতের লেখাও পুনরুদ্ধার সম্ভব নানা কৌশলে, যার মধ্যে রয়েছে পিন ফোঁড়া কৌশল—অসুদ্দেশ্যে কোন এক পত্র লেখক জনৈকা ভদ্রমহিলাকে একখানা আপত্তিকর চিঠি লিখে নিজের নাম ঠিকানা ভুলক্রমে লিখে ফেলে। অবশেষে সে তা রাবার দিয়ে ঘষে তুলে ফেলে। কিন্তু তাতেও সে নিষ্কৃতি পায় নি। বিশেষজ্ঞের সাহায্যে সেই ঘষে তোলা ঠিকানার পাঠোদ্ধার হয়ে শেষ পর্যন্ত সে ধরা পড়ে যায়।

তুলে বা মুছে ফেলা লেখার সীমারেখা বরাবর কৌশলে এমনভাবে আলপিন দিয়ে পর পর ছিদ্র করে সাজিয়ে যাওয়া হয়, যাতে সেটা আলোর সামনে ধরলে তুলে বা মুছে ফেলা লেখাটা ফের পড়া এবং তার ফটো তোলা সম্ভব হয়। এর নাম পিনফোঁড়া কৌশলে হস্তাক্ষর পুনরুদ্ধার।

ভয়েস প্রিণ্ট

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ডাঃ কেরসটারের যুগান্তকারী আবিষ্কার এই স্বর-মুদ্রণ বা ভয়েস প্রিণ্ট। এই পদ্ধতিটা হচ্ছে—ব্যক্তিবিশেষের কণ্ঠস্বর স্পেকট্রোগ্রাফ (Spectograph) নামক ইলেকট্রনিক যন্ত্রের সাহায্যে রেকর্ড থেকে কাগজের বুকে শব্দের অঙ্কিত নক্সা বা ছবিরূপে স্থানান্তরিত ও লিপিবদ্ধ করা—যার দরুণ কানে-শোনা শব্দের একটা অঙ্কিত দৃশ্যগোচর রূপ লাভ

করা যায়। এটা আবার অনেক সংখ্যায় ছাপিয়েও নেওয়া চলে। এই জাতীয় স্পেকট্রোগ্রাম বা দৃশ্যগোচর শব্দের আকৃতি হয় সাধারণতঃ বিভিন্ন পরিসরের অনিয়মিত আকৃতির কতকগুলি খাড়া (Vertical) এবং আড়াআড়ি (Horizontal) রেখার (Band) সমন্বয়। এই স্বর-মুদ্রণকে ধরা টনে। টেলিফোন ইত্যাদি মারফৎ ভয় দেখানো, অর্থ ইত্যাদি দাবী করা, তঞ্চকতা করা, মহিলাকে অশ্লীল ও আপত্তিকর সম্ভাষণ করা, কাউকে অহেতুক হয়রানি ও বিরক্তি উৎপাদন আজকাল বিশ্বব্যাপী এক সাধারণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভয়েস প্রিন্ট এই সব ক্ষেত্রে অপরাধীর কণ্ঠস্বরের



পাঁচজন পুরুষের কণ্ঠে 'ইউ' উচ্চারণের ভয়েস প্রিন্ট। উপরের দক্ষিণে এবং নিম্নের বামে একই ব্যক্তির ভয়েস প্রিন্ট।

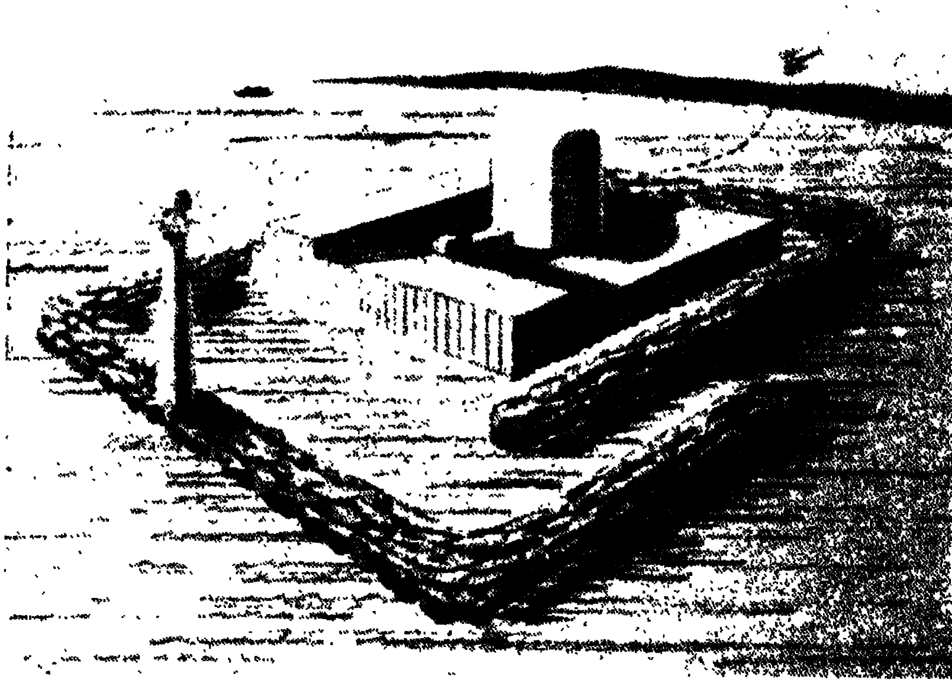
হয় ব্যক্তিবিশেষের কণ্ঠস্বরের এক অকাট্য প্রমাণ রূপে, কারণ কোন দু-জন বক্তারই কণ্ঠস্বরের নক্সার (Pattern) পরিমাপ ও বৈচিত্র্য অবিকল এক হওয়া সম্ভব নয়। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেছে, সনাক্তকরণে এই পদ্ধতির সাফল্যের পরিমাণ শতকরা প্রায় 99·75 ভাগ। এই কৌশল সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে 'ভুতুড়ে' টেলিফোন সংলাপে অজ্ঞাত ব্যক্তির পরিচয়ের রহস্য উদ্ঘা- এক অভ্রান্ত স্বরলিপি রূপে প্রায় নির্ভুলভাবে তার পরিচয় নির্ণয়ে সক্ষম।

ওলফ্যাকট্রনিক্স বা আঘ্রাণ তত্ত্ব

ওলফ্যাকট্রনিক্স (Olfactronics) বা আঘ্রাণ তত্ত্বের সাহায্যে মানুষের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা বা অন্য উপায়ে যে কোন গন্ধের উৎস নির্ণয় ও পরিমাপ করা যায়। বস্তুবিশেষের গন্ধের পরিমাণ ও

ঘনত্ব নির্ভর করে, কি পরিমাণ বিশেষ গুণ ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বাষ্প বস্তুবিশেষ থেকে নির্গত হচ্ছে—তার উপর। গন্ধের পরিমাণ নির্ণয় করতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে উপযুক্ত বাষ্প ও তরল বিশ্লেষক ক্রোম্যাটোগ্রাফ যন্ত্র, যার সঙ্গে যুক্ত থাকে উচ্চশক্তিসম্পন্ন ডিটেকটর বা নির্ধারক যন্ত্র। মাদক বা বিস্ফোরক দ্রব্যাদির উৎস নির্ণয় ছাড়াও এই যন্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে ব্যক্তিবিশেষের দেহের স্বকীয় ঘ্রাণ নির্ণয়ের কাজে। তাছাড়া দেখা গেছে, কোন ব্যক্তিবিশেষ কোন ঘ্রাণ-বস্তুর সংস্রবে বেশ কিছুক্ষণ কাটালে তার দেহ থেকেও সেই ঘ্রাণের রেশ খুঁজে পাওয়া সম্ভব। এই উপায়েই অপকর্মের সঙ্গে অপরাধীর সংস্রব নির্ণয়ও সম্ভব। এতে প্রমাণিত হতে পারে অপরাধীর অপরাধ। এ নিয়ে আরও বিস্তর গবেষণা চলেছে।

এই সব কারণে আশা করা যায় যে, সে দিন খুব বেশী দূরে নয়, যে দিন সনাক্তকরণের মাধ্যমে অপরাধী নির্ণয়ের আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত কলাকৌশল শুধু পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না—তা ছড়িয়ে পড়বে পৃথিবীর সর্বদেশে; ফলে সভ্য সমাজের জটিলতর ও ক্রমবর্ধমান অপরাধের মোকাবেলাও সেই অনুপাতে সাফল্য লাভ করবে।



মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সির উপকূলের কাছে অ্যাটলান্টিক মহাসাগরে এই রকম একটি ভাসমান পরমাণুশক্তি উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তোলবার পরিকল্পনা আছে। কেন্দ্রটি বিরাট একটি বজরার উপর ভাসমান থাকবে। এখানে 11 লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হবে। প্রস্তাব কার্যকরী হলে 1980 সালের গোড়ার দিকে একে রূপদান করা হবে। ছবিটি প্রস্তাবিত কেন্দ্রের নক্সা।

বৈজ্ঞানিক শিল্প প্রবর্তনে দূষিত পরিবেশ এবং তার প্রতিকার

প্রিয়দারঞ্জন রায়

জনকয়েক প্রাচীনপন্থী আদর্শবাদী ব্যতিরেকে আর সকলে একবাক্যে স্বীকার করবেন যে, বৈজ্ঞানিক শিল্পের কারখানা প্রতিষ্ঠায় মানুষের জীবনযাত্রার মান ও সুখ সুবিধা বেড়ে গেছে অভাবনীয় রূপে। কিন্তু এ-ও মানতে হবে যে, মানুষকে তার প্রত্যেক সুখ-সুবিধা বাড়াবার জন্যে প্রকৃতির দরবারে অনেক মূল্য ও মাশুল দিতে হয়। বিজ্ঞানীদের পরীক্ষায় এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

জীবনযাত্রার দুটি প্রধান ও অপরিহার্য উপকরণ হচ্ছে—বায়ু এবং জল। এই দুটিই প্রকৃতির অকৃপণ দান। বায়ুর অভাবে মানুষ কয়েক মিনিটের বেশী বাঁচতে পারে না। তৃষ্ণায় জল না পেলেও বেশীক্ষণ বাঁচা যায় না। কিন্তু এরা আবার দূষিত হলেও মানুষের স্বাস্থ্য ও জীবন হানির সম্ভাবনা ঘটে।

বায়ু দূষিতকরণ

বায়ুর উপাদান আয়তনে শতকরা 78 ভাগ নাইট্রোজেন, 21 ভাগ অক্সিজেন, 0·9 ভাগ কার্বন ডাই-অক্সাইড, 0·03–6·04 ভাগ বিরল গ্যাস এবং বাকীটা জলীয় বাষ্প। কোন কারণে যদি বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যায় (শতকরা 0·1 ভাগ), তাতে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে। সেরূপ অক্সিজেনের পরিমাণ যদি অনেক কমে যায়, তাতেও মানুষের শ্বাসরোধ হতে পারে। এছাড়া, কোন কোন দূষিত পদার্থ, যথা—কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস অতি অল্প মাত্রাতে (আয়তনে শতকরা 0·125) থাকলেও বায়ু বিষাক্ত হয়। তাতে মানুষের মৃত্যু ঘটে। অনেকে জানেন যে, রাত্রে ঘরের দরজা, জানালা সব বন্ধ করে কয়লার আগুন জালিয়ে রেখে ঘুমুলে মানুষ মারা যায়। কারণ বন্ধ বায়ুতে কয়লা জলতে থাকলে শুধু কার্বন ডাই-অক্সাইড নয়, কার্বন মনোক্সাইডেরও উৎপত্তি হতে পারে। বড় বড় শিল্প কারখানার চুল্লীতে অহরহ প্রচুর পরিমাণে কয়লা জলতে থাকে (কোক ওভেন, ব্লাষ্ট ফার্নেস ইত্যাদি)। ফলে বায়ুতে বিপুল পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস মিশ্রিত হয়। বড় বড় শহরে যেখানে বহু মোটর গাড়ী ও বাস চলাচল করে, তাতে যে পেট্রোল পোড়ে তাতেও কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জৈব রাসায়নিক গ্যাসীয় পদার্থের (কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ঘটিত) সৃষ্টি হয়ে বায়ুকে দূষিত করে। মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে এই সব গ্যাস বিশেষ ক্ষতিকর। কয়লাতেও অল্প-বিস্তর সালফার থাকে। কয়লা পোড়বার সময় সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়ে বায়ুতে মিশে যায়। এটি মানুষের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর। কারখানার চিম্‌নি থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, জলীয় বাষ্প এবং কয়লার সূক্ষ্ম ধূলিকণা নিঃসৃত হয়ে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। বাড়ীর উনুনে কয়লা জললেও কার্বন ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি গ্যাস ও কয়লার ধূলিকণা ঐভাবে বায়ুকে দূষিত করে। শীতকালে কলকাতার মত শহরে নাকে কাপড়

দিলে কয়লার ধূলিতে কালো হয়ে যায়। H_2SO_4, HCl, HNO_3 ইত্যাদি অ্যাসিডের কারখানার চিম্‌নি থেকেও SO_2, HCl গ্যাস, Oxides of Nitrogen অল্পবিস্তর পরিমাণে বেরিয়ে আসে। Cl_2 গ্যাস, ব্লিচিং পাউডার ইত্যাদির কারখানা থেকে Chlorine বায়ুকে দূষিত করে। এর প্রতিকারের জন্যে প্রত্যেক শিল্পপ্রধান দেশে নানাবিধ আইন বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, যাতে কারখানার চিম্‌নি থেকে নির্ধারিত পরিমাণের অধিক স্বাস্থ্যহানিকর গ্যাস বেরিয়ে এলে কারখানার কর্তৃপক্ষ দণ্ডনীয় হবেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বড় বড় শিল্পপ্রধান নগরে এই জাতীয় ক্ষতিকর পদার্থের অস্তিত্ব বায়ুতে পরীক্ষায় বহুল পরিমাণে দেখা গিয়েছে। এসব শহরে CO_2, CO, SO_2, H_2S, বালি ও কয়লার ধূলিকণার বহু টন প্রতি বছরে কয়লা, পেট্রোল, তেল ইত্যাদির প্রজ্বলন থেকে এবং নানাজাতীয় কারখানার চিম্‌নি থেকে বায়ুমণ্ডলে নিঃসৃত হতে থাকে।



শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অঙ্গারসঞ্জাত ধূলিকণার দ্বারা বায়ু বিশেষভাবে দূষিত হয়ে থাকে।

আরও একটি ভয়াবহ ক্ষতিকর পদার্থ বায়ুতে বর্তমান যুগে দেখা গিয়েছে। এটি হলো পরমাণু-বোমার বিস্ফোরণ থেকে প্রক্ষিপ্ত তেজস্ক্রিয় পদার্থ। এগুলি মানুষের পক্ষে দারুণ ক্ষতিকর। অনেকে এদের দুরারোগ্য ক্যান্সার প্রভৃতি রোগের কারণ বলে নির্দেশ করেন। বৃষ্টির জলে ধৌত হয়ে এরা মাটিতে মেশে এবং মাটি থেকে মানুষের খাদ্য শাকসব্‌জিতে প্রবেশ করে। বায়ু থেকে, এবং এসব শাকসব্‌জি থেকে মানুষের দেহে অনুপ্রবেশ করে। বলা বাহুল্য পৃথিবীর সবকয়টি শক্তিশালী জাতিই পরমাণুবোমা বিস্ফোরণের পরীক্ষা করছেন সময়ে সময়ে।

জল দূষিতকরণ

জীবনধারণের একটি প্রধান উপকরণ হচ্ছে জল। বহু বৈজ্ঞানিক শিল্প প্রবর্তনে পানীয় জলও কিভাবে দূষিত হচ্ছে, তার কিছু সংক্ষেপে বর্ণনা করা হবে এখানে।

কলকারখানার অপজাত পদার্থবাহী নর্দমার জল এবং শহরের মলমূত্র ও আবর্জনাবাহী পয়ঃ-প্রণালীর জল ইত্যাদি জলাশয়ে ও নদীতে গিয়ে পড়ে। তাতে এগুলির জল দূষিত হয় এবং ঐ জলে মৎস্যাদিও রোগগ্রস্ত হয়। এই সব মৎস্য থেকে নানাবিধ রোগের বীজ মানুষের দেহে প্রবেশ করে। এখানে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক—কানাডা হাডসন নদীর উপর ক্ষার ও ক্লোরিন তৈরির একটি বিরাট কারখানা আছে। বেশী পরিমাণ পারদযুক্ত মাছ সমূহ ক্ষতি করে। কানাডা সরকার হাডসন নদীর মাছ নিষিদ্ধ খাদ্য বলে ঘোষণা করেছেন।

পরমাণু বোমা ও পারমাণবিক শক্তি সৃষ্টির জন্যে যে সব প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, তাদের পয়ঃ-প্রণালী থেকেও সমুদ্রের জল অহরহ নানাবিধ তেজস্ক্রিয় পদার্থের সংমিশ্রণে দূষিত হয়। ঐ জলের মৎস্যাদিও এই কারণে মানুষের খাদ্য হিসাবে বিশেষ ক্ষতিকর হবার সম্ভাবনা।



2নং চিত্র
জলের দ্বারা পরিবেশ দূষিতকরণের তিনটি প্রধান উৎস পৌর সংস্থা, শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও কৃষিকার্যের আবর্জনা।

ঐ কারখানায় বহুল পরিমাণে পারদের ব্যবহার হয় Na-amalgam তৈরির জন্যে। তা থেকে কারখানার পয়ঃপ্রণালীতে পরিত্যক্ত ধোয়া জলে প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে পারদ ধাতু পালিয়ে গিয়ে হাডসন নদীতে পড়ে। সম্প্রতি বিজ্ঞানীদের পরীক্ষায় দেখা গেছে, হাডসন-নদীর মৎস্যাদির দেহে শতকরা 5 ভাগ পারদঘটিত পদার্থ রয়েছে। মানুষের খাদ্য হিসাবে খুব

বহু কীটঘ্ন ও রোগবীজাণুনাশক রাসায়নিক পদার্থ এবং সার কৃষির কাজে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। এদের অপব্যবহার বা অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার জমি ও ফসলের পক্ষে যেমন ক্ষতিকর, তেমনি পশুপাখী ও মানুষের পক্ষেও কম ক্ষতি-কর নয়। এভাবে দেখা যায় যে, বৈজ্ঞানিক শিল্পে মানুষের সুখসুবিধা ও স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় যেমন একদিকে অপরিমিতভাবে বেড়ে উঠেছে,

তেমনি সঙ্গে সঙ্গে এথেকেও নানা বিপদ ও রোগের আশঙ্কা কম বাড়ে নি। একথা হয়তো অনেকে স্বীকার করবেন যে, শহরের অবস্থাপন্ন লোকদের শিশুরা জন্ম থেকে নানাবিধ রোগে ভুগতে থাকে। প্রায় প্রত্যেক পরিবারে দেখা যায়, ডাক্তার ও বিবিধ ওষুধপত্রের ব্যবহার যেন বাড়ীতে লেগেই আছে। এর তুলনায় পল্লী-গ্রামে গরীব লোকদের শিশুদের স্বাস্থ্য দারিদ্র্য সত্ত্বেও অপেক্ষাকৃত ভাল। মুক্ত ও বিশুদ্ধ বায়ু এর একটি প্রধান কারণ।

দূষিত পরিবেশের প্রতিকার

দূষিত পরিবেশের প্রতিকারকল্পে নানাবিধ উপায় নির্দেশ বর্তমানে করা হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই সম্বন্ধে বহু গবেষণা ও অনুসন্ধান চলেছে। এখানে এর কিঞ্চিৎ আলোচনা করে প্রবন্ধের উপসংহার করছি।

(1) জ্বালানী কয়লা থেকে গন্ধক অপসৃত করতে পারলে SO_2 গ্যাস উৎপন্ন হয়ে বায়ুকে দূষিত করবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না। এই সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা বর্তমানে পরীক্ষা সুরু করেছেন।

(2) মোটর গাড়ী ও বাসের ইঞ্জিনে তেল না পুড়িয়ে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে পারলে বড় বড় শহরে বায়ু দূষিত হবার সম্ভাবনা কিছু কমে যাবে।

(3) শহরাঞ্চলের গৃহস্থের বাড়ীতে কয়লার ব্যবহার ও প্রজ্বলন সুনিয়ন্ত্রিত করতে পারলে বায়ুতে অঙ্গারের ধূলিকণা শরীরে প্রবেশের সম্ভাবনা কমে যাবে।

(4) বায়ুকে বিশোধিত করবার জন্যে বৈজ্ঞানিক শিল্প কারখানাবহুল শহরে নানাবিধ গাছপালা রোপণ একটা প্রশস্ত উপায়। এর ফলে বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণের ব্যতিক্রম ঘটবার সম্ভাবনা কমে যায়।

(5) কলকারখানার পরিত্যক্ত জল ও শহরের পয়ঃপ্রণালীর জল জলাশয় ও নদীতে গিয়ে পড়বার আগে বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাদের পরিশুদ্ধ করবার প্রয়োজন আছে। শহরের পয়ঃপ্রণালীর জল পচনক্রিয়ার সাহায্যে অনেক সময় জমিতে সারের কাজ করে। এভাবে তার ব্যবহার করতে পারলে নদীর জল দূষিত হবার সম্ভাবনা কমে যায়।

(6) কীটঘ্ন রাসায়নিক পদার্থগুলির সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার এবং চাষের ক্ষেতে জীবাণু নষ্ট করবার জন্যে জীব-বিজ্ঞানের নির্দেশিত উপায় অবলম্বন দূষিত পরিবেশের প্রতিকারে সহায়তা করে।

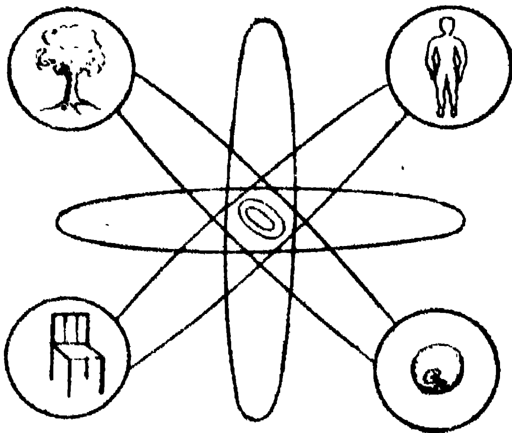
(7) শহরের লোকসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও তাদের বিকেন্দ্রীকরণ দূষিত পরিবেশ প্রতিকারের একটি আবশ্যকীয় অঙ্গ।

আণবিক জীববিদ্যা

অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়*

বৈজ্ঞানিক গবেষণার এক উচ্চতম পর্যায়ে পৌঁছে বৈজ্ঞানিকেরা এখন দেখছেন যে, আগেকার দিনে বিজ্ঞানকে যে ভাবে আলাদা আলাদা করে দেখা হতো—যেমন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বা Natural sciences বলতে পদার্থ-রসায়ন-ভূবিদ্যা বোঝায়, যার মারফৎ আমরা জড় জগতের খবর পাই, আর প্রাণ-বিজ্ঞান বা Life sciences বলতে প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা বোঝায়, যার মারফৎ আমরা জীবজন্তু জগতের খবর পাই—এমন পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগহীন, বিচ্ছিন্ন ভাবে বিজ্ঞানকে আর দেখা যায় না বা ব্যবহারও করা যায় না।

দৃষ্টিভঙ্গীর এই পরিবর্তনের ফলেই সকল বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গে নতুন পথেরও প্রবর্তন হয়েছে। জীববিদ্যার



1নং চিত্র
সকল বস্তুই অণু-পরমাণু দিয়ে তৈরি।

বেলায় গবেষণার যে সব নতুন নতুন উৎসমুখ উন্মোচিত হয়েছে, সেগুলির মধ্যে অন্যতম এবং গুরুত্বপূর্ণ হলো আণবিক জীববিদ্যা বা Molecular biology-র গবেষণা।

এই বিশ্বের সকল বস্তুই—সে জীবজন্তু বা জড়, জৈব বা অজৈব যাই হোক না কেন, মূলতঃ অণু-পরমাণু দিয়েই তৈরি (1নং চিত্র)। জড়ের সঙ্গে জীবনের ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে, কারণ জড়ের উপাদানেই জীবনের সৃষ্টি। জড়-উপাদানের গঠনশৈলীর আণবিক বিশ্লেষণ বহু দিন ধরেই পদার্থ ও রসায়নবিদ্যার সাহায্যে করা হয়েছে ও হচ্ছে।

আণবিক জীববিদ্যার মূল উদ্দেশ্য

আণবিক জীববিদ্যার মূল উদ্দেশ্য হলো, জীবনের যেগুলি অবিভাজ্য (Irreducible) লক্ষণ, আণবিক স্তরে সেগুলিকে জানতে বা বুঝতে চেষ্টা করা। এই লক্ষণগুলি হলো, বংশপরম্পরায় বয়ে আসা প্রাণধারার যে প্রবাহ বা জিন-সম্পৃক্ত বস্তুর বিভাজন, প্রাণিদেহের প্রধান উপাদান প্রোটিন সংশ্লেষণ ও প্রোটিনের ক্রিয়া এবং আণবিক স্তরে শক্তির সঞ্চালন। এই ক্রিয়াগুলিকে জৈব রসায়ন ও জৈব পদার্থবিদ্যার সাহায্যে রাসায়নিক ও ভৌতিক গুণাগুণ মারফৎ আণবিক পর্যায়ে বিশ্লেষণ করাই হলো আণবিক জীববিদ্যার গবেষণার অন্যতম প্রধান ধারা।

জীববিদ্যার সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার বোধ হয় জীবজন্তু জিনিষের এত বৈচিত্র্য। সংখ্যা দিয়ে বোঝাতে হলে বলা যায়, পৃথিবীতে অন্ততঃ 15 লক্ষের মত জীবের প্রজাতির অস্তিত্ব আছে।

*সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9

কিন্তু আণবিক জীববিদ্যার গবেষণা দেখিয়ে দিয়েছে যে, আরও বিস্ময়কর ঘটনা হলো, এত প্রচণ্ড বিভিন্নতার মাঝেও—সে হোক না কেন উচ্চস্তরের প্রাণী বা উদ্ভিদ, ব্যাক্টিরিয়া বা ভাইরাস—আণবিক স্তরে কতকগুলি মৌলিক একতা বা সাম্যও সেখানে আছে।

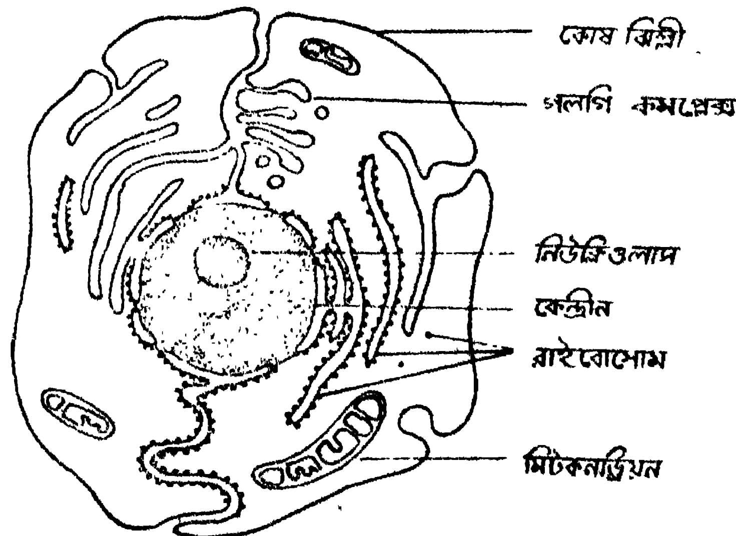
জীবদেহের সাংগঠনিক মালমশলা

জীবদেহে যে যে মৌলিক পদার্থগুলি পাওয়া যায়, সেগুলি খুব জটিল আণবিক যৌগ হিসাবেই বর্তমান থাকে। এদের জৈব ও অজৈব দুই ভাগে ভাগ করা যায়। অজৈব যৌগের প্রধান হলো জল, যা জীবদেহে থাকে শতকরা 66-90 ভাগ। জৈব পদার্থগুলি হলো 1—কার্বোহাইড্রেট, 2—লিপিড, 3—প্রোটিন, 4—নিউক্লিওটাইড, 5—ভিটামিন। এছাড়াও থাকে জৈব অ্যাসিড, অ্যালকোহল ও স্টেরয়েড।

সকল জীবদেহই তৈরি হয় কোষ দিয়ে (2নং চিত্র)। আর এই কোষগুলি তৈরির প্রধান আর বহুকোষী প্রাণী—যেমন আমরা—এখানে বহু রকমারী কোষের সমষ্টিতে গড়ে উঠেছে আমাদের জটিল দেহযন্ত্র। বৈজ্ঞানিকেরা দেখিয়েছেন—প্রতিটি জীবের এই যে বিভিন্নতা, এক বিশেষ ধারায় গড়ে ওঠা—কে কি হবে এবং কেমন ভাবে হবে—এ সবই ঠিক করে দেয় জীবদেহের কোষের কেন্দ্রীনে (Nucleus) অবস্থিত নিউক্লিক অ্যাসিড। এই অ্যাসিড দু-রকমের হয়, ডিঅক্সিরাইবো-নিউক্লিক অ্যাসিড বা ডি এন এ (D N A) আর রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড বা আর এন এ (R N A)। এই D N A, R N A এবং প্রোটিন হলো জীবদেহের অতি প্রয়োজনীয় বৃহদণু (Macromolecule)।

D N A থেকে প্রোটিন সংশ্লেষণ

এই প্রবন্ধে D N A থেকে প্রোটিন সংশ্লেষণ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে যে, জীবদেহ তৈরির প্রধান মালমশলা হলো বিভিন্ন প্রোটিন। এই যে প্রোটিনের

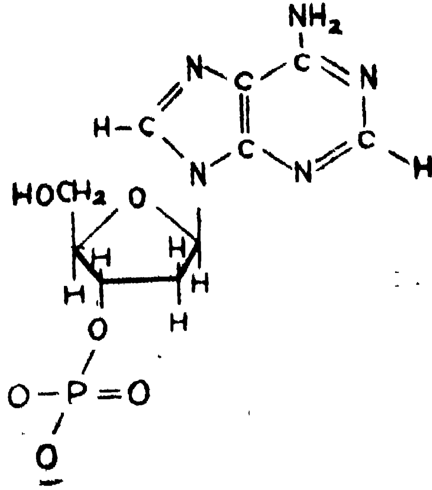


2নং চিত্র
একটি জীবকোষ।

মালমশলা হলো বিভিন্ন প্রোটিন। এককোষী প্রাণী—যেমন অ্যামিবা—তার দেহে থাকে একটি কোষ, সেই একটি কোষই সর্ব-কর্মবিশারদ। রকমারিত্ব—তার সমস্ত রাসায়নিক সঙ্কেত কিন্তু নিহিত আছে D N A-র মধ্যে। আমরা যে নিউক্লিওটাইডের কথা উল্লেখ করেছি আগে, সেই

একাধিক নিউক্লিওটাইডের সংযোগে একটি D N A-র অণু তৈরি হয়।

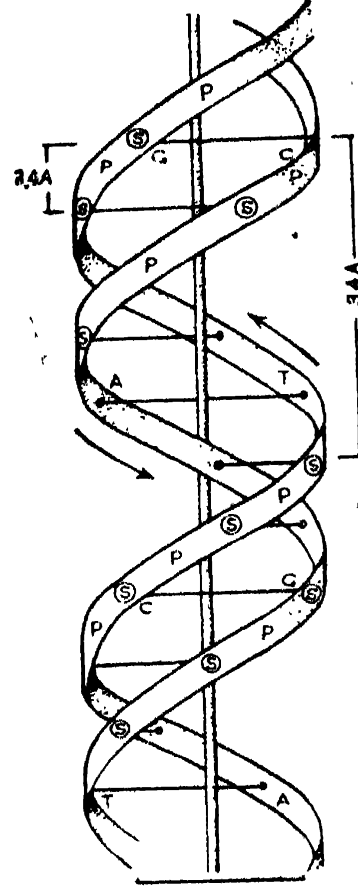
আবার একটি নিউক্লিওটাইডে আছে একটি নাইট্রোজেনঘটিত বেস, একটি শর্করা এবং একটি ফস্‌ফরিক অ্যাসিডের অণু (3নং চিত্র)।



3নং চিত্র

একটি নিউক্লিওটাইড—এতে আছে বেস (Adenine), শর্করা (Deoxyribose) এবং একটি ফস্‌ফরাস অ্যাসিডের অণু।

D N A-র শর্করা হলো deoxyribose আর R N A-র শর্করা হলো ribose। একটি D N A অণু খুব লম্বা সুতার মত হয় এবং তাতে 60 থেকে 100,000টিরও বেশী নিউক্লিওটাইড থাকতে পারে। বেশীর ভাগ D N A অণুতেই দু-নরী (Double strand) সুতার মত পরস্পরের সঙ্গে পাকিয়ে থাকে। D N A-র ফস্‌ফরিক অ্যাসিড এবং শর্করা একই রকম হয়, কিন্তু বেস থাকে চার রকমের—Adenine, Cytosine, Guanine, এবং Thymine—ছোট করে বলা হয় A, C, G, T। এক নরীতে A থাকলে তার অপর দিকের নরীতে থাকবে T এবং একদিকে C থাকলে অপর দিকে থাকবে G। পরস্পরের সঙ্গে এরা হাইড্রোজেন বন্ধনী (Hydrogen band) দিয়ে যুক্ত থাকে। সব মিলিয়ে দেখতে হয় অনেকটা দড়ির মৈ-কে যেন পাকিয়ে দেওয়া হয়েছে ঘোরানো সিঁড়ির মত (4নং চিত্র)। কি ভাবে পর পর এই A C G T সাজানো আছে, তার উপরই বিভিন্ন জীবের D N A-র বিভিন্নতা নির্ভর করে।



4নং চিত্র

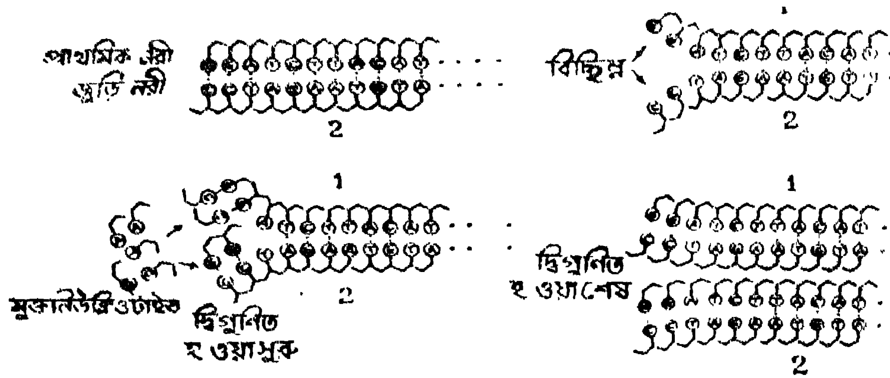
ঘোরানো সিঁড়ির মত দু-নরী DNA। পাকের একমাথা থেকে আর একমাথার দূরত্ব 34 অ্যাংষ্ট্রম (34A) এবং পাশাপাশি দুটি বেসের দূরত্ব হলো 3·4 অ্যাঃ। দুটি নরীর পরস্পরের মাঝের দূরত্ব হলো 20 অ্যাঃ। S এবং P হলো শর্করা ও ফস্‌ফরিক অ্যাসিড এবং ACGT হলো বেস।

একে বলা হয় বেস সজ্জাক্রম বা base sequence। যে কোন জীবদেহের D N A-তে A-র পরিমাণ সকল সময়ই T-র সমান হয় এবং C-র পরিমাণ G-র সমান। একটি D N A অণুতে বহু-

সংখ্যক A C G T থাকে এবং তাদের combination-এ বহু রকম D N A হতে পারে।

কোষের কেন্দ্রীনে যে বংশসূত্র (Chromosome) থাকে, তা হলো বিরাট লম্বা D N A অণু (এই D N A-র সঙ্গে প্রোটিনও যুক্ত থাকে) এবং এক-একটি জিন হলো এই অণুরই ছোট ছোট অংশবিশেষ। প্রোটিন তৈরির কাজের নির্দেশ দেয় জিনগুলিই এবং জীবের যা কিছু দৈহিক এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তা নিয়ন্ত্রিত হয় এই জিনের সাহায্যে।

কোষ-বিভাজনের সময় A-T এবং C-G-র সঙ্গে প্রোটিনের সঙ্গে কি সম্পর্ক। প্রোটিন বহু রকমের হয় এবং জীবদেহে তাদের ক্রিয়া-বিক্রিয়াও অনেক রকমের। যেমন, আমাদের চোখের কোষগুলি যে প্রোটিন দিয়ে তৈরি, তাথেকে আমাদের পেশী বা কিড্‌নীর কোষের প্রোটিন উপাদান সম্পূর্ণ ভিন্ন। কতকগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় প্রোটিনকে বলা হয় এন্‌জাইম (Enzymes)—এগুলি জৈব অনুঘটকের কাজ করে থাকে। সব প্রাণীই পারিপার্শ্বিক থেকে এই রকম কতকগুলি এন্‌জাইম অণুঘটিত রাসায়নিক বিপাকের মাধ্যমে তাদের শক্তি আহরণ করে থাকে। Adenosine triphosphatase নামে



5নং চিত্র

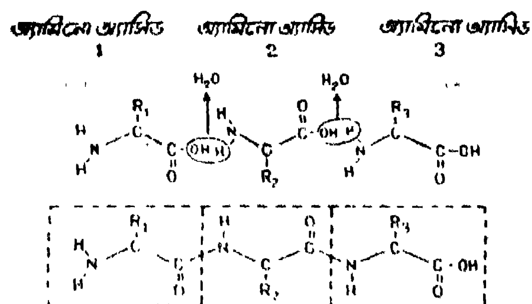
পুরনো DNA থেকে নতুন DNA তৈরি হচ্ছে। এখানে শেষের ছবির (1) ও (2) সংখ্যা পুরনো DNA নরীকে বোঝাচ্ছে। ঐ (1) ও (2) চিহ্নিত নরীর সঙ্গে নতুন তৈরি নরী যুক্ত হয়ে দু-জোড়া DNA নরী তৈরি হলো।

মাঝের হাইড্রোজেন বন্ধনীগুলি ভেঙ্গে যায় এবং D N A-র দুটি নরী আলাদা হয়ে যায়। এর পর এক-একটি নরী পারিপার্শ্বিক থেকে মুক্ত-নিউক্লিওটাইড গ্রহণ করতে থাকে এবং তার ফলে দুটি নতুন পূর্ণাঙ্গ D N A নরী তৈরি হয়। এদের একটি করে অংশ পুরনো D N A অণু থেকে এসেছে, অপরটি নতুন তৈরি হলো (5নং চিত্র)। এভাবেই D N A অতি বিশ্বস্তভাবে জিন-সম্পর্কে যাবতীয় খবর নতুন কোষের মধ্যে পাঠিয়ে দেয়। এখন দেখা যাক, D N A-র

একটি এন্‌জাইমের সাহায্যে পেশী-সঙ্কোচন ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয় আর দেহের মধ্যে অক্সিজেনের মত ছোট অণুর চলাচলে সাহায্য করে haemoglobin নামে একটি প্রোটিন। DNA অণু তৈরির কাজে DNA-polymerase নামে এন্‌জাইমটি খুবই প্রয়োজনীয়।

প্রোটিন তৈরি হয়েছে কতকগুলি ছোট ছোট একক দিয়ে—তাদের বলা হয় peptides—আবার এগুলি তৈরি হয়েছে অ্যামিনো অ্যাসিড (Amino acid) দিয়ে। আবশ্যকীয় (Essential)

অ্যামিনো অ্যাসিডের সংখ্যা হলো 20। অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি পরস্পরের সঙ্গে পেপ্‌টাইড বন্ধনীর সাহায্যে যুক্ত থাকে। এই রকম পর পর দুটি যুক্ত থাকলে বলা হয় dipeptide, তিনটিকে tripeptide (6নং চিত্র) এবং আরও বেশী হলে polypeptide। একটি প্রোটিন অণুতে একটি বা অনেকগুলি polypeptide chain থাকে।



6নং চিত্র
একটি ট্রাইপেপ্‌টাইড শেকল।

DNA-র মধ্যেই কোন্ কোষে কেমন প্রোটিন হবে, তার সঙ্কেত নিহিত আছে। অনেক গবেষণার পর বৈজ্ঞানিকেরা দেখেছেন, DNA-র যে ACGT বেসগুলি আছে, সেগুলির তিনটি করে একত্রে নিলে বিশেষ একটি অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরির সঙ্কেত হয়। এখন অনেক রকমভাবে এই 'ত্রয়ী'কে সাজানো যায়—যার ফলে সব অ্যামিনো অ্যাসিডের সঙ্কেতই এর মধ্য থেকে পাওয়া গেছে। এই ত্রয়ীকে বলা হয় triplet code।

RNA-র দৌত্য

DNA সরাসরি কেন্দ্রের বাইরে এই সঙ্কেত পাঠাতে পারে না—তাকে আগে একটি এক নরী (Single strand) RNA তৈরি করতে হয়। RNA-এর বেসগুলির মধ্যে T-র জায়গায় থাকে Uracil বা U, আর শর্করায় (Ribose sugar) তফাতের কথাও বলা হয়েছে। এই RNA-কে তার কাজ অনুসারে 2/3 রকম নাম দেওয়া হয়েছে; যেমন—messenger RNA (m-RNA), transfer RNA (t-RNA) ইত্যাদি। DNA-র একটি নরীর ছাঁচের অনুলিপি হয়ে (যেখানে TTG আছে, সেখানে হবে AAC) একটি m-RNA কেন্দ্রীনের ঝিল্লী ছিদ্র (Membrane pore) দিয়ে বেরিয়ে আসে এবং কোষের মধ্যে সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত রাইবোসোম নামে অতি ক্ষুদ্র এক রকম বস্তুর সঙ্গে যুক্ত হয়। এই রাইবোসোমের মধ্যেও একরকম RNA আছে। একগুচ্ছ রাইবোসোমকে বলা হয় পলিসোম (Polysome)। প্রোটিন সংশ্লেষণ এখানেই সুরু হয়, বলা যায় এরা প্রোটিন তৈরির কারখানা। এখন এই কাজে সাহায্য করে t-RNA। একটি করে অ্যামিনো অ্যাসিড সঙ্কেতের একক (Coding unit) এই t-RNA-র সঙ্গে যুক্ত থাকে। এখন যে polypeptide chain-টি তৈরি হচ্ছে, t-RNA-র সাহায্যেই একটি করে অ্যামিনো অ্যাসিড তার কাছে পৌঁছে যায়। একটি অ্যামিনো অ্যাসিডের সাঙ্কেতিক বেস ত্রয়ীকে বলা হয় একটি কোডন (Codon) (7নং চিত্র)। তাহলে দেখা যাচ্ছে DNA-র সঙ্কেত থেকে অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরি হয়, আবার এই অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি যুক্ত হয়ে polypeptide chain তৈরি করছে এবং তারপর তৈরি হচ্ছে প্রোটিন। পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতা, যেমন—অতি-বেগুনী রশ্মির বা তেজস্ক্রিয় বিকিরণের প্রভাব কিম্বা কোন রাসায়নিক ক্রিয়ায়—যদি এই সঙ্কেতে কোন ভুল হয়, তখন ঘটে পরিব্যক্তি বা gene mutation।

DNA-ই যে বংশগতির (তথা জীবদেহের) মূল ধারক, তা ব্যাক্টিরিয়া এবং ভাইরাস নিয়ে বহু গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে এবং একথা উচ্চতর প্রাণীর ক্ষেত্রেও বহুলাংশে ঠিক বলেই দেখা গেছে।

পূর্বের ধারণা অনুযায়ী DNA একমাত্র

কোষের কেন্দ্রীনেই থাকতে পারে, কিন্তু আধুনিক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে, কেন্দ্রীনের বাইরেও—কোষের ভিতরে সাইটোপ্লাজমে—DNA পাওয়া যায়। কোষের এক রকম ক্ষুদ্র অঙ্গ (Organelle) আছে, যাকে মিটকণ্ড্রিয়া (Mitochondria) বলে—এরা Oxygen reduction-এ সাহায্য করে। এদের মধ্যে এক রকম DNA পাওয়া গেছে, যেগুলি দুই মুখ বন্ধ মালার মত হয়—খোলা মুখ থাকে না। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কোষবিমুক্ত DNA-র ছবি দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে (8নং চিত্র)। Ultracentrifuge যন্ত্রের সাহায্যে বহু DNA, RNA এবং প্রোটিনের আণবিক ওজনও জানতে পারা গেছে।

DNA অণুর সম্ভাব্য গঠন সম্পর্কে গবেষণার জন্যে যে তিনজন বৈজ্ঞানিকের নাম সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য, তাঁরা হলেন J. D. Watson, T. H. C. Crick এবং M. H. F. Wilkins। কোষবিমুক্ত DNA নিয়ে Wilkins-এর X-ray diffraction-এর কাজের উপর ভিত্তি করেই DNA-এর Watson-Crick model আজ বিশ্ববিখ্যাত।

জৈব অণুর মধ্যে শক্তির সঞ্চালন

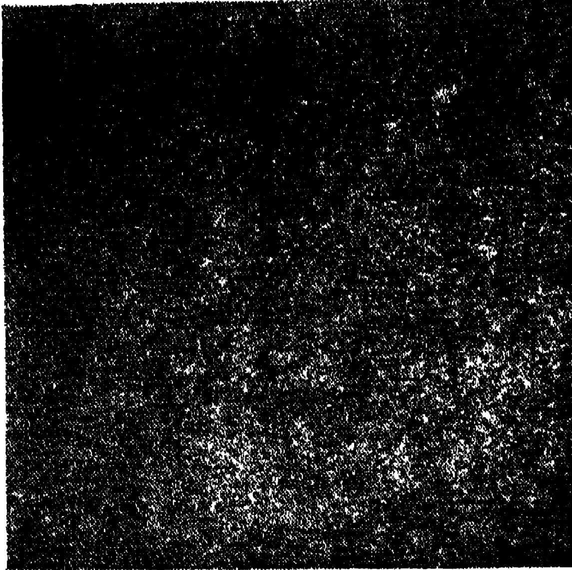
উদ্ভিদ-জগতের একটি খুব প্রয়োজনীয় ঘটনা আলোক-সংশ্লেষণ (Photosynthesis) সম্পর্কে আণবিক জীববিদ্যার গবেষণা অনেক নতুন তথ্য দিয়েছে। উদ্ভিদ-কোষের সাইটোপ্লাজমের মধ্যে ক্লোরোপ্লাস্ট নামে ছোট ছোট কতকগুলি অঙ্গ আছে, আর তাতে আছে ক্লোরোফিল নামে এক রকম লিপিড অণু। আলোক-সংশ্লেষণের কাজে ক্লোরোফিল অণুই সাহায্য করে। ক্লোরো-

7নং চিত্র

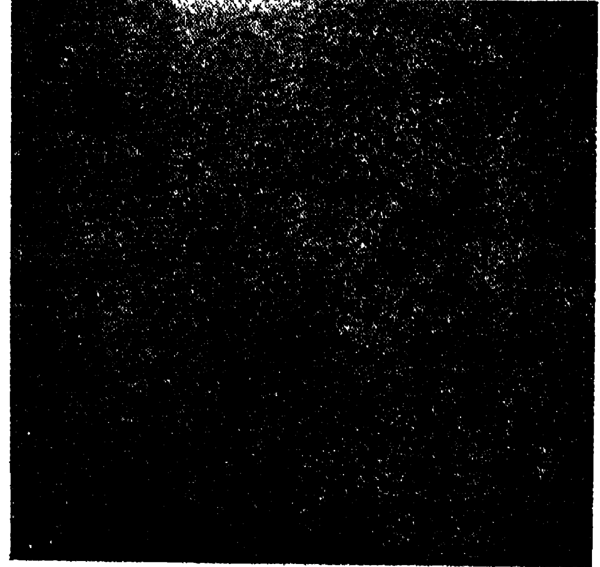
DNA থেকে RNA মারফৎ প্রোটিন সংশ্লেষণ। (1) DNA-র জোড়া শেকল থেকে (2) মেসেঞ্জার RNA-র একটি শেকল তৈরি হয়ে (3) রাইবোসোমের সঙ্গে মিলিত হলো। (4) এথেকে এবার তিনটি করে বেস নিয়ে তৈরি অ্যামিনো অ্যাসিডের সঙ্কেত ট্র্যান্সফার RNA পৌঁছে দিচ্ছে পলিপেপ্‌টাইড শেকলের কাছে। এবার তৈরি হলো প্রোটিন অণু।

ফিল যখন আলোক শোষণ করে, তখন তাদের অন্তর্নিহিত শক্তির পরিমাণ স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে বেশী হয়ে যায় এবং এই অণুগুলিকে তখন উত্তেজিত অণু বলা হয়। এর ফলে

এই রোগের কারণ জানবার জন্যে যে গবেষণা চলেছে, তাতে নানাভাবে আণবিক জীববিদ্যার প্রয়োগ করা হচ্ছে। কর্কটরোগের প্রধান লক্ষণ হলো জীবকোষের অনিয়ন্ত্রিত বিভাজন—আর



8 (ক) নং চিত্র



8 (খ) নং চিত্র

শুক্র-কোষ থেকে নিষ্কাশিত DNA-র চিত্র। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে গবেষণাগারে লেখিকা কর্তৃক গৃহীত। (ক) লম্বা DNA-র ছবিটি প্রায় 12,000 গুণ এবং (খ) মালার মত DNA-র ছবিটি 23,000 গুণ বর্ধিত করে দেখানো হয়েছে।

অণুগুলি খুব প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থায় থাকে এবং সহজেই অন্য যৌগে তাদের শক্তি সঞ্চালিত করে দিতে পারে। এসব প্রতিক্রিয়ার একটি প্রধান ফল হলো কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং জলকে শক্তিসমৃদ্ধ জৈব পদার্থে (Organic matter) রূপান্তরিত করা।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানে আণবিক জীববিদ্যার প্রয়োগ

আণবিক জীববিদ্যার গবেষণা প্রযুক্তি-বিজ্ঞানেও নানাভাবে সাহায্য করছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো চিকিৎসায়। আণবিক রোগের (Molecular disease) মধ্যে কর্কটরোগ আজ সব দেশের বৈজ্ঞানিকদের ভাবিয়ে তুলেছে।

কোষ-বিভাজনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হলো DNA, RNA এবং প্রোটিন। কোন কোন বৈজ্ঞানিক মনে করেন যে, একমুখী প্রবাহ হয়তো কোন কারণে বিপরীতমুখী হয়ে যায়, DNA-র কোন ভুল সঙ্কেতের জন্যে কোষ-বিভাজনের বল্গা আলগা হয়ে যায়। কেমন করে তাকে আবার নিয়ন্ত্রণে আনা যাবে? এই প্রশ্নের জবাব দেবার চেষ্টা বৈজ্ঞানিকেরা এখন করছেন।

খোরানার জিন সংশ্লেষণের সফল গবেষণা বৈজ্ঞানিকদের মনে এখন এই আশাই জাগ্রত করেছে যে, খুব নিকট না হোক, সুদূর ভবিষ্যতেও এই সংশ্লেষিত বা কৃত্রিম জিন অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি সারিয়ে তুলতে সাহায্য করবে।

অলৌকিক সংখ্যা ও পাই

ক্ষমা মুখোপাধ্যায়

আমরা যখন প্রথম সংখ্যা গুণতে শিখি—সুরু করি পূর্ণ সংখ্যা দিয়ে। তারপর শিখি সরল ভগ্নাংশ। মানব ইতিহাসের শৈশবেও আদি মানব প্রথম পূর্ণ সংখ্যা দিয়েই সংখ্যা গণনা সুরু করেছিল; তারপর এসেছিল ভগ্নাংশ। আজকাল স্কুলে পঞ্চম বা ষষ্ঠ শ্রেণীতেই ঋণাত্মক সংখ্যা শেখানো হয়। গণিতশাস্ত্রের কালানুক্রমিক সূচীতে ঋণাত্মক সংখ্যার স্থান কিন্তু অনেক পরে। তার আগে করণী (Surd) এসে গেছে।

পূর্ণ সংখ্যা আর ভগ্নাংশ (ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক) নিয়ে যে সংখ্যাগোষ্ঠী তৈরি হলো, তাকে বলা হয় মূলদ রাশি (Rational number)। এক কথায় বলা যায়, যে সংখ্যাকে $\frac{p}{q}$ রূপে—যেখানে p এবং q উভয়েই পূর্ণ সংখ্যা—লেখা যায়, তাকে মূলদ সংখ্যা বা রাশি বলে। তারপর গণিতজ্ঞরা দেখলেন বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা এমন কতগুলি সংখ্যা পাই, যাদের $\frac{p}{q}$-রূপে লেখা যায় না, যেমন $\sqrt{2}$। পিথাগরাসের উপপাদ্য (একটি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের সমষ্টির সমান) অনুসারে কোন সমকোণী ত্রিভুজের দুই বাহুর দৈর্ঘ্য যদি এক একক করে হয়, তবে অতিভুজের দৈর্ঘ্য হবে $\sqrt{2}$ একক। যে কোন মূলদ রাশিকে একটি সসীম বা আবৃত্ত দশমিকরূপে প্রকাশ করা যায়; যেমন—

$\frac{1}{2}=\cdot5$, $\frac{1}{3}=\cdot\dot{3}$ অর্থাৎ $\cdot3333\cdots\cdots$

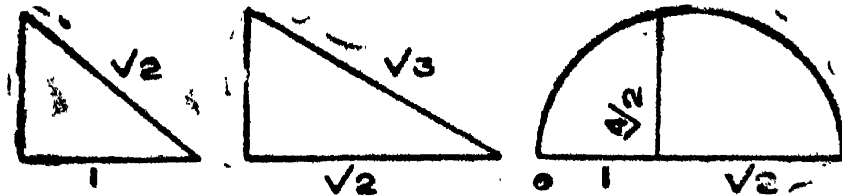
$\frac{1}{25}=\cdot04$ $\frac{1}{7}=\cdot\dot{1}4285\dot{7}$

কিন্তু $\sqrt{2}$-কে দশমিকের সাহায্যে প্রকাশ করতে গেলে দশমিক বিন্দুর পরের অঙ্কগুলি কখন শেষ হয় না বা পৌনঃপুনিক হয় না।

$\sqrt{2}=1\cdot414248\cdots\cdots$

এই জাতীয় রাশিগুলিকে বলা হয় অমূলদ রাশি।

$\sqrt[3]{3}$, $\sqrt[5]{45}$, $\sqrt{\sqrt{2}+\sqrt{3}}$ ইত্যাদি সব অমূলদ রাশি। এই রাশিগুলির অদ্ভুত চরিত্র বোধ হয় সে যুগের গণিতজ্ঞদের খুব বিস্মিত করেছিল। তাই তাঁরা এদের নাম দিলেন সার্ড (Surd)। কথিত আছে করণী বা সার্ডের আবিষ্কারকে অভিনন্দিত করবার জন্যে পিথাগরাসের শিষ্যেরা এক-শ'টি ষাঁড় বলি দিয়েছিলেন তাঁদের দেবতার কাছে।



1নং চিত্র

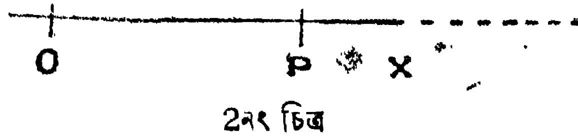
এই দুই শ্রেণীর মূলদ ও অমূলদ রাশি নিয়ে যে সংখ্যা গোষ্ঠী তৈরি হলো, তাদের বলা হয় বাস্তব রাশি।

সেই যুগে করণী বলতে $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{\sqrt{2}+\sqrt{5}}$,

$\sqrt[4]{2}$, $\sqrt{7\sqrt{6}}$ এই ধরণের রাশিগুলিকেই বোঝাতো, যাদের রুলার এবং কম্পাসের সাহায্যে আঁকা যায় (1নং চিত্র)।

$\sqrt[3]{2}$ বা $\sqrt[5]{26}$ ধরণের করণী সংখ্যাগোষ্ঠীতে স্থান পায় আরও পরে।

জ্যামিতিকভাবে বাস্তব রাশিগুলিকে বাস্তব বা X-অক্ষের বিন্দুগুলির ভুজের দ্বারা প্রকাশ করা যায়। মনে করা যাক, যে কোন একটি অনুভূমিক সরল রেখার উপর O একটি ধ্রুববিন্দু (2নং চিত্র)।



2নং চিত্র

এখন O থেকে যে কোন মূলদ বা অমূলদ করণী রাশির দূরত্বে OX-এর উপর একটি বিন্দু পাওয়া যায়। বিপরীত দিক থেকে, যদি P, OX-এর উপর যে কোন একটি বিন্দু হয়, তাহলে OP-এর দূরত্ব কি সব সময়ে মূলদ বা অমূলদ রাশির দ্বারা প্রকাশ করা যাবে? সাধারণভাবে, OX-এর উপর সমস্ত বিন্দুই কি মূলদ বা করণীর দ্বারা প্রকাশ করা যায়? মূলদ ও করণীগুলি পাবার পরে গণিতজ্ঞরা ভেবেছিলেন OX-এর উপরে সব বিন্দু-গুলিই বুঝি পাওয়া গেছে। কিন্তু পরে দেখা গেল, মূলদ রাশি ও করণী ছাড়া এমন কতকগুলি অমূলদ রাশি আছে, যাদের অস্তিত্ব পণ্ডিতেরা আগে জানতেন না।

সমস্যাটা কোথা থেকে সুরু হলো বলি। অতি প্রাচীন একটি সম্পাদ্য বহু শতাব্দী ধরে গণিতজ্ঞ-দের ভাবিয়েছে—সেটি হলো রুলার আর কম্পাসের সাহায্যে একটি বৃত্তের সমান ক্ষেত্রফল-বিশিষ্ট একটি বর্গক্ষেত্র অঙ্কিত করা যায় কিনা। অসুবিধা ঘটাচ্ছিল বৃত্তের ক্ষেত্রফলের π রাশিটি। সকলেই জানেন, বৃত্তের পরিধি ব্যাসের সঙ্গে যে অনুপাত সৃষ্টি করে, তাকে বলা হয় π (পাই)।

$$\pi = \frac{\text{পরিধি}}{\text{ব্যাস}}$$

বহুকাল ধরেই π-এর মান নির্ণয় আর বৃত্তকে বর্গায়িত করবার চেষ্টা গণিতজ্ঞেরা করে আসছেন। এই সম্বন্ধে একটু ঐতিহাসিক অনুসন্ধান বোধ হয় ক্লান্তিকর হবে না।

এই বিষয়ে সর্বপুরাতন যে দলিল পাওয়া যায়, তা হলো রিণ্ড প্যাপাইরাস, খৃঃ পূঃ 1650 অব্দের। প্যাপাইরাসের লেখক বলেছেন—বৃত্তের ব্যাস থেকে $\frac{1}{9}$ অংশ কেটে বাদ দিয়ে অবশিষ্টাংশের উপর বর্গক্ষেত্র অঙ্কিত করলে তার ক্ষেত্রফল বৃত্তের ক্ষেত্রফলের সমান হবে। এই সূত্র অনুসারে π-এর মান পাওয়া যায় 3·16। [বর্তমানে π-এর মান 1000 দশমিক স্থান পর্যন্ত নির্দিষ্ট হয়েছে। 10 দশমিক স্থান পর্যন্ত মান $\pi = 3{\cdot}1415926535\cdots$] বাইবেলে π-এর মান 3। আর্কিমিডিস (খৃঃ পূঃ 300 অব্দ) দেখালেন π $3\frac{10}{70}$ আর $3\frac{10}{71}$-এর মধ্যে; অর্থাৎ $\pi = 3{\cdot}1408\cdots$ থেকে 3·1428-এর মধ্যে; আর্কিমিডিস থেকে নিউটন-লাইব্‌নিৎসের (সপ্তদশ শতাব্দী) আগে পর্যন্ত π-এর মান নির্ণয়ের চেষ্টা হয়েছে বৃত্তের অন্তর্লিখিত ও পরি-লিখিত সুষম বহুভুজের সাহায্যে। আমাদের দেশেও π-এর মান নির্ণয়ের চেষ্টা হয়েছে। আর্যভট্ট দিলেন $\pi = 3{\cdot}14161$। ভাস্করাচার্য দুটি আসন্ন মান দেন $\frac{3927}{1250} = 3{\cdot}1416$ $3\frac{177}{1250} = 3{\cdot}1416$। নিউটন ও লাইবনিৎসের দ্বারা ক্যালকুলাস আবিষ্কৃত হবার পরে অসীম যোগ ও গুণশ্রেণীর দ্বারা π-এর মান নির্ণয়ের চেষ্টা সুরু হয়। ইংরেজ গণিতজ্ঞ

জন ওয়ালিসের দেওয়া একটি গুণশ্রেণী খ্যাতি অর্জন করে। সেটি হলো—

$$\frac{\pi}{2}=\frac{2}{1}\times\frac{2}{3}\times\frac{4}{3}\times\frac{4}{5}\times\frac{6}{5}\times\frac{6}{7}\times\cdots\cdots$$

লাইবনিৎস দিলেন একটি যোগশ্রেণী—

$$\frac{\pi}{4}=1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\frac{1}{9}-\frac{1}{11}\cdots\cdots$$

আরো দ্রুত অভিসারী (Convergent) শ্রেণীর সাহায্যে ইংরেজ গণিতজ্ঞ শ্যাঙ্কস 707 দশমিক স্থান পর্যন্ত π-এর মান নির্ণয় করেন। কিন্তু একটা কথা এখানে অবান্তর হবে না যে, ফলিত বিজ্ঞানে এই পরিশ্রমের বিশেষ কোন মূল্য নেই। দশ দশমিক পর্যন্ত π-এর মানের সাহায্যে পৃথিবীর পরিসীমা এক ইঞ্চির অতি ক্ষুদ্রাংশ পর্যন্ত নির্ণয় করা যায় এবং সমগ্র বিশ্বের জন্যে প্রয়োজন মাত্র ত্রিশ দশমিক স্থান পর্যন্ত।

π-এর মান আসন্ন ফলে তো নির্ণীত হলো, কিন্তু এখন প্রশ্ন হলো, বাস্তবরাশি গোষ্ঠিতে π-এর স্থান কোথায় হবে? বহু বছরের প্রচেষ্টাতেও যখন রুলার আর কম্পাসের সাহায্যে বৃত্তকে বর্গায়িত করা গেল না, তখন পণ্ডিতদের মনে হলো π নিশ্চয় এমন এক রাশি, যাকে করণীর দ্বারা প্রকাশ করা যায় না; অর্থাৎ π কোন বীজগাণিতিক সমীকরণের মূল হতে পারে না। বিষয়টি বুঝিয়ে বলি।

একটি সমীকরণ, যার রূপ এই রকম—

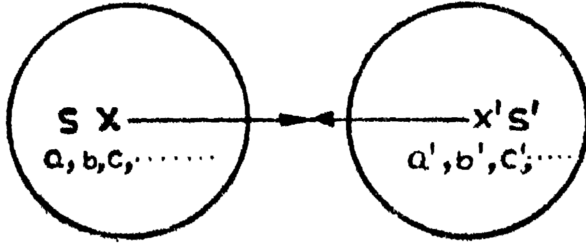
$$a_0x^n+a_1x^{n-1}+a_2x^{n-2}+\cdots+a^n=0$$

যেখানে a_0, a_1,$\cdots a_n$ এবং n সব পূর্ণসংখ্যা, তাকে বলা হয় বীজগাণিতিক সমীকরণ। $x+1=0$, $x^2+2x-3=0$, $3x^{26}+5x^{10}+x+2=0$ ইত্যাদি বীজগাণিতিক সমীকরণের উদাহরণ। যে সব রাশি বীজগাণিতিক সমীকরণের মূল হতে পারে, তাদের বলা হয় বীজগাণিতিক রাশি। যাবতীয় মূলদ ও করণী এই শ্রেণীভুক্ত। 1794 খৃষ্টাব্দে গণিতজ্ঞ লেজেণ্ডার দেখালেন, π একটি অমেয় (Incommeasurable) অমূলদ রাশি; অর্থাৎ করণীর মত π কে যদি দশমিকে প্রকাশ করা যায়, তাহলে যতই অগ্রসর হই না কেন, কখন শেষ হবে না বা আবৃত্ত হবে না। তারপর 1882 খৃষ্টাব্দে লিণ্ডেমান দেখালেন যে, শুধু তাই নয় π একটি বীজগাণিতিক রাশিও নয়। সুতরাং π শ্রেণীভুক্ত হলো এমন এক রাশিগোষ্ঠীতে, যাকে বলা হয় অলৌকিক বা ট্রানসেনডেণ্ট্যাল (Transcendental) রাশি। এখন প্রশ্ন হলো এই— অলৌকিক রাশি কোন্‌গুলি? এক কথায়, যে বাস্তব রাশি বীজগাণিতিক নয়, তাই অলৌকিক।

এই অলৌকিক রাশির অস্তিত্বের কথা পণ্ডিতেরা আগে থাকতেই জানতেন। প্রশ্নটা উঠেছিল একটি সরল রেখা বা তলের উপর যত বিন্দু আছে, সবগুলিকেই কি বীজগাণিতিক রাশির দ্বারা প্রকাশ করা যায়? উত্তর দিলেন প্রথম লুভিল (1844) অবিচ্ছিন্ন ভগ্নাংশের সাহায্যে অলৌকিক রাশির অস্তিত্ব প্রমাণ করে। কয়েক বছর পরে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হলেন অসীম জোটের (Infinite set) যাদুকর ক্যাণ্টর। অনেক সহজ উপায়ে তিনি অলৌকিক রাশির অস্তিত্ব প্রমাণ করলেন।

বিষয়টি বুঝতে হলে আগে অন্য কয়েকটি বিষয়ের অবতারণা করতে হবে। আমরা জানি, পূর্ণসংখ্যার সংখ্যা অসীম, ভগ্নাংশেরও তাই। কিন্তু আমাদের মনে হয়, যেহেতু যে কোন দুটি পূর্ণসংখ্যার মধ্যে অসীম সংখ্যক ভগ্নাংশ আছে, [যেমন 1 আর 2 এর মাঝখানে, 1, $1\frac{1}{2}$, $1\frac{2}{3}$, $1\frac{1}{4}$, $1\frac{1}{5}$,.........2]। সুতরাং ভগ্নাংশের সংখ্যা নিশ্চয় পূর্ণ সংখ্যার চেয়ে বেশী। ক্যাণ্টর বললেন— না, পূর্ণসংখ্যা আর ভগ্নাংশের সংখ্যা সমান। সমগ্র তার একটি অংশের চেয়ে বড়—একথা সসীম জোটের বেলায় খাটে, অসীমের বেলায় নয়। কি করে হলো? মনে করা যাক, S এবং S^1 দুটি জোট আছে, যাদের পদগুলি যথাক্রমে a, b, c, d,......এবং a^1, b^1, c^1, d^1......। এখন, S এবং S^1-এর পদসংখ্যা সমান বলা হবে তখনই

যখন S-এর একটি পদের জন্যে S^1-এর একটি এবং একটি মাত্র পদ পাওয়া যাবে, আবার S^1-এর একটি পদের জন্যে S-এর একটি মাত্র পদ পাওয়া যাবে। গণিতের ভাষায় একে বলা হয় ওয়ান-টু-ওয়ান করেস্‌পণ্ডেন্স বা একৈক সম্বন্ধ (3নং চিত্র)।



3নং চিত্র

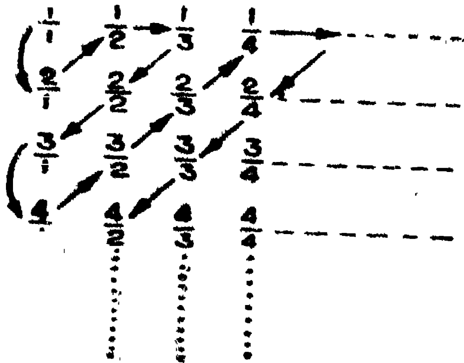
সমস্ত পূর্ণ সংখ্যা এবং সমস্ত যুগ্ম সংখ্যা এরূপ দুটি জোট উৎপন্ন করে। নীচের ছকটি থেকেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে—

1	2	3	4	5
↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓
2	4	6	8	10

অনুরূপে পূর্ণ সংখ্যার বর্গগুলির সংখ্যা পূর্ণসংখ্যার সঙ্গে সমান।

1	2	3	4
↑↓	↑↓	↑↓	↑↓
1	4	9	16

এর উপর ক্যান্টর দেখালেন, সমস্ত মূলদ সংখ্যার দ্বারা উৎপন্ন জোটের পদসংখ্যা পূর্ণ সংখ্যার জোটের পদসংখ্যার সমান। কারণ এই দুটি জোটের পদগুলির মধ্যে একৈক সম্বন্ধ দেখানো যায়। এর জন্যে সমস্ত মূলদ রাশিগুলিকে নিম্নলিখিতরূপে সাজাতে হবে—



উপরের ছকে প্রত্যেক পংক্তিতে লবগুলি সমান এবং প্রতি স্তম্ভে হরগুলি সমান। এখন পূর্ণসংখ্যার সঙ্গে একৈক-সম্বন্ধ স্থাপিত হবে পরপর তীর প্রদর্শিত পথে। অর্থাৎ—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓
1	$\frac{2}{1}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{2}$	$\frac{3}{1}$	$\frac{4}{1}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{4}$

কাজেই প্রমাণিত হলো পূর্ণ সংখ্যা ও মূলদরাশির পদসংখ্যা সমান। ক্যান্টর এই সংখ্যার নাম দিলেন S (আলেফ)। আলেফ হিব্রু বর্ণমালার প্রথম বর্ণ (আমরা এখানে আলেফকে S দ্বারা প্রকাশ করছি)। কিন্তু ক্যান্টর দেখলেন আরও এমন অসীম জোট আছে, যাদের পদসংখ্যা আলেফের চেয়ে বেশী ; অর্থাৎ অসীম জোটগুলির মধ্যে পূর্ণ সংখ্যা বা মূলদ রাশির পদসংখ্যা ক্ষুদ্রতম। তাই সংখ্যাগুলির বিভিন্নতা প্রকাশের জন্যে S-কে করে দিলেন S_0, আর অন্যগুলিকে প্রকাশ করলেন S_1, S_2 রূপে। ক্যান্টর আবার দেখালেন কেবল মূলদ রাশিই নয়, সমস্ত বীজগাণিতিক রাশিগোষ্ঠীর পদসংখ্যাও S_0 ; অর্থাৎ সমস্ত বীজগাণিতিক রাশি পূর্ণ সংখ্যার সঙ্গে একৈক সম্বন্ধবিশিষ্ট। তাই যদি হয়, তাহলে বীজগাণিতিক রাশিগুলিকে প্রথম, দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদিভাবে সাজানো যাবে। মনে করা যাক—

প্রথম: $x_1 \cdot a_1 b_1 c_1 d_1$ - - - - - - - -
দ্বিতীয়: $x_2 \cdot a_2 b_2 c_2 d_2$ - - -
তৃতীয়: $x_3 \cdot a_3 b_3 c_3 d_3$ - - - - - -
চতুর্থ: $x_4 \cdot a_4 b_4 c_4 d_4$ - - - - - - -

[এখানে $x_1, x_2 \cdots$ পূর্ণাংশ, a_1 b_1... ভগ্নাংশের অঙ্কগুলি]

এখন আমরা এমন একটি রাশি তৈরি করবো, যা এই যাবতীয় বীজগাণিতিক রাশি থেকে ভিন্ন। মনে করা যাক, রাশিটি Y। Y-এর দশমিক বিন্দুর পরের প্রথম অঙ্কের জন্যে প্রথম বীজগাণিতিক রাশির প্রথম অঙ্ক থেকে ভিন্ন একটি অঙ্ক নেব ; অর্থাৎ a_1 থেকে ভিন্ন অঙ্ক,

মনে করা যাক, m_1 নিলাম। দ্বিতীয় অঙ্কের জন্যে দ্বিতীয় রাশির দ্বিতীয় অঙ্ক, অর্থাৎ b_2 থেকে ভিন্ন n_2 নিলাম। এভাবে কর্ণ (Diagonal) বরাবর অঙ্কগুলি বদলে বদলে নিলে আমরা যে রাশিটি পাব, সেটি প্রথম বীজগাণিতিক রাশি থেকে প্রথম অঙ্কে ভিন্ন, দ্বিতীয় থেকে দ্বিতীয় অঙ্কে ইত্যাদি। অর্থাৎ নবনির্মিত Y।

$Y = y{\cdot}m_1 n_2 l_3 \ldots\ldots$

রাশিটি যাবতীয় বীজগাণিতিক রাশি থেকে ভিন্ন।

কাজেই এটি একটি অলৌকিক রাশি। এই ভাবে অলৌকিক রাশির অস্তিত্ব প্রমাণিত হলো। এই পদ্ধতিকে ক্যান্টরের তীর্যক-পদ্ধতি বলা হয়। ক্যান্টর আরও দেখালেন—এই অলৌকিক রাশিগোষ্ঠী পূর্ণ সংখ্যার সঙ্গে একৈক সম্বন্ধবিশিষ্ট নয়, এদের সংখ্যা উন্নততর অসীম বা S_1।

এখন π যে অলৌকিক রাশি, তার প্রমাণের জন্যে আর একটি অলৌকিক রাশির উল্লেখ অপরিহার্য, সেটি হলো প্রাকৃত লগারিথ্‌মের নিধান e। e-কে প্রকাশ করা হয় একটি অসীম অভিসারী শ্রেণীর দ্বারা—

$$e = 1 + \frac{1}{\angle 1} + \frac{1}{\angle 2} + \frac{1}{\angle 3} + \cdots$$

[$\angle n = n \times (n-1) \quad (n-2) \times \cdots \times 2 \times 1$]

1873 সালে গণিতজ্ঞ হারমাইট দেখালেন যে, e একটি অলৌকিক রাশি। তিনি প্রমাণ করলেন e

$$a_0 X^n + a_1 X^{n-1} + \ldots\ldots + a_n = 0$$

এরূপ একটি বীজগাণিতিক সমীকরণের মূল হতে পারে না। এমন কি, তিনি এও দেখালেন—a_0, a_1, a_2 ..ইত্যাদি এবং n যদি পূর্ণ সংখ্যা না হয়ে বীজগাণিতিক রাশি হয়, তবু—

$$a_0 e^n + a_1 e^{n-1} + a_2 e^{n-2} + \ldots + a_n = 0$$

হবে না।

হারমাইটের এই তত্ত্ব এবং অয়লারের প্রসিদ্ধ সূত্র $e^{2\pi i} - 1 = 0$ থেকে 1885 সালে লিণ্ডেমান অবিসংবাদীভাবে প্রমাণ করলেন যে, π একটি অলৌকিক রাশি। $e^{2\pi i} - 1 = 0$-এর রূপ বীজগাণিতিক সমীকরণের অনুরূপ। সুতরাং π বীজগাণিতিক রাশি হলে $e^{2\pi i} - 1 = 0$ হবে না।

বহু যুগের সমস্যার সমাধান হলো। যেহেতু π একটি অলৌকিক রাশি, রুলার-কম্পাস তো দূরের কথা, বহু জটিল বক্ররেখার সাহায্যেও এমন কোন লেখ অঙ্কিত করা যায় না, যার বিন্দুগুলির কোটি (Ordinate) π-এর অপেক্ষক হবে। অতি সম্প্রতি একজন রুশদেশীয় যন্ত্রবিদ্ ইন্টেগ্রাফ নামে একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন, যার সাহায্যে π-এর লেখ অঙ্কিত করা যায়।

সদা পরিচিত বক্ররেখাগুলির মধ্যে বৃত্ত সরলতম। কিন্তু এই সরলতার মধ্যে π নামক জটিলতাটি এমন ভাবে লুকানো আছে যে, ভিতরে অনুসন্ধান না করলে ধরা যায় না। π-এর মহিমায় বৃত্তও অলৌকিকত্ব প্রাপ্ত হয়েছে।

মহাকর্ষের তরঙ্গ

বিমলেন্দু মিত্র*

মহাকর্ষ বললেই যে নাম দুটি প্রথমেই মনে পড়ে, তা হলো গ্যালিলিও ও নিউটন। মহাকর্ষের জন্যে আপেল মাটিতে পড়ে। মহাকর্ষের জন্যেই মহাবিশ্বে গ্রহ-নক্ষত্র কক্ষপথে ঘুরছে, অর্থাৎ মহাকর্ষই মহাবিশ্বের কাঠামো খাড়া রেখেছে। নিউটন মহাকর্ষের দরুণ আকর্ষণের যে নিয়ম খাড়া করলেন, তা সকলেরই জানা। নিয়মটির বিশেষত্ব হচ্ছে—তা প্রায় কুলম্ব্-প্রবর্তিত স্থির-বিদ্যুতের ক্ষেত্রের আকর্ষণের নিয়মের মতই।

তারপরে 1916 সালে আইনষ্টাইন প্রকাশ করলেন তাঁর সার্বজনীন আপেক্ষিকতাতত্ত্ব (Generalized Relativity)। সে যেন এক বিরাট বৈজ্ঞানিক বিস্ময়। Gamow-র ভাষায়—তা যেন উত্তুঙ্গ-শীর্ষ এক তাজমহল, বিজ্ঞান-জগতে নিজস্ব মহিমায় স্বতন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি দেখালেন, বিশ্বের বক্র কাঠামোর জন্যেই মহাকর্ষ। মজা এই যে, আইনষ্টাইনের তত্ত্বের চেহারা আবার অনেকটা ম্যাক্স্‌ওয়েলের গড়া বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গের চেহারার মতই। আশ্চর্য নয় যে, আপেক্ষিকতাবাদ অনুযায়ী তত্ত্বের আঁকযোগ করতে গিয়ে আইনষ্টাইন প্রমাণ পেলেন, মহাকর্ষ কেবল স্থির বলক্ষেত্র নয়, বরং যেমন বৈদ্যুতিক আলোড়নে আলোক-তরঙ্গের উদ্ভব হয়, তেমনই পদার্থতর ত্বরণশীল হলে মহাকর্ষ-তরঙ্গের জন্ম দেয়। আলোক-তরঙ্গ বিদ্যুৎ-চৌম্বক শক্তিকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যায়—মহাকর্ষ-তরঙ্গ মহাকর্ষ-শক্তিকে ছড়িয়ে দেয়। স্বীকার করতে ক্ষতি নেই যে, ব্যাপারটা বেশ দুর্বোধ্য।

কথা হলো, এই যে মহাকর্ষ-তরঙ্গ কি মহাজাগতিকের কল্পনা মাত্র, না এর অস্তিত্ব বস্তুজগতে রয়েছে? এর সম্ভাব্য উৎস কি কি হতে পারে? আইনষ্টাইন নিজে বলেছিলেন—একটি ঘুরন্ত লাঠির কথা। একটি লাঠি মাঝখান বরাবর ধরে ঘোরালে এর বস্তুনিচয় ক্রমাগতই ত্বরণশীল। এরকম ঘুরন্ত লাঠি থেকে মহাকর্ষ-তরঙ্গের উদ্ভব হবে। ঐ তরঙ্গ খুবই ক্ষীণ শক্তি (মহাকর্ষ-শক্তি) শূন্যে ছড়িয়ে দেবে। ঐ ক্ষীণতার মাত্রা কতটা? একটি হিসেবে দেখা যায় যে, এক মিটার লম্বা লাঠিকে যদি সম্ভাব্য বেগে ঘোরানো যায়, তবে তাথেকে প্রতি সেকেণ্ডে মাত্র 10^{-30} আর্গ পরিমাণ শক্তি বিকিরিত হবে।

1918 সালের প্রবন্ধে আইনষ্টাইন দেখালেন যে, মহাকর্ষ-তরঙ্গের গতিবেগ কিন্তু আলোর গতিবেগেরই সমান। এই ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করে প্রধানতঃ বৃটিশ বিজ্ঞানী এডিংটন অনেক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। কিন্তু প্রমাণিত হয়েছে যে, ওদের গতিবেগ একই। আলোক-তরঙ্গ শূন্যের মধ্যে যখন ছড়িয়ে পড়ে, বহন করে নিয়ে যায় সে বিদ্যুৎ-চৌম্বক শক্তি। মহাকর্ষ-তরঙ্গ বহন করে নিয়ে যাচ্ছে মহাকর্ষীয় শক্তি। হিসাবে দেখা যায় যে, পৃথিবী সূর্যপ্রদক্ষিণকালে 0·001 ওয়াট শক্তি তরঙ্গাকারে ছড়িয়ে দিয়ে ব্যয় করে। আলোর কোয়ান্টা বা শক্তিকণার চেহারা বৈজ্ঞানিকেরা জানেন। বিজ্ঞানী Dirac দেখালেন যে, মহাকর্ষ-শক্তিও, শক্তি-কণিকা বা কোয়ান্টার চেহারায় কল্পনা করা যায়। Dirac ঐ শক্তি-কণার নাম দিলেন গ্র্যাভিটন (Graviton)।

---

*বসু বিজ্ঞান মন্দির, কলিকাতা-9

আলোর কোয়ান্টার মতই গ্র্যাভিটনের শক্তিও (hν) এই আঁকে প্রকাশ করা যায়—h হচ্ছে প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক ও ν হচ্ছে তরঙ্গের কম্পন-সংখ্যা।

এখন কথা হচ্ছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সত্যই মহাকর্ষ-তরঙ্গের কোন জোরালো উৎস আছে কিনা? সে ইঙ্গিতও আইনষ্টাইন দিয়েছিলেন। মহাকাশে জোড়া নক্ষত্র বা Binary Star এরকম শক্তির উৎস হতে পারে। জোড়া নক্ষত্র যেন লম্বা বারবেলের দুই প্রান্তের দুটি ওজন, মাঝের লাঠিটি কাল্পনিক। বারবেল মাথার চারদিকে ঘোরালে যেমন ওজন দুটি নিজেদের মধ্যের দূরত্ব বজায় রেখে পরস্পরে ঘূর্ণায়মান হয়, তেমনই জোড়া নক্ষত্র ঘুরে চলেছে। তাহলে এদের আইনষ্টাইনের ঘুরন্ত লাঠি হিসেবেও কল্পনা করা যাচ্ছে।

আরও একটি জোরালো উৎসের কথাও বলা হয়েছে। একটি বিশেষ অবস্থায় নক্ষত্রের অভ্যন্তর ভাগ হঠাৎ সঙ্কুচিত হতে থাকে। তার ঘনত্ব প্রচণ্ডভাবে বেড়ে যায়। ফল এই যে, ঐ নক্ষত্রটি ভেঙ্গে পড়ে, যাকে বলা হয় Gavitational collapse। তারপরই আবার অবশ্য বিস্ফোরণ ঘটে বা Supernova-র সৃষ্টি হয়। যাহোক, নক্ষত্রের অভ্যন্তর ভাগ যখন সঙ্কুচিত হতে থাকে, তখন ঐ অবস্থায় প্রচুর মহাকর্ষ-শক্তি ছাড়া পায়। মহাকর্ষ-শক্তিই নক্ষত্রটির বাইরের উত্তাপ বাড়াতে থাকে এবং ছাড়া পাওয়া শক্তি তরঙ্গাকারেও বিকিরিত হতে পারে।

অন্য একটি উৎসের কথাও কল্পনা করা হয়েছে। মহাবিশ্ব যদি একদা বিরাট বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্টি হয়ে থাকে—যাকে পণ্ডিতেরা Big Bang Origin বলে থাকেন—তবে আদিতে সেই ব্রহ্মার অণ্ড বিস্ফোটনের মহা আলোড়নে প্রচুর মহাকর্ষ-তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়েছিল নিশ্চয়। তারই অবশিষ্ট বিশ্বজুড়ে এখনও হয়তো প্রবাহিত হচ্ছে।

আমরা আগেই ইঙ্গিত দিয়েছি যে, মহাকর্ষ-তরঙ্গের তীব্রতা অতিশয় ক্ষীণ হতে বাধ্য। অন্যান্য শক্তির ক্রিয়ার তুলনায় মহাকর্ষ-শক্তির ক্রিয়া কত ক্ষীণ, তার একটা সহজ হিসেব তুলে ধরা যায়। ধরা যাক, আমাদের কাছে প্রোটন ও ইলেকট্রনের মাঝামাঝি ভরযুক্ত দুটি ক্ষুদ্র কণিকা রয়েছে, যাদের মধ্যে বিপরীত আধান। আধানের পরিমাণ—ইলেকট্রন-আধানের সমান বা 4.77×10^{-10} e. s. u.। ওদের মধ্যে বৈদ্যুতিক আকর্ষণ $\frac{e^2}{r^2}$, কারণ কুলম্ব্-এর (Coulomb) আইন তাই বলছে। আবার নিউটনের আইন অনুযায়ী মহাকর্ষের দরুণ আকর্ষণ $G\frac{M^2}{r^2}$. M হচ্ছে ভর—নেওয়া হয়েছে 4×10^{-26} গ্র্যাম। G হচ্ছে নিউটনীয় অভিকর্ষী ধ্রুবক 6.67×10^{-8}। সুতরাং বৈদ্যুতিক শক্তির তুলনায় মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির পরিমাণ $G\frac{M^2}{e^2}$, অর্থাৎ প্রায় 10^{-40}। এই সংখ্যাটি যে কত ছোট, তা প্রায় ধারণার বাইরে।

এখন কথা হচ্ছে যে, মহাকর্ষ-তরঙ্গ এত ক্ষীণশক্তির, তাকে কি করে হাতে-কলমে ধরা যাবে? কোন পার্থিব জিনিষে কতটুকু বিক্রিয়া সে ঘটাবে, যার ফলে অন্য সব শক্তির বহুগুণে জোরালো প্রতিক্রিয়ার মধ্যে থেকে মহাকর্ষ-তরঙ্গের দরুণ সংঘটিত ব্যাপারস্যাপার চিনে নেওয়া যাবে? বহুদিন ধরেই বৈজ্ঞানিক মহল একরকম মেনেই নিয়েছিলেন যে, মহাকর্ষ-তরঙ্গ যদি বাস্তবিকই থাকে, তবুও তার অস্তিত্ব পরীক্ষাগারে প্রমাণ করা প্রায় অসম্ভব।

একটি মানুষ কিন্তু বরাবর বিশ্বাস করেছেন যে, এই অতিক্ষীণ তরঙ্গও যন্ত্রপাতি দিয়ে ধরা সম্ভব এবং এর জন্যে উপযুক্ত যন্ত্রপাতিও তৈরি করা সম্ভব। ইনি হচ্ছেন আমেরিকার মেরীল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক যোসেফ ওয়েবার।

1958 সাল থেকে এই ভদ্রলোক নীরবে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন ঐ দুর্বল তরঙ্গের প্রতিক্রিয়ার প্রমাণ পাবার জন্যে, যার ফলে সন্দেহাতীতভাবে বলা যাবে—আছে, মহাকর্ষ-তরঙ্গের অস্তিত্ব আছে—এ কেবল আইনষ্টাইনের কল্পনামাত্র নয়।

ওয়েবার চিন্তা করতে লাগলেন, সরাসরি কিভাবে তিনি ঐ তরঙ্গ ধরবেন। মহাকর্ষ-তরঙ্গ কঠিন বস্তুতে তার বিক্রিয়ায় স্থিতিস্থাপক তরঙ্গের (Elastic waves) সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু ঐ বিক্রিয়ার পরিমাপ যে খুবই কম, তা আমরা দেখেছি। তবুও ওয়েবার স্থির করলেন, তিনি এমন যন্ত্র তৈরি করবেন, যা ঐ Elastic waves-কে ইলেকট্রনিক উপায়ে বহুগুণে তীব্র করে তার সাড়া গ্রহণযোগ্য করে তুলবে। তিনি মহাকর্ষ-তরঙ্গের গ্রাহক-যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করলেন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি ড্রামের আকৃতির ঘন বস্তুর। ঐ ঘন (Solid) ড্রামগুলির আকার যদি এমন হয় যে, তা আগত মহাকর্ষ-তরঙ্গের কম্পনে অনুরণিত (Resonating) হবে, তবে এগুলিকে ঐ তরঙ্গের গ্রাহক-যন্ত্র বা এরিয়েল হিসেবে ভাবা চলবে। অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে—ঐ ড্রামগুলির ভর এমন হওয়া প্রয়োজন যে, আগত তরঙ্গের কম্পন-সংখ্যার সমান হবে ঐ বস্তুটির নিজস্ব (স্থিতিস্থাপকতার দরুণ) কম্পন-সংখ্যা (Natural frequency)।

ঐ ড্রাম এরিয়েলগুলির মাপযোখ কি রকম হবে স্থির করতে গিয়ে ওয়েবারকে চিন্তা করতে হলো, তিনি কোন উৎস থেকে উৎসারিত তরঙ্গ ধরবেন। তিনি স্থির করলেন যে, ছায়াপথে সুদূরস্থ নক্ষত্রের সঙ্কোচনের (Collapse) ফলে উৎসারিত তরঙ্গই সবচেয়ে সম্ভাবনাময়। জানা আছে যে, বিশ্বের বেশীর ভাগ নক্ষত্রের ভর আমাদের সূর্যের ভরের চেয়ে বেশী নয়। জানা আছে যে, সূর্যের সমান ভরের নক্ষত্রের ভগ্নদশা বা collapse ঘটলে যে তরঙ্গের জন্ম হবে, তার কম্পন-সংখ্যা সেকেণ্ডে কয়েক হাজার বার। ওয়েবার স্থির করলেন, তিনি তাঁর গ্রাহক-যন্ত্র ড্রাম এমন ভর ও আয়তনের করবেন যে, সেটি 1660 হাজার (1660 Kilo Hertz) কম্পনের তরঙ্গে অনুষ্ঠিত হবে। 1660 Kilo Hertz (বা সংক্ষেপে KHz) মাপের রেডিও-তরঙ্গ একটি Supernova-র বেলায় আগেই ধরা পড়েছিল। আশা করা অন্যায় নয় যে, ঐ একই কম্পন-সংখ্যার মহাকর্ষ-রশ্মিও বিকিরিত হচ্ছে ঐ সঙ্কুচিত নক্ষত্র থেকে।

1969 সালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে ওয়েবার ছয়টি এরকম মহাকর্ষ-এরিয়েলের বর্ণনা করেছেন। তাদের মধ্যে চারটি অ্যালুমিনিয়ামের solid ড্রাম, প্রত্যেকটি লম্বায় 153 সে. মি. ও ব্যাসের মাপ 96 সে. মি.। প্রত্যেকটির ওজন প্রায় 1400 কি. গ্রা.। অন্য দুটি ড্রামের পরিমাপ 61 সে. মি. $\times$ 61 সে. মি.। হিসেব মত এরা মহাকর্ষ-তরঙ্গের সুরে বাঁধা (Tuned) হবার দরুণ সামান্য মাত্রায় সঙ্কুচিত প্রসারিত হয়ে নিজেদের দেহে কম্পন সৃষ্টি করবে। কিন্তু ঐ মাত্রা এত সামান্য যে, তা 10^{-14} সেন্টিমিটারের চেয়ে হয়তো বেশী হবে না।

বুঝুন ব্যাপারটা। এই অকল্পনীয় ক্ষুদ্রতার মান কোন যন্ত্রে ধরা পড়বে? ঐ আলোড়ন জানবার জন্যে কোন রকম আলোর সাহায্য (Optical device) নেওয়া চলবে না, কারণ আলোক-তরঙ্গ (বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ) নিজেই এর চেয়ে ঢের বেশী আলোড়ন ঘটাবে। ওয়েবার তারও সমাধান করেছেন। বিশেষ ধরণে কাটা কোয়ার্ট্জ একটি পীজোইলেকট্রিক ক্রষ্ট্যাল (Piezoelectric)। এর উপর সামান্য চাপের পরিবর্তন ঘটলে দু-দিকে একটু বিদ্যুৎ-চাপের সৃষ্টি হয়। পীজোইলেকট্রিক ক্রষ্ট্যালের ঐ ধর্মটি কাজে লাগালেন ওয়েবার।

তিনি অনেকগুলি পীজোইলেকট্রিক কৃষ্ট্যাল তাঁর অ্যালুমিনিয়ামের ড্রামগুলির গায়ে পর পর লাগিয়ে বেড় দিয়ে দিলেন। এখন যে যন্ত্রটি দাঁড়ালো, সেটি খুবই অনুভূতিশীল। ড্রামটির আয়তনের ক্ষুদ্রতম সঙ্কোচন-প্রসারণও বৈদ্যুতিক সাড়া হিসেবে পাওয়া সম্ভব। তারপর ঐ বৈদ্যুতিক সাড়া ইলেকট্রনিক উপায়ে বহুগুণে বাড়ানো যেতে পারে। এভাবে তৈরি ওয়েবারের নতুন যন্ত্রের অনুভূতিশীলতা নাকি 10^{-16} সে. মি. অর্থাৎ ঐ প্রকাণ্ড ড্রামের চেহারায় যদি 10^{-16} সেন্টিমিটার পরিবর্তন ঘটে, তবে তাও ঐ যন্ত্রে ধরা পড়বে। ব্যাপারটি বিশেষভাবে অনুধাবন-যোগ্য, কারণ পরমাণুর নিউক্লিয়াসের বেধ হচ্ছে মোটামুটি 10^{-13} সে. মি. এবং ব্রাউনীয় গতিও (Brownian motion) ওটিতে 10^{-14} সে. মি. পরিবর্তন ঘটাতে পারে।



যোসেফ ওয়েবার ও তাঁর বিরাট অ্যালুমিনিয়ামের ড্রাম। মাঝ বরাবর পীজোইলেকট্রিক কৃষ্ট্যালের বেড় দেওয়া রয়েছে।

ওয়েবার 1958 সাল থেকেই এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করছেন। প্রথম যখন তিনি প্রকাশ করলেন যে, তাঁর যন্ত্রে তিনি মহাকর্ষ-তরঙ্গের অস্তিত্বের প্রমাণ পেয়েছেন, তখন দুনিয়ার কোন বিজ্ঞানীই তাঁর কথা বিশ্বাস করেন নি। যে কারণগুলির জন্যে বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব ঘটতে পারে, তা নিয়ে আলোচনা করা যাক।

প্রথমতঃ—এত সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল যন্ত্রে, যেখানে আসল ক্রিয়াটির সাড়া এত ক্ষীণ, সেখানে অন্যান্য সর্ববিধ পার্থিব কম্পন অনেক বেশী সাড়া

তুলবে। এদের মধ্যে আছে শব্দের দরুণ কম্পন (Acoustic) এবং ভূপৃষ্ঠের নানারকম কম্পন (Seismic)। তাছাড়া আছে জটিল যন্ত্রাংশের বিচিত্র ইলেকট্রনিক ও বৈদ্যুতিক আলোড়ন (Noise)। এই আলোড়ন আসল সাড়ার চেয়ে বহুগুণে প্রবল সাড়া তুলবে। ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক দল বিজ্ঞানী বললেন—মহাজাগতিক রশ্মির (Cosmic Rays) দরুণও বেশ জোর আলোড়ন হবে।

ওয়েবারের বৃহদাকার ড্রামগুলি প্রথমত: বায়ুশূন্য কক্ষে ঝোলানো। চারদিকের শব্দের সাড়াতে যাতে কোন আলোড়ন না জাগে, সে জন্যে ওয়েবার ভাল করে রবারের প্যাড দিয়ে জুড়েছিলেন ড্রামগুলিকে। ব্যবস্থা এমন ভাল হলো যে, বাইরে থেকে ঐ ভ্যাকুয়াম ট্যাঙ্কের গায়ে হাতুড়ির ঘা মারলেও Acoustic কম্পন ভিতরে সাড়া তোলে না। ভূমির আন্দোলনের (Seismic vibration) হিসেব রাখবার জন্যে ভূকম্পনজ্ঞাপক যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হলো। এর ফলে দেখানো যেতে পারে যে, ভূপৃষ্ঠের কোন কম্পনের ঠিক একই সময়ে বা একই তালে ঐ যন্ত্রে সাড়া জাগছে কি জাগছে না। ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির নানারকম আলোড়ন বা যাকে Noise বলা হয়, তাকে কমাবার জন্যে বিশদ ব্যবস্থা নেওয়া হলো। সমস্ত ইলেকট্রনিক যন্ত্রগুলিকে খুবই ঠাণ্ডায় রাখা গেল—প্রায় তরল হাইড্রোজেনের তাপে। উত্তাপ কমালে Noise-ও কম হয়। এরপর আরও যে ব্যবস্থাটি নেওয়া হলো, সেটি হলো সাড়ার সমাপতনের পরিমাপ (Coincidence measurement); অর্থাৎ এমন ব্যবস্থা যে, দুটি সাড়া যদি একেবারে একই সময়ে আসে, তবেই যন্ত্র তাকে লিপিবদ্ধ করবে, এলোমেলো সাড়াকে সে অগ্রাহ্য করবে। ওয়েবার Argonne National Laboratory ও মেরীল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়—এই দুটি জায়গাতেই যন্ত্র বসালেন। জায়গা দুটির মধ্যে তফাৎ প্রায় 1000 কিলোমিটার। এত তফাতে এই দুটি জায়গায় যে সব সাড়া একই সময়ে দুটি যন্ত্রকে আলোড়িত করবে, শুধু সেগুলিরই হিসেব নেওয়া হবে—এই ব্যবস্থা হলো। ওয়েবার আরও দেখালেন যে, মহাজাগতিক রশ্মি তাঁর যন্ত্রে কোন সাড়া জাগায় না। এভাবে সর্বরকমের ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনাকে এড়িয়ে প্রায় দশ বছর কাজ করবার পর যে সব ফলাফল ওয়েবার প্রকাশ করলেন, তাতে আর সন্দেহ করবার অবকাশ রইলো না যে, সত্যই মহাকাশের সুদূরস্থ Supernova-র পাঠানো মহাকর্ষ-তরঙ্গ পৃথিবীতে ধরা গেছে।

ইতিমধ্যেই ওয়বারের এই পরীক্ষা অনেকগুলি সুদূরপ্রসারী ফলাফল এনে হাজির করেছে। তিনি দেখিয়েছেন যে, ঐ তরঙ্গ আসছে আমাদের ছায়াপথ বা Galaxy-র মোটামুটি কেন্দ্রস্থল থেকে। আর ঐ তরঙ্গের তীব্রতা থেকে হিসেব করে দেখা যায় যে, প্রতি বছরে সূর্যের সমান প্রায় 200টি নক্ষত্র ছায়াপথের কেন্দ্রে ভেঙ্গে পড়ছে (Gravitational collapse)। এতগুলি নক্ষত্রের ভেঙ্গে পড়া সম্ভব কিনা, সে সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক হয়েছে। কেম্ব্রিজের বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী D. W. Sciama বলেছেন যে, এই সংখ্যা অবিশ্বাস্য নয়। এখন আবার কেউ কেউ চেষ্টা করছেন দেখাতে যে, পৃথিবীর কাছাকাছি মহাশূন্যে নক্ষত্রাদির অবস্থানের এমনই বিচিত্র জ্যামিতিক ছক রয়েছে যে, তার ফলে পৃথিবীর বুকে আসলে গ্র্যাভিটনসমূহ কেন্দ্রীভূত ও তীব্রতর হয়ে পড়ছে (Focussed হচ্ছে)। ওয়েবারের পরীক্ষার দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ফল এইভাবে বর্ণনা করা যায়:—Carl Brans ও Robert Dicke তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন যে, মহাকর্ষীয় বলক্ষেত্র শুধুমাত্র আইনষ্টাইন-বর্ণিত Tensor-ক্ষেত্র নয়, বরং Tensor ও Scalar-এর মিশ্রিত ক্ষেত্র (এই অংশটি অন্যভাবে

সহজ করে বোঝানো লেখকের সাধ্যাতীত)। কিন্তু সে রকম হলে ওয়েবারের ড্রামে কম্পনের অন্যরকম চেহারা হতো। পরীক্ষার ফল প্রমাণিত করলো, মহাকর্ষ আইনষ্টাইন-বর্ণিত Tensor-ক্ষেত্রই, Scalar অংশ তাতে নেই।

যাহোক, যোসেফ ওয়েবারের এক যুগের ধৈর্য ও পরীক্ষায় যে চমকপ্রদ জ্ঞান আহৃরিত হলো, তাতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিজ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিক সমাজের এই দিকে নজর পড়েছে। ইংল্যাণ্ডে রেডিং বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক W. D. Allen একটি অনুরূপ যন্ত্র তৈরি করছেন, যাতে আশা করা যাচ্ছে, মেরীল্যাণ্ডে ওয়েবারের যন্ত্রের সঙ্গে একযোগে (Coincidence-এ) সাড়া পাওয়া যাবে। ব্রিষ্টলে Aplin‌ও (রেডিং থেকে 100 কিলোমিটার দূরে) এরকম যন্ত্র বসাচ্ছেন। আমেরিকার অন্যান্য লেবরেটরীও এগিয়ে এসেছে। ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে চেষ্টা চলেছে—শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিগুলিই নয় বরং ঐ বিরাট ড্রামগুলিকেও তরল হিলিয়ামের ঠাণ্ডায় রাখবার। ব্রাউনীয় গতি (যা 10^{-14} সে. মি. আয়তন কমাতে-বাড়াতে পারে) কমাবার জন্যেই এই কাণ্ড। ওঁরা বলছেন, এই উপায়ে ওয়েবারের যন্ত্র প্রায় 10^{-21} সেন্টিমিটার তফাৎও ধরতে পারবে।

সমস্ত পৃথিবীর ভরটাকেই এরিয়েল করে তার কম্পন ধরবার ব্যবস্থার কথা কেউ কেউ বলেছেন। কিন্তু প্রথমতঃ ভূত্বকের কম্পন তুলনায় এত বেশী হয়ে দাঁড়াবে যে, এতে হয়তো ভাল ফল পাওয়া যাবে না। ওয়েবার পরামর্শ দিয়েছেন NASA-কে যে, চাঁদের বুকে একটি যন্ত্র যেন বসিয়ে আসা হয়, কারণ চন্দ্রপৃষ্ঠে এরূপ কম্পন (Seismic vibration) কম বা নেই—এখনও সে বিষয়ে কিছু করা হয় নি। Dr. Levine, Boulder-এ (Colorado, আমেরিকা) গভীর খনিগর্ভে লেসার বসিয়ে মহাকর্ষ-তরঙ্গাঘাতে সমগ্র পৃথিবীর প্রতিক্রিয়া ধরবার কাজে লেগে রয়েছেন। সোভিয়েট রাশিয়াও এই কাজে উপযুক্ত যন্ত্র বসাচ্ছে।

দেখা যাচ্ছে, বিশ্বজোড়া (পৃথিবীজোড়া) ফাঁদ পাতা হয়েছে। আশা করা যায়, মহাকর্ষ-তরঙ্গ ফাঁকি দেবে না, সন্দেহাতীত ভাবেই ধরা দেবে।

মনে রাখতে হবে, এর মূলে একজন বিজ্ঞানীর, যোসেফ ওয়েবারের একযুগব্যাপী একনিষ্ঠ পরিশ্রম। সহস্র প্রতিকূলতা, অবিশ্বাস—এমন কি, বিদ্রূপও সহ্য করে তিনি ক্রমাগত একমনে নিজের বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে ধীরে ধীরে নিজের যন্ত্রকে আরও সক্রিয়, আরও অনুভূতিশীল করে অবশেষে পৃথিবীর জনসমাজে এক বিচিত্র সফল পরীক্ষার নজির তুলে ধরেছেন। আপেক্ষিকতাবাদ বিষয়ে এত সুন্দর, এত কৌতুহলোদ্দীপক পরীক্ষা বর্তমানকালে আর হয় নি।

আধুনিক জীব-বিজ্ঞান ও মানব সমাজের ভবিষ্যৎ

শ্রীরাধাকান্ত মণ্ডল*

জন্মসূত্রে ভারতীয় বিজ্ঞানী বর্তমানে আমেরিকার নাগরিক হরগোবিন্দ খোরানার নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সময় এদেশের পত্র-পত্রিকা ও বেতারে যতটুকু আলোচনা হয়েছিল, তাতে জনসাধারণের অন্ততঃ এটুকু ধারণা হয়েছিল যে, জীব-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটা বিরাট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। তার পরে সংবাদপত্রের পাতায় আরও কয়েকটি চমকপ্রদ সংবাদ ছোট আকারে প্রকাশিত হয়েছে; যেমন—হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শাপিরো ও বেকউইথ কর্তৃক একটি জীবাণু থেকে সম্পূর্ণ একটি জিন নিষ্কাশিত করা, খোরানা কর্তৃক প্রথম পরীক্ষা-নলে একটি কৃত্রিম জিন সংশ্লেষণ, বাফেলোর নিউইয়র্ক স্টেট ইউনিভার্সিটির ডেনিয়েলি কর্তৃক কৃত্রিম জীবকোষ তৈরি, অক্সফোর্ডের হেনরি হ্যারিস কর্তৃক সঙ্কর জীবকোষ তৈরি, লণ্ডনের ডাঃ স্টেপ্‌টো কর্তৃক পরীক্ষা-নলে প্রথম মানব-ভ্রূণ সৃষ্টি এবং ম্যাসাচুসেট্‌সের বাল্টিমোর ও উইসকন্‌সিনের টেমিন কর্তৃক জিনের বার্তার বিপরীত প্রতিলেখন প্রভৃতি। অ্যাপোলো ও সয়ুজ শ্রেণীর মহাকাশযানের চন্দ্রবিজয়ের চমকের আড়ালে অনেকটা চাপা পড়ে থাকলেও আধুনিক জীব-বিজ্ঞানের এই আবিষ্কারগুলি তা থেকে কম তাৎপর্যপূর্ণ তো নয়ই, বরং এগুলির সুদূরপ্রসারী ফলাফল মহাকাশজয়ের চেয়ে অনেক বেশী ব্যাপক ও ভবিষ্যৎ মানবজাতির পক্ষে অধিক সম্ভাবনাপূর্ণ। জীব-বিজ্ঞানের এই আবিষ্কারগুলি এখন বিজ্ঞানীদের সামাজিক দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হতে বাধ্য করবে।

গত তিন দশকের গবেষণার ফলে শুধুমাত্র বর্ণনাভিত্তিক জীব-বিজ্ঞানকে (Descriptive biology) আজ অণু-পরমাণুর স্তরে দেখা ও ব্যাখ্যা করা সম্ভব হচ্ছে। জীবনের রহস্য, বিভিন্ন জীবের প্রবহমান ধারার মূল বস্তু, জীবদেহের কার্যাবলী প্রভৃতি সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু জানতে পেরেছি। সাধারণভাবে দেখতে গেলে চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি প্রভৃতি বিষয়ে এই লব্ধ-জ্ঞান মানুষের মঙ্গলেই লাগছে। তবে আধুনিক জীব-বিজ্ঞানের বর্তমান অগ্রগতি এত দ্রুত ও মানবিক, তথা সমাজ-বিজ্ঞানসমূহের তুলনায় এই গবেষণার ব্যাপ্তি এত ভারসাম্যহীন যে, এই অগ্রগতিতে ভীত হবার কারণও যথেষ্ট আছে। আবিষ্কারের ঘটনার পাশাপাশি আরও কয়েকটি খবর বিজ্ঞানী ও জনসাধারণের মধ্যে আলোড়ন তুলেছে। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো—তাঁদের আবিষ্কারের ভবিষ্যৎ অপপ্রয়োগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করবার জন্যে জীবাণু থেকে ল্যাক্টোজ জিন বের করবার কৃতিত্বের অন্যতম অধিকারী শাপিরোর নাটকীয় ভাবে জীব-বিজ্ঞানের গবেষণা পরিত্যাগ করে সমাজকল্যাণমূলক কাজে যোগদান। প্রায় বছর খানেক আগে বৃটিশ সোসাইটি ফর সোশ্যাল রেস্পন্‌সিবিলিটি অফ সায়েন্সের 'জীব-বিজ্ঞানের সামাজিক প্রভাব' সংক্রান্ত আলোচনা-চক্রে এই ব্যাপারে দু-ধরণের মতের বিরোধ দেখা যায়। প্রবীণ ও প্রাচীনপন্থী বিজ্ঞানীরা এখনও বিজ্ঞান গবেষণাকে স্বাধীন ও গজদন্তমিনারে আবদ্ধ বিজ্ঞানীর নিজের বিচার-বিবেচনার উপরই ছেড়ে দেবার পক্ষপাতী। কিন্তু আর একদল তরুণ (এঁরা সকলেই বয়সে তরুণ তা নয়, অনেকে

*বসু বিজ্ঞান মন্দির কলিকাতা।

মনের দিক দিয়ে তরুণ) বিজ্ঞানীর মত হচ্ছে—যেহেতু বিজ্ঞানের গবেষণা জনসাধারণের অর্থেই পরিচালিত হয়, সেই জন্যে বিজ্ঞানের গবেষণার বিষয়বস্তু সমাজের দিকে লক্ষ্য রেখে স্থির করতে হবে এবং গবেষণালব্ধ ফলাফলের সম্পূর্ণ প্রয়োগ, তথা অপপ্রয়োগের সম্ভাবনার কথা সাধারণের কাছে প্রচার করতে হবে। আশার কথা, সংখ্যায় এঁরা অনেক বেশী। যান্ত্রিক সভ্যতার চরমে উন্নীত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণ লোকও আজ কলকারখানা ও মোটর গাড়ীর দূষিত বর্জদ্রব্যে (Waste Product) মানুষের পরিবেশ ও আবহাওয়া দূষিতকরণের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছেন। প্রায় একই কারণে সেখানে বিজ্ঞানীরা ভিয়েৎনামে রাসায়নিক যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহারের জন্যে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে এমন অনেক সময় এসেছে, যখন মানুষ বিশেষ একটি বিষয়ে এমন জ্ঞান ও ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে, যার সম্যক ব্যবহারের অধিকারী তখনও মানুষ হতে পারে নি। যেমন বলা যায় পারমাণবিক শক্তির বেলায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে, পারমাণবিক শক্তিকে ব্যবহারের পূর্ণ সম্ভাবনা সম্পর্কে যেমন মানুষের সম্যক ধারণা ছিল না, তেমনি একে ব্যবহারের অধিকার পাওয়ার মত যথেষ্ট সভ্য হতে মানব সমাজ পারে নি। হিরোসিমা, নাগাসাকিতে ধ্বংসলীলা দেখে বোমার আবিষ্কর্তা বিজ্ঞানীরাও বিস্মিত হয়েছিলেন। ঠিক কতটা ভয়াবহ এই অস্ত্র হতে পারে, সে সম্বন্ধে সঠিক ধারণা তাঁদের তখন ছিল না। 1971 সালেও আমরা সেই অধিকার অর্জন করতে পেরেছি কিনা জানি না। তবে পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ কাজে ব্যবহারের অনেক সম্ভাবনাই এখন বাস্তবে রূপায়িত হচ্ছে। ভারতের মত দরিদ্র দেশেও আজ তারাপুরে পারমাণবিক শক্তিকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে লাগানো হচ্ছে। যাই হোক, এ থেকে বোঝা যায় যে, বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন যথেষ্ট সাবালকত্ব আসবার আগেই বিজ্ঞানীরা মানুষের হাতে এক মারাত্মক অস্ত্র তুলে দিয়েছিলেন। যার ফল হিরোসিমা, নাগাসাকিতে প্রত্যক্ষ, অপ্রত্যক্ষ ফল কত যুগ ধরে দেখতে হবে কে জানে? ঠিক এই ধরণের আশঙ্কাই আছে জীব-বিজ্ঞানকে নিয়ে।

এখন আমরা বংশগতির ধারক ও বাহক যে জিন বা DNA, তার গঠন-প্রণালী, তার মধ্যে লুকিয়ে থাকা জিনের বার্তাসঙ্কেত (Genetic code), DNA থেকে RNA-তে বার্তা পাঠানো, RNA থেকে প্রোটিন সংশ্লেষণের কৌশল ইত্যাদি জানতে পেরেছি। খোরানা এবং আরও অনেকের কাজের ফলে এখন পরীক্ষা-নলে ইচ্ছামত অর্থবাহী নিউক্লিক অ্যাসিড তৈরি করা সম্ভব। দু-বছর আগে কর্ণ্‌বার্গ কৃত্রিম উপায়ে জীবনের ক্ষুদ্রতম অভিব্যক্তিযুক্ত ভাইরাস প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছেন। আণবিক বংশগতিবিদ্যার (Molecular genetics) অগ্রগতির ফলে এখন কোন জীবকোষের জিনের বার্তার রদবদল বা প্রয়োজনমত কৃত্রিম উপায়ে সংশ্লেষিত জিন জীবকোষে ঢুকিয়ে দেবার সম্ভাবনা আজ বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে। নিরেনবার্গের মতে, আগামী পঁচিশ বছরের মধ্যেই মানুষ জীবকোষে বার্তা নিয়ন্ত্রণের ও কৃত্রিম জিনকে কাজে লাগাবার ক্ষমতার অধিকারী হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তখন কি মানব সমাজ এই অগ্রগতিকে গ্রহণ করবার জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হতে পারবে? এর পরিপূর্ণ সম্ভাবনা, ভবিষ্যৎ বিপদাশঙ্কা ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যকরূপে সচেতন হবে মনে হয় না।

ঠিক পারমাণবিক বোমার মতই অবিবেচক সরকার বা রাষ্ট্রনায়কের হাতে এই জৈবিক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার অপব্যবহার হতে পারে। মানবজাতির এক বৃহৎ অংশের বা কোন বিশেষ গোষ্ঠীর কর্মক্ষমতা, চিন্তাধারা—এক কথায় সব-

কিছু হয়তো একজন নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। উদাহরণস্বরূপ, কোন সরকার ইচ্ছা করলে কোন জাতি বা উপজাতির সমস্ত জনসংখ্যাকে ভাইরাসের সাহায্যে এমন একটি কৃত্রিম জিন দিয়ে প্রভাবিত করতে পারে—যার ফলে তাদের কাজ করবার ক্ষমতা থাকবে, কিন্তু স্বাধীন চিন্তা করবার ক্ষমতা থাকবে না, অর্থাৎ তাদের পশুর স্তরে নামিয়ে দেওয়া যাবে। পারমাণবিক বোমা বা সাধারণ যুদ্ধের চেয়ে তা আরও খারাপ এই জন্যে যে, এই ক্ষেত্রে পরিবর্তন বা ক্ষতি ঘটানো হবে জিনের, যা সন্তানসন্ততিক্রমে চলতেই থাকবে। তাছাড়া আরও অনেক ভাববার বিষয় আছে। এর সঙ্গে সমাজ, রীতিনীতি, রাজনীতির প্রশ্নও জড়িত। মানুষ এখন নিজের ভবিষ্যৎ—এমন কি, তার বিবর্তন, পারিপার্শ্বিক জীবজগতের সঙ্গে তার সহাবস্থান (Ecology) প্রভৃতি নিজের হাতে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তাই সেটা করবার আগে মানুষের লক্ষ্য কি হবে বা হওয়া উচিত, সেটা ভেবে ঠিক করা দরকার। আর এই জন্যেই মানবিক বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞানসমূহের (Humanities and Social sciences) যথেষ্ট অনুশীলন প্রয়োজন, যাতে জীব-বিজ্ঞানের অগ্রগতি একপেশে ও ভারসাম্যহীন না হয়ে পড়ে।

অবশ্য ইতিমধ্যেই সুদূর ভবিষ্যতে কি দাঁড়াবে, তা না জেনেই জীব-বিজ্ঞানের অনেক জ্ঞানের ব্যাপক প্রয়োগ আমরা সুরু করেছি আশু ফললাভের জন্যে। যেমন কীটঘ্ন ও প্রতিজীবক ওষুধের (Insecticides ও Antibiotics) ও তেজষ্ক্রিয় বিকিরণের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের ফলে জীবজগতের ভবিষ্যৎ সাম্যাবস্থা আমরা অনেকটা পাল্টে ফেলেছি। মৎস্যহীন নদী, হ্রদ, পশুপক্ষীহীন বনস্থলী, বৃক্ষলতাহীন প্রান্তর ইত্যাদির প্রভাব মানুষের উপর কতটা হবে, তা ভবিষ্যতেই জানা যাবে। উদাহরণস্বরূপ ভিয়েৎনামে সমরাঞ্চল পত্রশূন্য করবার জন্যে ব্যাপকভাবে রাসায়নিক পদার্থ (Defoliant) ব্যবহার করবার কুফল এখনই বোঝা যাচ্ছে। তেমনি, জীবাণু ও ভাইরাসজনিত রোগের টিকার (কোন কোন ক্ষেত্রে জীবিত ভাইরাসসমন্বিত) ব্যাপক ব্যবহারে রোগনিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ আশু আশীর্বাদরূপেই আমরা দেখতে পাচ্ছি। তবে এদের সুদূরপ্রসারী ফলাফল সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণার অবকাশ আছে। তেমনি গবেষণার অবকাশ রয়েছে হর্মোনজাতীয় জন্মনিরোধক ওষুধের দীর্ঘ ব্যবহারের ফল সম্বন্ধে। আশার কথা, বিজ্ঞানীরা এই বিষয়ে সচেতন।

সাধারণ পাঠককে শঙ্কিত করা বা জীববিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে লব্ধ শুভ ফলগুলি থেকে তাঁদের বঞ্চিত থাকতে বলা এই আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। এর উদ্দেশ্য সমাজবিজ্ঞানীদের আরও বেশী সচেতন ও অনুসন্ধিৎসু করা মানব সমাজের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য সম্বন্ধে। যেহেতু মানুষ নিজেরাই নিজেদের ভবিষ্যৎ এখন বহুল পরিমাণে নির্ধারিত করতে পারে, সেহেতু সময় থাকতেই ভাবা দরকার, ভবিষ্যতে এই আধুনিক জীব-বিজ্ঞানের কি কি ব্যবহার, তথা অপব্যবহার হতে পারে। তার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে সমাজকে। এই প্রসঙ্গে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একবারে নিরাশ না করে দু-একটি শুভ সম্ভাবনার কথাও বলা যেতে পারে। রোগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে টিকার কথা আগেই বলা হয়েছে। ভবিষ্যতে প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম নিউক্লিক অ্যাসিড বার্তার সাহায্যে অনেক জন্মগত বা বংশগত ত্রুটির নিরাময় (Genetic surgery) সম্ভব হবে। কোষ বা কলাকৃষ্টির (Tissue culture) উন্নতির ফলে ভবিষ্যতে ইচ্ছামত বিশেষ ধরণের জীবকোষ বা কলা ও প্রত্যঙ্গ পরীক্ষাগারে বর্ধিত করে দেহে সংযোজন করা যাবে। ভ্রূণবিস্তার (Embryology) অগ্রগতির ফলে প্রতিভাবান ব্যক্তির শুক্রাণু এবং প্রতিভা-

মনীষীদের ডিম্বাণু সঞ্চয় করে রেখে প্রয়োজনমত বিশিষ্ট প্রতিভা বা নিপুণতাসম্পন্ন নাগরিক সৃষ্টি করা যেতে পারে পরিকল্পিত মানব সমাজে। এসব সম্ভাবনার ফলে অনিবার্যভাবেই সামাজিক ও নৈতিক অনেক বড় বড় সমস্যা দেখা দেবে। সম্পূর্ণ বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিতে দেখলে যান্ত্রিক সভ্যতার চরমে মানুষ মানুষকে শ্রম উৎপাদনের যন্ত্র বা একক হিসাবে ভাববে। তখন কৃত্রিম শিশু (Test-tube baby) উৎপাদন করতে তার হয়তো দ্বিধা থাকবে না—যদি সমাজ ও আইন সেটা অনুমোদন করে। এতে মানুষের মনোজগতের মূল্যবোধ, স্নেহ, প্রীতি প্রভৃতি সুকুমার মনোবৃত্তি কমে যেতে পারে। সে সম্বন্ধে এখনই চিন্তা করা দরকার। বৈজ্ঞানিক সভ্যতা আমাদের স্বাভাবিক ন্যায়বোধ ও ঈশ্বরকেন্দ্রিক ধর্মবোধ (Spiritualism) হরণ করেছে। কিন্তু তার পরিবর্তে অন্য কোন মানবকেন্দ্রিক মূল্যবোধ দিতে পারে নি। পৃথিবীতে আজ মানুষে মানুষে হানাহানি, নূতন প্রজন্মের সঙ্গে পুরাতন দ্বন্দ্ব তারই পরিণতি। বিজ্ঞানের তথাকথিত পবিত্রতা ও স্বাধীনতার খাতিরে আজ তাই বিজ্ঞানীদের গজদন্ত-মিনারে বসে আবিষ্কারের আনন্দেই মশগুল হয়ে থাকলে চলবে না। আজ তাঁদের বাস্তব পৃথিবীতে নেমে এসে যে সব নূতন সমস্যা তাঁরা এনে দিয়েছেন, তার সমাধানের কথা ভাবতে হবে—কারণ, তাঁরাও মানব সমাজের অংশ।

"বিজ্ঞানের ইতিহাস ব্যাখ্যায় আমাকে বহু দেশবাসী মনস্বিগণের নাম স্মরণ করাইতে হইত। কিন্তু তাহাদের মধ্যে ভারতের স্থান কোথায়? শিক্ষাকার্যে অন্যে যাহা বলিয়াছে সেই সকল কথাই শিখাইতে হইত। ভারতবাসী যে কেবলই ভাবপ্রবণ স্বপ্নাবিষ্ট, অনুসন্ধান কার্য কোনদিনই তাহাদের নহে, এই এক কথাই চিরদিন শুনিয়া আসিতাম। বিলাতের ন্যায় এদেশে পরীক্ষাগার নাই, সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্মাণও এদেশে কোন দিন হইতে পারে না, তাহাও কতবার শুনিয়াছি। তখন মনে হইল যে ব্যক্তি পৌরুষ হারাইয়াছে, কেবল সেই বৃথা পরিতাপ করে। অবসাদ দূর করিতে হইবে। ভারতই আমাদের কর্মভূমি, সহজ পন্থা আমাদের জন্য নহে"।

আচার্য জগদীশচন্দ্র

উপজাতি সমাজে পরিবর্তনের ইঙ্গিত

প্রবোধকুমার ভৌমিক*

আমাদের ভারতভূমি যেমন বিচিত্র, তেমনি বিচিত্র এর জনসমষ্টি। বর্তমান ভারতের জনসমষ্টির দিকে তাকালে দেখা যাবে, প্রায় তিন কোটির মত অনগ্রসর গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় রয়েছে, যাদের আমরা উপজাতি, খণ্ডজাতি (Tribe) বা আদিবাসী (Aboriginal) বলে অভিহিত করে থাকি। রাজনৈতিক মাপকাঠিতে বা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যদিও তাদের সবাইকে তফশিলভুক্ত (Scheduled) উপজাতি হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়ে থাকে, তবুও তারা বিভিন্ন। তাদের শারীরিক বৈশিষ্ট্যে অথবা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বহু ক্ষেত্রে দুস্তর প্রভেদ রয়েছে। তফশিলভুক্ত করবার অর্থ অন্য গোষ্ঠী থেকে পৃথকীকরণ বা চিহ্নিত করে নেওয়া। কেন না, জীবনযাত্রার প্রতিটি পদক্ষেপে তাদের যে অনগ্রসরতা রয়েছে, স্বাধীন দেশের গণতান্ত্রিক সরকার নানাভাবে



আদিবাসী মেয়ে-পুরুষ ধানের বোঝা নিয়ে ফিরছে।

*নৃতত্ত্ব বিভাগ, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-19

তা পূরণ করে অন্যান্য জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে সরল সমতা আনবার চেষ্টা পাবে।

এই উপজাতি গোষ্ঠীদের ভারতের আদিম বাসিন্দা (Autochthons) বলে ধরে নেওয়া হয়। কেন না, আর্যপূর্ব ভারতের তারাই ছিল প্রথম বা আদিম অধিবাসী। আমাদের দেশে বহু জায়গায় প্রস্তর যুগের সভ্যতার (Stone age culture) নানা নিদর্শন পাওয়া গেছে, যা দেখে আমরা অতি সহজেই অনুমান করতে পারি যে, ভারতের নানাস্থানে এককালে আদিম জীবনাবদ্ধ বহু গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় ছিল—প্রস্তর-নির্মিত আয়ুধ বা হাতিয়ার ছিল তাদের জীবনযাত্রার প্রধান অবলম্বন। তাদের কেউ কেউ হয়তো পশুপালন করেছে, আর করেছে শিকার বা অরণ্যের ফলমূল আহরণ। কালক্রমে তাদের অর্থনৈতিত জীবনযাত্রার পরিবর্তন হয়েছে, সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখার বিবর্তন হয়েছে। ধীরে ধীরে সেই শিকারজীবী ভবঘুরে মানুষের জীবনে আদিম কৃষি-ব্যবস্থা রূপ নেয়। পাথরের হাতিয়ারের বদলে কাঠের তৈরি চাষের যন্ত্রপাতি এবং ভূগর্ভে নিহিত আকরিক লোহের সদ্ব্যবহার করে তারা জীবন-যাত্রার মান উন্নীত করবার প্রয়াস পায়।

ভারতের উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলকে মোটামুটি তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়;—(1) হিমালয় পর্বতের পাদদেশ থেকে আরম্ভ করে উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল [ডাক্‌লা, ভোট, আপাটানি, নাগা, কুকি, কাছাড়ি, খাসিয়া, গারো, রাভা, লেপ্‌চা প্রভৃতি]; (2) মধ্যভারত বা ছোটনাগপুরের পার্বত্য অঞ্চল, বিশেষভাবে পশ্চিম বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, রাজস্থান, উত্তর বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশ [শবর, জুয়াং, খাড়িয়া, খন্দ, ভূমিজ, ভুইয়া, মুণ্ডা, সাঁওতাল, ওঁরাও, লোধা, মহালি, বীরহড়, হো, কোল, অসুর, মালের, বাইগা, গন্দ প্রভৃতি]; (3) দক্ষিণাঞ্চলের অর্থাৎ কেরল, তামিল নাড়ু, অন্ধ্র প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চল [চেঞ্চু, রেড্ডি, টোডা, ভুগতা, কোটা, ইরুলা, কাদার, কানিকর, মাল কুরুভান প্রভৃতি], এর সঙ্গে আন্দামান, নিকোবর, স্পিটি প্রভৃতি অঞ্চলও উল্লেখযোগ্য। আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির বৈশিষ্ট্য হলো অস্বাস্থ্যকর জঙ্গলাকীর্ণ পরিবেশ। প্রকৃতি সেখানে কঠোর আর অনগ্রসর উপজাতি গোষ্ঠীর জীবনসংগ্রামের পার্থিব হাতিয়ার অতি নগণ্য। সেই বিরুদ্ধ পরিবেশে প্রতিনিয়ত আপোষহীন সংগ্রাম ধীর অভিযোজনে (Adaptation) তাদের সাধারণ জীবনের স্বাভাবিক গতি বিকশিত হবার চেয়ে সঙ্কুচিতই হয়েছে বেশী। তাই অনগ্রসরতা এবং প্রকৃতি-নির্ভরতা তাদের জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্য। এই সকল অনগ্রসর উপজাতি গোষ্ঠীকে তথাকথিত সভ্য মানুষ অথবা বহিরাগত উন্নত গোষ্ঠী এই ক্লিষ্ট পরিবেশে বাস করতে বাধ্য করেছে। পরাজিত এই সকল গোষ্ঠীও নিরুপদ্রবে নিজ অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখবার জন্যে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অতি সঙ্গোপনে বাঁচবার চেষ্টা করছে। সে বাঁচবার মধ্যে রয়েছে প্রাণ-চঞ্চলতা, আনন্দমুখর নৃত্যগীত, সমবেত উৎসব, আর হাসিমুখে সকল দুঃখ-কষ্ট-বঞ্চনা সহ্য করবার স্বাভাবিক প্রচেষ্টা। তবুও ইতিহাসের নিষ্ঠুর পরিহাস—একদিন এই স্বাধীন অরণ্যচারী মানুষকে বহিরাগত শক্তিশালী সভ্য মানুষের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল। এই জয়ের মহিমা নানাভাবে ঘোষিত হয়েছিল। এই জয়ের মহিমার বিবরণ ভাগবত পুরাণে রয়েছে।

"কাক-কৃষ্ণ হ্রস্বজ হ্রস্বাবাহু মহাহনু
হ্রস্বপানি নিম্ননাসাগ্র রক্তাক্ষ তাম্রমূর্দ্ধজ।"

প্রাক-আর্য গোষ্ঠীর আদিম গোষ্ঠীগুলিকে প্রাচীন সাহিত্যে দস্যু, নিষাদ, শবর প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত করা হয়েছে।

এর দ্বারা সহজে প্রমাণিত হয় যে, আদিম গোষ্ঠীগুলি যদিও নিরুপদ্রবে বিচ্ছিন্নভাবে বাঁচবার

প্রয়াস পেয়েছে, তথাপি তারা বিজিত গোষ্ঠীর কাছে একেবারে অপরিচিত ছিল না। দীর্ঘ সহাবস্থানে এই সকল বিজিত আদিম গোষ্ঠীর জীবনযাত্রারও বেশ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। আমরা যদি মুণ্ডা উপজাতির ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায় অনু-

বিভিন্ন শ্রেণীর প্রশাসক রয়েছে। কর্তা বা পাহানের কাজ পুরোহিতের মত। পাঁড়ের কাজ সংবাদ দেওয়া—অর্থাৎ হিন্দু রাজাদের দরবারের অনুকরণে এসব গঠিত। খাসিয়া উপজাতির মধ্যেও এমনি মন্ত্রী বা দরবার রয়েছে। বিশেষভাবে



একটি সমবেত উৎসবের আঙিনায়।

ধাবন করি, তাহলে অতি সহজেই বুঝতে পারি যে, কেমনভাবে তারা ধীরে ধীরে প্রতিবেশী হিন্দুদের অনুকরণ করতে সক্ষম হয়েছিল। কেবল প্রশাসনিক ব্যবস্থায় নয়, সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রেও। প্রশাসনিক ব্যবস্থায় দেখা যায়, মুণ্ডাদের মধ্যে প্রথম জঙ্গল কেটে যারা বসতি স্থাপন করেছে, তাদের বলা হয় ভুঁইহার। এই ভুঁইহারী মুণ্ডাদের পুরুষেরা নিজেদের সমাজ পরিচালনার জন্যে পঞ্চায়েৎ গঠন করেছে, প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্কই হলো এর সভ্য। যিনি প্রধান হিসাবে বিভিন্ন আলোচনা বা সভাকে পরিচালনা করেন, তিনি পাড়হা রাজা (Parha Raja), তাঁকে সাহায্য করতো দু-জন সিপাহী, একজন দেওয়ান এবং তাঁর দু-জন সিপাহী। এছাড়া ঠাকুর, লাল, পাঁড়ে ও কর্তা প্রভৃতি

এই সকল উপজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে যারা হিন্দুদের নিকট প্রতিবেশী হিসাবে বসবাস করবার সুযোগ পেয়েছে, তাদের জীবনযাত্রার প্রতিটি দৃশ্যে এমনি ভাবে আর্য সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে—যাকে আমরা আর্যীকরণ (Aryanisation) বলে অভিহিত করি। সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে ও কোন কোন উপজাতি তাদের গোত্রদেবতার (Totem) নামে যে কৌলিক (Clan) পরিচয় দিত, তারও পরিবর্তন ঘটেছে। কোন কোন উপজাতির কচ্ছপ টোটেম; অর্থাৎ ঐ উপজাতির মধ্যে অনেক কুল রয়েছে অনেকটা আমাদের গোত্রের মত। সেই সকল কুলের কোন কোনটি কচ্ছপকে গোত্রদেবতা বলে স্বীকার করে থাকে; অর্থাৎ তারা কচ্ছপ কখনও খায় না বরং

দেখতে পেলে তাকে শ্রদ্ধা বা প্রণাম জানায়। কিন্তু অন্য গোত্রের লোক প্রয়োজন হলে কচ্ছপ খেতে পারে—কেন না, কচ্ছপ তাদর কুলদেবতা



মেদিনীপুর অঞ্চলের এক মুণ্ডা কৃষক।

নয়। এর দ্বারা আদিম মানুষ তার ভক্ষ্যবস্তুর উপর কিছু কিছু বাধানিষেধের গণ্ডী (Taboo) দাঁড় করিয়ে প্রাকৃতিক খাদ্যসম্ভার বৃদ্ধির চেষ্টা করেছে। যাহোক, ঐ কচ্ছপ গোত্রের লোকেরা এখন বলেন, তাদের গোত্র কাশ্যপ; অর্থাৎ হিন্দু সমাজের মুনি-ঋষির নামে যে গোত্র, অনেকটা সেই রকম। মুণ্ডারা চাণ্ডিল অর্থাৎ উদ্বাকে তাদের সমাজের কুলের (Clan) পরিচায়ক হিসাবে ধরে। সাম্প্রতিক কালে তারা চাণ্ডিলকে শাণ্ডিল্য বলে অভিহিত করতে চায়। এই ধরণের সমাজের বিভিন্ন স্তরের পরিবর্তনকে আর্যসংস্কৃতির ধীর অনুপ্রবেশ বলে স্বীকার করা হয়।

ফলে তাদের মধ্যে হিন্দুয়ানীর ভাব দেখা যায়। এখানে এটা মনে রাখতে হবে যে, যেখানে এই হিন্দুয়ানী বা আর্যীকরণ ঘটেছে, সেখানে তারা ভারতের বৃহত্তর সমাজের দেহে তত বেশী অনুপ্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে। আর্যসংস্কৃতির ধারাকেও তারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছে। আমরা বহু লৌকিক দেবদেবীর আরাধনা বা পুজার্চনায় যে সব উপকরণ দিই, তার মধ্যে এই সকল প্রাক-আর্য বা অনার্য সংস্কৃতির প্রভাব দেখা যায়। যেমন ধরা যাক, মাতৃতান্ত্রিক প্রাক-আর্য-গোষ্ঠীর দেবী হলেন কালী। যাঁর পূজা হয় রাত্রিতে, তাঁর কাছে উৎসর্গ করা হয় জীবজন্তুর রক্ত। চর্ম বাদ্য উৎসবের এক অঙ্গ অথচ আর্যসংস্কৃতির দেবতা বিষ্ণুর পূজায় এসব নিষিদ্ধ। কাংস্য, ঘন্টা, ঘৃত, দুগ্ধ ইত্যাদি উন্নততর জীবনযাত্রায় সংস্কৃতির রূপ-রেণু এর মধ্যে বিদ্যমান। এমনিভাবে বর্তমানের হিন্দুধর্মের মধ্যে প্রাগার্য সংস্কৃতির অনেক রূপু-রেণু (Cultural traits) ছড়িয়ে আছে, সকলের যাই নজরে পড়ে—যাকে আমরা আর্য-অনার্য সম্পর্কের সংস্কৃতির লেন-দেনের (Acculturation) নিদর্শন হিসাবে স্বীকার করি। এও দেখা গেছে, যেখানে এই সকল উপজাতি গোষ্ঠী ভারতীয় সংস্কৃতির ঐক্য থেকে দূরে সরে গেছে, যাদের মধ্যে হয়তো খৃষ্টীয় বা ইসলাম ধর্ম প্রভাব বিস্তার করেছে, সেই সকল উপজাতি বৃহত্তর ভারতীয় ঐক্যকে ভুল বোঝবার চেষ্টা করেছে। দীর্ঘ সহাব-স্থানে ও পারস্পরিক সম্পর্কের নিগূঢ়তায় এক দিকে আর্যীকরণ যেমন দৃঢ় হয়ে ওঠে, অপর দিকে তেমনি বহু উপজাতি সরাসরি নিজেদের হিন্দু বলে অথবা হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত কৌলিক উপজীবিকায় নির্ভরশীল জাতি বলে পরিচয় দেবার প্রয়াস পায়। মধ্যপ্রদেশের গন্দ উপজাতি-উদ্ভূত গোষ্ঠীগুলি কালক্রমে এক…একটি জাতিতে (?) পরিগণিত হয়েছে। ভূমিজ, লোধা,

শবর, রাজবংশী, বাগ্‌দী, বাউড়ী প্রভৃতি তথাকথিত গোষ্ঠিগুলি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত এক জাতি বলে পরিচিত হবার দাবী রাখে। এই ভাবে উপজাতি সমাজের মধ্যে যে মৌলিক পরিবর্তন ঘটছে, তাকে আমরা উপজাতি বিলুপ্ততা (De-Tribalisation) বলে অভিহিত করি। যেমন—সাঁওতালদের 'সাফা হড়' আন্দোলন, অর্থাৎ চিরাচরিত সাঁওতালী উপজাতীয় জীবনযাত্রার কোন কোন রীতিকে অপবিত্র, অশুচি বলে ধরে নিয়ে সাফা অর্থাৎ পবিত্র হবার আন্দোলনই হলো 'সাফা হড়' আন্দোলন। এমনিভাবে সাঁওতাল গোষ্ঠীর দেশওয়ালী মাঝি সাঁওতাল গোষ্ঠীসম্পৃক্ত একটি যার ফলে তারা শূকর বা গোমাংস পরিত্যাগ করে, উপবীত বা শিখা ধারণ করে এক পবিত্র জীবনাদর্শের পথপ্রান্তে জীবন-পতাকা উড্ডীন করে সমাজের মৌলিক আকার বা মূল্যবোধের নূতন ভাষ্য দিতে পেরেছিল। ঠিক এমনিভাবে মুণ্ডাদের মধ্যেও আন্দোলন হয়েছে বিরসা মুণ্ডার অভ্যুত্থানে। বিরসাকে তারা বিরসা ভগবান বলে অভিহিত করে। মুণ্ডা বা কোল গোষ্ঠীর ক্রমান্বয়ে হিন্দুয়ানীর পথে এগিয়ে যাওয়াই বা আদিমতা পরিত্যাগই হলো ভূমিজ সংস্কৃতির বুনিয়াদ। লোধা উপজাতি নিজেদের শবর অর্থাৎ রামায়ণে বর্ণিত অরণ্যচারীর গোষ্ঠী হিসাবে পরিচিত করবার গর্ব রাখে।



বড়াম বা চণ্ডীর থানে উৎসর্গীকৃত পোড়ামাটির হাতী ও ঘোড়া।

গোষ্ঠী। ওরাওঁ উপজাতির মধ্যে যে ভকত (ভক্ত) আন্দোলন ঘটে, তাতে হিন্দু অনুপ্রবেশ বা আর্যীকরণের স্বাক্ষর বহন করে। ওরাওঁদের টানা ভকত আন্দোলন তাদের সমাজের দেহে প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছিল, প্রসারিত করেছিল জীবন-বোধের নতুন দিগন্ত। তারা শীতলা ও চণ্ডীর পূজা করে, হিন্দুদের মত পূজক ব্রাহ্মণ দিয়ে নয়, নিজেদের দেউড়ী বা দেহেরী দিয়ে। আর শীতলা বা চণ্ডীর কাছে কেবল পাঁঠা নয়, মুরগীও বলি দেয় তাঁদের প্রীতি সাধনের জন্যে।

এমনিভাবে আর্যসংস্কৃতিরও এক বিরাট

রূপান্তর ঘটে। লোকায়ত বিশ্বাসের ধারা ও জীবনযাত্রা আর্যসংস্কৃতির জীবনযাত্রার রূপ-রেখা পাল্টে দেয়। ভারতীয় হিন্দু ধর্মের এই সদাপ্রসারী শক্তিই ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির বুনিয়াদকে শক্ত করেছে। নানা বিভেদ বা বৈষম্যের মধ্যে ঐক্যভাবকে সদামুখর করে তুলেছে। যতই ভারতের বহুধা বিভক্ত অনগ্রসর সমাজের কাঠামো নিয়ে আলোচনা করা যাবে, ততই আমাদের কাছে ভারতীয় সংস্কৃতির এই চিত্র বার বার উদ্ভাসিত হবে।

মুসলমান রাজত্বে ভারতীয় উপজাতিদের মধ্যে কিছু কিছু অর্থনৈতিক পরিবর্তন আসে। উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলে অনেক মুসলমান ব্যবসায়ী নতুন ব্যবসায়ের তাগিদে বসবাস করে। এর ফলে এদের পুরনো অর্থনৈতিক কাঠামো এবং ব্যক্তিসম্পর্কের হের-ফের ঘটে। উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলে মুসলমান ব্যবসায়ীর সঙ্গে অন্যান্য হিন্দু ব্যবসায়ীরাও ঐ সকল অঞ্চলে যেতে সুরু করে। উপজাতি সমাজের যে স্বনির্ভর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলবৎ ছিল, তার কাঠামো পরিবর্তিত হতে থাকে। আগে যেখানে বদ্লী ব্যবস্থায় (Barter) জিনিষপত্র কেনাবেচা হতো, কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সঙ্গে অপর প্রয়োজনীয় দ্রব্যের পাল্টা বদল চলতো, সেই আদিম অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ধ্বসে যাওয়ায় সেখানে নগদ অর্থমূল্যের (Cash money) চলন এল। তাছাড়া সংশ্রব ও সংশ্লেষণের ফলে জীবনযাত্রায় বিবিধ দ্রব্যসম্ভারের প্রয়োজনও অনুভূত হলো। এসব যোগান দিতে প্রকৃতি-নির্ভর উপজাতি সমাজের কাঠামো জীর্ণ হতে আরম্ভ করে। ভীল প্রভৃতি উপজাতির জীবনে ইসলাম ধর্ম প্রভাব বিস্তার করলেও বৃহত্তর উপজাতি সমাজ ধর্মান্তরিত হবার চেষ্টা করে নি। তাদের কাছে চিরাচরিত বাহুল্যময় উৎসব ও আড়ম্বরময় পূজা ও অশরীরী শক্তির আরাধনা অনেক বেশী আকর্ষণীয় ছিল। বিশেষ ভাবে মুসলমান শাসক গোষ্ঠী উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির পুনর্বিন্যাস না করে সামন্ত রাজা বা জমিদারদের উপর বেশী নির্ভরশীল ছিলেন।

দু-শ' বছরের বৃটিশ শাসনে যেমন ভাবে সর্বভারতীয় মানচিত্রের পরিবর্তন ঘটেছে, সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন গোষ্ঠী বা সমাজের মানচিত্রেরও অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটেছে। বৃটিশ শাসক প্রথমে উপজাতি-অঞ্চল বা উপজাতি গোষ্ঠীকে ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতির এক বিচ্ছিন্ন অংশ বলে ধরে শাসন ব্যবস্থা সুরু করেছিল। যদিও কিছু কিছু স্বনামধন্য বিদগ্ধ প্রশাসক ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের উপজাতিদের জীবন-যাত্রার বিবরণ লিখে গেছেন, তবুও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে উপজাতিদের বিছিন্ন করে রাখবার জন্যে যে সব ধূর্ত ব্যবসায়ী, সুদখোর, অত্যাচারী জমিদার এদের উপর নির্মম শোষণ চালিয়ে যেত, তারা সবাই সমানে আগের মত অত্যাচার বা শোষণ চালাতে থাকেন। বৃটিশ শাসক তাদের সমর্থকদের বা সাহায্যকারীদের সমর্থন বা সাহায্য করতে লাগলেন। ফলে নিপীড়িত মানুষ আরও বেশী অত্যাচারিত হতে লাগলো। এর ফলে এই সকল বহিরাগত গোষ্ঠী বা ব্যক্তি উপজাতি সমাজকে দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত করে দিতে থাকে। এদের মধ্যে ক্রীতদাস প্রথার মত টাকা ধার দিয়ে সুদের বাবদ কোন ব্যক্তিকে বা তার বংশধরকে দীর্ঘ দিন ধরে বিনা মজুরীতে খাটিয়ে নেবার প্রথা চালু হয়। এই ঋণ-দাসত্ব (Bonded labour) ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে পরিচিত। সাগড়ি, গোঠী, বেটি্ট প্রভৃতি মধ্য ভারত এবং দক্ষিণ ভারতে ক্রীত-দাস প্রথার মতই সুপরিচিত। বিশেষভাবে গোষ্ঠী প্রথায় কেবল সুদের বাবদ ঋণীকে বা তাদের বংশধরদের আমরণ খাটতে হতো।

স্বাধীন অরণ্যাচারী উপজাতি কোথাও কোথাও

জঙ্গল কেটে চাষ-আবাদ বা বন্ধ প্রথায় চাষ-আবাদ করেছে। এখনও উপজাতি গোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ এই আদিম প্রথায় চাষ করে। এর ফলে জঙ্গল ও স্বাভাবিক অরণ্য সম্পদ নষ্ট হয়ে থাকে এবং ভূমির ক্ষয় সাধিত হয়। বৃটিশ শাসনে উপজাতিদের অরণ্যের উপর এই অবাধ বিচরণ ও অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। এর ফলে অরণ্যকে কেন্দ্র করে তাদের যে অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠেছিল অথবা শিকার বা অন্য উপায়ে যে জঙ্গলের সম্পদ পরিপূরক অর্থনীতির অঙ্গ হিসাবে প্রসারিত হয়েছিল, তার পথ রুদ্ধ হয়। উপজাতি সমাজে অর্থনৈতিক কাঠামো বিধ্বস্ত হলে অরণ্যের অধিকার হারিয়ে পশ্চিমে বাংলার লোধা উপজাতি জীবিকাহীন দস্যু-তস্কর বা স্বভাবদুর্বৃত্ত গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হয়। ছোটনাগপুরের উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলে যখন বৃটিশের অবসরপ্রাপ্ত সেনাদের পুনর্বাসন করবার ব্যবস্থা হয়, তখন সেখানে প্রচণ্ড বিক্ষোভ ধূমায়িত হতে থাকে। পরে বিপ্লবের বহ্নি নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। উল্লেখযোগ্য উপজাতি বিদ্রোহ হলো 1831-32 সালের কোল বিদ্রোহ। ছোটনাগপুরের বেগার খাটার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রচণ্ডতা ধারণ করে। এই সময় মেদিনীপুর অঞ্চলের পাইক বা চুয়াড় হাঙ্গামাও উল্লেখযোগ্য। পাইকদের পাইকান জমি বাজেয়াপ্ত করবার ফলে এই আন্দোলন ঘটে। 1857 সালে সিপাহী বিদ্রোহের প্রাক্কালে সাঁওতাল বিদ্রোহ (1855) ঘটে। Thompson and Garratt এই সম্পর্কে বলেছেন—

"Then without warning, a Santal inundation swept over the outlying regions of Bengal, reaching to within a hundred miles of Calcutta, clearing open the skulls of European and Indian alike, pouring out poisoned arrows, burning huts and bungalows. All ended, however, as it was bound to end in massacre and executions."

1887 সালে সরদারি বিক্ষোভ ঘটে, যার প্রধান কারণ নিরিখ বৃদ্ধি, বাধ্যতামূলক বেগার খাটা ইত্যাদি। এমনিভাবে বৃটিশের শাসন ব্যবস্থা কৃষিজীবী মানুষের, মেহনতী মানুষের দুঃখ-দুর্দশাকে আরও গভীর করে দেয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে অনেক আদিবাসীর ধারণা হয়েছিল যে, যদি তারা ধর্মান্তরিত হয়, বিশেষভাবে খৃষ্টান হয়, তবে মিশনারীদের চেষ্টায় বৃটিশ শাসকের অত্যাচার থেকে রেহাই পাবে। ফলে ছোটনাগপুর অঞ্চলে ধর্মান্তরিত হবার এক হিড়িক পড়ে যায়। ঠিক ঐ সময়ে অন্ধ্রপ্রদেশে কয়া উপজাতিদের মধ্যে এই বিদ্রোহের বহিঃপ্রকাশ হয় শাসকগোষ্ঠীর উপর সমবেত আক্রমণে।

রাঁচি অঞ্চলে মুণ্ডাদের মধ্যে বিরসা মুণ্ডার নেতৃত্বে যে বিরাট গণ-অভ্যুত্থান ঘটে, তা বর্তমানের বাংলা দেশের গণ-আন্দোলনের মত। 1895 সালের এই বিরসা আন্দোলন অনেকটা ধর্মীয় আন্দোলনের মত হলেও তা ছিল প্রধানতঃ বৃটিশ শাসক, হিন্দু জমিদার ও মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে। 1911 সালে ওড়িসার কন্দ উপজাতিদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা যায়। 1911 সালে ওরাওঁ উপজাতিদের ভকত আন্দোলন সুরু হয়। এই ভকত আন্দোলনগুলির মধ্যে টানা ভকতের আন্দোলন উল্লেখযোগ্য। এছাড়া হায়দরাবাদ, আদিলাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে বৃটিশ শাসনে নানাভাবে উপজাতিদের গণ-অভ্যুত্থান বা বিদ্রোহ ঘটেছিল।

এমনিভাবে বৃটিশ শাসনে নিরীহ উপজাতি গোষ্ঠীদের মধ্যে শোষণ ও নির্যাতনের মাত্রা প্রচণ্ডভাবে বেড়ে ওঠে, ফলে তাদের বিদ্রোহের পথে পা বাড়াতে হয়েছিল। বৃটিশ শাসনের অবসানে স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারত সরকার সংবিধানের 339 অনুচ্ছেদে বলেছেন,—

"The President may at any time and shall at the expiration of ten years from the commencement of the Constitution by order appoint a commission to report on the administration of the Scheduled Areas and the welfare of the Scheduled Tribes in the States."

ক্রমবর্ধমান সমাজ ব্যবস্থায় পিছিয়ে থাকা উপজাতি গোষ্ঠীদের জীবনের পথকে অনেক সহজ ও সুগম করে বর্ধিষ্ণু, বৃহত্তর প্রতিবেশী অন্যান্য সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীজীবনের সঙ্গে সংযুক্তির মাধ্যমে এক প্রবাহ তৈরি করে জাতীয় জীবনে একীকরণ বা সংহতির প্রচেষ্টা হলো উপজাতি উন্নয়ন।

আর্থিক সাহায্য বা ক্ষুদ্র-বৃহৎ অনেক উন্নয়ন প্রকল্প, চাকুরী, লোকসভা বা বিধানসভার নির্দিষ্ট বা সংরক্ষিত আসনের মাধ্যমে এদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলো। শোষণের বিরুদ্ধে, অবিচারের বিরুদ্ধে রক্ষা করবার জন্যে হলো আইন প্রণয়ন। উপজাতিরা যাতে তাদের কৃষি জমি না হারায় তারও ব্যবস্থা হলো। মোট কথা, জীবনের পরিবর্তন মানে কোন রক্তক্ষয়ী আন্দোলন নয় বরং তাদের সংস্কৃতি ও প্রতিভার দৃপ্ত বিকাশের পথে শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও অন্যান্য উন্নয়নধর্মী কাজের সঙ্গে প্রতিবেশী মানুষের সহযোগিতা, মানসিকতাই হবে এর পাথেয়। তবুও স্বাধীনতার পর আমাদের দেশে উপজাতিদের মধ্যে নানা আন্দোলন হয়। বিশেষ করে উপজাতি-অধ্যুষিত আসাম সীমান্তে তা অন্য রূপ নেয়। মিজো এবং নাগাদের অভ্যুত্থান, স্বতন্ত্র নাগাভূমি ও মেঘালয় রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, ঝাড়খণ্ড পার্টির অভ্যুত্থান উপজাতির সমাজ ও জীবনে অনেক উন্মাদনা ও আলোড়ন এনে দিয়েছে। এর মধ্যে স্বভাব-শান্ত, প্রকৃতিমুগ্ধ, নিরীহ উপজাতিদের মানসিকতার ঘটেছে পরিবর্তন। সংবিধানে সিডিউলড অঞ্চল (Scheduled areas) বলে বহু রাজ্যের আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলকে চিহ্নিত করা হয়েছে। যে সব অঞ্চলে উপজাতিরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, সে সব অঞ্চলে শাসনের ধারা ও উন্নয়নের কার্যক্রম স্বাভাবিক অঞ্চল থেকে অনেকটা ভিন্ন। ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে অন্ধ্র প্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব ও রাজস্থানে প্রায় 90 লক্ষ উপজাতি লোকেরা 99,693 বর্গমাইল জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে।

বিভিন্ন উন্নয়নের সুযোগে দীর্ঘ এই কয় বছরে উপজাতি সমাজে শিক্ষার যেমন প্রসার ঘটেছে, তেমনি কর্মসংস্থানও হয়েছে। এর ফলে যে সকল উপজাতি আন্দোলনের মাধ্যমে নিজেদের জাতি বলে পরিগণিত করেছিল, তাদের কেউ কেউ পুনরায় উপজাতীয় এবং তফশিলী তালিকাভুক্ত হবার প্রয়াস পাচ্ছে। আমরা এই ফিরে আসবার মানসিকতাকে মাধ্যমিক উপজাতীয়তা (Secondary tribalisation) বলে অভিহিত করে থাকি। সংবিধানের এই সংরক্ষণ তাদের সঙ্কুচিত হবার মদৎ জুগিয়েছে।

জীবন-জিজ্ঞাসা

সূর্যেন্দুবিকাশ কর*

পৃথিবী ছাড়া বহির্বিশ্বে আর কোথাও জীবনের অস্তিত্ব আছে কিনা, এই পৃথিবীতে আদিম জীবের সৃষ্টি কিভাবে হলো—এই দুটি প্রশ্নই প্রাচীন কাল থেকে মানুষের মনকে নাড়া দিয়েছে। আমাদের ছায়াপথেই রয়েছে কোটি কোটি নক্ষত্র আর তাদের গ্রহ-উপগ্রহ—সারা বিশ্বে আবার ছড়িয়ে আছে অনুরূপ ছায়াপথ। তাই এই বিশাল বিশ্বে শুধু পৃথিবীতেই জীব-জগতের অনন্ত অধিকার থাকবে, এই কল্পনা বাস্তব নয়। তাত্ত্বিক বিচারে বিজ্ঞানীরা অনুমান করেছেন, সারা বিশ্বে প্রায় 10^{17}টি গ্রহে জীবনের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব আর আমাদের ছায়াপথে খুব কম করে ধরলেও অন্ততঃ 40টি অথবা বেশী হলে সর্বোচ্চ 5 কোটি গ্রহে জীবনের অস্তিত্ব থাকা উচিত। আমাদের সৌরজগতে অন্ততঃ মঙ্গল ও শুক্রগ্রহে জীবের বসবাস আছে, এরকম সযত্ন-লালিত ধারণাটুকুও মহাকাশ গবেষণার এই প্রথম যুগেই প্রায় নস্যাৎ হয়ে গেছে। তবে এই সব গ্রহে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে হয়তো কিছু জীবাণু টিকে থাকতে পারে, কিন্তু মানুষ বা মানুষের চেয়ে উন্নততর জীব কখনো নয়। তবে হ্যাঁ—অতীতের কোন জীব-জগতের সাক্ষ্য নিয়ে এই সব গ্রহে যদি কোন ফসিল আবিষ্কৃত হয়, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না। বাইরের কোন সৌরজগতে আমাদের চেয়ে অসভ্য বা আরো সভ্য জীব থাকতে পারে, এই সিদ্ধান্ত খুব দুঃসাহসের নয়।

বিজ্ঞানীরা যে এই সব ধারণা নিশ্চিত বলেই মনে করেছেন, তার কারণস্বরূপ বলা যায় যে, গত বিশ বছর ধরে জীবন সম্পর্কিত এই প্রশ্নগুলি আর অনুমানভিত্তিক নয়—রীতিমত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সামিল হয়ে গেছে। ফলে গ্রহ সম্পর্কে আমাদের ধারণা যেমন স্পষ্ট হয়েছে, তেমনি জীব-বিজ্ঞানের মৌলিক রহস্যও গবেষণার ফলে ক্রমশঃ পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। মহাকাশ ও জীব-বিজ্ঞানের গবেষণার অগ্রগতিতে উল্লিখিত দুটি প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে পাওয়া সম্ভব হয়।

বর্তমানে যে সামান্য ফলাফল পাওয়া গেছে, তার উপর নির্ভর করে পৃথিবীর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, পুরাণ, গাথা প্রভৃতির সাহায্য নিয়ে দানিয়েন (Danien) প্রমুখ কেউ কেউ বলছেন, গ্রহান্তরের সভ্যতর জীবগোষ্ঠীই পৃথিবীতে বর্তমান সভ্যতার পত্তন করেছে। উড়ন্ত চাকী (Flying saucer) সম্পর্কে অনুসন্ধানের মধ্যে সেই সভ্যতর জীবগোষ্ঠীর সূত্র ধরবার চেষ্টা কেউ কেউ করে চলেছেন, যেমন ইয়েতির সন্ধানও করা হচ্ছে বর্তমান মানুষের পূর্বপুরুষ কি ছিল, সেই হারানো সূত্র (Missing link) পাওয়ার জন্যে। এই সমস্যাগুলিও বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ইয়েতি বা উড়ন্ত চাকী যত দিন না সরাসরি ধরা পড়ছে, সে সম্পর্কে গবেষণা চলতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে জীব-বিজ্ঞান ও মহাকাশ গবেষণা থেকে এই প্রশ্নগুলির কিছু উত্তর পাওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে।

এই উত্তর পাওয়ার চেষ্টা আরম্ভ হয়েছে প্রায় 2000 বছর আগে, যখন লুক্রেটিয়াস (Lucretius) বিশ্ব, নক্ষত্রজগৎ, জীবজগৎ প্রভৃতি

*সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9

সৃষ্টির মতবাদ এক সঙ্গে খাড়া করবার চেষ্টা করেছিলেন। সে মতবাদ গৃহীত হয় নি বরং অ্যারিষ্টটলের (Aristotle) স্বতঃজনন (Spontaneous generation) মতবাদ বেশ চালু হয়েছিল কিছুদিন। তাঁর মতে, অজৈব পদার্থ থেকেই হঠাৎ আপনা-আপনি জীবনের সৃষ্টি হয়। সতেরো শতকে পাস্তুরের (Pasteur) আবিষ্কারে এই মতবাদ নস্যাৎ হলো। নির্বীজ (Sterile) কোষে তো জীবনের সৃষ্টি হয় না! পাস্তুরের পর অনেক বছর কেটে গেল। টিণ্ডাল (Tyndal), হাক্সলি (Huxley) প্রমুখ বিজ্ঞানীরা বললেন, জীবন হলো রাসায়নিক পরিবর্তন ও নির্বাচনের জটিল প্রক্রিয়ার ফল এবং তা ধীরে ধীরে পৃথিবীর পরিবর্তনশীল কাঠামোর অণুজগৎ থেকেই সৃষ্টিলাভ করেছে। 1928 খৃঃ-অব্দে হলডেন (Haldane) ও ওপারিন (Oparin) প্রথম এই প্রশ্নের বিজ্ঞানভিত্তিক মীমাংসা করেন, যা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সত্যতা নির্ধারণের অপেক্ষা রাখে। তাঁদের প্রেরণার উৎস হলো উনিশ শতকের ডারুইন (Darwin) ও লামার্কের (Lamarck) অভিব্যক্তিবাদ। তাঁদের মতবাদের মূল কথা হলো, পৃথিবীর প্রাথমিক আবহমণ্ডলে ছিল না অক্সিজেন, তাতে ছিল শুধু হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, মিথেন, অ্যামোনিয়া, জল ও কিছু কার্বন মনো- ও ডাই-অক্সাইড। আন্তগ্রহ মহাকাশে এই সব বায়ব পদার্থ উড়ে যাওয়ায় এবং জলের ফটোডিসোসিয়েশন (Photodissociation) ও ক্লোরোফিলের বিশ্লেষণে অক্সিজেন সৃষ্টি হলো—ফলে আমাদের বর্তমান আবহমণ্ডলের সৃষ্টি। বিদ্যুৎ, সূর্য ও নভোরশ্মির নানান বিকিরণ এই সব আদিম অণু থেকে জীবন সৃষ্টির ভিত্তিভূমি নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিনের সৃষ্টি করেছে। উরে (Urey), বার্নাল (Bernal) প্রমুখ বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্ত প্রমাণ করেছেন। পরবর্তী কালে ফটোকেমিষ্ট্রি (Photo-chemistry) ও রেডিও কেমিষ্ট্রির (Radio-chemistry) বিভিন্ন পরীক্ষা এই দ্বি-আবহমণ্ডল মতবাদ সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করেছে।

এ তো গেল পার্থিব জীবন সৃষ্টির কথা, কিন্তু বহির্বিশ্বে জীবনের সন্ধান তো দূর অস্ত্। সে যুগে প্রথম যে বস্তুখণ্ড বহির্বিশ্ব থেকে পড়েছিল, তা হলো উল্কা। 1806 খৃঃ-অব্দে বিজ্ঞানী বায়োট (Biot) প্রথম প্রমাণ করলেন যে, এই সব উল্কা অপার্থিব। 1834 থেকে 1866 খৃঃ-অব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন গবেষকেরা উল্কাপিণ্ডের পরীক্ষায় স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, উল্কায় জৈব পদার্থ বর্তমান। এই জৈব পদার্থ হলো হাইড্রোকার্বন—যা অন্য গ্রহজগতের জীবনের অবক্ষয়িত অবশেষ হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু পাস্তুরের পরীক্ষায় দেখা গেল যে, উল্কা থেকে কোন ব্যাক্টিরিয়া জাতীয় জীবাণু পাওয়া যায় না।

উল্কাপিণ্ড পরীক্ষার এখানেই ইতি হয় নি। পরবর্তী কালে ক্রোম্যাটোগ্রাফী, নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স (N. M. R.)। মাসস্পেক্ট্রোস্কোপি (Mass-spectroscopy) প্রভৃতি উন্নততর যান্ত্রিক কৌশলে উল্কাপিণ্ডে যে সব জৈব পদার্থ পাওয়া গেছে, তার মধ্যে আছে প্যারাফিন হাইড্রোকার্বন, অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন (Aromatic hydrocarbon), ফেনল (Phenol), ফ্যাটি অ্যাসিড, শর্করা, অ্যামিনো অ্যাসিড (Amino acid)—যা পৃথিবীতে প্রোটিনের উপাদান বলে বিবেচিত হয়, নিউক্লিক অ্যাসিডের কিছু উপাদান, ক্লোরোফিল-জনিত কিছু যৌগিক পদার্থ। ফলে পৃথিবীর বাইরে জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কে সুদৃঢ় প্রমাণ আমাদের হাতে এসেছে। তাছাড়া ইলেকট্রন স্পিন রেজোনেন্স (E. S. R.) পরীক্ষায় জানা গেছে যে, এই সকল উল্কাপিণ্ডে জৈব বস্তুর বিন্যাস সারা দেহে ছড়িয়ে থাকে। ফলে পৃথিবীপৃষ্ঠের জৈব পদার্থ যে উল্কাপিণ্ডের দেহে মিশে যায় নি, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আর একটি পরীক্ষারও চেষ্টা হচ্ছে, তা হলো

উল্কাপিণ্ডের কার্বনের দুটি আইসোটোপ C^{12} ও C^{13}-এর আপেক্ষিক পরিমাণ নির্ধারণ। কারণ জৈব কার্বনে এই অনুপাত অজৈব কার্বন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

উল্কাপিণ্ড থেকে পাওয়া এসব তথ্য ছাড়াও মহাকাশ গবেষণায় জীবনের সন্ধানে অনেক কিছু তথ্য পাওয়া গেছে। ফলে অ্যাস্ট্রোবায়োলজি (Astrobiology) একটি নতুন রূপ নিতে চলেছে। কিন্তু পৃথিবীর বাইরে জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রমাণ এখনও আমাদের হাতে নেই। জেট প্রোপালসন লেবরেটরীর বিজ্ঞানী নর্মান হরোইৎজ্ একটি পরীক্ষায় মঙ্গলগ্রহে জৈব অণুর অস্তিত্বের সম্ভাবনাটুকু শুধু প্রমাণ করতে পেরেছেন। আগামী 1975 খৃঃ-অব্দে ভাইকিং পরিকল্পনায় মঙ্গলগ্রহে নামবার চেষ্টা হবে, তাতে ঐ গ্রহে কোন জীবন আছে কিনা, তা পরীক্ষা করবার যন্ত্রপাতি থাকবে। মহাকাশে সায়েনাইড, ফরম্যালডিহাইড প্রভৃতি জৈব রাসায়নিক পদার্থের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। তা থেকে মনে হয়, মহাকাশের অতি বিরুদ্ধ পরিবেশেও এদের অস্তিত্ব যখন সম্ভব, তখন জীবন সৃষ্টিতে রাসায়নিক বিক্রিয়ার এরা অংশীদারও হতে পারে। মঙ্গলগ্রহের পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা পৃথিবীর চেয়ে প্রায় 50° কম, আবহমণ্ডলের চাপ মাত্র 6 মিলিবার ও তার উপাদান জলীয় বাষ্প, কার্বন মনো- ও ডাই-অক্সাইড। হরোইৎজ্ অনুরূপ একটি আবহমণ্ডল গবেষণাগারে তৈরি করে ফর্মালডিহাইড তৈরি করতে পেরেছেন।

1975 খৃঃ-অব্দে দুটি ভাইকিং মহাকাশযান পৃথিবী থেকে যাত্রা করে কয়েক মাস সময়ের মধ্যে মঙ্গলগ্রহে নামতে পারবে। তাদের একটি নামবে গভীর উপত্যকা অঞ্চলে, যেখানে তরল জল ও ও আনুষঙ্গিক জীবন থাকা সম্ভব। যানগুলিতে জীবের বংশবৃদ্ধি, ফটোসিন্থেসিস প্রভৃতি প্রক্রিয়া ঘটাবার যান্ত্রিক কৌশল থাকবে, যাতে মঙ্গলগ্রহে জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া সম্ভব হয়।

এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষায় যদি সত্যই প্রমাণিত হয় যে, মঙ্গলগ্রহে জীবের অস্তিত্ব নেই, তবু কোন দিন ছিল কি না, সে প্রশ্নের সমাধান অন্ততঃ হতে পারবে। তখন ভরসা বৃহস্পতি। বিজ্ঞানী সাগানের মতে, বৃহস্পতির আবহমণ্ডলে প্রচুর মিথেন, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন ও সম্ভবতঃ জলীয় বাষ্প আছে। বিজ্ঞানী পোন্নামপেরুমা (Ponnamperuma) বৃহস্পতির কৃত্রিম আবহমণ্ডলে পরীক্ষা করে রক্তিমাভ তরল পদার্থ পেয়েছেন, যার উপাদান হলো নাইট্রাইল-এর মিশ্রণ। এই মিশ্রণ হাইড্রোলিসিস প্রক্রিয়ায় অ্যামিনো অ্যাসিডের জন্ম দিতে পারে। 1972 এবং 1973 খৃঃ-অব্দে পাইওনীয়ার এফ ও জি মহাকাশযানগুলি বৃহস্পতির গা ঘেঁষে যাবে। তারাও কিছু কিছু তথ্য দিতে পারবে আশা করা যায়। 1979 খৃঃ-অব্দে বৃহস্পতিগ্রহে স্বনিয়ন্ত্রিত মহাকাশযান পাঠাবার পরিকল্পনাও রয়েছে। জীবনের অস্তিত্ব খুঁজতে এই সব পরিকল্পনা তো আমাদের সৌরজগতের মধ্যেই আবদ্ধ। দূর বিশ্বে কোথাও জীবন আছে কি না, তার হদিশ কি কখনো পাওয়া যাবে? কোটি কোটি আলোক বছর দূরে কোনও গ্রহে যদি সত্যই সভ্য জীব থাকে আর তারা যদি কোন সঙ্কেতও পাঠায়, আমরা পৃথিবীর মানুষ কি কখনো সে সঙ্কেত ধরতে পারবো আর আমাদের পাঠানো কোন সঙ্কেত কি তারা কোন দিন পাবে? বিভিন্ন কণিকা ও বিকিরণ ছড়ানো রয়েছে সারা বিশ্বে—তার কোন্ অংশটুকু জীবের সৃষ্টি আর কোনটিই বা উত্তপ্ত নক্ষত্রের স্বাভাবিক উৎস—সে প্রশ্নের উত্তর কোথায়?

ভবিষ্যতের সংশ্লেষিত খাদ্য ও রসায়ন

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়*

এক সময় ছিল যখন প্রকৃতির উপর একান্তভাবে নির্ভর করে মানুষকে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকতে হতো। কিন্তু বিজ্ঞানের, বিশেষ করে রসায়ন-বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ আজ এমন অবস্থায় উপনীত হয়েছে যে, প্রকৃতির দাক্ষিণ্য ছাড়াই সে তার জীবনযাত্রার প্রায় সমস্ত সামগ্রীর প্রয়োজন নিজেই মেটাতে পারে। বস্ত্র তৈরির তন্তু, রঞ্জক দ্রব্য, রাবার, তরল জ্বালানী, চামড়া, ভেষজ দ্রব্য ইত্যাদি সামগ্রী মানুষ আজ কৃত্রিম উপায়ে সংশ্লেষণ করতে পারে। অবশ্য যুদ্ধের দরুণ অথবা কোন অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে প্রকৃতিজ উপকরণের অভাবের সম্মুখীন হয়েই মানুষকে এসব সামগ্রী কৃত্রিম উপায়ে উদ্ভাবন করতে হয়। এসব সংশ্লেষিত দ্রব্যের প্রত্যেকটি আজ প্রকৃতিজ উপকরণের সঙ্গে গুণগত প্রতিযোগিতায় পাল্লা দিতে পারে। আজ পৃথিবীতে লোকসংখ্যা যেরূপ দ্রুত হারে বেড়ে চলেছে, তার ফলে মানুষের খাদ্য-সমস্যা ক্রমশঃ প্রকট হয়ে উঠছে। এজন্যে বিজ্ঞানীদের আজ মানুষের প্রয়োজনীয় খাদ্য কৃত্রিম উপায়ে সংশ্লেষণ করবার কথা বিশেষভাবে চিন্তা করতে হচ্ছে। তারই ফল হচ্ছে সম্পূর্ণ সংশ্লেষিত খাদ্য।

কৃত্রিম উপায়ে কিভাবে খাদ্য সংশ্লেষণ করা যায়, তার বৈজ্ঞানিক জ্ঞান মানুষ ইতিমধ্যেই আয়ত্ত করেছে। এখানে খাদ্য সংশ্লেষণ বলতে কোন প্রচলিত খাদ্যদ্রব্যকে অন্য কোন খাদ্যে রূপান্তরের প্রক্রিয়ার কথাই শুধু বলছি না, রাসায়নিক উপায়ে খাদ্য সংশ্লেষণের বিষয়ই আমরা উল্লেখ করছি। উদাহরণস্বরূপ তথাকথিত বিকল্প মাংসের কথা বলা যায়। এই বিকল্প মাংস সয়াবীনজাত প্রোটিন থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত হয়ে থাকে। প্রোটিনকে প্রথমে ক্ষারীয় দ্রবণে দ্রবীভূত করা হয়, তারপর একটি তঞ্চন আধারে (Coagulating bath) সূচীনলমুখে অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে অন্যান্য উপকরণের সঙ্গে মিশিয়ে মাংসের স্বাদসম্পন্ন করা হয় এবং গরু বা ভেড়া, মুরগী, মাছ বা শূকরের মাংসের অনুকল্প হিসাবে বাজারে ছাড়া হয়। বস্তুতঃ এই উপায়ে প্রস্তুত শূকরের মাংসের যথেষ্ট চাহিদা বিদেশী বাজার দেখা দিয়েছে। কিন্তু এই জিনিষগুলি যথার্থ সংশ্লেষণ জাত নয়, কারণ এই মাংস বা মাছের অনুকল্প বস্তুটির মূল উপকরণ হচ্ছে কোন প্রকৃতিজ খাদ্যদ্রব্য। ঈষ্ট বা ব্যাক্টিরিয়ার দেহ থেকে এখন একক-কোষ প্রোটিন (Single-cell protein, সংক্ষেপে SCP) নিষ্কাশন করা হচ্ছে। এই ঈষ্ট বা ব্যাক্টিরিয়া এমন ধরণের খাদ্যদ্রব্যের উপর জন্মায়, যার মূল উপকরণ হচ্ছে তরল বা গ্যাসীয় পেট্রোলিয়ামের একটি ভগ্নাংশ।

একক-কোষ প্রোটিন, পাতা থেকে নিষ্কাশিত প্রোটিন, মাছের অনুকল্প খাদ্য এবং এই ধরণের অন্যান্য সামগ্রীগুলি সম্পর্কে আজ বিদেশী লোকদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হলেও তাদের ব্যবহার তেমন প্রসার লাভ করে নি। সেই সঙ্গে একথাও আমরা বলতে পারি, সম্পূর্ণ খাদ্য না হলেও খাদ্যের প্রধান প্রধান উপকরণের রাসায়নিক সংশ্লেষণের প্রতি আজও তেমন দৃষ্টি পড়ে নি। ভিটামিন-A, ভিটামিন-B কমপ্লেক্স-এর থিয়ামিন, রিবোফ্ল্যাবিন, নিয়াসিন, ভিটামিন-C বা অ্যাস্কর্বিক অ্যাসিড, ভিটামিন-D এবং অন্যান্য ভিটামিন

* দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং, কলকাতা-29

সামগ্রী আজকাল ব্যাপক হারে রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত হচ্ছে। ভিটামিন-A এবং ভিটামিন-D আজকাল মার্গারিনের (Margarine) সঙ্গে ব্যাপকভাবে মেশানো হয়। পাশ্চাত্য দেশসমূহে রুটি প্রস্তুতের সময় ময়দার সঙ্গে B-ভিটামিন মেশানো হয় এবং প্রাচ্য দেশগুলিতে চালের খাদ্যমান বৃদ্ধির জন্যে তা মেশানো হয়। ভিটামিন-C আজকাল অপেক্ষাকৃত কম দামে টন টন প্রস্তুত হচ্ছে এবং ঠাণ্ডা পানীয়, নির্জল আলুর গুঁড়া ও অন্যান্য অনেক খাদ্যসামগ্রীর সঙ্গে মেশানো হয়। এই সব ভিটামিনের সনাক্তীকরণ, তাদের কার্যকলাপ আবিষ্কার এবং অপেক্ষাকৃত কম দামে তাদের প্রস্তুতের উপায় উদ্ভাবন রসায়ন-বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ কৃতিত্ব। আরও উল্লেখযোগ্য যে, আমাদের জীবনকালের মধ্যেই এই কৃতিত্ব এবং শিল্পভিত্তিক সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, পাশ্চাত্য দেশগুলিতে আজকাল পাঁউরুটিতে ভিটামিন-B, ক্যালসিয়াম ও লোহা মেশানো হয়। এর কারণ হচ্ছে জনসাধারণের মধ্যে এমন অনেক দরিদ্র ও অসচ্ছল লোক আছে, যারা দেহরক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর উপাদানগুলি তাদের খাদ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে পায় না। দেহরক্ষার জন্যে ভিটামিন ইত্যাদি উপাদান যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনি প্রোটিনও পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রয়োজন। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে মানুষের খাদ্যে প্রোটিনের অভাব তেমন দেখা যায় না। কিন্তু প্রাচ্য দেশগুলিতে মানুষের খাদ্যে, বিশেষ করে শিশুদের খাদ্যে প্রোটিনের অভাব খুবই প্রকট। তবে অভাবটা ঠিক প্রোটিনের না-ও হতে পারে। সাধারণতঃ একটি অ্যামিনো অ্যাসিডের অভাব বিশেষভাবে দেখা যায় এবং সেটি হচ্ছে লাইসিন (Lysine)। উচ্চমানের (এবং উচ্চ মূল্যের) প্রাণিজ খাদ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে লাইসিন বিদ্যমান থাকে। খাদ্যশস্যের প্রোটিনেও লাইসিনের পরিমাণ কম নয়। মানুষের খাদ্যে লাইসিনের অভাব দূরীকরণের জন্যে লাইসিন এবং অন্য কয়েকটি অ্যামিনো অ্যাসিড আজকাল ব্যাপকহারে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করা হচ্ছে।

কিন্তু ভিটামিন এবং অ্যামিনো অ্যাসিড দেহের পুষ্টির জন্যে অপরিহার্য হলেও মানুষের সামগ্রিক খাদ্যের তারা হচ্ছে অংশবিশেষ মাত্র। রসায়ন-বিজ্ঞানীরা কি মানুষের সামগ্রিক খাদ্য সংশ্লেষণ করতে পারেন না? এর উত্তরে বিজ্ঞানীরা বলবেন—হ্যাঁ, তাঁরা তা পারেন।

বছর দুই আগে খাদ্য-বিজ্ঞানীরা মার্গারিন বা কৃত্রিম মাখন আবিষ্কারের শতবার্ষিকী পালন করেছেন। আমরা জানি, মার্গারিন হচ্ছে মাখনের অনুকল্প। বাজারে প্রাপ্ত যে কোন চর্বিকে শোধন, গন্ধমুক্ত ও হাইড্রোজেন সংযোগ করে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যে ক্ষুদ্রাকার কেলাসিত বস্তু পাওয়া যায়, তাই হলো মার্গারিন। মার্গারিনকে যদিও সাধারণতঃ কৃত্রিম মাখন বলা হয়, তথাপি এটি কিন্তু প্রাণিজ চর্বি থেকে তৈরি হয়। তবে পেট্রোলিয়াম থেকেও মার্গারিন প্রস্তুত করা হয়েছে। 1884 সালে পেট্রোলিয়ামের হাইড্রোকার্বন অংশ (যা খাওয়া চলে না) থেকে স্নেহজ অ্যাসিড (যা খাওয়া চলে) প্রথম প্রস্তুত করা হয়। গোড়ার দিকে যে সব পদ্ধতি অনুসরণ করে এই স্নেহজ অ্যাসিড প্রস্তুত করা হতো, তাতে স্নেহজ অ্যাসিডের মিশ্রণের সঙ্গে আরও অনেক জিনিষ মিশ্রিত থাকতো এবং অবাঞ্ছিত অন্যান্য পদার্থ থেকে স্নেহজ অ্যাসিডকে পৃথক করা সহজসাধ্য ছিল না। এমন কি, 1917 ও 1918 সালে জার্মেনী ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই উপায়ে যে স্নেহজ অ্যাসিড প্রস্তুত হতো, তাতেও এক বিশেষ ধরণের গন্ধ থেকে যেত। গত 20 বছরে এই সব সমস্যার অনেকখানি সমাধান করা গেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার আগে জার্মেনীতে চারটি বড় কারখানায় অঙ্গার-জাত পেট্রোলিয়ামের একটি হাইড্রোকার্বন অংশ থেকে চর্বি বা স্নেহদ্রব্য প্রস্তুত করা হতো।

এই চর্বি থেকে মার্গারিন বা কৃত্রিম মাখন প্রস্তুত করা হতো। ইঁদুর, গিনিপিগ, খরগোস, কুকুর ও ভেড়াকে এই মার্গারিন খাইয়ে পরীক্ষা করে দেখবার পর ডুবোজাহাজের নাবিকদের খাদ্যে এই মার্গারিন ব্যবহার করা হয়। এই সংশ্লেষিত মাখন দুধের প্রোটিন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়ায় মানুষের দেহের বিপাকে সহজে গৃহীত হতো। কিছুদিন রেখে দিলে এই মাখনে একটা গন্ধ সৃষ্টি হয় বলে খবর পাওয়া যায়। তবে এই গন্ধ (যদিও সুগন্ধ নয়) পেট্রোলের গন্ধ থেকে ভিন্ন রকমের।

সম্পূর্ণ সংশ্লেষিত খাদ্যের প্রথম সফল উদাহরণ হচ্ছে এই কৃত্রিম মাখন। যখন এই মাখন বাজারে প্রথম ছাড়া হয়, তখন এতে তিনটি ত্রুটি ছিল। প্রথম ত্রুটি হলো, এর রাসায়নিক সংযুতি স্বাভাবিক মাখনের সংযুতির চেয়ে কিছুটা ভিন্ন ধরণের। স্বাভাবিক স্নেহজ অ্যাসিডের আণবিক দৈর্ঘ্যে জোড় সংখ্যক কার্বন পরমাণু থাকে, কিন্তু সংশ্লেষিত মাখনের আণবিক দৈর্ঘ্য জোড় ও বিজোড় উভয় সংখ্যক কার্বন পরমাণু নিয়ে গঠিত। সংশ্লেষিত মাখনের আণবিক শৃঙ্খল (Molecular chain) কখনও আবার শাখায় বিভক্ত হয় এবং এই শাখার কোন কোনটিতে ডাই-কার্বোক্সিলিক অ্যাসিড-বর্গ থাকতে পারে। এই তারতম্যের ফলে সংশ্লেষিত মাখন ব্যবহারকারীদের সামান্য পেটের গোলমাল হতে পারে। তবে গবেষণার সাহায্যে এই ত্রুটি দূর করা যেতে পারে।

সংশ্লেষিত মাখনের দ্বিতীয় ত্রুটি হচ্ছে গন্ধ। এই ক্ষেত্রে রাসায়নিক সংশ্লেষণের সাহায্য নিয়ে n-Propyl acetate, λ-undecalone এবং methyl-3-methyl thiopropionate ব্যবহার করে জাশপাতি, পীচফল ও আনারসের স্বাদ এবং iso-pentyl isovalerate-এর সাহায্যে আপেলের স্বাদ সৃষ্টি করা যায়।

সংশ্লেষিত চর্বির তৃতীয় ত্রুটি হচ্ছে স্বাভাবিক চর্বির তুলনায় এর দাম অত্যন্ত বেশী। যুদ্ধের প্রয়োজনে সংশ্লেষিত বা কৃত্রিম রাবার যখন প্রথম ব্যবহার করা হয়, তখন প্রাকৃতিক রাবারের তুলনায় এর দাম ছিল খুব বেশী। কিন্তু আজ কৃত্রিম রাবারের দাম যেমন অনেক কমে গেছে, তেমনি এর ব্যবহারও অনেক বেড়েছে। গত দশ-পনেরো বছরের মধ্যে সংশ্লেষিত ভিটামিন এবং অ্যামিনো অ্যাসিডেরও দাম অনেক কমেছে। অনুরূপভাবে আমরা আশা করতে পারি, কৃত্রিম চর্বি প্রস্তুতের গবেষণায় যদি যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করা হয়, তাহলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে কৃত্রিম চর্বির দামও অনেক কমে যাবে।

কৃত্রিম চর্বি সংশ্লেষণের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও কারিগরী কৌশল বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই আয়ত্ত করেছেন। তবে কৃত্রিম উপায়ে প্রোটিন সংশ্লেষণের পথে এখনও অনেক বাধা আছে। প্রোটিনের আণবিক গঠনের ত্রিমাত্রিক জ্যামিতি অতীব জটিল এবং এই ধরণের অণু এক-একটা করে গড়ে তোলা প্রায় অসম্ভব। এক্ষেত্রে মুশকিল-আসান হিসাবে ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সিড্‌নি ফক্স একটি বিকল্প পন্থার সন্ধান দিয়েছেন। অধ্যাপক ফক্স দেখিয়েছেন, মিথেন গ্যাস (CH_4) এবং অ্যামোনিয়ার (NH_3) মধ্যে যখন যথোপযুক্ত তাপমাত্রায় ও চাপে বিক্রিয়া সংঘটিত হয়, তখন একাধিক অ্যামিনো অ্যাসিড একসঙ্গে সংশ্লেষিত হয়ে থাকে। এরপর অ্যামিনো অ্যাসিডের একটি উপযুক্ত মিশ্রণ নির্বাচন করে যদি উচ্চ তাপমাত্রায় তিন-চার ঘণ্টা ধরে উত্তপ্ত করা যায়, তাহলে একটি পলিমার (Polymer) বা বহুগুণক অণুবিশিষ্ট পদার্থের সৃষ্টি হয়। এই পলিমারে প্রোটিনের বহু বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। একই উপায়ে প্রায় এক শতাব্দী আগে রসায়ন-বিজ্ঞানী বার্থেলো (Berthelo) ফস্‌ফরিক অ্যাসিডের সান্নিধ্যে গ্লু-

গ্লোজকে (Glucose) উত্তপ্ত করে ডেক্সট্রিন (Dextrin) প্রস্তুত করেছিলেন। ডেক্সট্রিন হচ্ছে একটি কার্বোহাইড্রেট। মানুষের খাদ্য প্রস্তুতের জন্যে এই বিক্রিয়া এখনও পর্যন্ত কাজে লাগানো হয় নি। তবে রসায়ন-বিজ্ঞানে আমাদের বর্তমান জ্ঞানের ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি, বার্থেলোর পদ্ধতি সম্পর্কে আরও ব্যাপক গবেষণা চালানো নিরর্থক হবে না। এমন কি, এই বিক্রিয়ার মূল উপকরণ গ্লুকোজ ও ফরমোজ বিক্রিয়ার (Formose reaction) সাহায্যে ফরম্যালডিহাইড থেকে সংশ্লেষণ করা যেতে পারে। এক শতাব্দীরও আগে 1861 সালে রসায়ন-বিজ্ঞানী বাটলরো (A. Butlerow) এই ফরমোজ বিক্রিয়া উদ্ভাবন করেন।

উদ্ভিজ্জ রঞ্জক, উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ বস্ত্রতন্তু, প্রকৃতিজ রাবার এবং সাবান প্রধানতঃ ভোজ্য চর্বি থেকে প্রস্তুত হয়। কিন্তু এখন এদের স্থান অধিকার করেছে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত পরিপূরক-গুলি। কৃত্রিম উপায়ে চর্বি, প্রোটিন এবং কার্বোহাইড্রেট প্রস্তুতের মৌলিক জ্ঞান বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই আয়ত্ত করেছেন। এখন যা প্রয়োজন, তা হলো খাদ্য-বিজ্ঞানীদের উপযুক্ত কারিগরী পদ্ধতি উদ্ভাবন—যার সাহায্যে সম্পূর্ণ সংশ্লেষিত খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করা সম্ভব হবে। তার এই সংশ্লেষিত খাদ্য প্রস্তুতের পথ প্রশস্ত হলে মানুষের ক্রমবর্ধমান খাদ্য-সমস্যায় প্রকৃতিজ খাদ্যদ্রব্যের পরিপূরক হিসাবে তা নিঃসন্দেহে অনেকখানি সহায়তা করতে পারবে।

অভিনব প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য

মার্কিন কৃষি-বিজ্ঞানীরা স্নেহজাতীয় পদার্থের মধ্যে দই ভেজে অতি উচ্চ প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য প্রস্তুত করেছেন। এই জিনিষটি খেতে অনেকটা মাংসের মত। অনেকক্ষণ ধরে ভাজলেও এর গুণাগুণের খুব একটা পরিবর্তন হয় না। তারপরে রুচি অনুযায়ী একে সুগন্ধিযুক্তও করা যেতে পারে। পৃথিবীর স্বল্পোন্নত রাষ্ট্রসমূহে অনুপূরক পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে এই জিনিষটি ব্যবহার করা যেতে পারে। দইয়ের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন আছে। তাহলেও দুধ ও দুগ্ধজাত অন্যান্য বস্তুর মধ্যে যে প্রোটিন থাকে, তার সঙ্গে দইয়ের প্রোটিনের পার্থক্য অনেক।

ওয়াশিংটনের মার্কিন কৃষি-গবেষণা কৃত্যকের পুষ্টি-বিভাগের রসায়ন-বিজ্ঞানী নোবল পি. ওং এবং ওয়েন ডব্লিউ. পার্কস এই নতুন খাদ্যবস্তুটি তৈরি করেছেন। তারা প্রথমতঃ মাখনতোলা দুধে সামান্য পরিমাণ ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড মিশিয়ে দই তৈরি করেন। তারপর সেই দইকে জ্বাল দেওয়া হয়। জল টেনে যাবার পর নামিয়ে ঐ জিনিসকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে কেটে নেবার পর সেই সকল খণ্ডকে ঘি প্রভৃতি স্নেহজাতীয় পদার্থে ভাজা হয়।

এই ভাজা দই জলের মধ্যে ডুবিয়ে হিমাধারে প্রায় দু-সপ্তাহ অবিকৃত রাখা যেতে পারে। আর বীজাণুমুক্ত করে ঘরের তাপমাত্রায় প্রায় তিন মাস রাখা চলে। এই খাদ্যবস্তুটিকে নিয়ে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হচ্ছে।

সবুজ বিপ্লব

দীর্ঘকাল অক্লান্ত গবেষণার ফলে তিন বছর পূর্বে মেক্সিকোতে অতি উচ্চ ফলনশীল গম উদ্ভাবিত হয়েছে। ভারত, পাকিস্তান ও এশিয়ার অন্যান্য দেশে এই গমের বীজ ব্যবহারের ফলে ফসলের উৎপাদন আশাতিরিক্ত হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এথেকেই 'সবুজ বিপ্লব' কথাটার উৎপত্তি। কৃষি-বিজ্ঞানী ডক্টর নরম্যান ই. বোরলগ এর উদ্গাতা। ধান, গম প্রভৃতি ছাড়াও উচ্চ ফলনক্ষম অন্যান্য শস্যাদি উৎপাদনের জন্যে আজ ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে যে সব ক্রিয়াপদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে, নিঃশব্দ বিপ্লবরূপে মেক্সিকোতে তার সূচনা হয়েছিল 20 বছরেরও আগে। 1943 সালে মেক্সিকো সরকারের আমন্ত্রণে ও রকফেলার ফাউণ্ডেশনের অর্থ-সাহায্যে মেক্সিকোর খাদ্য-সমস্যার সমাধানে ডক্টর বোরলগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার যৌথ প্রয়োগে উদ্যোগী হন। মেক্সিকোতে এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছিল কতকটা মন্থর গতিতে দীর্ঘ সময় ধরে।



পাঞ্জাবে কৃষকদের সঙ্গে সবুজ বিপ্লবের উদ্গাতা ডক্টর নরম্যান বোরলগ (বামে)।

মেক্সিকোর চাহিদা মেটাবার উপযোগী খাদ্যশস্য উৎপাদনে প্রায় 12 বছর অতিক্রান্ত হয়ে যায়। তারপর থেকেই মেক্সিকো গমের ব্যাপারে স্বয়ম্ভর তো বটেই, অন্যান্য প্রধান খাদ্যশস্যের ব্যাপারেও স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে।

1960 সালে রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি-সংস্থা ডক্টর বোরলগকে মরক্কো থেকে ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে কোথায় কতটা গম উৎপাদনের প্রয়োজন, সে বিষয়ে সমীক্ষার কাজ চালাতে অনুরোধ করেন। এই ব্যাপারে বহু দেশ সফর করবার সময় তিনি ঐ বিষয়ে বহুবিধ তথ্যাদি সংগ্রহ করেন।

1964 সালে মেক্সিকো থেকে অল্প পরিমাণ বীজ আমদানী করা হয় ভারতের গবেষণা কেন্দ্রগুলিতে পরীক্ষার জন্যে। পরের বছর আমদানী করা হয় আরও বেশী পরিমাণে। দু-বছর পরীক্ষা চালাবার পর ভারত সরকার প্রচুর বীজ আনাবার ব্যবস্থা করেন। এর ফলেই খাদ্যোৎপাদন অসম্ভব রকম বেড়ে যায়। গত তিন বছরে ভারত, পাকিস্তান ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে উচ্চ ফলনশীল ধান, গম প্রভৃতি ছাড়াও উচ্চ ফলনশীল রবিশস্যাদি উৎপাদনেও উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে। তাছাড়া আফগানিস্তান, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, কোরিয়া, মালয়, মরক্কো, থাইল্যাণ্ড, টিউনিসিয়া ও তুরস্ক প্রভৃতি দেশেও উচ্চ ফলনশীল রবিশস্যাদি উৎপাদনে অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে। বিশ বছর অক্লান্ত সাধনার ফলে মেক্সিকো আজ গম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে এবং এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশেও উচ্চ ফলনক্ষম গম উৎপাদনে প্রেরণা জোগাচ্ছে। অতি উচ্চ ফলনশীল গম উদ্ভাবনের জন্যে ডক্টর বোরলগকে 1970 সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার দানে সম্মানিত করা হয়েছে।

ভারতে বর্তমানে প্রতি বছর 4% হারে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ছে, সেই সঙ্গে লোকসংখ্যা বাড়ছে বছরে 2·5% হারে। যে হারে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার মোকাবেলা করা সম্ভব না হলে কেবল উচ্চ ফলনশীল শস্যাদি উৎপাদনেই খাদ্য-সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব নয়। তাছাড়া কেবল উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজ হলেই হবে না, উপযুক্ত পরিবেশ (আবহাওয়া ইত্যাদি), উপযুক্ত সার, সংরক্ষণ ও কীটঘ্ন ঔষধাদির যথোপযুক্ত ব্যবস্থা হলেই তবে সবুজ বিপ্লব সার্থকতার পথে দ্রুত অগ্রসর হতে পারবে।

পাঞ্জাবে সবুজ বিপ্লব অর্থাৎ গমের উৎপাদন অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেছে। এমন কি, মেক্সিকো 'বামন গমের' সাহায্যে ভারত 5 বছরে যা উৎপাদন করেছে, সেই লক্ষ্যে পৌঁছুতে মেক্সিকোতেও 15 বছর লাগতো। গবেষণার ফলে প্রচুর ফলনশীল বীজের উৎপাদন এবং ব্যাপকভাবে সেই বীজের ব্যবহারে পাঞ্জাব এবং তার দেখাদেখি উত্তর ভারতের অনেক জায়গায় গমের ফলনের পরিমাণ বিস্ময়করভাবে বেড়ে গেছে। ফলে আমাদের দেশে হালআমলে গমের উৎপাদনের দিক থেকে একটা যে বিপ্লব সাধিত হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। অবশ্য এই সবুজ বিপ্লব এখনও আমাদের সম্পূর্ণ করায়ত্ত হয় নি। বিদেশ থেকে (পি. এল. 480) এখনও আমাদের গম আনতে হচ্ছে এবং দেশের দুর্দিনের আশঙ্কায় তা মজুদ করে রাখতে হচ্ছে।

নতুন ধরণের ভুট্টা ও গম প্রভৃতি শস্য উৎপাদনের ফলে বিভিন্ন দেশে সবুজ বিপ্লবের সূচনা হয়। 1963 সালে ভারত রকফেলার ফাউণ্ডেশনকে অনুরোধ করেন ডক্টর বোরলগকে এদেশে পাঠাতে। তিনি ভারতে এক মাস অতিবাহিত করে মেক্সিকো জাতের গম এদেশে রোপণের অভিমত প্রকাশ করেন। এই নতুন ধরণের গমের চাষ ইতিমধ্যেই ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, তুরস্ক, ইস্রায়েল, জর্ডন, টিউনিশিয়া, সুদান, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশে হয়েছে—বিশেষ

করে ভারত, পাকিস্তান ও মেক্সিকোতে এই ধরণের গম ও ভুট্টার চাষ করে যে পরিমাণ ফসল পাওয়া গেছে, সেই পরিমাণ ফসল অন্য জাতের ভুট্টা ও গম চাষ করে এর আগে আর কখনও পাওয়া যায় নি।

বেশী ফলনের জন্যে সারের সঙ্গে দরকার উন্নত জাতের বীজ। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উদ্ভাবিত সঙ্কর জাতের বীজ কৃষিতে বিপ্লব এনে দিয়েছে। এগুলির সার গ্রহণের ক্ষমতা যেমন বেশী, তেমনি বিশেষ বিশেষ আবহাওয়া ও পরিবেশের উপযোগী করে তৈরি করাও সম্ভব। উন্নত ধরণের বীজ নিয়ে গবেষণা ও উৎপাদনের জন্যে 1960 সালে ন্যাশন্যাল সীড কর্পোরেশনের সৃষ্টি হয়েছে। এরা ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচার রিসার্চ ইনষ্টিটিউশনের সহযোগিতায় ও আমেরিকার সহায়তায় অনেক নতুন জাতের সঙ্কর বীজ তৈরি করেছেন। জয়া, পদ্মা, গঙ্গা—101, 233-রঞ্জিত, ডেকান, হিমালয়-123 প্রভৃতি ভুট্টার বীজ, সি. এস. এইচ-1 ও 2 জোয়ার, এইচ. বি-1 বজরা, সোনারা গম-64, লারসা রোজো-64 ও সরবতী সোনারা গম, এ. ডি. টি-27, তাইচুং নেটিভ-1, তাইনান-3, আই. আর.-7 ও 8 ধান, অ্যাসিরিয়া মিটুণ্ডে বাদাম, পুসা সাওয়ানি ঢ্যাড়স এবং নেগেভিল ছোলা ইত্যাদি বহু রকমের সঙ্কর বীজ নিয়ে গবেষণা চলছে। তাছাড়াও এই কর্পোরেশন পুসা রুবি টোম্যাটো, পুসা পার্পল বেগুন, পুসা কাট্‌কি ফুলকপি, পুসা লঙ্কা প্রভৃতি নতুন জাতের উচ্চ ফলনক্ষম সব্‌জীর বীজও তৈরি হয়েছে। ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচার রিসার্চের তত্ত্বাবধানে উন্নত ধরণের আম, শসা, লেবু, আঙুর, পেয়ারা, আনারস ও আপেলের বীজ উৎপাদনের কাজও চলছে। বেশী ফলন ছাড়াও অন্যান্য উৎকর্ষ আনবারও চেষ্টা হচ্ছে। রন্টগেন রশ্মি প্রয়োগে অধিকতর প্রোটিনসমৃদ্ধ গমের বীজও তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া পারমাণবিক রশ্মি প্রয়োগেও অধিক ফলনশীল উন্নত জাতের ধান, গম, বার্লি, সয়াবিন, পীচ প্রভৃতির উন্নত ধরণের বীজ উৎপাদন করা হয়েছে। উন্নত বীজের সুফল একটা উদাহরণ থেকেই বোঝা যাবে—উপযুক্ত সার প্রয়োগে তাইচুং নেটিভ 1 ধান হেক্টর প্রতি প্রায় 6000 কেজি পাওয়া গেছে, যেখানে প্রচলিত জাতের বীজ থেকে পাওয়া যেত 700 থেকে 1000 কেজি মাত্র।

কেবল ফলন বৃদ্ধি পেলেই সমস্যার সমাধান হবে না—উপযুক্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থা ও বিলিব্যবস্থার প্রয়োজন। হরিয়ানার রেওয়া বাজারে গম বিক্রয় করতে এসে চাষীরা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে। চাষীরা এবার প্রচুর গম ফলিয়েছে। উটের পিঠে চাপিয়ে সেই গম তারা বাজারে বিক্রয়ের জন্যে নিয়ে আসছে। প্রতিদিন গমের বস্তায় বাজার ছেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যে পরিমাণ গম আসছে, তার তুলনায় খরিদ্দারের অভাব। ব্যাপারী ও ফড়েরা গমের যে দাম দিতে চাইছেন, তাতে চাষীরা হতাশ হয়ে পড়েছে। যে গমের জন্যে গত বছর কুইন্টাল পিছু 84 টাকা দাম পাওয়া গেছে, এবার তার জন্যে কুইন্টাল পিছু 60 টাকার বেশী দাম উঠছে না। আরও আশ্চর্য খবর এই যে, নির্ধারিত মূল্যে বাজার থেকে গম কিনে নিয়ে যাবার জন্যে চণ্ডীগড়ে ফুড কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়ার অফিসে খবর পাঠানো হয়েছিল। এর উত্তরে জানানো হয়েছে, ফুড কর্পোরেশন ঐ গম কিনতে উৎসুক নয়। অথচ বেশী ফসল উৎপন্ন করে পড়্‌তি বাজার দরের ধাক্কায় চাষীরা যাতে মার না খায়, সে জন্যে ফসলের নিম্নতম দাম বেঁধে দেওয়া আছে এবং ফুড কর্পোরেশনের এই দামে ফসল কিনে বাজার দর ঠিক রাখবার কথা। অধিক ফসল উৎপাদনে উৎসাহ দেওয়া যেখানে সরকারী নীতি, সেখানে বাস্তবে তার বিপরীত কাজেই করা হচ্ছে।

বর্তমানে কৃষি পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতি ঘটছে। একে বলা হয় সবুজ বিপ্লব।

এর মূলে যে ক'জন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী রয়েছেন, তাঁদেরই অন্যতম হচ্ছেন নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত ডক্টর নরম্যান আর্নেষ্ট বোরলগ। দূরপ্রাচ্য ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যে অতিরিক্ত ফলনশীল ধান উদ্ভাবিত হয়েছে, তাও বোরলগ কর্তৃক এই নব উদ্ভাবিত গম উৎপাদনের কার্যপদ্ধতি অনুসরণেরই ফল। ভারত, নেপাল, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, সুদান, ইজরায়েল প্রভৃতি রাষ্ট্র এই ধরণের গম ও ধান চাষ করে খুবই লাভবান হয়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের বেঁচে থাকবার জন্যে খাদ্যশস্যের উপরই নির্ভর করতে হয়। প্রোটিনসমৃদ্ধ সুষম খাদ্য সংগ্রহ তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। কিন্তু কার্বন, হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেনের সমবায়ে গঠিত প্রোটিনের অন্যতম উপাদান লাইসিন নামে এক প্রকার অ্যামিনো অ্যাসিড দেহের পুষ্টির পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। ডক্টর বোরলগ বর্তমানে এই ধরণের অ্যামিনো অ্যাসিড বা প্রোটিনসমৃদ্ধ ভুট্টা উৎপাদনে ব্যাপৃত রয়েছেন। তিনি মেক্সিকোর আন্তর্জাতিক গম ও ভুট্টা উন্নয়ন কেন্দ্রের (International maize and wheat improvement centre) ডিরেক্টর। তাঁর ধারণা, আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই এই নূতন ধরণের অতি পুষ্টিকর ভুট্টা উৎপাদন সম্ভব হবে। খাদ্যশস্যে সাধারণতঃ প্রোটিনের অন্যতম মূল উপাদান অ্যামিনো অ্যাসিড, লাইসিন থাকে না বললেই হয়।

তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, অপেক-2 নামে একজাতীয় ভুট্টার মধ্যে অন্যান্য খাদ্যশস্যের তুলনায় বেশী পরিমাণে লাইসিন রয়েছে। অপেক-2 জাতীয় ভুট্টার উৎপাদন খুব কম হয়ে থাকে এবং কীট পতঙ্গের দ্বারা অনেক বেশী আক্রান্ত হয়। এই কেন্দ্রের গবেষকদের ধারণা, অপেক-2 জাতীয় ভুট্টা এবং অন্য জাতীয় ভুট্টার সংমিশ্রণে তাঁরা লাইসিন-সমৃদ্ধ অতি উচ্চ ফলনশীল এক-প্রকার অভিনব ভুট্টা উৎপাদনে সক্ষম হবেন। কীট-পতঙ্গ এদের নষ্ট করবে না। প্রোটিন-সমৃদ্ধ খাদ্যের অভাব পূরণে এই জাতীয় ভুট্টা খুবই সহায়ক হবে।

বিশ্বের খাদ্যাভাব দূরীকরণে যাঁরা প্রয়াসী হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য হচ্ছেন এই একনিষ্ঠ বিজ্ঞানী। তিনি সবুজ বিপ্লব সম্বন্ধে বলেছেন—গতি পরিবর্তিত হয়েছে, আমরা কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধে জয়লাভ করেছি, কিন্তু বৃহৎ যুদ্ধে এখনও বিজয়ী হতে পারি নি।

এশিয়ার বিভিন্ন দেশে কম-বেশী সবুজ বিপ্লবের কর্মপদ্ধতি অনুসরণের ফলে চাল উৎপাদনের মোটামুটি বিবরণ ('ডেপ্‌থ্‌ নিউজ, 12.6.71 থেকে সংগৃহীত) দেওয়া হলো।

এশিয়ার চাল উৎপাদনকারী দেশগুলিতে 1970 সালে চালের ফলন বৃদ্ধির যে লক্ষণ দেখা গিয়েছিল, 1971 সালেও তা বজায় আছে।

রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এখন এই বলে হুঁসিয়ার করে দিয়েছে যে, এই দেশগুলিতে অত্যধিক উৎপাদনে একাধিক সমস্যা দেখা দিয়েছে। সমস্যাগুলি হলো—পড়তি বাজার দর ও রপ্তানীর জন্যে রেষারেষি। চালের রপ্তানী মূল্যের যে সূচক সংখ্যা এই সংস্থা প্রস্তুত করেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, 1967 সালের ডিসেম্বর মাসে এই সূচক সংখ্যা ছিল 123 এবং 1970 সালের অগাষ্ট মাসে এই সংখ্যা কমে গিয়ে 106-এ এসে দাঁড়িয়েছে।

দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রেকর্ড উৎপাদনের ফলে জাপান এখন চাল আমদানীকারী দেশ থেকে চাল রপ্তানীকারী দেশে পরিণত হয়েছে এবং 1970 সালের মধ্যে চাল রপ্তানীর আন্তর্জাতিক বাজারে জাপানের অংশ শতকরা পাঁচ ভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। আগে অনুমান করা হয়েছিল যে, এই বছর জাপানের মোট 70 লক্ষ টন চাল উদ্বৃত্ত হবে। আসলে দেখা যাচ্ছে, উদ্বৃত্তের পরিমাণ 80 লক্ষ টন। জাপান সরকার এই বিপুল পরিমাণ

চাল নিয়ে কি করবেন, ভেবে পাচ্ছেন না এবং ভবিষ্যতের জন্যে চালের ফলন কমাবার চেষ্টা করছেন। ধান চাষ না করে অন্য ফসল বুনলে জাপানী চাষীরা সরকারের কাছ থেকে এই ক্ষতিপূরণ বাবদ 150 কোটি টাকা পাবেন। তাদের লক্ষ্য হচ্ছে 3 লক্ষ 54 হাজার হেক্টার ধান-জমিকে অন্য কাজে লাগানো।

ব্রহ্মদেশ, কাম্বোডিয়া, থাইল্যাণ্ড, পাকিস্তান ও চীন—এশিয়ার এই পাঁচটি দেশ থেকে রপ্তানী করবার মত উদ্বৃত্ত চাল রয়েছে 36 লক্ষ 15 হাজার টন; অর্থাৎ জাপানের উদ্বৃত্ত সমেত মোট 1 কোটি 16 লক্ষ 15 হাজার টন চাল রপ্তানীর অপেক্ষায় রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইটালী, ব্রেজিল, অষ্ট্রেলিয়া ও সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র যে চাল রপ্তানী করে, সেটা যদি হিসাবে ধরা হয়, তাহলে এই অঙ্কটা আরও অনেক বেশী হবে, অথচ আশেপাশের যে সব দেশ চাল রপ্তানী করে, তাদের চাহিদা 31 লক্ষ 14 হাজার টনের বেশী নয়।

1970 সালে এফ. এ. ও-র (F.A.O.) চাল সংক্রান্ত রিপোর্টে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে চালের অত্যধিক উৎপাদনের সমস্যাটা সংক্ষেপে এভাবে দেখানো হয়েছে—

থাইল্যাণ্ড—চাল রপ্তানীর পরিমাণের দিক থেকে এই দেশের স্থান পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয়—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরেই। গত বছরের তুলনায় এবার তার চালের উৎপাদন দশ লক্ষ টনের বেশী বেড়েছে। 1969 সালে তার চালের উৎপাদন (1 কোটি 34 লক্ষ 10 হাজার টন) পূর্বেকার রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে এবং তার রপ্তানীযোগ্য চালের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে 15 লক্ষ টন। থাইল্যাণ্ডের চালের প্রধান প্রধান বাজার হচ্ছে সিঙ্গাপুর, ভারতবর্ষ, মালয়েশিয়া, হংকং ও জাপান।

চীন—যতটুকু খবর জানা যায়, তাতে প্রকাশ যে, 1969 সালে চীনে চালের উৎপাদন আগের বারের তুলনায় 46 লক্ষ টন বৃদ্ধি পেয়ে সাড়ে নয় কোটি টনে এসে দাঁড়িয়েছে এবং 1970 সালে উৎপাদনের অঙ্ক আরও বৃদ্ধি পেয়ে 9 কোটি 60 লক্ষ টনে এসে পৌঁচেছে। 1969 সালে চীন 7 লক্ষ 30 হাজার টন চাল রপ্তানী করেছে। খাদ্য ও কৃষি সংস্থার অনুমান, এই বছরেও চীনের রপ্তানী করবার মত চাল একই পরিমাণের হবে। জাপান চীন থেকে চাল আমদানী বন্ধ করায় 1968 সাল থেকে সে দেশের রপ্তানীর পরিমাণ দুই লক্ষ টন কমে গেছে।

ব্রহ্মদেশ—1968 সালের রেকর্ড ফলনের তুলনায় কিছু কম (79 লক্ষ 96 হাজার টন) উৎপাদন হয়েছে। রপ্তানীর জন্যে রাখা হয়েছে সাড়ে সাত লক্ষ টন।

কাম্বোডিয়া—রেকর্ড উৎপাদন। মোট উৎপাদন 36 লক্ষ টন। রপ্তানীর অপেক্ষায় আছে সাড়ে চার লক্ষ টন।

পাকিস্তান—1969 সালে রেকর্ড উৎপাদন 2 কোটি 13 লক্ষ টন। রপ্তানীর জন্যে ছিল 1 লক্ষ 85 হাজার টন। বাংলা দেশে অশান্তির ফলে এই বছর ও পরের বছরে চাল আমদানী করতে হতে পারে।

তাইওয়ান—ধানের জমি অন্য কাজে লাগিয়ে তাইওয়ান তার চাল রপ্তানীর পরিমাণ কমিয়ে ফেলছে। 1969 সালে মাত্র 39 হাজার টন রপ্তানী করেছে। এটা আগের বছরের তুলনায় এক ষষ্ঠাংশ মাত্র। 1969 সালে তার চাল উৎপাদনের পরিমাণ ছিল 30 লক্ষ 41 হাজার টন। এটা তার নিজের চাহিদা মেটাতেই লেগে যাবে

অন্য দিকে রাশিয়ার চাল আমদানীকারী দেশগুলির চাহিদা একই আছে বা কমছে। দেশ অনুযায়ী হিসাবটা এই রকম—

ইন্দোনেশিয়া—চাল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল 1 কোটি 70 লক্ষ টন। হয়েছে 1 কোটি 66 লক্ষ টন। চাল আমদানীকারী দেশগুলির মধ্যে

প্রথম স্থান। এই বছরের চাহিদা সাড়ে ছয় লক্ষ টন।

দক্ষিণ কোরিয়া ও দক্ষিণ ভিয়েৎনাম—রেকর্ড ফলন সত্ত্বেও উভয়কেই 5 লক্ষ টন করে চাল আমদানী করতে হবে। 1969 সালে দক্ষিণ কোরিয়ার চালের উৎপাদন ছিল 57 লক্ষ টন, দক্ষিণ ভিয়েৎনামে 51 লক্ষ টন। 1970 সালেও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের চালের ফলন একই থাকবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এই দেশের চাল আমদানীর চাহিদা ইতিমধ্যে অর্ধেক হয়েছে এবং ত্রিশ বছরব্যাপী যুদ্ধ সত্ত্বেও অদূর ভবিষ্যতে এই দেশ চালের ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

হংকং—চিরকালই তাকে চাল আমদানী করতে হবে। গত দু-বছর ধরে তার চাহিদা তিন লক্ষ ত্রিশ হাজার টনের অঙ্কে স্থির হয়ে আছে। এই বছরেও সেটাই থাকবার সম্ভাবনা। খাদ্য ও কৃষি সংস্থার রিপোর্টে বলা হয়েছে, অধিবাসীদের আয় ও জীবনযাত্রার মান বেড়ে যাবার ফলে সরেস জাতের চালের চাহিদা বাড়তে পারে।

ভারতবর্ষ—ফলন 6 কোটি 6 লক্ষ টন। আমদানীর চাহিদা তিন লক্ষ টন। 1969 সালে ছিল 12 লক্ষ 87 হাজার টন।

ফিলিপাইন—1968 সালে চাল রপ্তানী করেছিল। চালের ফলন বেড়ে 1969 সালে 49 লক্ষ 97 হাজার টন ও 1970 সালে 58 লক্ষ 44 হাজার টন হওয়া সত্ত্বেও এই বছরের মাঝামাঝি থাইল্যাণ্ড, জাপান ও তাইওয়ান থেকে 1 লক্ষ 10 হাজার টন আমদানী করতে হয়েছে।

সিংহল—14 লক্ষ টন ফলন হওয়া সত্বেও তিন লক্ষ টন চাল আমদানী করতে হচ্ছে।

মোটের উপর এশিয়ার দেশগুলি একে একে সবাই চালের ব্যাপারে স্বয়ং নির্ভরশীল হয়ে ওঠবার আশা করছে। এই বছরের মাঝামাঝি নাগাদ ভারত, 1972 সালের মধ্যে মালয়েশিয়া, বড় জোর 1974 সাল নাগাদ ইন্দোনেশিয়া, 1975 সাল নাগাদ দক্ষিণ কোরিয়া চাল উৎপাদনের ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ওঠবার সম্ভাবনা আছে।

"বড়ো অরণ্যে গাছতলায় শুকনো পাতা আপনি খসে পড়ে, তাতেই মাটিকে করে উর্বরা। বিজ্ঞানচর্চার দেশে জ্ঞানের টুকরো জিনিষগুলি কেবলি ঝরে ঝরে ছড়িয়ে পড়ছে। তাতে চিত্তভূমিতে বৈজ্ঞানিক উর্বরতা জীবধর্ম জেগে উঠতে থাকে। তারি অভাবে আমাদের মন আছে অবৈজ্ঞানিক হয়ে। এই দৈন্য কেবল বিদ্যার-বিভাগে নয়, কাজের ক্ষেত্রেও আমাদের অকৃতার্থ করে রাখছে।"

রবীন্দ্রনাথ

ভারত মহাসাগর সম্পর্কিত গবেষণা

শঙ্কর চক্রবর্তী

সুদীর্ঘ কাল ভারত মহাসাগর ছিল পৃথিবীর একটি বিরাট রহস্যাবৃত অঞ্চল। প্রশান্ত ও আটলান্টিক—পৃথিবীর এই দুটি বৃহত্তম মহাসাগর সম্বন্ধে সমুদ্র-বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন অনুসন্ধানকার্যের মধ্য দিয়ে বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। এমন কি, উত্তর ও দক্ষিণ মেরুসাগরে বিভিন্ন অভিযানের মধ্য দিয়ে সেখানকার বেশ কিছু রহস্যও উদ্‌ঘাটিত হচ্ছিল। কিন্তু ভারত মহাসাগররূপী তৃতীয় বৃহত্তম মহাসাগরটি ছিল অনাবিষ্কৃত। ফলে অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যের মত এখানকার আবহাওয়া সংক্রান্ত জ্ঞানও ছিল নিতান্তই অসম্পূর্ণ। এই মহাসাগরের তীরবর্তী দেশগুলির আবহাওয়ার পূর্বাভাসও স্বভাবতঃই ত্রুটিপূর্ণ থেকে যেত।

ভারত মহাসাগরের মোট আয়তন হলো 4 কোটি 48 লক্ষ বর্গ কিলোমিটার—পৃথিবীর মোট আয়তনের এক-সপ্তমাংশ। এর তীরবর্তী দেশগুলিতে পৃথিবীর মোট অধিবাসীর এক-চতুর্থাংশের বাস। এই দেশগুলির জনসংখ্যা যেমন ক্রমবর্ধমান, তেমনি খাদ্য উৎপাদনের ব্যাপারেও এরা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। এদের ক্ষেত্রে খাদ্যের সম্ভাবনাপূর্ণ একটি নতুন এলাকার অনুসন্ধান ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্রোটিন খাদ্যের ভাণ্ডাররূপে ভারত মহাসাগর স্বভাবতঃই ছিল এজাতীয় একটি এলাকা।

আন্তর্জাতিক ভারত মহাসাগর অভিযান

1957 থেকে 1958 সাল—এই এক বছরব্যাপী আন্তর্জাতিক ভূপদার্থতাত্ত্বিক বছরের কার্যক্রমের সাফল্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীদের বিপুলভাবে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করেছিল। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে তাঁরা পৃথিবী-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়, মহাকাশ এবং সূর্যদেহজাত বিভিন্ন ঘটনা সম্বন্ধে বিপুল তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। এই আন্তর্জাতিক কর্মপ্রচেষ্টাকে তাঁরা ভারত মহাসাগরের সামগ্রিক অনুসন্ধানের কাজে নিয়োগের জন্যে উৎসাহী হয়ে উঠলেন।

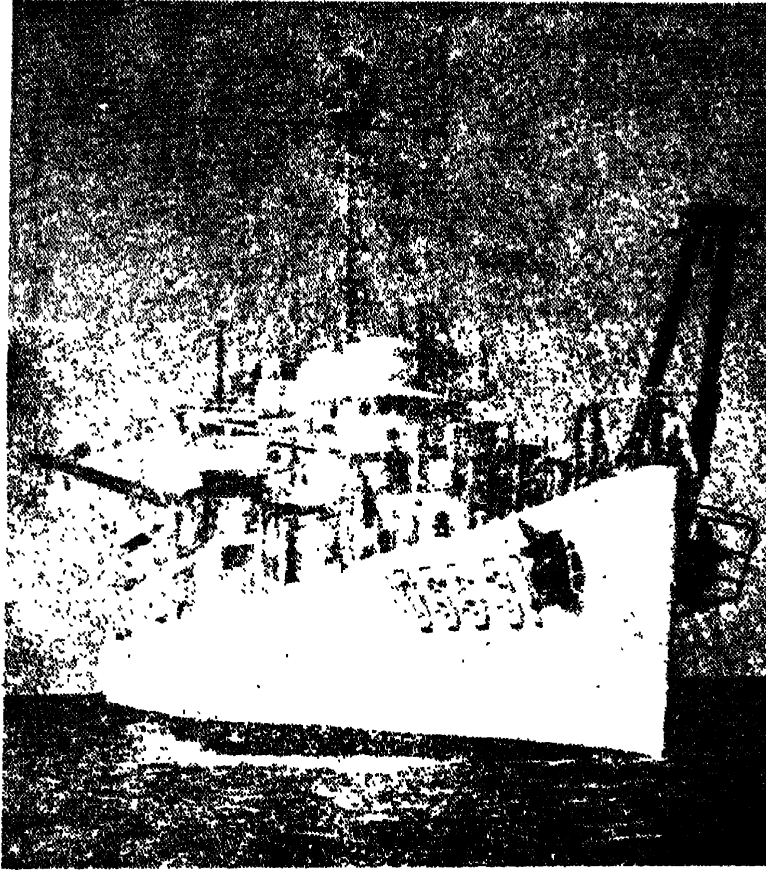
1961 সালে ইউনেস্কোর (UNESCO) উদ্যোগে আন্তর্জাতিক ভারত মহাসাগর অভিযানের (International Indian Ocean Expedition) কার্যক্রম সুরু হলো। এই অভিযানের বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার কর্মসূচীর মধ্যে ছিল—ভারত মহাসাগরের বিভিন্ন সমুদ্রস্রোত এবং বায়ুস্রোতের পর্যবেক্ষণ এবং সঠিক গতিপথ নিরূপণ, সাগর ও বায়ুমণ্ডলের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ও বস্তুবিনিময় সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ, সাগরে বিভিন্ন প্রাণিজ সম্পদের রাসায়নিক গঠন ও পরিমাণ নির্ণয় এবং ভারত মহাসাগরের তলাবর্ত (Submarine topography) ও উপকূলভাগের গঠনবিন্যাস, মহীসোপান (Continental shelf) ও মহাদেশের ঢাল (Continental slope) সম্বন্ধে সুবিস্তৃত অনুসন্ধান কাজ পরিচালনা।

এছাড়াও বিভিন্ন জ্ঞাতব্য প্রশ্ন ছিল। যেমন—প্রশান্ত, আটলান্টিক এবং ভারত—এই তিনটি মহাসাগরের তলাবর্তের গঠন কি অভিন্ন? প্রশান্ত মহাসাগরের অনুরূপ ভারত মহাসাগরেও কি নিরক্ষীয় সমুদ্রস্রোতের একটি বিপরীতমুখী স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে? মৌসুমী বায়ু এবং ক্রান্তীয় অঞ্চলের ঝড়-তুফানগুলিরই বা কি ভাবে সৃষ্টি হচ্ছে?

ভারতের উপকূলভাগের দৈর্ঘ্য প্রায় 4800 কিলোমিটার এবং ভারত মহাসাগরের তীরবর্তী

প্রধান দেশরূপে ঐ মহাসাগরের গবেষণাসংক্রান্ত প্রতিটি কার্যক্রমের সঙ্গে ভারতের সংযুক্ত হয়ে পড়া ছিল খুবই স্বাভাবিক। ভারতসহ 32টি দেশ এই আন্তর্জাতিক তথ্যানুসন্ধান অভিযানে অংশগ্রহণ করে। প্রায় দু-ডজনের মত গবেষণাকারী জাহাজ এই তথ্য সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত হয়। ওয়াশিংটন, মস্কো এবং বোম্বাইতে একটি করে আবহাওয়া কেন্দ্র এবং কোচিনে একটি প্রাণিবিজ্ঞা-সংক্রান্ত গবেষণা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। 1961 থেকে 1965 সালব্যাপী এই কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে যে বিপুল পরিমাণ তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল, তার বিশ্লেষণের কাজ আজও চলেছে।

ভারত মহাসাগরসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা সমুদ্র-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার জন্যে যে কর্মসূচীটি গ্রহণ করেছিলেন, তার পর্যবেক্ষণের এলাকা ছিল আরব সাগর এবং বঙ্গোপসাগর—নিরক্ষীয় অঞ্চল ছিল মোটামুটিভাবে এর দক্ষিণ প্রান্ত। সামগ্রিক অনুসন্ধান কাজের মধ্য দিয়ে ভারত মহাসাগর সম্বন্ধে যা জানা গিয়েছিল, তারই কিছু তথ্য নিয়ে আমরা আলোচনা করবো।



আমেরিকার সমুদ্র-গবেষণাকারী জাহাজ পায়োনিয়ার।

মহাসাগরের তলাবস্থা

আমেরিকার সমুদ্র-গবেষণাকারী জাহাজ পায়োনিয়ার এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের ভিতিয়াজ ভারত মহাসাগরের গর্ভে গ্রীনীচের পূর্বে 90 ডিগ্রী মধ্যরেখা বরাবর 4800 কিলোমিটার দীর্ঘ ও 1500

থেকে 3000 মিটার উঁচু একটি বিরাট সরলরেখাকৃতি পর্বতমালার সন্ধান লাভ করেছিল। পরে দেখা গেল, ঠিক সরলরেখা নয়, অনেকটা সারিবদ্ধ সমান্তরাল ভাঙাভাঙা শিলাস্তূপের সমবায়ে এটি গড়ে উঠেছে। এই পর্বতমালাটির বিভিন্ন তথ্য সমুদ্রতলের বিস্তার সংক্রান্ত তত্ত্বটিকেই নাকি জোরদার করে তুলছে। এই তত্ত্বটি আবার চলমান মহাদেশ (Continental drift) ধারণাটির সঙ্গে যুক্ত, যে ধারণার মোদ্দা কথা হলো, বর্তমানে 10 থেকে 15 কোটি বছর আগে ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, অ্যান্টার্কটিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকা গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড নামে একটি মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড ভেঙ্গে যাবার সময়, 20 কোটি বছর আগে সমুদ্রগর্ভে এক বিরাট ফাটলের সৃষ্টি হয় এবং ভারত মহাসাগরের তলবর্তী পর্বতমালাটির উদ্ভব ঐ সময়ের ক্রিয়াশীল মূল শক্তিগুলির সঙ্গে জড়িত। এই পর্বতমালার শিলাস্তূপ প্রতি বছর কয়েক সেন্টিমিটার করে নাকি মহাদেশের উপকূলভাগের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এই ধারণাটি অবশ্য কিছু তর্কের সৃষ্টি করেছে।

পৃথিবীর সবচেয়ে সমতল এলাকা সমুদ্রগর্ভের সমভূমিগুলি। ভারত উপমহাদেশ যথাক্রমে 34000 ও 51000 মিটার সমুদ্রগর্ভে অবস্থিত এই জাতীয় দুটি সমতল ক্ষেত্রের দ্বারা বেষ্টিত। একটি রয়েছে আরব সাগরে—সিন্ধু নদের দ্বারা সৃষ্ট; অপরটি বঙ্গোপসাগরে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের দ্বারা গড়ে উঠেছে। এদের গঠনের মূলে রয়েছে Turbidity current—কাদা, মাটি এবং অন্যান্য বস্তু যে প্রবাহ সমুদ্রের তলদেশের উপর গিয়ে বিপুলবেগে প্রবাহিত হয়ে থাকে। সমুদ্রগর্ভে ভূমিকম্পের ফলেও এই সব স্রোত প্রায়ই বিধ্বংসী হয়ে ওঠে।

1963 সালের মে মাসে আমেরিকান গবেষণামূলক জাহাজ অ্যানটন ব্রুনের সাহায্যে ভারতীয় ও মার্কিন বিজ্ঞানীরা অন্ধ্র প্রদেশের উপকূলের কাছে বিশাখাপত্তনমের উত্তরে তিনটি গভীর খাদ (Canyon) আবিষ্কারে সক্ষম হন। এদের গভীরতা 1300 থেকে 1500 মিটারের মত।

সমুদ্রে উধ্বর্মুখী জলস্রোত

ভারতের সমগ্র উপকূলভাগ থেকে সারা বছরে যে পরিমাণ মাছ ধরা হয়, তার দুই-তৃতীয়াংশ সংগৃহীত হয় পশ্চিম উপকূল থেকে। এথেকে স্বভাবতঃই প্রমাণিত হচ্ছে, আরব সাগরে মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ বঙ্গোপসাগরের তুলনায় বেশী। এই ঘটনাটা কিভাবে ঘটছে, তার সঠিক বৈজ্ঞানিক কারণ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। অনেকের একটি মত হলো, সমুদ্রের গভীর প্রদেশ থেকে মাছের পক্ষে পুষ্টিকর পদার্থবাহিত জলস্রোত সমুদ্রপৃষ্ঠে এসে পৌঁছাবার ফলে এটা ঘটছে। আফ্রিকার উপকূলভাগ থেকে প্রবাহিত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে সোমালিল্যাণ্ডের কাছে জোয়ালো বায়ুস্রোত সমুদ্রপৃষ্ঠের জলরাশিকে উপকূলভাগ থেকে সরিয়ে দেয় এবং প্রায় 200 মিটার নীচের জলরাশি তাদের স্থান গ্রহণের জন্যে উপরে এসে হাজির হয়। এই জাতীয় ব্যাপারকে বলা হচ্ছে উধ্বর্মুখী জলস্রোত। এর অস্তিত্বের প্রমাণ মেলে জলের তাপমাত্রা নিরূপণের দ্বারা। নিরক্ষীয় অঞ্চলে সমুদ্রজলের তাপমাত্রা যেখানে 24 থেকে 27 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড, সেখানে উধ্বর্মুখী জলস্রোতের জন্যে নিরক্ষরেখার মাত্র পাঁচ ডিগ্রী উত্তরে জলের তাপমাত্রা হলো 18 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড।

মৌসুমী বায়ুতাড়িত উল্লিখিত বিরাট ও বিপুল জলস্রোত উত্তর-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে সোমালি-স্রোত নামে সমুদ্রবিদ্‌দের কাছে পরিচিতি লাভ করেছে। যে উধ্বর্মুখী জলস্রোত এর দ্বারা সৃষ্ট হচ্ছে, তা সমুদ্রের গভীর থেকে নাইট্রেট এবং ফস্‌ফেটজাতীয় পুষ্টি-উপাদানগুলিকে এনে

হাজির করছে সমুদ্রপৃষ্ঠে। এই ব্যাপারটা অনেকটা যেন পরবর্তী ফসল ফলানোর জন্যে জমি কর্ষণের মত একটা ব্যাপার। ঐ পুষ্টি-উপাদানগুলি সমুদ্রের উপরিভাগে এক বিপুল পরিমাণ উদ্ভিদকে বংশবিস্তারে সাহায্য করে—এককোষী শ্যাওলা (Algae) বা ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন হলো যার মধ্যে প্রধান। সমুদ্রের মৎস্যজাতীয় প্রাণীরাও এই উদ্ভিদগুলিকে আশ্রয় করে বিপুল পরিমাণে বেড়ে ওঠে।

প্রাণিজ সম্পদের সন্ধান

অনুসন্ধানের ফলে জানা গেছে, আরব সাগরের উপকূলভাগে বঙ্গোপসাগরের তুলনায় জলে ফস্‌ফেটের পরিমাণ প্রায় পাঁচগুণ বেশী। ভারতের মালাবার উপকূলে অনেক বেশী পরিমাণে মাছের উপস্থিতির মূলে উর্ধ্বমুখী জলস্রোত যেমন একটি কারণ, এছাড়া আরো কিছু কারণের সমবেত প্রভাব রয়েছে কিনা, এটা ভারতীয় বিজ্ঞানীরা জানতে চেয়েছিলেন। অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল সমুদ্রবিদ্ ওয়ালটেয়ারের উপকূলের কাছাকাছি একটি উর্ধ্বমুখী জলস্রোতের সন্ধান পেয়েছেন, তার ফলে বঙ্গোপসাগরে মাছের সংখ্যা বৃদ্ধি কি পরিমাণে ঘটেছে, তা অনুসন্ধান করছেন বিজ্ঞানীরা।

সমুদ্রের উপকূলভাগে অগভীর জলে মৎস্য-চাষের ক্ষেত্র (Aquatic farm) তৈরি করে উৎপাদন বৃদ্ধির উপায় নির্ধারণ করতে চেয়েছিলেন ভারতীয় বিজ্ঞানীরা। মালাবার উপকূলে সমুদ্রের প্রতি একর পরিমাণ এলাকায় 900 পাউণ্ড পরিমাণ মাছ উৎপন্ন হয়; কোচিন উপকূলে এর পরিমাণ হচ্ছে 1500 পাউণ্ড। বঙ্গোপসাগরের পূর্বভাগে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের কাছাকাছি প্রচুর পরিমাণ মাছের ঝাঁক মার্কিন জাহাজ অ্যানটন ব্রনের অনুসন্ধানে ধরা পড়ে। এই অঞ্চলটিও অদূর ভবিষ্যতে মৎস্যচাষের একটি বড় ক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারে।

আন্তর্জাতিক ভারত মহাসাগর অভিযানের সময় দেখা যায়, সমুদ্রের গভীরে 1000 মিটার অঞ্চলের মধ্যেই বেশীর ভাগ জৈব ফস্‌ফরাস অবস্থিত রয়েছে, শতকরা 75 ভাগ রয়েছে প্রথম 200 মিটারের মধ্যেই। এর নীচেকার যে অঞ্চল, সেখানে অজৈব ফস্‌ফেটের প্রাধান্য এবং জলে অক্সিজেনের পরিমাণও অতি সামান্য। ভারত মহাসাগরে এই জাতীয় বেশ কিছু নিম্নতম অক্সিজেনের এলাকা (Oxygen minimum zones) আবিষ্কৃত হয়েছে। এসব অঞ্চলে প্রাণিজ সম্পদ খুব বেশী পরিমাণে থাকে না। দক্ষিণ মেরু সাগরের জৈব এবং অজৈব পুষ্টি-উপাদান-সমৃদ্ধ জল কিছু পরিমাণে ভারত মহাসাগরের দক্ষিণ অঞ্চলে মিশ্রিত হয়, কিন্তু তা নিরক্ষীয় অঞ্চল পর্যন্ত এসে পৌঁছুতে পারে না। ভারত মহা-সাগরের উত্তর ভাগ স্থলবেষ্টিত এবং পৃষ্ঠভাগের লঘু, উষ্ণ জল মিশ্রণের কাজ সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত করে।

ভারতের উপকূলভাগে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হলে সারা দেশে প্রোটিন খাদ্যের চাহিদা অনেকখানি মিটবে। মাছের অবস্থানের এলাকাগুলিও ভালভাবে ছকে ফেলা দরকার। ভারতের সমুদ্র-গবেষক জাহাজ কঙ্ক কেরালার উপকূলের কাছে সমুদ্রের গভীর প্রদেশে বিপুল পরিমাণ কাঁকড়া ও গলদা চিংড়ির সন্ধান পেয়েছিল। বিজ্ঞানীদের হিসেব অনুযায়ী, বর্তমানে যে পরিমাণ প্রাণিজ সম্পদ ভারতের উপকূলভাগ থেকে সংগৃহীত হচ্ছে, তার পরিমাণ পাঁচগুণ বাড়ালেও বর্তমান সঞ্চয় বা মাছের প্রজননের ক্ষেত্রে কোন বিপর্যয় ঘটবার সম্ভাবনা নেই।

খনিজ সম্পদ

ভারতের মহীসোপান এবং মহাদেশের ঢাল অঞ্চলের আয়তন হলো 10 লক্ষ বর্গ কিলোমিটারের কাছাকাছি। এই বিরাট অঞ্চলের ভূবিদ্যাসংক্রান্ত

তথ্য খুবই সামান্য, একমাত্র পূর্ব উপকূলের মহীসোপান অঞ্চলে কিছু কিছু অনুসন্ধানের কাজ হয়েছে।

আন্তর্জাতিক ভারত মহাসাগর অভিযানের সময় ভারতের উপকূলভাগের মহীসোপান এবং মহাদেশের ঢাল অঞ্চলে খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন ভারতীয় বিজ্ঞানীরা। এই অঞ্চলে ইলমেনাইট, মোনাজাইট, ম্যাগ্নেটাইট এবং গারনেট জাতীয় ভারী খনিজ পদার্থ, ফস্ফোরাইট, ব্যারিয়াম, সিমেন্ট তৈরির কাজের উপযোগী চুনাপাথরের বালুকা এবং কাদার অস্তিত্বের সন্ধান ইতিপূর্বেই পাওয়া গিয়েছিল। অন্যান্য খনিজ পদার্থের অনুসন্ধানের কাজ তেমন বিস্তৃতভাবে করা হয় নি।

কেরালার উপকূলে কৃষ্ণ বালুকার (Black sand) যথেষ্ট সঞ্চয় রয়েছে। নদী যে সব পলি বহন করে নিয়ে এসে সমুদ্রে ঢেলে দেয়, তাই উপকূলের কাছে কৃষ্ণ বালুকার স্তূপরূপে জমা হতে থাকে। এই কৃষ্ণ বালুকা স্তূপের কিছু কিছু নমুনার মধ্যে মোনাজাইট, ইলমেনাইট এবং জারকন রয়েছে প্রচুর পরিমাণে, যাদের অর্থনৈতিক উপযোগিতা রয়েছে নানাভাবে। কেরালার কুইলনের উপকূলের কাছে কৃষ্ণ বালুকার সঞ্চয়ের মধ্যে প্রায় 1 কোটি 70 লক্ষ টন ইলমেনাইট, 10 লক্ষ টন রিউটাইল, 12 লক্ষ টন জারকন এবং 1 লক্ষ 20 হাজার টন মোনাজাইট রয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

ভারতের উপকূল থেকে দূরে সাগরের অভ্যন্তরে মোনাজাইটসমৃদ্ধ বালুকার অস্তিত্বের সম্ভাবনার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে, বিশেষ করে কেরালার উপকূলভাগের সমুদ্র অঞ্চলকেই বিজ্ঞানীরা এই জাতীয় একটি ক্ষেত্ররূপে বেছে নিয়েছেন।

ভারতের উপকূলভাগে জৈবিক খনিজ সম্পদের মধ্যে রয়েছে শামুক, প্রবাল এবং চুনাপাথর প্রভৃতি। কেরালার উপকূলভাগেই 17 থেকে 25 লক্ষ টনের মত চুনাপাথরের সঞ্চয় রয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জের লেগুনগুলিতে প্রায় 200 কোটি টনের মত চুনাপাথরের কাদা, বালুকা এবং স্তূপ রয়েছে। ভারতের পূর্ব উপকূলের মহীসোপান অঞ্চলেও শতকরা 50 ভাগ ক্যালসিয়াম কার্বনেটসমৃদ্ধ পলির সন্ধান পাওয়া গেছে।

সমুদ্রের গভীরে খনিজ সম্পদ আহরণের ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা কর্মসূচী গ্রহণ করতে চলেছেন। উত্তর আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের উপকূলের কাছে ফস্ফেটের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তূপের সন্ধান ইতিপূর্বেই পাওয়া গিয়েছিল। সোভিয়েট সমুদ্র-গবেষক জাহাজ ভিতিয়াজ বঙ্গোপসাগরের গভীর প্রদেশ থেকে ম্যাঙ্গানিজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তূপ সংগ্রহ করেছিল। সমুদ্রের গভীরে খনিজ সম্পদ সন্ধানের কাজ ব্যয়বহুল, তবে অর্থনৈতিক বিচারে যুক্তিযুক্ত হলে সে জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণে কোন বাধা নেই।

সমুদ্রে তেলের সন্ধান

ভারতের 3 লক্ষ বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত মহীসোপান অঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণে তেলের সঞ্চয় রয়েছে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। 1971 সালের 20শে মার্চ কাম্বে উপসাগরের ভিতরে সর্বপ্রথম ভারতের উপকূলের অনতিদূরে আলিয়াবেত (পশ্চিম) তৈলকূপে তেল পাওয়া গেছে। আন্তর্জাতিক ভারত মহাসাগর অভিযানের সময় 1963 সালে ভারতীয় সমুদ্র-গবেষক জাহাজ মহেন্দ্র থেকে বিশেষজ্ঞেরা যে প্রাথমিক ভূকম্পন সংক্রান্ত জরিপ করেছিলেন, তাথেকে প্রমাণিত হয়েছে, কাম্বের যে পালল অববাহিকায় বর্তমানে তেল আবিষ্কৃত হলো, তা সমুদ্রের অভ্যন্তর পর্যন্ত বিস্তৃত। 1964-66 সালে অ্যাকাডেমিক আর্খানগেলস্কি নামক বিশেষভাবে যন্ত্রীকৃত সোভিয়েট গবেষক জাহাজে যে ভূকম্পন সংক্রান্ত জরীপের অভিযান

পরিচালিত হয়েছিল, তার বিস্তৃত তদন্ত থেকেও একথা সমর্থিত হয়েছে। এই জরীপের সময়ে অনেকগুলি সম্ভাবনাপূর্ণ বড় তেলের কাঠামো আবিষ্কৃত হয়েছিল। এগুলির মধ্যে একটি হলো বম্বে হাই সেন্টি, যা 1200 বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত এবং পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম কাঠামো। এপর্যন্ত জমির উপরে একমাত্র গুজরাটের আংক্লেশ্বরে যে বিরাট তৈলক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, তার চেয়েও বম্বের কাঠামোটি অনেক গুণ বড়। করমণ্ডল উপকূলে, কারিকল ও কচ্ছের উপকূল অঞ্চলে এবং পক প্রণালীতে যে সব জরীপ করানো হয়েছিল, তাথেকে একথা বোঝা গিয়েছে যে, এখানে ভূখণ্ড থেকে সমুদ্রের অভ্যন্তরে মাইলের পর মাইল বিস্তৃত এরকম কাঠামো রয়েছে।

আরব সাগরের ভিতরে উপকূলের অনতিদূরে মহীসোপান অঞ্চলে বহুল পরিমাণে লভ্য মাইওসিন যুগের (পৃথিবীর বিবর্তনের সর্বশেষ পর্ব কেনোজোয়িকের একটি অধ্যায়, যে পর্ব সুরু হয়েছিল আজ থেকে 7 কোটি বছর আগে) শিলাতে যে প্রকৃতই তেল আছে, এই বছর আলিয়াবেতে ধরা-পড়া হাইড্রোকার্বনগুলি সমুদ্রের তলায় সেই লুকানো সম্পদের প্রথম নির্দিষ্ট খোঁজ দিল। এই জাতীয় অনুসন্ধান ভবিষ্যতে আরো ফলপ্রসূ হবে, সন্দেহ নেই।

আন্তর্জাতিক ভারত মহাসাগর অভিযানের সময় মৌসুমী বায়ুর গতি-প্রকৃতি, সমুদ্রগর্ভ থেকে তাপের প্রবহন প্রভৃতি বিষয়ে বহু গবেষণা পরিচালিত হয়েছে এবং মেঘলোকের আলোক-চিত্র গৃহীত হয়েছে ও সমুদ্রগর্ভের বিস্তৃত মানচিত্র রচিত হয়েছে। এই মহান আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক কর্মপ্রচেষ্টার কিছু কিছু সুফল আমরা ইতিমধ্যেই লাভ করেছি এবং ভবিষ্যতে যে আরো বেশী পরিমাণে সেটা সম্ভব হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

"আমাদের দেশে বিজ্ঞানশিক্ষা যে কতদূর প্রয়োজনীয় তাহা কি নূতন করিয়া বলিতে হইবে? প্রয়োজনীয় বলিলে বরং কম বলা হয়। বিজ্ঞান ব্যতীত আমাদের গতি নাই, রক্ষা নাই। * * * মনে করিও না, বিজ্ঞান হইতে কেবল অর্থলাভই হয়। সংসারে মানুষের বড় কে? মানুষের মনের চেয়ে বড় কি আছে? মানবমন বিজ্ঞান বলে মার্জিত, উন্নত ও শক্তিশালী হয়। সমাজনীতি, ধর্মনীতি সমস্তই নানাপ্রকারে বিজ্ঞানের নিকট ঋণী। তাই বলি, যদি বাঁচিতে চাও, সভ্য মানবমণ্ডলীর মধ্যে মুখ দেখাইতে চাও, বিজ্ঞানের সেবা কর।"

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

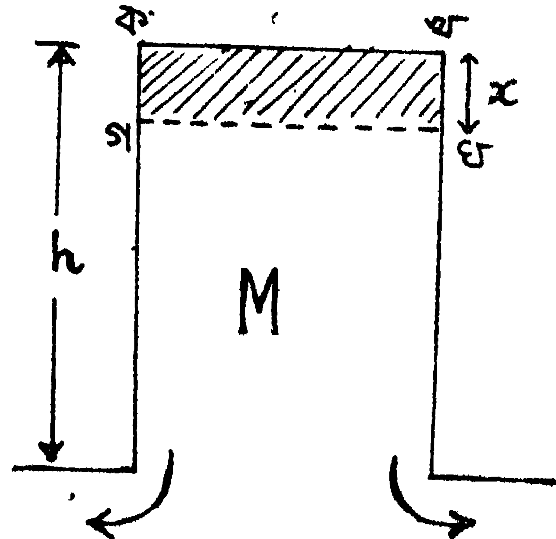
এভারেষ্টই কি সর্বোচ্চ পর্বত?

সমীরকুমার ঘোষ*

সারা পৃথিবীতে ছোট-বড় যে কত রকমের পাহাড়-পর্বত আছে, তার সঠিক হিসাব বলা শক্ত। কিন্তু কারো মনে যদি কখনো এরকম প্রশ্ন ওঠে যে, পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেষ্ট (29028 ফুট বা প্রায় 9 কিলোমিটার) কেন, তার চেয়েও কি উঁচু শৃঙ্গ হওয়া সম্ভব ছিল না!—তাহলে আপাতদৃষ্টিতে প্রশ্নটি হয়তো অনেকের কাছেই অযৌক্তিক বলে মনে হতে পারে। সমতলভূমি থেকে সুরু করে এভারেষ্টের মত উচ্চ শৃঙ্গ পর্যন্ত সব রকমের উচ্চতার পর্বতশৃঙ্গ যদি এই পৃথিবীতে হওয়া সম্ভব হয়, তবে এভারেষ্টের চেয়েও উঁচু পর্বতশৃঙ্গ না থাকাটা কি শুধুই এক আকস্মিক ব্যাপার! কিন্তু না, প্রমাণ করে দেখানো যেতে পারে যে, ঘটনাটা মোটেই আকস্মিক নয়। পৃথিবী যে ধরণের শিলা দিয়ে সাধারণতঃ গঠিত, সেই শিলার উপাদান, গঠন, প্রকৃতি এবং পৃথিবীর অভিকর্ষজ ত্বরণ ইত্যাদির জন্যে পৃথিবীপৃষ্ঠে এভারেষ্টের চেয়ে উচ্চ পর্বতশৃঙ্গ থাকা কোনমতেই সম্ভব নয়। হ্যাঁ, কথাটা যদিও একটা বলিষ্ঠ দুঃসাহসিক মন্তব্যের মত মনে হতে পারে, তবুও গাণিতিক নিয়মে এই মন্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করা যেতে পারে।

কি কি কারণে পর্বতের সৃষ্টি হতে পারে, তার আলোচনার মধ্যে না গিয়ে যে কোন কারণেই সৃষ্ট পর্বত যে কোন সীমাহীন উচ্চতাবিশিষ্ট হতে পারে না, সে প্রশ্নটা অনেকেরই মনে উদয় হতে পারে। আসলে পর্বত যদি খুব বেশী উঁচু হয়ে পড়ে, তাহলে তা মাটির মধ্যে আস্তে আস্তে বসে যায়, কারণ পৃথিবীর ত্বকে, পর্বতের নীচে, গ্র্যানিট, কোয়ার্টজ, সিলিকা প্রভৃতি যে সব উপাদান থাকে, সেগুলি বিশাল উচ্চ পর্বতের ভার সহ্য করতে পারে না। পর্বতের বিশাল চাপে তার তলদেশের উপাদান শিলাগুলি তরলীকৃত হয়ে পাশের দিকে সরে যায়, যার ফলে পর্বতের উচ্চতা কমে এসে একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় দাঁড়ায়। আর ঐ শিলাগুলির গলনের জন্যে যে শক্তির প্রয়োজন হয়, তা পর্বতের উচ্চতা কমে যাওয়ার জন্যে যে স্থিতিশক্তির উদ্ভব হয়, তাথেকেই পাওয়া যায়। গাণিতিক ভাষায় প্রকাশ করলে ব্যাপারটা বোধ হয় আরো সহজবোধ্য হবে।

মনে করা যাক, যে কোন এক পর্বতের প্রাথমিক উচ্চতা ছিল h এবং নিজের ওজনের চাপে পর্বতটির x পরিমাণ উচ্চতা মাটিতে বসে



গিয়েছে। চিত্রে ক খ রেখাটি পর্বতশীর্ষের প্রাথমিক অবস্থান এবং গ ঘ রেখাটি পর্বতটি বসে

*পদার্থবিদ্যা বিভাগ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন।

যাবার পরের অবস্থান নির্দেশ করছে। পর্বতটির উচ্চতা x পরিমাণ কমে যাওয়ার ফলে যে পরিমাণ মহাকর্ষীয় স্থিতিশক্তির (Gravitational potential energy) উদ্ভব হবে, সেই শক্তির সাহায্যে x উচ্চতার মধ্যে যতখানি শিলা ছিল (চিত্রে দাগ দেওয়া অংশটুকু), ঠিক সেই পরিমাণ শিলাকে নিজের পাদদেশে পর্বতটিকে গলিয়ে নিজের জায়গা করে নিতে হবে ; অর্থাৎ পর্বত থেকে মুক্ত স্থিতিশক্তি এবং পর্বতের তলদেশে শিলা গলনের জন্যে প্রয়োজনীয় শক্তি পরস্পর সমান হবে। সুতরাং সমস্ত পর্বতটির ভর যদি M গ্র্যাম হয় এবং তার তলদেশের প্রস্থচ্ছেদ A বর্গসেন্টিমিটার, পর্বতের উপাদানের একক আয়তনে অণুর সংখ্যা n এবং ঐ উপাদানের প্রতি অণুর গলনের জন্যে শক্তির পরিমাণ (Latent heat of melting per molecule) যদি Lliq হয়, তবে—

$$Mgx = nx\ ALliq.$$

অথবা, $Mg = nALliq. \cdots\cdots (i)$

(i) নং সমীকরণের ডানপাশের অংশটির একটি নির্দিষ্ট সামগ্রিক মান আছে। সে জন্যে পর্বতটি নিজের চাপের জন্যে মাটিতে যাতে বসে যেতে না পারে (অর্থাৎ চাপে তলদেশের যাতে গলন না হতে পারে) সে জন্যে M-এর একটি নির্দিষ্ট মান থাকবে। M-এর মান তার বেশী হলে পর্বতটি অপ্রতিষ্ঠ (Unstable) হয়ে তলদেশে কিছু বসে যাবে। সুতরাং কোন পর্বত সুপ্রতিষ্ঠ (Stable) হতে হলে—

$$Mg \leqslant nALliq \cdots\cdots (2)$$

কিন্তু ভর $M = nAhm$ (m = পর্বতের উপাদান-শিলার প্রতিটি অণুর ভর)

$= n\ Ah\ \text{-Z-}\ mp.$ ($m = \text{-Z-}\ mp$; -Z- = পারমাণবিক সংখ্যা, mp = প্রোটনের ভর)

সুতরাং (2) সমীকরণ থেকে—

$$n\ Ah\ \text{-Z-}.\ mpg \leqslant nALliq$$

বা, $h \leqslant \dfrac{Lliq}{g\text{-Z-}.mp} \cdots\cdots (3)$

সুতরাং পর্বতের তলদেশ যাতে পৃথিবীতে বসে না যায়, তার জন্যে পর্বতের উচ্চতার সঙ্কট মান (Critical value) হবে (3) নং সমীকরণ থেকে $\dfrac{Lliq}{g\ \text{-Z-}\ mp}$-এর সমান। এখন এই রাশিমালার মধ্যেকার বিভিন্ন রাশির মান নির্ণয় করতে পারলেই পৃথিবীপৃষ্ঠে সুপ্রতিষ্ঠ পর্বতের উচ্চতার সর্বোচ্চ সীমা বের করতে পারা যাবে।

প্রথমেই ধরা যাক, Lliq-এর মানের কথা। এর মান নির্ণয় করতে হলে প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে, তরল পদার্থের অণুগুলি পারস্পরিক মধ্যে বেশ সুদৃঢ়ভাবেই বন্ধনযুক্ত, অবশ্য গ্যাসের তুলনায়। যখন কোন কঠিন পদার্থের গলন হয়ে তরলে রূপান্তরিত হতে থাকে, তখন সেই পদার্থের অণুগুলির মধ্যেকার পারস্পরিক দৃঢ়বন্ধন (Bonds) সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন হয় না, বরং বন্ধনগুলির দিকাভিমুখ (Directionality) শুধু পরিবর্তিত হয়। এই কারণেই কোন তরল পদার্থের পক্ষে তরলীকৃত হওয়ার পর প্রবাহিত হওয়া সম্ভব হয়, যেটা কঠিন পদার্থের পক্ষে সম্ভব নয়। এখন কোন কঠিন পদার্থকে তরলীকৃত করতে, অর্থাৎ তার ভিতরকার অণুর বন্ধনগুলির দিকাভিমুখ পরিবর্তন করলে যে পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হয়, তা সেই অণুর বন্ধনশক্তির (Binding energy) চেয়ে কম। অবশ্য এই কমের পরিমাণ যে কতটা, তা সঠিক বলা শক্ত। তবে জল ও বরফের কথা বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, বরফের গলনের লীন তাপের পরিমাণ, জলের স্ফুটনের লীন তাপের প্রায় এক-সপ্তমাংশ। অবশ্য গলনাঙ্কে বরফের বন্ধনশক্তি, স্ফুটনাঙ্কে স্ফুটনশক্তির (লীন তাপ) থেকে কিছু বেশী ধরে নিলে মোটামুটিভাবে আমরা বলতে পারি যে, গলনের শক্তি (লীন তাপ) গলনের বন্ধনশক্তির প্রায় এক-দশমাংশ। সুতরাং গণিতের ভাষায় লেখা যেতে পারে—

$L_{liq} = \frac{1}{10} \times B$ (B – বন্ধনশক্তি)

$= \frac{1}{10} \times \alpha \times Ry$ ($B = \alpha\ Ry$; Ry– রিডবার্গ ধ্রুবক এবং α একটি ধ্রুবক, যা শিলার প্রকৃতির উপর এবং তার উত্তাপের উপর নির্ভরশীল)

এখন, পর্বতশিলার আভ্যন্তরীণ উপাদানের অধিকাংশটাই সাধারণতঃ সিলিকন ডাই-অক্সাইড (SiO_2) এবং সে ক্ষেত্রে α-র মান গলনাঙ্কে প্রায় 0·2-এর কাছাকাছি ধরা যেতে পারে। সুতরাং (3) নং সমীকরণ থেকে আমরা পাই—

$$h \leqslant \frac{\frac{1}{10} \times \frac{1}{5} \times Rv}{g \cdot Z \cdot mp} \cdots\cdots(4)$$

SiO_2-এর ক্ষেত্রে $Z = 28 + 2 \cdot 16 = 60$,

সুতরাং $h \leqslant \frac{\frac{1}{10} \times \frac{1}{5} \times 109678}{980 \times 60 \times 1.67 \times 10^{-24}}$

($Ry = 109678$ সেমি$^{-1}$ = 13.53 ইলেকট্রন ভোল্ট, 1 ই. ভো. = 1.6×10^{-12} আর্গ)

$\leqslant \frac{13.53}{5 \times 98 \times 6 \times 1.67 \times 10^{-21}}$ সে. মি.

$\leqslant$ 46 কিলোমিটার

এথেকে প্রমাণিত হয় যে, ভূপৃষ্ঠে কোন পর্বত সুপ্রতিষ্ঠিতভাবে পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে থাকতে গেলে তার উচ্চতা 46 কিলোমিটারের কম হতেই হবে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এই সীমারেখার চেয়ে প্রকৃত উচ্চতা আরো অনেক কম হবে, কারণ পর্বতশিলার অভ্যন্তরভাগ, বিশেষ করে ভূপৃষ্ঠে মাটির কাছে যথেষ্ট উষ্ণ এবং সে জন্যে শিলার গলনের জন্যে প্রয়োজনীয় শক্তির পরিমাণ (L_{liq})—বাস্তব ক্ষেত্রে উপরে যে মান ধরা হয়েছে, তার চেয়ে অনেক কম। সে জন্যে পৃথিবীপৃষ্ঠে সুদৃঢ় পর্বতের উচ্চতার সর্বোচ্চ সীমাও 46 কিলোমিটারের চেয়ে অনেক কম হবে। এই সব প্রসঙ্গ বিবেচনা করলে গাণিতিক হিসাবে দেখা যায় যে, ভূপৃষ্ঠে সুদৃঢ় পর্বতের উচ্চতা 10-11 কিলোমিটারের মধ্যে হবেই। বাস্তব ক্ষেত্রেও আমরা যে সব পর্বত দেখতে পাই, তারা সকলেই এই সীমারেখার নীচে আছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, পৃথিবী ছাড়া অন্য কোন গ্রহ-উপগ্রহেও যদি অনুরূপভাবে হিসাব করা যায়, তাহলে সেখানেও ঠিক একইভাবে সম্ভাব্য পাহাড়-পর্বতের উচ্চতার সীমারেখা নির্ণয় করা সম্ভব হবে। অবশ্য সেখানে উচ্চতার সীমারেখা পৃথিবীর ক্ষেত্রের সীমারেখা থেকে আলাদা হবে, কারণ প্রথমতঃ সেখানে অভিকর্ষজ ত্বরণের মান, পৃথিবীর মানের চেয়ে ভিন্ন এবং দ্বিতীয়তঃ গ্রহান্তরের আভ্যন্তরিক গঠনে ভিন্ন প্রকার শিলা ও অন্যান্য বস্তুসামগ্রীর উপস্থিতি।

গাণিতিক হিসাবের সাহায্যে (4) নং সমীকরণ থেকে অভিকর্ষজ ত্বরণের মানকে বিলোপ করে। উচ্চতার সর্বোচ্চ সীমারেখার মানকে এমন এক রাশির সাহায্যেও প্রকাশ করা যেতে পারে, যাতে লব্ধ সমীকরণ সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে। অবশ্য সেই জটিলতার মধ্যে আলোচ্য প্রবন্ধে আর প্রবেশ করা হলো না।

ত্বকের কথা

রমেন দেবনাথ*

প্রাণিদেহের পঞ্চেন্দ্রিয়ের অন্যতম হলো ত্বক। দেহের বহির্ভাগ ত্বকের দ্বারা আবৃত থাকে, যাতে কোন অংশ নষ্ট না হয়। সে জন্যে ত্বকের আর এক নাম রক্ষাবরণী (Protective covering)। ত্বক শুধুই একটি আবরণী নয়—পরিপাকতন্ত্র, শ্বসনতন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্র ইত্যাদির ন্যায় এটিও একটি প্রয়োজনীয় তন্ত্র বিশেষ। বিভিন্ন তন্ত্র (System) মিলে একটি জীবের দেহ গঠিত হয়ে থাকে। জীব-বিজ্ঞানের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, একটি জীবের দৈহিক গঠনপ্রণালীর মূলে আছে জীবকোষ। কতকগুলি কোষ মিলে তৈরি হয় টিস্যু, কতকগুলি টিস্যুর সমষ্টি হলো যন্ত্র (Organ), আর যন্ত্রের সমষ্টি হলো তন্ত্র। যেমন মুখগহ্বর, গ্রাসনালী, অন্ত্র, পাকস্থলী, পায়ু, যকৃৎ ইত্যাদি যন্ত্রের সমবায়ে গঠিত হয় পরিপাকতন্ত্র, তেমনি ত্বক এবং ত্বকজাতযন্ত্রাদি নিয়ে গঠিত হয়েছে ত্বকসম্পর্কিত তন্ত্রাদি (Integumentary system)।

শরীরের সবচেয়ে বড় অংশ হচ্ছে ত্বক। বিশেষজ্ঞদের মতে, একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের ত্বকের আয়তন 3000 বর্গ ইঞ্চি, ওজন 10 পাউণ্ড এবং পুরু হচ্ছে $\frac{1}{100}$ থেকে $\frac{1}{8}$ ইঞ্চি। পায়ের পাতা এবং হাতের চেটোতে ত্বক সবচেয়ে পুরু, অক্ষিগোলকের আবরণীতে ত্বক সবচেয়ে পাতলা। ত্বকের প্রস্থচ্ছেদ করে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করলে দেখা যায়—এর দুটি স্তর—বহিস্ত্বক (Epidermis) এবং অন্তস্ত্বক (Dermis) [1নং চিত্র]।

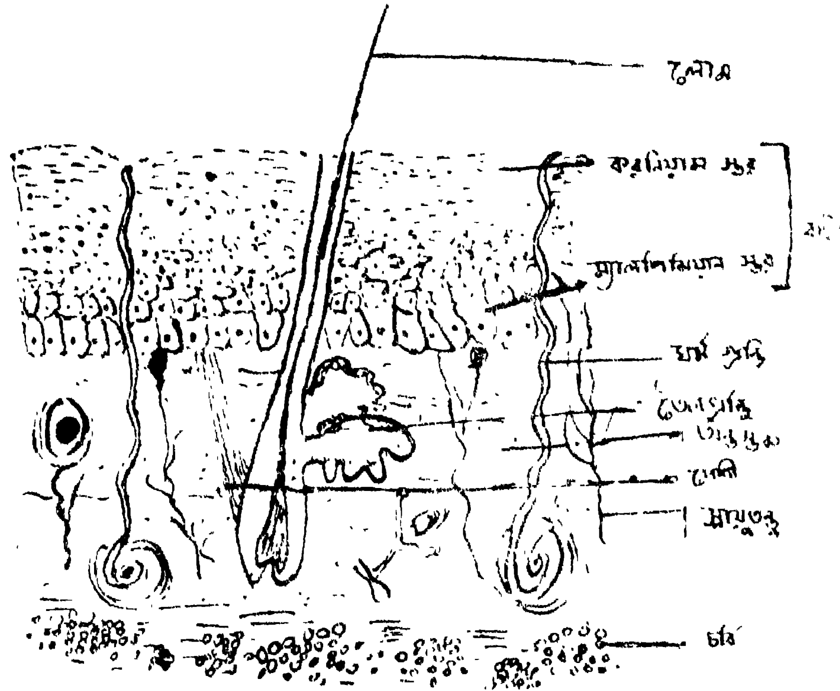
বহিস্ত্বক—এটি স্তরে স্তরে সজ্জিত কোষের দ্বারা গঠিত। বহিস্ত্বক আবার দুটি ভাগে বিভক্ত—নীচেরটির নাম গঠনকারী স্তর (Germinative layer) বা ম্যালপিঘিয়ান স্তর (বিজ্ঞানী Malpighi-র নাম অনুসারে) এবং উপরের স্তরের নাম হলো করনিয়াম স্তর (Corneum layer)। গঠনকারী স্তর থেকে অবিরত কোষ তৈরি হতে থাকে—ঐগুলি স্তরে স্তরে সজ্জিত হয়ে করনিয়াম স্তর তৈরি করে। গঠনকারী স্তর এবং করনিয়াম স্তরের কোষগুলির আকৃতি এবং প্রকৃতি ভিন্ন। গঠনকারী স্তরের লম্বা ধরণের কোষগুলি স্থানত্যাগ করে উপরে গিয়ে করনিয়াম স্তর তৈরি করে। ঐ কোষগুলির স্থানান্তরের সময় Keratinisation প্রক্রিয়া সাধিত হয়, যার ফলে কোষের প্রোটোপ্লাজম একটি শক্ত পদার্থে রূপান্তরিত হয়—যার নাম কেরাটিন (Keratin)। করনিয়াম স্তরের কেরাটিনযুক্ত কোষগুলি আস্তে আস্তে চ্যাপ্টা এবং আঁশের মত হয়ে যায়। এই কেরাটিন খুব শক্ত, মজবুত এবং জলে অদ্রাব্য—যার মধ্যে করনিয়াম স্তর একটি আদর্শ রক্ষাবরণীর কাজ করতে পারে।

উপরিউক্ত স্তরের কোষ প্রতিনিয়ত ধ্বংস হচ্ছে—এই মৃত কোষ স্তূপাকারে সজ্জিত থাকে এবং অনবরত বহিস্ত্বক থেকে খসে পড়ে সে জায়গায় নতুন কোষ যোজিত হয় গঠনকারী স্তর থেকে। মৃত কোষের জায়গায় নতুন কোষ গঠনের এই প্রক্রিয়াকে নির্মোচন (Moulting) বা খোলস পাল্টানো বলা হয়। সাপের ক্ষেত্রে মৃত কোষের গোটা স্তরটাই অর্থাৎ পুরনো খোলসটা খসে পড়ে এবং নতুন কোষের স্তর গজিয়ে ওঠে। কিন্তু অন্যান্য প্রাণীদের ক্ষেত্রে টুকরা টুকরা অথবা আংশিকভাবে নির্মোচন প্রক্রিয়া সাধিত হয়।

* প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, টি. ডি. বি কলেজ, রাণীগঞ্জ।

আমাদের শরীর থেকে অনবরতই পুরনো চামড়া খসে গিয়ে নতুন চামড়া গজায়, কিন্তু তা এতই অল্প পরিমাণে যে, আমাদের নজরে সব সময় পড়ে না। খুস্‌কি, মরামাস ইত্যাদি হচ্ছে মৃত কোষ। ঘর্মাক্ত শরীর রগড়ালে মৃত কোষ বেরিয়ে আসে—একে বলা হয় শরীরের ময়লা। মৃত কোষের জায়গা প্রতিনিয়ত নতুন কোষ দখল করছে বলে ত্বক সর্বদা সজীব এবং উজ্জ্বল থাকে। ফলে কাটা, পোড়া, ঘাজনিত ক্ষতচিহ্ন শরীরে বড় একটা দেখা যায় না, আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়।

অন্তস্ত্বক—বহিস্ত্বকের নীচের অংশটির নাম অন্তস্ত্বক। অনেকের মতে এটি প্রাণীর আসল চামড়া। এটি পুরু সংযোজক টিস্যু দিয়ে তৈরি। এতে আছে রক্তনালী, স্নায়ুকোষ, চর্বি, পেশী ইত্যাদি। তাছাড়া আছে নানারকম গ্রন্থি, চুল, আঁশ প্রভৃতি। অন্তস্ত্বকের পেশীর মধ্যে দুই রকম পেশীতন্তুর কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য—কঠিন পেশীতন্তু (Callogen fibre) এবং স্থিতিস্থাপক তন্তু (Elastic fibre); প্রথমটি ত্বকের কাঠিন্য এবং দ্বিতীয়টি স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখে। বৃদ্ধ বয়সে শেষোক্ত তন্তুটি অকেজো হয়ে পড়ে বলে শরীরের চামড়া ঢিলে হয়ে যায় আর তারই জন্যে মুখমণ্ডল, গণ্ডদেশে বলিরেখা বা কুঁচ্‌কানো চর্ম দেখা দেয়।



1নং চিত্র
চর্মের প্রস্থচ্ছেদ

চামড়ার স্যুটকেস, ব্যাগ, জুতা, ফুটবল এবং ঢাক-ঢোল-তবলা নির্মাণে চামড়ার অন্তস্ত্বকটিকেই কাজে লাগানো হয় এবং চামড়াটিকে ভিজিয়ে রেখে বহিস্ত্বককে আগে ছাড়িয়ে ফেলে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অন্তস্ত্বককে ট্যান করে পছন্দমত চামড়া তৈরি করা হয়। মানুষের অন্তস্ত্বকটিও খুব মজবুত এবং এর দ্বারা মজবুত জুতা তৈরি করা যায়। প্রাচীন কালে যুদ্ধে নিহত শত্রু সেনাদের চামড়া নিয়ে জুতা তৈরি করা হতো।

ত্বকের রং—দৈহিক বর্ণের পার্থক্যের মূলে আছে দেহের রঞ্জক কোষ (Chromatophore)—যা ত্বকের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। মানুষের গায়ের রঙের জন্যে দায়ী যে কোষ, তার নাম হলো মেলানোসাইট (Melanocyte), যা থেকে মেলানিন কণা (Melanin granule) তৈরি হয়। সাধারণতঃ ফরসা লোকের চেয়ে কালো লোকের মধ্যে মেলানিন কণা বেশী থাকে। মেলানোসাইট ভ্রূণাবস্থায় স্নায়বিক অংশ থেকে তৈরি হয়ে পরে বহিস্ত্বক গঠনকারী স্তরে এসে জমায়েত হয় এবং ঐ স্তরের কোষের মধ্যে মেলানিন কণা ছড়িয়ে পড়ে, যা ত্বকের রংকে প্রভাবিত করে। কিছু কিছু মেলানোসাইট অন্তস্ত্বকের মধ্যেও থাকে। সাদা-কালোতে ভেদাভেদ থাকলেও রক্তের রং যেমন সকল মানুষের এক—তেমনি শরীরে যে ফোস্কা (Blister) পড়ে, তাও সাদা কালো মানুষের একই রকম, কারণ যে চামড়া ফোস্কাটি ঘিরে রাখে, তা রঞ্জক কোষবিহীন।

হস্তরেখা—হাতের চেটো এবং পায়ের পাতা সর্বাধিক ঘর্ষণের সম্মুখীন হয় বলে ঐ জায়গা দুটি সবচেয়ে পুরু। ঐ জায়গা দুটি যাতে পুরু হয় সে জন্যে বহিস্ত্বক এবং অন্তস্ত্বকের দুটি অংশ ঐসব জায়গায় কতকগুলি লাইন বরাবর যুক্ত থাকে। ঐ যুক্ত লাইনগুলিই হাতের ভাঁজ, যাকে হস্তরেখা বলা হয়। আঙুলের ছাপের গঠন-প্রক্রিয়াও একই রকম। দু-জন লোকের হাতের ছাপ কখনও একরকম নয়, প্রত্যেকের প্রত্যেকটি ছাপই আলাদা।

এপর্যন্ত ত্বক সম্পর্কে অনেক কিছু আলোচনা হলো—এবার ত্বক যে যে জিনিষ তৈরি করে অর্থাৎ ত্বকজাত দৈহিক যন্ত্রাদির কথা (Integumental derivatives) কিছু আলোচনা করা হচ্ছে।

বহিস্ত্বকজাত যন্ত্রাদি (Epidermal derivatives)—সরীসৃপের দেহের আঁশ, পাখীর পালক, স্তন্যপায়ী প্রাণীর লোম ইত্যাদি বহিস্ত্বক থেকে তৈরি হয়। এছাড়া হাত ও পায়ের নখ, চতুষ্পদ প্রাণীর পায়ের খুর, শিং ইত্যাদিও তা থেকে তৈরি হয়, আর তৈরি হয় শরীরের বিভিন্ন গ্রন্থি, তার মধ্যে স্তন্যপায়ী প্রাণীর ঘর্মগ্রন্থি, তৈল-গ্রন্থি ও দুগ্ধগ্রন্থি (স্তন) উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থি তিনটির কথা আলোচনা করা হচ্ছে।

ঘর্মগ্রন্থি—ঠোঁট ও নখের গোড়া প্রভৃতি ছাড়া শরীরের সমস্ত অংশে এই গ্রন্থি প্রচুর পরিমাণে থাকে। রেচনকার্য এবং দৈহিক উত্তাপের সমতা রক্ষা করা হলো ঘর্মগ্রন্থির মূল কাজ। বিজ্ঞানী-দের হিসাবে দেখা যায় যে, মানুষের ত্বকে প্রায় 2½ মিলিয়ন ঘর্মগ্রন্থি আছে এবং 24 ঘন্টায় একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের 2-3 লিটার ঘাম বেরোয়। এই ঘামের সঙ্গে শরীরের 8-10 ভাগ বর্জ্য পদার্থ ইউরিয়া বেরিয়ে যায়। শারীর-বিজ্ঞানী কুজ-এর হিসাব অনুযায়ী ত্বকের বিভিন্ন স্থানে (প্রতি বর্গসেন্টিমিটারে) ঘর্মগ্রন্থির সংখ্যা এরূপ—হাতের চেটো—275, কপাল, গলা—175, বুক, পেট—155, কাঁধ, পিঠ, পা—80।

ঘর্মগ্রন্থির ঘাম ঘর্মনালীর সাহায্যে ত্বকের বাইরে বেরোয় (1নং চিত্র)। বিশেষজ্ঞদের বিশ্লেষণ থেকে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি ঘামের মধ্যে পাওয়া যায়—

জল—99%, ইউরিয়া—0·03%, ল্যাকটিক অ্যাসিড 0·07%, চিনি—0·004%, ক্লোরিন—1·15% সোডিয়াম—0·15%, পটাসিয়াম—0·017%, সালফেট—0·004%।

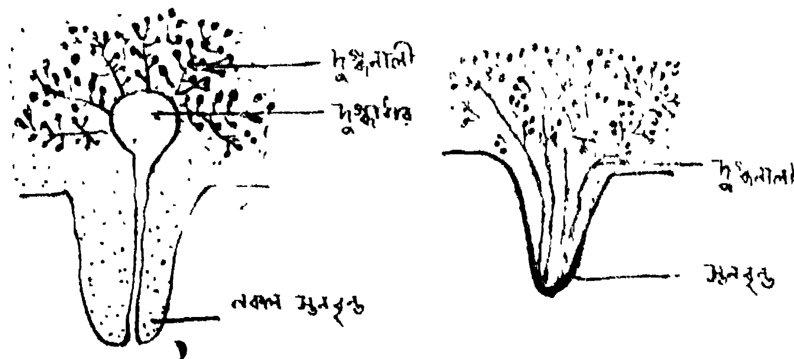
তৈলগ্রন্থি—পায়ের পাতা এবং হাতের চেটো ছাড়া ত্বকের সমস্ত অংশে এই গ্রন্থি আছে লোমের সঙ্গে এগুলি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ত্বককে মসৃণ, সজীব এবং তৈলাক্ত রাখা হলো এই গ্রন্থির কাজ। প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব একটা গন্ধ থাকে। এই গন্ধের জন্যেও তৈলগ্রন্থি দায়ী।

দুগ্ধগ্রন্থি—মেরুদণ্ডী প্রাণীর অন্তর্গত এক

শ্রেণীর প্রাণীর এই গ্রন্থি অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যমূলক একটি লক্ষণ। উক্ত গ্রন্থির নামানুসারেই ঐ শ্রেণীটির নাম হয়েছে—ম্যামেলিয়া (Mammelia ; Mamma-breast-স্তন) বা স্তন্যপায়ী শ্রেণী। এক-একটি স্তন অনেকগুলি ছোট ছোট খণ্ডে (Lobule) বিভক্ত থাকে, প্রত্যেকটি খণ্ড আবার অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থলির (Alveolus) সমষ্টি। তার মধ্যেই থাকে দুগ্ধ-ক্ষরণকারী কোষ। স্তন থেকে দুগ্ধনালীর সাহায্যে দুগ্ধ বাইরে নির্গত হয়। মূল দুগ্ধনালীটি অসংখ্য ছোট দুগ্ধনালীর সমবায়ে তৈরি। স্তনের যে জায়গায় দুগ্ধনালী এসে বের হয়, তাকে স্তন-বৃন্ত বলে। উপরে বর্ণিত দুগ্ধগ্রন্থির চার দিকে প্রচুর পরিমাণে চর্বি-জাতীয় টিস্যু জমায়েত থাকে, যার ফলে দুগ্ধগ্রন্থি বা স্তন মাংসবহুল হয়।

একটি করে দুগ্ধাধার (Cistern) থাকে, যার মধ্যে দুগ্ধনালী থেকে দুধ এসে জমা হয়। এই দুগ্ধাধার থেকে বাঁটের মাধ্যমে (2নং চিত্র) একটি দ্বিতীয় নল দিয়ে দুধ বাইরে আসে।

অন্তস্ত্বকজাত যন্ত্রাদি (Dermal derivatives)—অন্তস্ত্বক থেকে মাছের আঁশ তৈরি হয়। সাপ, গিরগিটি ইত্যাদি সরীসৃপজাতীয় প্রাণীর আঁশ তৈরি হয় বহিস্ত্বক থেকে, তাই ঐ দুই শ্রেণীর প্রাণীদের আঁশ এক নয়। মৎস্য-শ্রেণীকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়—তরুণাস্থি (Cartilaginous) ও কঠিনাস্থি (Bony)। প্রথমোক্ত বিভাগের মাছের গায়ে শুধু এক ধরণের আঁশ থাকে—যার গঠন-পদ্ধতি দাঁতের ন্যায়। ঐ আঁশের নাম প্ল্যাকয়েড আঁশ (Placoid scale)। মাছের কঠিনাস্থির আঁশ



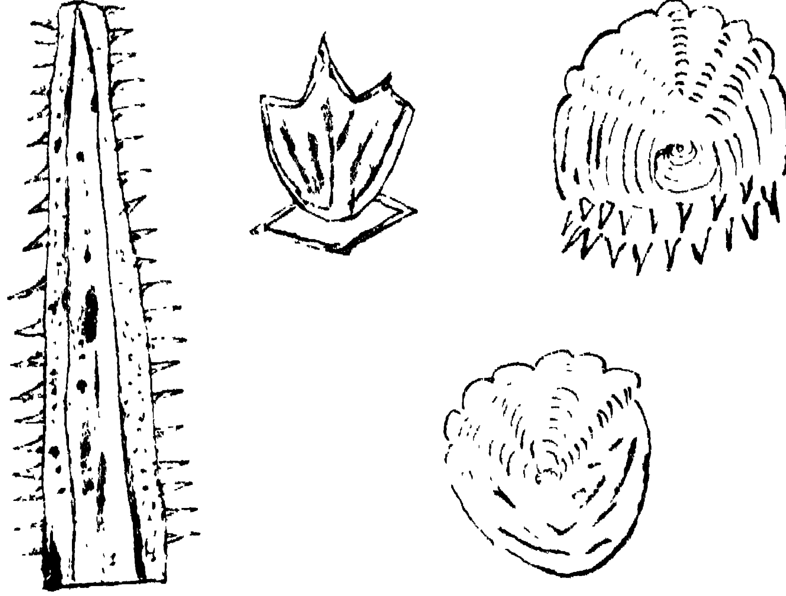
2নং চিত্র

রোমন্থক প্রাণীর স্তন মনুষ্যস্তন

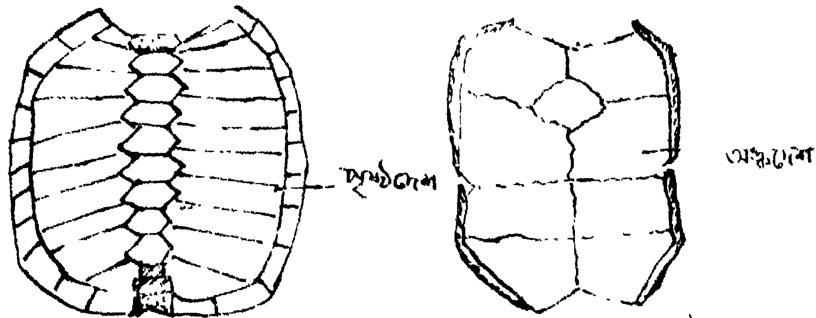
মানুষ, তিমি, বাদুর, ঘোড়া প্রভৃতির একজোড়া করে স্তনবৃন্ত থাকে। ওপোসামের 12 জোড়া, মাংসাশী প্রাণীর 3-4 জোড়া এবং গরু, মহিষ, ছাগল ইত্যাদি রোমন্থক প্রাণীর দুই জোড়া করে স্তনবৃন্ত থাকে। মানুষের স্তনবৃন্তে অনেকগুলি দুগ্ধনালী এসে জমা হয়, যার মাধ্যমে দুগ্ধ বাইরে নির্গত হয়। গাভী-মহিষের স্তনবৃন্তকে বাঁট বা নকল স্তনবৃন্ত (Falsenipple) বলা হয়। এদের বাঁটের গোড়ায়

একটি সাধারণতঃ দুই রকমের হয়—গোলাকার (Cycloid) ও চিরুণী (Ctenoid) আকারের (3নং চিত্র)। হাঙর প্রভৃতি মাছের সারা শরীরে প্ল্যাকয়েড আঁশ সমানভাবে বিস্তৃত থাকে, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় সেগুলি ভিন্ন ভিন্ন আকারের হয়ে থাকে। করাত মাছের করাতের দুই দিকে যে ধারালো দাঁতের মত অংশ (3নং চিত্র) থাকে, সেগুলি আসলে দাঁত

নয়, রূপান্তরিত প্ল্যাকয়েড আঁশ। কচ্ছপের দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি যে দুটি খোলকের (Shell) মধ্যে আবদ্ধ থাকে, তাও অন্তস্ত্বক থেকে তৈরি হয় (4নং চিত্র)। কুমীরের গায়ে শক্ত প্লেটের মত অংশ, যার উপর বড় বড় আঁশ থাকে, সেই প্লেটগুলিও অন্তস্ত্বক থেকে তৈরি হয়।



3নং চিত্র
সর্ববামে—করাত-মাছের করাত, উপরে বামে—প্ল্যাকয়েড আঁশ, উপরে দক্ষিণে—চিরুণী আঁশ, নীচে—গোলাকার আঁশ।



4নং চিত্র
কচ্ছপের অন্তস্ত্বকীয় খোলস

ত্বকের কাজ—শরীরের একটি অপরিহার্য অংশ হলো ত্বক। এই ত্বকের সাহায্যে দেহের এই সব কাজ সম্পন্ন হয়—(1) রক্ষাবরণী, (2) খাদ্যসঞ্চয়ন—ত্বকের মধ্যে যে চর্বি থাকে, তার মধ্যেই খাদ্য সঞ্চিত থাকে, যা দরকারের সময় ব্যবহৃত হয়, (3) দৈহিক তাপের সমতা রক্ষা, (4) রেচন, (5) ক্ষরণ, (6) শ্বসন—উভচর প্রাণী ফুল্‌কা ও ফুস্‌ফুস ছাড়া ত্বকের সাহায্যেও শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া চালায়, (7) চলন-প্রক্রিয়া—মাছ, পাখী এবং বাদুড় প্রকারান্তরে ত্বকের সাহায্যেই চলাফেরা করে, কারণ মাছের পাখ্‌না, পাখীর পালক ও ডানা এবং বাদুড়ের ডানা ত্বক থেকেই তৈরি হয়, (8) অনুভূতি—ত্বকের মধ্যে স্পর্শেন্দ্রিয় বিদ্যমান, সে জন্যে স্পর্শসংক্রান্ত সমস্ত অনুভূতি ত্বকের মাধ্যমে আমরা পেয়ে থাকি।

সঞ্চয়ন

চাঁদের গঠন সম্পর্কে অ্যাপোলো-15 কর্তৃক প্রেরিত তথ্য

অ্যাপোলো-15-এর মহাকাশচারীরা চন্দ্রপৃষ্ঠের হেডলী খাদ এলাকায় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করে এসেছেন। ঐ সকল যন্ত্র এবং অ্যাপোলো-15-এর ক্যামেরা ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই বহু তথ্য পৃথিবীতে সরবরাহ করেছে। হিউস্টনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মিলনে বিজ্ঞানীরা ঐ সকল তথ্যের ভিত্তিতে চন্দ্র সম্পর্কে নতুন নতুন অভিমত প্রকাশ করেছেন।

গত 4ঠা অগাষ্ট যে সকল বিজ্ঞানী চন্দ্রবক্ষের গবেষণা সম্বন্ধে পরিকল্পনা করেছিলেন, তাঁদের এবং চান্দ্র পরিকল্পনার প্রধান পরিচালকদের উদ্যোগে এই সাংবাদিক সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মিলনে বিজ্ঞানীরা চন্দ্র সম্পর্কে যে সকল অভিমত ব্যক্ত করেন, তার মধ্যে ডক্টর গ্যারি ল্যাথামের অভিমতই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য।

চন্দ্রগর্ভ পৃথিবীর মতই নানা স্তরে বিভক্ত

নিউইয়র্কের লামন্ট ডোহার্টি ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত মানমন্দিরের বিশিষ্ট ভূকম্প-বিজ্ঞানী ডক্টর ল্যাথাম বলেন যে, চন্দ্রগর্ভ পৃথিবীর মতই হয়তো নানা স্তরে বিভক্ত। চাঁদের উপরিভাগের কঠিন 25 কিলোমিটার পরিমিত স্তরটি নানা উপাদানে গঠিত। তারপরে আরম্ভ হয়েছে এর দ্বিতীয় স্তর। এই স্তর অন্ততঃ 100 কিলোমিটার পর্যন্ত গভীর।

এখানে চাঁদের গঠনে আকস্মিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে। নানা অজ্ঞাত উপকরণ দিয়েই এই স্তর গঠিত।

ডক্টর ল্যাথামের নির্দেশে 1969 সালের মাঝামাঝি সময়ে অ্যাপোলো 11-এর মহাকাশচারীরা চন্দ্রবক্ষে যে সকল কম্পন-নির্দেশক যন্ত্রপাতি স্থাপন করে এসেছিলেন, সেই সকল যন্ত্রপাতি সেই সময় থেকেই চন্দ্রপৃষ্ঠের কম্পন সম্পর্কে তথ্যাদি পৃথিবীতে সরবরাহ করে এসেছে। সেই সকল কম্পন এবং অ্যাপোলোযানের অংশবিশেষের চন্দ্রবক্ষে পতনের ফলে যে কম্পনের সৃষ্টি হয়েছিল, সেগুলি পরীক্ষা করে তিনি তখন বলেছিলেন যে, চন্দ্রগর্ভে কোন স্তর নেই।

ডক্টর ল্যাথাম তাঁর পুরাতন অভিমত সম্পর্কে বলেছেন যে, তারপরে অ্যাপোলো-12, অ্যাপোলো-14 এবং বর্তমানে অ্যাপোলো-15-এর মহাকাশ-চারীরা চাঁদের বিভিন্ন স্থানে আরও সূক্ষ্ম কম্পন-নির্দেশক যন্ত্রপাতি স্থাপন করে এসেছেন। চন্দ্রপৃষ্ঠে কম্পনের উৎপত্তি স্থল সম্পর্কে এই তিনটি কেন্দ্রের যন্ত্রপাতির সাহায্যে যে সকল নতুন নতুন তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, সেগুলির ভিত্তিতেই তাঁর পূর্ব অভিমতের পরিবর্তন করতে হয়েছে।

অ্যাপোলো-15 কর্তৃক প্রেরিত অ্যাপেনাইন পর্বতের চিত্র

হিউস্টন মহাকাশকেন্দ্রের চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহ সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানী পরিকল্পনা পর্যালোচনা বিভাগের প্রধান ডক্টর পল গ্যাস্ট অ্যাপোলো-15 কর্তৃক প্রেরিত টেলিভিশন চিত্র সম্পর্কে বলেছেন যে, এগুলি সবই চাঁদের অ্যাপেনাইন পাহাড়ের প্রথম ছবি।" চাঁদের সৃষ্টির প্রথম পর্যায়ে একটি গ্রহাণুর সংঘাতে তার বুকে সৃষ্টি হয়েছিল ইমব্রিয়াম উপসাগর এবং তাঁর নিকটস্থ ক্রা মরো এলাকা থেকে যে সকল উপকরণ ছিটকে পড়েছিল, সেগুলি দিয়েই তৈরি হয়েছে অ্যাপেনাইন পর্বতের চূড়া।

ঐ পর্বতের মধ্যভাগটি তৈরি হয়েছে এর চেয়েও প্রাচীন নিথর সমুদ্র বা সী অব সেরিনিটির উপকরণ দিয়ে। আর এর পাদদেশ গঠিত হয়েছে চাঁদ-সৃষ্টির প্রথম দিনের উপকরণ দিয়ে। অ্যাপেনাইন পর্বতের সম্মুখভাগ হেড্‌লী খাদ ওই পার্বত্য অঞ্চলেরই অন্যতম অংশ। মহাকাশচারী স্কট ও আরউইন ঐ অঞ্চলে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন।

চাঁদের চৌম্বক ক্ষেত্র

মার্কিন মহাকাশ সংস্থার ক্যালিফোর্ণিয়ার এমজ গবেষণা কেন্দ্রের ডক্টর পল ডায়েল চাঁদের চৌম্বক ক্ষেত্র সম্পর্কে বলেছেন যে, অ্যাপোলো-15 চন্দ্রবক্ষে চৌম্বক শক্তি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্যে একটি ম্যাগনেটোমিটার স্থাপন করে এসেছে। এই যন্ত্রটি যে সকল তথ্য পৃথিবীতে প্রেরণ করেছে, তাতে জানা যায়—যে স্থানে ঐ যন্ত্রটি বসানো হয়েছে, সেখানকার চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তির পরিমাণ চাঁদের অন্যান্য স্থানের গড়পড়তা শক্তির তুলনায় কম।

ডক্টর ডায়েল এই প্রসঙ্গে আরও বলেন যে, চাঁদের গভীরে যে বৈদ্যুতিক সঙ্কেত পাঠানো হচ্ছে, সে সম্পর্কে তথ্যাদি ঐ ম্যাগ্‌নেটোমিটারের সাহায্যে সংগৃহীত হচ্ছে। ঐ সকল তথ্যের সাহায্যে আলোক বিজ্ঞানীরা চন্দ্রগর্ভের কেন্দ্রস্থল পর্যন্ত তাপমাত্রা সম্পর্কেও একটা আঁচ করতে পারবেন।

চাঁদের আয়নমণ্ডল সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান

টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর কেন হিলস বলেন যে, চাঁদের আয়নমণ্ডল বা আয়নোস্ফিয়ার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যে ডিটেক্টর যন্ত্রটি স্থাপন করা হয়েছে, তাতে অ্যাপোলো-15 চান্দ্রযানটিকে চন্দ্রবক্ষে নিক্ষেপ করবার ফলে সেখান থেকে কয়েক মিনিট ধরে কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রভৃতি যে সকল রাসায়নিক পদার্থ উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল, তাও ধরা পড়ে। এটি অতিরিক্ত লাভ, কারণ ঐ যন্ত্রটি চাঁদের অতি সূক্ষ্ম আয়নমণ্ডল সম্পর্কেই মাত্র তথ্য সংগ্রহের জন্যে স্থাপন করা হয়েছে।

চাঁদে তাপ-প্রবাহ নিরূপণের প্রথম উদ্যোগ

ল্যামন্ট ডোহার্টি মানমন্দিরের বিজ্ঞানী ডক্টর মার্কাস ল্যাংসেথ বলেন, অ্যাপোলো-15-এর মহাকাশচারীরাই প্রথম চাঁদে তাপ-প্রবাহ নিরূপণের যন্ত্র স্থাপন করে এলেন। চাঁদের অভ্যন্তর থেকে কি হারে তাপমাত্রা মহাকাশে ছড়িয়ে পড়েছে, তা প্রত্যক্ষভাবে ঐ যন্ত্রের সাহায্যে নিরূপণ করা সম্ভব হবে। চাঁদের গর্ভ কি পরিমাণে উত্তপ্ত বা শীতল, তা সঠিকভাবে জানবার ব্যাপারে এই সকল তথ্য খুবই সহায়ক হবে। ডক্টর গ্যাস্ট সকলের শেষে বলেন যে, অ্যাপোলো-15 যে সকল তথ্য সংগ্রহ করেছে, সেই তথ্যাদি এসে পৌঁছুলে প্রকৃত তথ্য নিরূপিত হবে। তবে বিজ্ঞানীদের অভিমত, চাঁদ অতি দ্রুত গঠিত হয়েছে। এর অভ্যন্তর ভাগ শীতল এবং উপরিভাগ উত্তপ্ত। পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহে এর উল্টোটাই দেখা যায়। রাসায়নিক গঠনের দিক থেকে চাঁদ পৃথিবী এবং সৌর-মণ্ডলীর অন্যান্য গ্রহ থেকে ভিন্ন।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর — 1971

চতুর্বিংশ বর্ষ — নবম-দশম সংখ্যা



ক্যালিফোর্নিয়ার জঙ্গলে দুটি বাচ্চাসহ ঝুঁটিওয়ালা হুতোম প্যাঁচা

আমাদের ঘ্রাণ-যন্ত্র ও গন্ধ-রহস্য

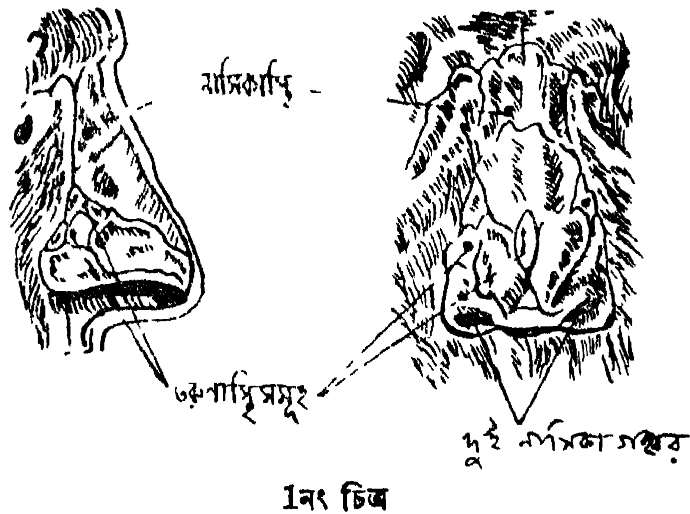
নাক যাঁদের সুন্দর, অনেক সময় তাঁদের চলাফেরায় একটু নাক-উঁচু ভাব দেখা যায়। যাঁদের নাক বেশ উঁচু, সৌন্দর্যের বিচারে তাঁরা একটু উপরে স্থান পেয়ে থাকেন। আর যাঁদের নাক নিতান্তই রেলগাড়ী-চলে-যাওয়া কিংবা কামান দাগা, তাঁরা স্বভাবতঃই কিছুটা হীনমন্যতায় ভোগেন। বর্ণনায় শোনা যায়—কারোর নাক টিয়াপাখীর ঠোঁটের মত, কারোর বা তা বাঁশির মত। আসলে বর্ণনায় যা-ই বলা হোক না কেন, কাজের দিক থেকে খাঁদা কিংবা টিকালো নাকের কোন ভেদ নেই—তবে সৌন্দর্যের বিচারে আলাদা কথা।

নাকের যে বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমরা আলোচনা করি, সে হলো তার বহিরঙ্গ। নাসিকা-রহস্যের চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে দেহের অভ্যন্তরে। তাই ভিতরের গঠন ও তার কার্যক্রম বিচার করলে টিকালো বা খাঁদা নাকের তারতম্য ঘুচে যাবে, তখন আর উঁচু নাকের জন্যে গর্ব করা চলবে না।

নাকের আসল কাজ দুটি। শ্বাস-প্রশ্বাস ও গন্ধের অনুভূতি। অবশ্য স্বাদ গ্রহণের ব্যাপারটিও এর সঙ্গে যুক্ত। তবে সে সব কথা পরে। শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যাপারে নাকের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগ ফুসফুসের। আর গন্ধের অনুভূতি ও স্বাদ গ্রহণের ব্যাপারটি এক জটিল ব্যবস্থার মাধ্যমে সরাসরি যুক্ত মস্তিষ্কের বহিস্ত্বক বা Cortex-এর সঙ্গে।

ঘ্রাণ-যন্ত্রের সংক্ষিপ্ত একটি অংশ রয়েছে বাইরের দিকে। এই অংশটিকে বহির্নাসিকা বা সাধারণভাবে নাক বলা হয়। বহির্নাসিকা দু-মুখ খোলা একটি দু-নলা চোঙ, অনেকটা দু-নলা বন্দুকের ব্যারেলের মত। দুটি নলের মাঝে আছে বিভেদ প্রাচীর, যাকে ইংরেজীতে বলে সেপ্টাম (Septum)। সেপ্টাম লাঙ্গলের আকারের এক বিশেষ ধরণের হাড় দিয়ে তৈরী। হাড়গুলি নরম ও জীব-বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় তরুণাস্থি। বহির্নাসিকার সম্মুখভাগ মূলতঃ বায়ুর প্রবেশ ও নির্গমনের কাজ করে থাকে। সমগ্র বহির্নাসিকাটি তরুণাস্থির দ্বারা গঠিত। নলের শেষ প্রান্ত দুটি যেখানে মুখের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে, ঠিক সেখানে আছে একজোড়া ছোট শক্ত হাড়ের কাঠামো। এদের নাম নাসিকাস্থি। সেপ্টামের দু-পাশে সুড়ঙ্গের মত যে দুটি নল অগ্রভাগ পর্যন্ত প্রসারিত, তাকে বলে নাসিকাগহ্বর (Vestibule)। নাসিকাগহ্বরের সম্মুখ প্রান্তে ভিতরের দিকের দেয়ালে থাকে বেশ কিছু লম্বা লোম। এরা নাসিকাগহ্বরের ভিতরে জটিল জালের সৃষ্টি করে। নিশ্বাসবায়ুর সঙ্গে পর্যাপ্ত পরিমাণে ধূলিকণা ও কোন কঠিন বস্তুর ছোট ছোট কণা নাকের মধ্যে ঢুকলে এই লোমের জালে সহজেই ধরা পড়ে।

বাম ও দক্ষিণ নাসিকাগহ্বরের বাইরের দিকের দেয়াল থেকে বেরোনো ভোমার (Vomer), এথময়েড (Ethmoid) প্রভৃতি অস্থিগহ্বরকে মোট তিনটি অপরিসর কক্ষে বিভক্ত করেছে। এথময়ডীয় অস্থির উপরাংশে আছে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র। এগুলির মধ্য দিয়ে ঘ্রাণবাহী স্নায়ুগুলি (Olfactory nerve) মস্তিষ্কে প্রবেশ করে। দুই নাসিকা-গহ্বরের ভিতর দিকের দেয়ালে আবরণীর নীচে আছে অসংখ্য গন্ধগ্রাহী কোষ (Olfactory receptor cell)। কোষগুলির সঙ্গে যুক্ত ঘ্রাণবাহী স্নায়ু মস্তিষ্কে বার্তা নিয়ে যায়। নাসিকাগহ্বরের শেষ প্রান্তে মূল গহ্বর (Nasal foosa), তার সঙ্গে শ্বাসনালীর সংযোগ [1, 2 চিত্রে দ্রষ্টব্য]।

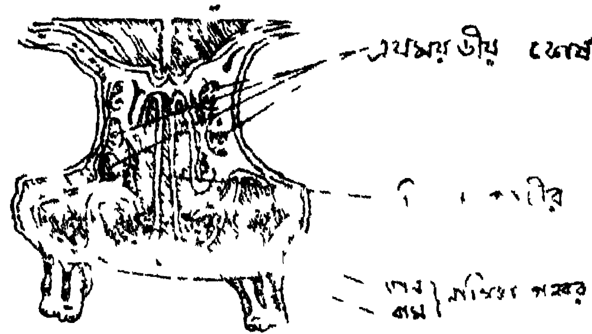


1নং চিত্র

আমাদের যে কোন অনুভূতিকে জীবনের পথপ্রদর্শক বলা চলে। শব্দ, আলো ইত্যাদি অনুভূতির ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। গন্ধানুভূতিতে এই পার্থক্য আরও বেশী। কোন একটি গন্ধ কারোর ভাল লাগে, কারোর বা লাগে না। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, আমাদের পুরনো অভিজ্ঞতার উপরই কোন গন্ধ ভাল-লাগা বা না-লাগা নির্ভর করে। কোন দুঃখজনক ঘটনার সঙ্গে কোন গন্ধের স্মৃতি যদি জড়িত থাকে, তবে অন্যেরা পছন্দ করলেও আমরা সচেতন বা অচেতনভাবে সেই গন্ধটিকে অপছন্দ করে থাকি। অনেক সময় আমরা অনেক বিরক্তিকর গন্ধের সঙ্গেও দিব্যি সন্ধি করে ফেলি। রাসায়নিক কারখানা বা চামড়ার কারখানার আশেপাশে যাঁদের বাড়ী, তাঁরা দিনের পর দিন ঐ দুর্গন্ধের মধ্যে বাস করা ছাড়া অন্য উপায় না পেয়ে গন্ধটিকে সহ্য করে নেন এবং দুর্গন্ধের মধ্যে নির্বিবাদে বাস করেন।

বিভিন্ন সময়ে একই ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উপর গন্ধের অনুভূতি নির্ভর করে। বয়স বৃদ্ধি, মানসিক পরিবর্তন, শারীরিক সুস্থতা বা অসুস্থতা আমাদের এই অনুভূতিতে প্রভাব বিস্তার করে। সুস্থ অবস্থায় যে গন্ধটি ভাল লাগে, অসুস্থ অবস্থায়

সেই গন্ধই বিরক্তিকর মনে হতে পারে। গন্ধানুভূতির ক্ষেত্রে এক ধরণের বিভ্রম (Hallucination) লক্ষ্য করা যায়। মন খারাপ থাকলে বা অসুখে ভুগে ভুগে দেহ ও মন ক্লান্ত হয়ে পড়লে তখনকার নিঃসঙ্গ অবস্থায় শৈশবের আনন্দময় নানা ছবি আমাদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এই ছবিগুলি দেখতে দেখতে আমরা কখনো বা সুগন্ধের অনুভূতিতে চম্‌কে উঠি। মনে হয় কই এই রকম ফুল বা গন্ধ কাছাকাছি কোথাও তো নেই। শৈশবজীবনের কোন সুগন্ধের স্মৃতিই বাস্তবকে উপেক্ষা করে এই অনুভূতির সৃষ্টি করতে পারে। অপরাধীদের ক্ষেত্রেও এরকম ঘটনা দেখা যায়। কারাগারের নির্জন ঘরে পুরনো ঘটনা ভাবতে ভাবতে খুনী ব্যক্তিটি হঠাৎ চম্‌কে ওঠেন। কয়েক বছর আগে যাকে খুন করেছিলেন, তার দেহের গন্ধটিই এতদিন বাদে ফিরে আসে অবিশ্বাস্যভাবে। তবে মানুষের ক্ষেত্রে এই গন্ধস্মৃতি খুব সক্রিয় নয়। মানুষের উন্নত ধরণের দৃষ্টি ও শ্রবণ-শক্তি আর তারই সঙ্গে কল্পনাশক্তি, বাস্তববোধ, বয়সবৃদ্ধি, শিক্ষা, রুচি, কর্মব্যস্ততা ইত্যাদি



2নং চিত্র
মানুষের নাক সোজাসুজি কাটা হয়েছে।

প্রায়শঃই এই স্মৃতিকে মুছে দেয়। পশুদের ক্ষেত্রে এই গন্ধস্মৃতি অত্যন্ত সক্রিয়। কোন ব্যক্তি বা বস্তুর কোন বিশেষ গন্ধ কুকুরের স্মৃতিতে চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকে। তাই বেশ কয়েক বার হাত বদলের পরেও প্রাক্তন প্রভুকে চিনতে তার কষ্ট হয় না। কোন ব্যক্তির ব্যবহৃত জিনিষের গন্ধ শুঁকে বহু লোকের মধ্যে থেকেও নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে খুঁজে বের করে অনায়াসে। পুলিশ-কুকুরের সাহায্যে অপরাধী খুঁজে বের করবার কথা কারও অজানা নয়। আশ্চর্যের বিষয়, একই ব্যক্তির দেহে বিভিন্ন সময়ে নানা ধরণের গন্ধ সৃষ্টি হতে পারে। আবার একই ব্যক্তির দেহে একই সময়ে বিভিন্ন অংশের গন্ধও এক নয়। সে ক্ষেত্রে কুকুর যে কিভাবে কোন একটি অংশের গন্ধের সূত্র ধরে মানুষটিকে চিনে বের করে, বিজ্ঞানীদের তা আজও অজানা। তবে কি প্রতিটি ব্যক্তির নিজস্ব একটি গন্ধ আছে, যা একেবারে স্বতন্ত্র ও মৌলিক? যদি তা থাকে, তবে এরই সঙ্গে আরও একটি সত্য বেরিয়ে আসবে—মানুষে মানুষে দেহগন্ধের মিল নেই। বিজ্ঞানী হ্যান্স ক্যালমাস

বলেছেন—দুটি মানুষের দেহের গন্ধ একেবারে আলাদা। তিনি পরীক্ষা করে দেখেছেন—হুবহু এক রকমের দুটি যমজ শিশুর ক্ষেত্রেই কেবল দেহগন্ধের মিল দেখা যায়। তিনি অবশ্য কুকুরের পরীক্ষা দিয়েই তা প্রমাণ করেছেন। এই তথ্য যদি সত্য বলে বিজ্ঞান কোনদিন মেনে নেয়, তবে হাতের ছাপ ইত্যাদির মত অপরাধীর গায়ের গন্ধও রেকর্ড করে রাখা হবে, যাতে অপরাধীকে সহজে ধরা যায়। মহাভারতের কাহিনীতে দেখা যায়—দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেন তীব্র রকমের গন্ধ-সচেতন ছিলেন। পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারবার জন্যে দুর্যোধন যে জতুগৃহ তৈরি করেছিলেন, ভীমসেন গন্ধ শুঁকেই নাকি তার মধ্যে বিপদের সঙ্কেত পেয়ে যান এবং সপরিবারে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন।

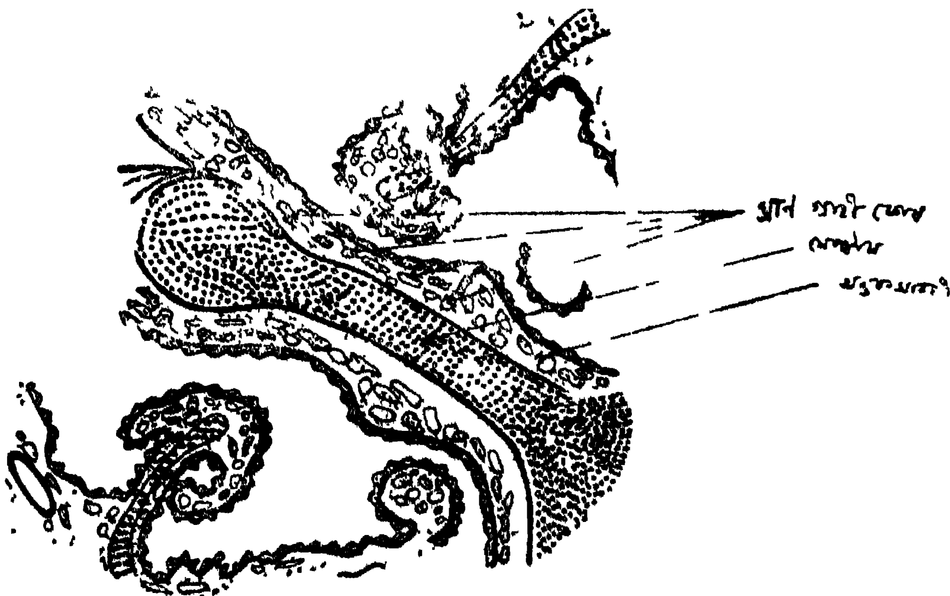
গন্ধ আমাদের স্বাভাবিক শান্ত জীবনে হঠাৎ কখনো উৎসাহ-উত্তেজনা, কখনো বা ক্লান্তি-অবসাদ এনে দিতে পারে। সুগন্ধি যেমন মনকে প্রফুল্ল রাখে, ঠিক তেমনি কুৎসিত বা দুর্গন্ধ মনকে বিষাদ ও বিরক্তিতে ভরে দেয়। আবার কোন বিশেষ গন্ধানুভূতি শান্ত ও ধীর মস্তিষ্ককে হঠাৎ উত্তেজিত করে তুলতে পারে অতি সহজে। মানুষের ক্ষেত্রে এই প্রভাব ততটা কার্যকর হয় না রুচিবোধ, শিক্ষা, সংযম ইত্যাদির জন্যে। কিন্তু পশুদের ক্ষেত্রে এটি যথেষ্ট প্রকট হয়ে দেখা দেয়। প্রজননের সময় স্ত্রী-পশুরা তাদের যৌনাঙ্গ থেকে এক ধরণের গন্ধ বের করে। গন্ধটি অন্য প্রজাতির উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। কিন্তু নিজ প্রজাতির পুরুষ পশুরা ঐ বিশেষ গন্ধে যৌন উত্তেজনা বোধ করে। শরীরের এই পরিবর্তন সাধনে গন্ধ এখানে হর্মোনের কাজ করে। এক্ষেত্রে তাই গন্ধকে বায়ুবাহী হর্মোন বলা চলে।

উপদান ও রাসায়নিক গঠনের পার্থক্যের জন্যে বিভিন্ন পদার্থের গন্ধ বিভিন্ন হয়ে থাকে। রসায়নের ভাষায় যাদের Isomer বলে, অর্থাৎ যে সব পদার্থের অণুগুলি সমসংখ্যক সমজাতীয় পরমাণু দিয়ে গঠিত হলেও পরমাণুগুলির পারস্পরিক সংযোগ বা সংস্থান এক নয়, তাদের ক্ষেত্রে অন্যান্য ধর্মের মত গন্ধ ও স্বাদে বৈচিত্র্য দেখা যায়; যেমন অ্যামোনিয়াম সায়ানেট (NH_4CNO) এবং ইউরিয়া [$CO(NH_2)_2$]। দুটি পদার্থের গন্ধ সম্পূর্ণ আলাদা।

একসময় মনে করা হতো, গন্ধবাহী বস্তুকণা কিংবা অদৃশ্য গন্ধরশ্মিই বুঝি এই অনুভূতির কারণ। কিন্তু ইদানীং কালের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এই তত্ত্বগুলি অসার প্রমাণিত হয়েছে। গন্ধবিশিষ্ট কোন উদ্বায়ী পদার্থের সূক্ষ্ম অণু বাতাসে বাহিত হয়ে বা ব্যাপনক্রিয়ায় (Diffusion) পদার্থতল থেকে বেরিয়ে যখন নাকের মধ্যে ঘ্রাণবাহী কোষগুলিকে স্পর্শ করে, তখন ঘ্রাণবাহী স্নায়ুর সাহায্যে বার্তা পৌঁছয় মস্তিষ্কের Cortex-এ। মস্তিষ্ক এই গন্ধগুলির বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করে। মস্তিষ্কের উপলব্ধি অনুসারেই গন্ধটিকে ভাল বা খারাপ লাগে।

বিজ্ঞানী লর্ড অ্যাড্রিয়ানের মতে, এই গন্ধগ্রাহী কোষগুলি কয়েক ডজন শ্রেণীতে বিভক্ত। এক-একটি শ্রেণী এক এক ধরণের গন্ধের জন্যে উপযোগী। কোন শ্রেণীর অন্তর্গত প্রতিটি সদস্য তাদের জন্যে নির্ধারিত গন্ধবিশিষ্ট অণুর আগমনবার্তা পৌঁছে দেয় মস্তিষ্কে। তাদের পাঠানো খবর থেকেই মস্তিষ্ক গন্ধটিকে অনুভব করে। পৃথিবীতে গন্ধ অসংখ্য রকমের। আর তাদের জন্যে সক্রিয় রয়েছে গন্ধগ্রাহী অসংখ্য কোষশ্রেণী। এরকম কোষের সংখ্যা এখন নির্ণয় করা গেছে। দুই নাকের ভিতর দিকের দেয়ালে রয়েছে মোট দশ লক্ষ কোষ [3নং চিত্র]।

একই গন্ধ অনেক শুঁকলে ঐ গন্ধের অনুভূতি ক্রমশঃ কমে আসে। এ রহস্যটিও চিত্তাকর্ষক। আসলে ঐ বিশেষ গন্ধটির জন্যে যে গন্ধবাহী কোষগুলি কাজ করে। অনেকক্ষণ একটানা পরিশ্রমে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে, ঠিক যেমন একটানা পরিশ্রমে আমরাও ক্লান্তি বোধ করি। ঐ ক্লান্ত কোষগুলি তখন আর মস্তিষ্কে খবর পাঠাতে পারে না। ফলে বার্তা সরবরাহের অভাবে আমাদের ঘ্রাণশক্তি ঐ বিশেষ গন্ধটির ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে অথচ তখন অন্য গন্ধ দিব্যি অনুভব করা যায়। আমরা সবাই সব গন্ধ অনুভব করতে পারি না। কোন বিশেষ গন্ধ অনুভবের জন্যে যে কোষশ্রেণী আছে, তাদের অক্ষমতার ফলেই এরকম হয়ে থাকে। পশুদের ক্ষেত্রেও এর মিল আছে। গরু, মোষ প্রভৃতি



3নং চিত্র
নাকের ভিতরের অংশ—তির্যকছেদ।

পশু ঘাস, পাতা ইত্যাদি ছাড়া অন্য কোন গন্ধ বিশেষ বুঝতে পারে না। সর্দি বা নাকের অন্য রোগে ঘ্রাণশক্তি সাময়িক বা স্থায়ীভাবে নষ্ট হয়ে যায়। নস্য ব্যবহার, ধূমপান ইত্যাদিও ঘ্রাণশক্তিকে অনেকাংশে নষ্ট করে দেয়।

গন্ধগ্রাহী কোষগুলি এবং মস্তিষ্কের মধ্যে পারস্পরিক যে সম্বন্ধ, তার সঙ্গে তুলনা চলে কোন শহরের টেলিফোন এক্সচেঞ্জের। গ্রাহকদের সঙ্গে এক্সচেঞ্জের যেমন সংযোগ থাকে, এক্ষেত্রেও ঠিক তাই। ঘ্রাণগ্রাহী কোষগুলি ঘ্রাণবাহী স্নায়ুর সাহায্যে সংযুক্ত রয়েছে মস্তিষ্কের সঙ্গে। অন্তর্মুখী স্নায়ু খবর পৌঁছে দেয় মস্তিষ্কের Cortex-এ। সেখানে চলে গন্ধ-বিশ্লেষণ। মস্তিষ্কের অনুভূতি বহির্মুখী স্নায়ুর সাহায্যে পৌঁছে যায় দেহের বিভিন্ন অংশে। কোন সুগন্ধ আরও বেশী করে উপভোগ করবার জন্যে মস্তিষ্কের হুকুমে আমরা জোরে জোরে শ্বাস টানি, নিঃশ্বাসের সঙ্গে উদ্বায়ী গন্ধ-অণুকে নাকের মধ্যে এনে গন্ধগ্রাহী কোষগুলির সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়ে দিই আবার বিরক্তিকর গন্ধ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে মস্তিষ্কের আদেশেই নাক বন্ধ করি বা রুমাল চাপা দিই। কাজেই একথা নির্বিবাদে বলা যায়, নাক দিয়ে গন্ধ শুঁকলেও গন্ধটি আসলে পায় মস্তিষ্ক।

অলোক সেন

জেনে রাখ

আমেরিকার আদি বসবাসকারী ইংরেজরা সর্বপ্রথম যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর পূর্ব কোণে যে জায়গায় বসতি স্থাপন করেছিল, সেই জায়গাটা এখন নিউ ইংল্যাণ্ড নামে পরিচিত। সে স্থানে খাদ্যাভাব দেখা দিলে সেখানকার আদিম অধিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানরা তাদেরকে ক্লাম নামক প্রচুর সেল-



ফিসের সন্ধান বলে দেয় এবং সেগুলিকে চৌকা গর্তের মধ্যে রেখে তার চতুর্দিকে উত্তপ্ত প্রস্তরখণ্ড সাজিয়ে কেমন করে সেগুলিকে খাদ্যোপযোগী করা যায়, তাও দেখিয়ে দেয়। ক্লাম পুড়িয়ে খাওয়া এখন একটা প্রচলিত রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং নিউ ইংল্যাণ্ডে প্রত্যেক বছর জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ক্লামবেক ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

তিনটি গাছ

বারো বছর বয়স পর্যন্ত শহরের প্রভাবের বাইরে একেবারে প্রকৃতির নিজের রাজ্যে কাটিয়েছিলাম। তাকে তখন এড়িয়ে যাবার জো ছিল না। সে তার হাড়-কাঁপানো শীত, তার মন-ভোলানো বসন্ত আর গ্রীষ্ম, তার আশ্চর্য বর্ষা আর ফল-পাকানো শরৎ-হেমন্তের কুয়াশা, ফুলের বাহার, মেঘ, রামধনু, ছোট ছোট বন্যার সঙ্গে মৌমাছি, গুটিপোকা, প্রজাপতি, পাখী, জোঁক, সাপ, শোঁয়াপোকা, চামচিকা, বাদুড়, শেয়াল, খ্যাঁকশেয়াল নিয়ে আমাদের চারদিকের দৃশ্যমান আর অদৃশ্য জগতে এমন ভিড় করতো যে, তার মধ্যে নিজেদের পা রাখবার জায়গা খুঁজে বের করাও মাঝে মাঝে মুস্কিলের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতো। কেবলি মনে হতো এটা ওদেরি জায়গা, আমাদের একটু দেখেশুনে চলতে হবে।

যেই না এই কথা মনে হওয়া, অমনি দেখলাম আমরাও দিব্যি ওদের রাজ্যে জায়গা পেয়ে গেছি। তার উপর বড়রা কেবলি সাবধান করে দিতেন—ঠ্যাং নেই, লম্বা গড়নের—ওগুলি সাপ, কামড়ালেই মানুষ মরে যায়, কাছে যাস নি। মেটে রঙের ছুটো শিং-ওয়ালা, পিঠে শামুক, যেখানে যায় চট্‌চটে দাগ টেনে যায়—ওকেও এড়িয়ে চলিস। আর খবরদার ব্যাঙের ছাতার ধারেকাছেও যাবি না। বিলেতে প্রতি বছর বহু লোক নাকি ব্যাঙের ছাতা খেয়ে মরে যায়, তাছাড়া ওতে হাত দিলেও হাতে ঘা হয়। এই সব সাবধানী কথা কানে নিয়ে প্রকৃতির রাজ্যের ঠিক মাঝখানে আমরা বাস করতাম।

গাছপালাগুলি ছিল আমাদের বন্ধু—যেমন তাদের স্নিগ্ধ ছায়া, তেমনি মিষ্টি তাদের ফল, আর সবচেয়ে মনোহর তাদের ডালপালার রহস্য। কত পাখীর বাসা, কত অদ্ভুত কোটর, কত আশ্চর্য পোকার গুটি, কত সুগন্ধি আঠার টুপ্‌লি। একবার গাছে চড়লে আর নামতে ইচ্ছা করতো না।

সবচেয়ে অন্তরঙ্গ ছিল আমাদের বাড়ীর হাতার মধ্যে তিনটি বড় বড় ন্যাসপাতি গাছ। সেগুলিকে সারা বছর ধরে দেখে দেখে আমাদের আশ মিটতো না। কলকাতা থেকে মাসী গেলেন, তাঁকে ফলের বাহার দেখিয়ে বললাম—কলকাতায় নাকি তোমরা পয়সা দিয়ে এসব ফল কেন, তাও অনেক ছোট, অনেক শুক্‌নো, অনেক কম মিষ্টি? মাসী নাক সিঁটকে বললেন—দূর্. এগুলিকে আবার ন্যাসপাতি বলে নাকি, এই চাউস বড়, কামড়ালেই রস গড়ায়, জামায় লাগলে তার দাগ ওঠে না, চিবুতে ক্যাচ-ক্যাচ করে। আসল ন্যাসপাতি দেখতে চাস, কলকাতার মার্কেটে যাস। কেমন ছোট,

হল্‌দে, লম্বাটে গড়ন, পাকলে নরম তুল্‌তুল করে। এগুলি আমাকে দিলেও খাবো না। তাঁর দেখাদেখি তাঁর মেয়েও বললো—ছ্যা-ছ্যা-ছ্যা, দিলেও খাব না। আমরা এমনি অবাক হয়ে গেলাম যে, ভাল করে কোন উত্তর দিতেও পারি নি। তবে সত্যিই যে খেতেন না, তাও নয়। প্রত্যেক বছর ঐ গাছে ফল হতো, কখনো বাদ যেত না। কিন্তু পঞ্চাশ বছর পরেও আজ পর্যন্ত ঐ তিনটি ন্যাসপাতি গাছ আমার মনের মাটিতে তেমনি উজ্জ্বল সরস চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই লেখা তাদেরি বিষয়ে।

যতদূর মনে হয়, গাছগুলির গা খুব মোলায়েম ছিল না। ওখানকার উচ্চতা ছিল পাঁচ হাজার ফুটেরও বেশী, শীতকালে এত ঠাণ্ডা হতো যে, ছোট ছোট ঢেউশুদ্ধ অনেক নদী-নালা জমে যেত। শুধু যেগুলির স্রোত বেশী, সেগুলি জমতো না। কন্‌কনে ঠাণ্ডা একটা হাওয়া বইতো। বেজায় কষ্ট হতো। কষ্টটা শুধু শরীরের ছিল না, গাছগুলির অবস্থা ভেবে মনেও বড় কষ্ট হতো। মাছগুলি বরং অনেক বেশী আরামে থাকতো। নদী-নালা ছোট ছোট পুকুরের উপরে হয়তো জল জমে এক পরত বরফ হয়ে থাকতো, তার নীচে দিব্যি বরফের ছাদের তলায় মাছেরা আনন্দে সাঁতার কেটে বেড়াতো—একথা আমাদের পাহাড়ী ধাই-মা'রা প্রায়ই আমাদের বলতো।

ন্যাসপাতি গাছগুলির কথা আর কি বলবো। শীতের হাওয়া লাগতেই তাদের পাতাগুলি প্রথমে ফিকে সবুজ, তারপর হলুদ, তারপর পাট্‌কিলে, লাল্‌চে, কোন কোন গাছে কুচ্‌কুচে কালো হয়ে গিয়ে ঝরে পড়তো। গাছের তলায় শুক্‌নো পাতা-গুলি স্তূপাকার হয়ে থাকতো। এমন একটা সোঁদা গন্ধ বেরুত যে, স্পষ্টই বোঝা যেত ওরা সব মরে গেছে।

শুক্‌নো ঘূর্ণী হাওয়ায় মরা পাতাগুলি বাগানের ঘাস-জমিতে উড়ে উড়ে বেড়াতো, চারদিক নোংরা দেখাতো। মালি সেগুলিকে লম্বা বাঁশের হাতল লাগানো কাঁটা দিয়ে আঁচড়ে আঁচড়ে এখানে-ওখানে—যেখানে হাওয়া লাগতো না, এমন জায়গায় জড়ো করতো। তারপর সবগুলিকে একসঙ্গে করে বাড়ী থেকে একটু দূরে প্রকাণ্ড এক ঢিপি বানাতো। সন্ধ্যার আগে তাতে আগুন লাগানো হতো। দেখতে দেখতে সে আগুন উঁচু হয়ে জ্বলে উঠতো। মালি আর অন্য চাকরেরা বালতি করে জল, গাছের ডাল ইত্যাদি নিয়ে তৈরি থাকতো, যাতে আগুন ছড়িয়ে না পড়ে আর আমরা আগুনের যতটা কাছে যাওয়া সম্ভব, ততটা এগিয়ে তাকে ঘিরে থাকতাম। কান ভরে যেত আগুনের গানে। সে গান কাঠ-ফাটা আগুনের আওয়াজ দিয়ে তৈরি নয়, চাপা একটা গণ-গণ সুর। এখনো সে আমার কানে লেগে আছে। আর কি সুন্দর গন্ধ। পাকা ফল, শুক্‌নো খড় কিম্বা মিহি একটু কস্তুরির গন্ধ নাকে এলো—সে গন্ধের কথা মনে পড়ে।

যখন সারা মুখ আর শরীরের সামনের দিকটা তেতে আগুন হয়ে যেত, তখন সরে দাঁড়াতে বাধ্য হতাম। সকলের মুখ লাল, চোখ চক্‌চকে। তারপর সব পাতা পুড়ে ছাই

হয়ে যেত, আগুনের হল্‌কা নেমে যেত, তবু অনেকক্ষণ পর্যন্ত ছাইগুলির মধ্যে লাল্‌চে রং দেখা যেত। রাত বাড়লে আমাদেরও ঘরে যেতে হতো। সামনেটা গরম, পিঠটা ঠাণ্ডা, সারা গায়ে পোড়া পাতার মিষ্টি গন্ধ নিয়ে যখন খেতে বসতাম, মনটা যেন কেমন করতো।

আস্তে আস্তে ন্যাসপাতির ডাল একেবারে ন্যাড়া হয়ে যেত। নীল আকাশের গায়ে হাত-পা মেলে কত দিন গাছগুলি কেমন যেন একটা বেপরোয়া ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো। শীত এগুতে থাকতো। ন্যাসপাতি গাছ তাদের এবড়ো-খেবড়ো ছালে ঢাকা গুঁড়ি আর ডালপালা নিয়ে শীতের শেষের জন্যে অপেক্ষা করে থাকতো। ডিসেম্বর কাটতো, জানুয়ারী কাটতো, ফেব্রুয়ারীতে খুব নজর করে দেখলে মনে হতো—খোঁচা খোঁচা ডালপালার খাঁজে খাঁজে আর ডগায় যেন খোঁচার বদলে একটুখানি গোলভাব দেখা যাচ্ছে। ফেব্রুয়ারীর শেষে আর কোন সন্দেহই থাকতো না। ডালপালা আর গাছের গুঁড়িকে কালো দেখাতো, কিন্তু খাঁজের মধ্যে আর ডালের আগায় যেন লাল্‌চে আভা। আরো কিছুদিন কাটতো। মার্চের গোড়ায় আমাদের লম্বা শীতের ছুটি ফুরিয়ে যেত। রোজ ঘুম থেকে উঠে একবার করে গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়াতাম। এখন আর চিনতে ভুল হতো না। ছোট ছোট ডালের আগায় গোছা গোছা কুঁড়ি দেখা দিচ্ছে। প্রথমে ইটের মত শক্ত, ছোট ছোট গুটি যেন। কিন্তু ক্রমে যখন চারদিকে বসন্তকাল সাড়া দিত, শুক্‌নো ঘাসে সবুজ দেখা যেত, তার মধ্যে সাদা, গোলাপী ক্রোকাস ফুল ফুটতো, তখন কুঁড়িগুলিও যেন আগ্রহে অধীর হয়ে উঠতো।

হয়তো মার্চের শেষে কিম্বা এপ্রিলের গোড়ায় হঠাৎ একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখতাম, রাতারাতি ন্যাসপাতি গাছের ন্যাড়া ডাল সাদা ফুলের থোপায় ঢেকে গেছে। তখন ফুল ছাড়া আর কিছু চোখে পড়তো না। সে ফুলের তুলনা হয় না, ভাষায় তার বর্ণনা দেওয়া যায় না, মনের সম্পদ হয়ে থাকে সে। তার মৃদু গন্ধ গাছতলায় না গেলে টের পাওয়া যায় না। কয়েক সপ্তাহ ধরে ফুটে ফুটে সব ফুল যখন ঝরে পড়ে যেত, তখনো মন খারাপ করবার অবকাশ থাকতো না। দেখতাম ক্ষুদে ক্ষুদে গুটির মত ছোট্ট ছোট্ট ফল। মাথার উপরে অনেক উঁচুতে। কেউ যদি বা সাহস করে গাছে উঠে টিপে দেখতো, বলতো—উঃ, পাথরের মত শক্ত। আরো সাহস করে যদি কামড়ে দেখতো, বলতো বেজায় কষা।

অবশ্য দুঃখ করবার কিছু থাকতো না। কারণ এই সময় আরেকটা জিনিষ লক্ষ্য করতাম। গাছে আরো অনেক কুঁড়ি দেখা দিচ্ছে, ছোট ছোট ডালের খাঁজ থেকে একটু লম্বাটে গড়নের থাক থাক দাগকাটা কুঁড়ি। দেখতে দেখতে সেগুলিও খুলে যেত। দেখতাম হাজার হাজার কোমল কচি পাতা। চোখের সামনে পাতাগুলি বড় হয়ে সমস্ত কচি ফলকে আড়াল করে ফেলতো। তখন গাছটার আরেক রকম বাহার হতো।

কিন্তু অনেক দিন ধরে যেন আর কোন পরিবর্তন চোখে পড়তো না। খুব ভাল করে নজর করলে অবশ্য চোখে পড়তো ক্ষুদে ফলগুলি কেমন বাড়ছে। অনেকগুলি ছোট অবস্থায় খসে গিয়ে গাছতলায় পড়ে থাকতো। গাছের মাথার উপর দিয়ে গ্রীষ্ম কাটতো, বর্ষা কাটতো। আর সে কি প্রবল বর্ষা! কিন্তু পাতার ছাতার নীচে আমাদের ন্যাসপাতি ফলগুলি নিরাপদেই থাকতো।

তারপর বর্ষাও শেষ হয়ে যেত। গাছ যেন মাথা ঝাড়া দিয়ে আরো সবুজ, আরো সতেজ হয়ে উঠতো। তখন আমরা খেয়াল করতাম গাছের ডালপালাগুলি কত নীচে নেমে এসেছে। তাকেই বলে ফলের ভারে নুইয়ে পড়া। শরৎকালের ফল দেখতে বেশ বড়, লোভনীয়ও বটে। কিন্তু তাকে বাদুড়েও খেত না, পাখীতেও ঠোক্‌রাতো না। শরতের শেষে ফলে হল্‌দে রং ধরতো, সুগন্ধে চারদিক ম'-ম' করতো। রাতে বাদুড়েরা মহা ঝগড়াঝাটি করতো, দিনে পাখীরা ঝাঁক বেঁধে আসতো। আমরা তাদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে ফল খেতাম। পাখীতে ঠোক্‌রানো, বাদুড়ে আঁচড়ানো ফলগুলিই সবচেয়ে মিষ্টি লাগতো। একটুও ঘেন্না হতো না। জখম হওয়া জায়গাটুকু কেটে ফেলে দিতাম।

মাঝে মাঝে রাতে ধুপ্ করে শব্দ হতো। বুঝতাম বড় একটা ফল পেকে পড়ে গেল। সকালে অমনি ছুটাছুটি। পৃথিবীতে এত আনন্দ কম জিনিষেই পাওয়া যায়।

লীলা মজুমদার

জেনে রাখ

শেষ বরফযুগের সুরু হয়েছিল প্রায় 50,000 বছর পূর্বে। এই বরফস্তর উত্তর আমেরিকার প্রায় 27,820,000 বর্গ কিলোমিটার জয়গা ঢেকে ফেলেছিল। উইসকনসিনও সেই সময় বরফ-



স্তূপের নীচে চাপা পড়েছিল। আজ সেখানে একটি সংগ্রহশালা স্থাপিত হয়েছে। সেখানে হাজার হাজার বছর পূর্বেকার সেই হিমযুগের হিমবাহ কর্তৃক স্বাভাবিক কারণেই সৃষ্ট নানাপ্রকার অদ্ভুত প্রস্তরসামগ্রী রক্ষিত আছে।

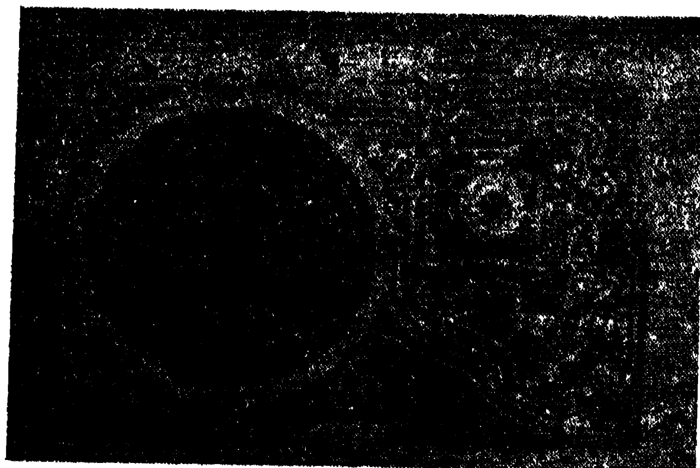
ছাপা সার্কিট

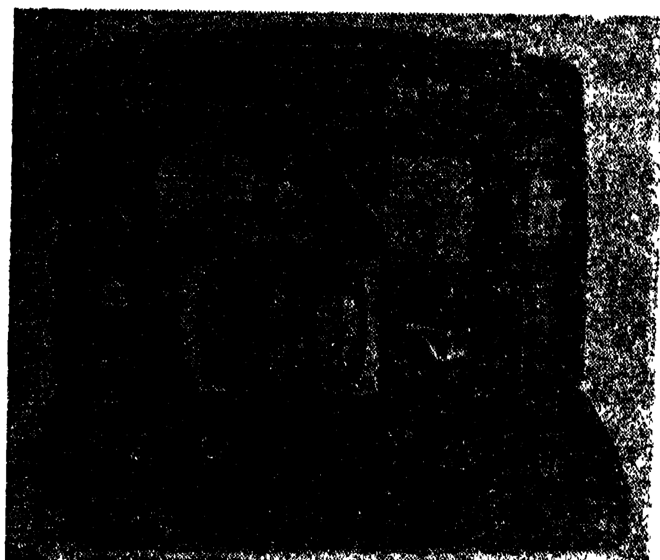
কাগজের উপর ছাপা অক্ষর তো তোমরা হামেশাই দেখেছ (এখনো তো দেখছো), আর ছাপা কাপড়ের সার্ট বা ছাপা শাড়ির সঙ্গে তোমাদের অনেকেরই নিশ্চয় ভাল রকম পরিচয় আছে। কিন্তু ছাপা সার্কিটের (Printed circuit) বিষয়টা হয়তো তোমাদের কাছে নতুন। ঐ সার্কিট সম্বন্ধে কিছুটা প্রাথমিক আলোচনা করবার জন্যে বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

প্রচলিত সার্কিট বনাম ছাপা সার্কিট

আধুনিক যুগে প্রগতির অন্যতম বাহক যে ইলেকট্রনিক্স, সেই ইলেকট্রনিক্সের ব্যাপক ও সূক্ষ্ম ব্যবহারে ছাপা সার্কিটের অবদান অনেকখানি। রেডিও, টেলিভিসন, কম্পিউটার প্রভৃতি ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির ভিতর রোধক (Resistor), আবেশক (Inductor), ধারক (Capacitor), ভাল্‌ব বা ট্রানজিস্টর, পরিবর্তক (Transformer) প্রভৃতি বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্যে ধাতব তারের ব্যবহার বহুকাল ধরে প্রচলিত রয়েছে। এই সব উপাদান এবং সংযোগকারী তার দিয়ে গড়ে ওঠে ইলেকট্রনিক সার্কিট, যার ভিতরের তড়িৎ-প্রবাহ ঈপ্সিতভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ঐ সার্কিটে প্রত্যেকটি তারের প্রান্তকে আলাদা আলাদা ভাবে নির্দিষ্ট উপাদানের প্রান্তের সঙ্গে সযত্নে ঝালাই (Solder) করে লাগিয়ে দিতে হয়। যে কোন জটিল সার্কিটে বহুসংখ্যক তার ব্যবহার করতে হয় বলে সেই সার্কিট তৈরি করতে প্রচুর সময় ও পরিশ্রম ব্যয়িত হয় এবং যন্ত্রের মধ্যে ঐ সার্কিটের জন্যে জায়গাও লেগে যায় অনেকখানি। সবচেয়ে অসুবিধা হলো, এই ধরণের সার্কিট স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় প্রস্তুত করা সম্ভব নয়। এই সব অসুবিধা দূর করবার জন্যে ছাপা সার্কিটের উদ্ভাবন হয়েছে। ঐ সার্কিটে প্লাষ্টিক বা সিরামিক জাতীয় অপরিবাহী পদার্থের একখানি বোর্ডের সমতল পৃষ্ঠের উপর প্রয়োজন অনুযায়ী পাত্‌লা ধাতব পাত মুদ্রিত করে সেই সব পাত দিয়ে বৈদ্যুতিক সংযোগের কাজ করানো হয়; অর্থাৎ পাতগুলি ধাতব তারের কাজ করে। এই পাত এক ইঞ্চির কয়েক শ' ভাগের এক ভাগ মাত্র পুরু হয়। প্রত্যেকটি পাতের প্রান্ত নির্দিষ্ট উপাদান জুড়ে দিয়ে ডোবানো ঝালাই (Dip soldering) প্রক্রিয়ায় সমস্ত ঝালাইয়ের কাজ একসঙ্গে করবার ব্যবস্থা থাকে। আবার অনেক ক্ষেত্রে রোধক, আবেশক, ধারক প্রভৃতি কয়েকটি উপাদান পৃথকভাবে সংগ্রহ না করে বোর্ডটির উপর নির্দিষ্ট স্থানে ঐ সব উপাদান তৈরি করা হয় উপযুক্ত কোন পদার্থের পাত্‌লা পাত বা অপরিবাহী বোর্ডের অংশবিশেষকে যথাযথ ভাবে ব্যবহার করে।

ছাপবার জন্যে যে সব পদ্ধতি প্রচলিত আছে, বোর্ডের উপর পাতলা পাত তৈরি করবার কাজে তাদের বেশ কয়েকটির সাহায্য নেওয়া হয়। ঐ বোর্ডটি দেখে মনে হয়, পাতগুলি যেন তার উপর মুদ্রিত করা হয়েছে। ছাপবার কাজে যেমন কাগজ





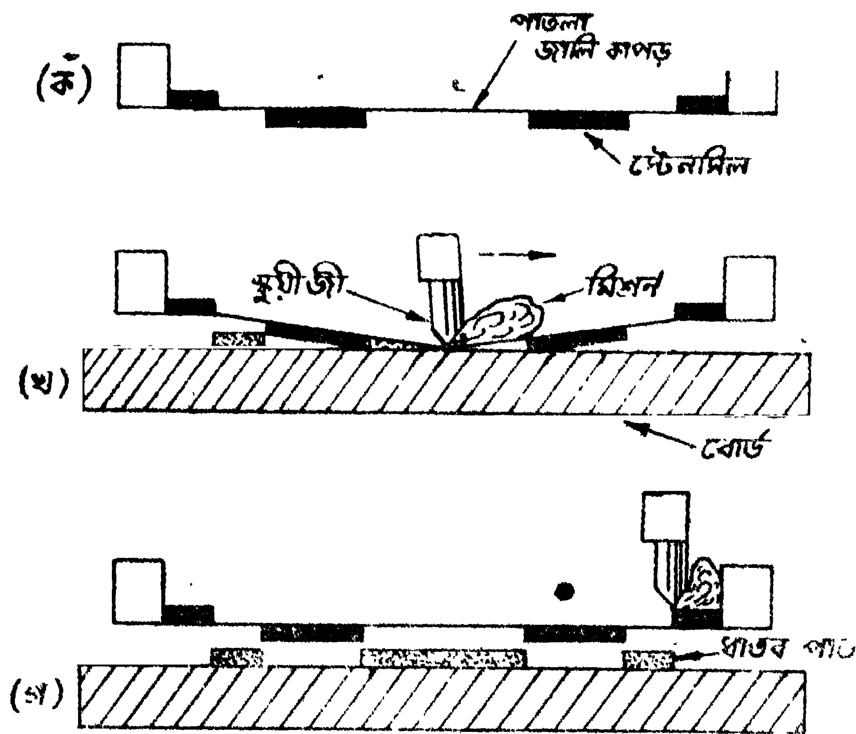
1 নং চিত্র—একটি ট্র্যানজিষ্টর রেডিওর ভিতরের ছাপা সার্কিট। উপরের চিত্রে ছাপা সার্কিটের ধাতব পাতগুলি এবং লাউড-স্পীকার দেখা যাচ্ছে। নীচের চিত্রে দেখা যাচ্ছে ছাপা সার্কিট বোর্ডের অপর পৃষ্ঠের সঙ্গে সংযুক্ত বিভিন্ন ইলেকট্রনিক উপাদান।

বা কাপড়ের উপর হুবহু একই নক্সা অনেকগুলি আঁকা যেতে পারে, এক্ষেত্রেও তেমনি বোর্ডের উপর পাতলা পাতের একেবারে একই ধাঁচে অনেকগুলি তৈরি করা সম্ভব হয়। এই সব কারণে পাতলা পাত সমেত বোর্ডকে ছাপা বোর্ড বলা যেতে পারে এবং ঐ

বোর্ড ব্যবহার করে যে ইলেকট্রনিক সার্কিট তৈরি হয়, তাকে বলা যেতে পারে ছাপা সার্কিট। তবে সাধারণতঃ ছাপা বোর্ডকেই ছাপা সার্কিট নামে অভিহিত করা হয়। 1 নং চিত্রে একটি ছাপা সার্কিটের নমুনা দেখানো হয়েছে।

ইতিবৃত্ত

ছাপা সার্কিট সম্পর্কে ধারণা খুব নতুন কিছু নয়। 1903 সালে বৃটেনে এই বিষয়ে একটি পেটেন্ট গৃহীত হয়। তারপর মাঝে মাঝে এ নিয়ে বেশ কিছুটা গবেষণা হয়েছে। তবে ছাপা সার্কিটের সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য ব্যবহার ঘটে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মর্টারের



2 নং চিত্র—ছাপা সার্কিট গঠনের প্রথম পদ্ধতির বিভিন্ন পর্যায়।

গোলা বিস্ফোরণের ব্যাপারে। এই সময় আমেরিকায় নৈকট্য ফিউজ (Proximity fuse) নামে এমন একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্রের বিষয় পরিকল্পনা করা হলো, যা মর্টারের গোলার অগ্রভাগে বসিয়ে দিলে লক্ষ্যবস্তু থেকে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে গোলাটি আপনা থেকেই বিস্ফোরিত হবে—এর আগে পর্যন্ত মর্টারের গোলা লক্ষ্যবস্তুতে গিয়ে আঘাত করলে তবে তা বিস্ফোরিত হতো। কিন্তু নৈকট্য ফিউজ তৈরি করবার সমস্যা হলো—মর্টারের গোলার অগ্রভাগের যৎসামান্য স্থানে এটিকে ধরাতে হবে, একে যথেষ্ট মজবুত হতে হবে, যাতে মর্টারের গোলা ছোঁড়বার ধাক্কা সে সামলাতে পারে এবং এই ফিউজ তৈরি করবার পদ্ধতি এমন হতে হবে যে, বহুল ব্যবহারের জন্যে একই ধাঁচের যথেষ্ট সংখ্যক ফিউজ যাতে অল্প

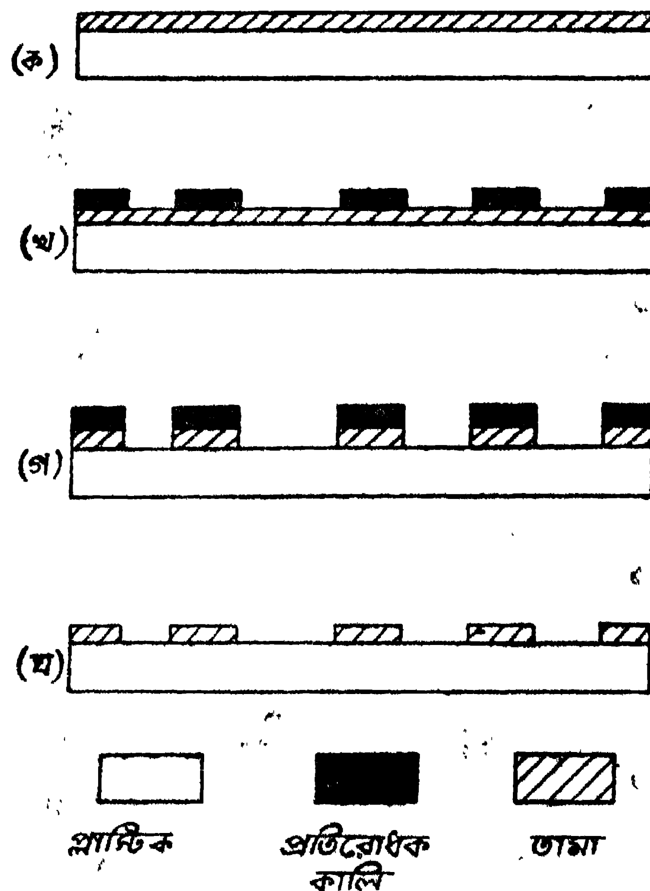
সময়ের মধ্যে উৎপাদন করা সম্ভব হয়। এই সব সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান করা হয় নৈকট্য ফিউজে ছাপা সার্কিট ব্যবহার করে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালে ছাপা সার্কিটের বহুল প্রচলন হয়েছে। আমাদের দেশেও এই সার্কিট তৈরি হচ্ছে এবং ইলেকট্রনিক যন্ত্রাদিতে এর ব্যবহার ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে।

গঠন পদ্ধতি

ছাপা সার্কিট তৈরির জন্যে অপরিবাহী পদার্থের বোর্ডের উপর ধাতব পাত বসানোর যে তিনটি মূল পদ্ধতি আছে, সেগুলি এখন সংক্ষেপে বর্ণনা করছি।

প্রথম পদ্ধতিতে (2নং চিত্র) একটি পাতলা জালি কাপড়ের সঙ্গে ঈপ্সিত সার্কিটের নক্সা অনুযায়ী তৈরি স্টেন্সিল জোড়া থাকে এবং কাপড়টি টান করে বাঁধা থাকে একটি

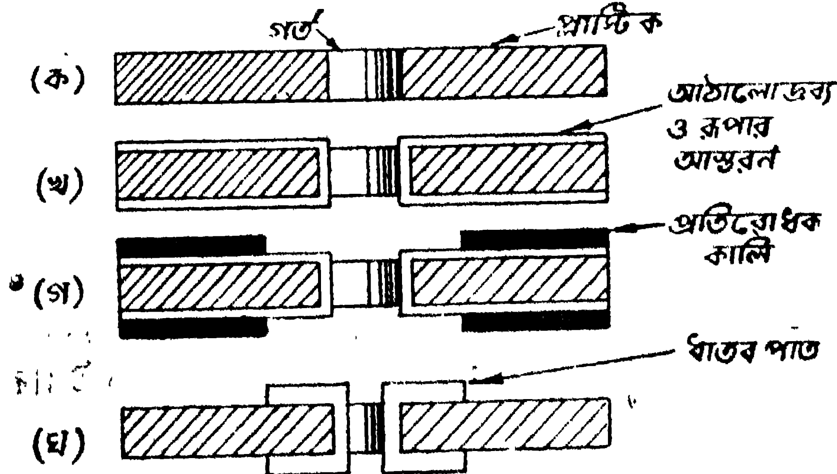


3 নং চিত্র—ছাপা সার্কিট গঠনের দ্বিতীয় পদ্ধতির বিভিন্ন পর্যায়।

কাঠামোর সঙ্গে। উপযুক্ত কোন ধাতব পদার্থকে গুঁড়া করে ধুনা-সদৃশ এক ধরণের দ্রব্যের সঙ্গে মেশানো হয় ও সেই মিশ্রণকে স্কুয়ীজী নামক তলায় রবার দেওয়া পেষকের সাহায্যে স্টেন্সিলের ফাঁকা স্থানগুলির মধ্য দিয়ে অপরিবাহী বোর্ডের তলদেশের উপর লাগিয়ে দেওয়া

হয়। ফলে অপরিবাহী তলদেশের উপর যে ধাতব পাতগুলি গড়ে ওঠে, সেগুলির বিন্যাস হয় ঈপ্সিত সার্কিটের নক্সা অনুযায়ী। নৈকট্য ফিউজের প্রস্তুতিতে এই পদ্ধতিটির সর্বপ্রথম প্রয়োগ হয়েছিল। স্টিয়েটাইট নামক সিরামিক পদার্থের বোর্ডের সমতল পৃষ্ঠের উপর রূপার পাত দিয়ে ঐ সার্কিট তৈরি করা হয়েছিল এবং সেই সার্কিটের রোধক ও ধারকগুলিও ছিল মুদ্রিত।

দ্বিতীয় পদ্ধতিতে (3 নং চিত্র) অপরিবাহী পদার্থের বোর্ডের একটি সম্পূর্ণ তলদেশের উপর ধাতব পদার্থের সূক্ষ্ম আস্তরণ দেওয়া হয়। ছাপবার জন্যে যে সব সুপরিচিত প্রক্রিয়া আছে, সেগুলির সাহায্যে একটি বিশেষ ধরণের প্রতিরোধক কালি (Ink resist) ঈপ্সিত নক্সা অনুযায়ী ধাতব আস্তরণের উপর মুদ্রিত করা হয়। অতঃপর রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে তলদেশটি চাঁচা হলে ঐ কালির প্রতিরোধ ক্ষমতার ফলে তার নীচের ধাতব আস্তরণ অপরিবর্তিত থাকে, কিন্তু বাকী অংশের আস্তরণ উঠে যায়। এর পর কালিটুকু তুলে ফেললে ছাপা সার্কিট তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হয়। বর্তমানে এই পদ্ধতিটিরই সবচেয়ে ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে। 1941 সালে ডক্টর পল আইজলার পদ্ধতিটির প্রবর্তন করেছিলেন।



4 নং চিত্র—ছাপা সার্কিট গঠনের তৃতীয় পদ্ধতির বিভিন্ন পর্যায়।

তৃতীয় পদ্ধতিতে (4 নং চিত্র) তড়িৎপ্রলেপণের সাহায্য নেওয়া হয়। এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হলো, বোর্ডের দু-পিঠের মধ্যে প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক সংযোগ করবার জন্যে যে সব গর্ত করা হয়, তলদেশের উপর ধাতব পাত লাগাবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ গর্তগুলির ভিতরও পাত দিয়ে মোড়া হয়ে যায় এবং বোর্ডের দু-পিঠেই সাধারণতঃ ধাতব পাত বসানো হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিতে প্রথমে অপরিবাহী বোর্ডের উপর একটি আঠালো দ্রব্যের আস্তরণ দিয়ে তার উপর স্প্রে করে রূপার অতি সূক্ষ্ম (এক ইঞ্চির কয়েক লক্ষ ভাগের এক ভাগ) আবরণ দেওয়া হয়, যাতে তড়িৎপ্রলেপণের সময় ঐ রূপার মাধ্যমে তড়িৎ-প্রবাহ সঞ্চালিত

হতে পারে। অতঃপর ঈপ্সিত সার্কিটের ধাতব পাতগুলির নক্সার বিপরীতভাবে প্রতিরোধক কালি রূপার আবরণের উপর মুদ্রিত করা হয়, অর্থাৎ যেখানে যেখানে ধাতব পাত থাকবে, সেখানে কালি মুদ্রিত হয় না। এইবার তামা প্রলেপণের উপযোগী কোন দ্রবণে বোর্ডটিকে ডুবিয়ে ঐ বোর্ডকে ক্যাথোডের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। গর্তগুলির অভ্যন্তরভাগ সমেত যে সব অংশে প্রতিরোধক কালি নেই, সেই অংশগুলিতে তড়িৎ-প্রবাহের ফলে তামা সঞ্চিত হয়ে ধাতব পাতের সৃষ্টি করে। এই পদ্ধতির শেষ পর্যায়ে রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে বা যান্ত্রিক উপায়ে কালি ও রূপার আবরণ তুলে ফেলা হয়।

ছাপা সার্কিট তৈরির পর তাতে রোধক, ধারক প্রভৃতি উপাদান সংযোগের জন্যে ডোবানো ঝালাইয়ের কথা আগেই বলেছি। এই ডোবানো ঝালাই ব্যাপারটা কি? এক্ষেত্রে প্রত্যেকটি সংযোগস্থলে আলাদা আলাদাভাবে ঝালাই করতে হয় না, উপাদান-গুলিকে বোর্ডের উপর যথাস্থানে বসিয়ে এবং বোর্ডটিতে প্রয়োজনীয় ফ্লাক্স লাগিয়ে সেটিকে গলিত ও উত্তপ্ত ঝালের (60 ভাগ টিন ও 40 ভাগ সীসা) মধ্যে নির্দিষ্ট সময় ডুবিয়ে রাখলে সব ঝালাইয়ের কাজই একসঙ্গে হয়ে যায়। পরে কোন উপযুক্ত দ্রবণের সাহায্যে বা অন্য কোন ভাবে অতিরিক্ত ফ্লাক্স সরিয়ে ফেললে উপাদান সমেত ছাপা সার্কিট তৈরির কাজ শেষ হয়।

উপসংহার

ছাপা সার্কিটের মাধ্যমে ইলেকট্রনিক্সে যে ক্ষুদ্রীকরণ ও স্বয়ংক্রিয়তার সূত্রপাত হয়, নানা ভাবে তা অনেকখানি এগিয়ে গেছে। এই প্রসঙ্গে সলিড স্টেট ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটের উল্লেখ করা যেতে পারে। সিলিকন বা জার্মেনিয়াম নামক আধা-পরিবাহী পদার্থের একটি কেলাস ব্যবহার করে কয়েকটি প্রক্রিয়ায় তার বিভিন্ন অংশের ধর্মকে এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হয় যে, ঐ একটি কেলাসই ট্র্যানজিষ্টর, রোধক, ধারক প্রভৃতি উপাদান ও সেগুলির সংযোগকারী ব্যবস্থা সমেত একটি সম্পূর্ণ সার্কিটের কাজ করতে পারে। সলিড স্টেট সার্কিট এত ক্ষুদ্র যে, এক ঘন ইঞ্চিতে যেখানে সাধারণ ট্র্যানজিস্টর সার্কিটের প্রায় 20টি উপাদান ধরতে পারে, সেখানে ঐ সার্কিটের উপাদান ধরে প্রায় 20,000। সলিড স্টেট সার্কিট ইলেকট্রনিক্সের ক্ষেত্রে একটি যুগান্তর সূচিত করছে বললে বোধহয় অত্যুক্তি হয় না।

জয়ন্ত বসু*

* সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9

হিম-কপোতের খোঁজে

দূরদেশের এক পাখীওয়ালা একবার আমাকে বলেছিল, হিমালয়ের চূড়া যেখানে মেঘ ফুঁড়ে উঠেছে, তার বরফ জড়ানো গা থেকে সে হিম-কপোতকে উড়ে আকাশে মিলিয়ে যেতে দেখেছে। সে পাখী কেউ জ্যান্ত ধরতে পারে না।

পাখীওয়ালার কথা রূপকথা বলেই ভাবতাম, যদি বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে পাখা দেখবার বাতিক আমাকে না পেয়ে বসতো। দেশ-বিদেশের পাখীর বইয়ের পাতা ওলটাতে ওলটাতে একদিন হিম-কপোত (Snow pigeon) নামটি চোখে পড়লো। বইতে পাখীটির ছবি ছিল না। শুধু লেখা ছিল—পাখীটির পালকের সবটাই প্রায় সাদা, হিমালয়ের তুষার অঞ্চলে তার বাস। এতটুকু বিবরণে আমি খুসী হতে পারি নি। হিমালয়ের আকর্ষণ আমার ছোটবেলা থেকেই। পাখীটির জন্যে সে আকর্ষণ আরো বেড়ে গেল।

হিমালয়ে বরফ-সীমার সুরু সাধারণতঃ চৌদ্দ হাজার ফুট থেকে, সে খবর নিয়ে নিলাম। আর বরফের কাছাকাছি সহজে পৌঁছুবার উপায়—তীর্থযাত্রীদের পথ ধরে



হিম-কপোত

হিমালয়ের তীর্থের যে কোনটাতে পৌঁছে যাওয়া। বরফ যখন তীর্থের কাছাকাছি, হিম-কপোতের দেখা সেখানে পেলেও পেতে পারি। হৃষীকেশ থেকে গঙ্গার ধার ধরে আমাদের বাস চললো ঘন বনের ভিতর দিয়ে। তখন শ্রাবণের শেষাশেষি, তের-শ' পচাত্তর সাল।

হিমালয়ে উঠতে গেলে সুরুতে এমন বনের দেখা মিলবে সবখানে। তরাই বনের নাম শুনেছ সবাই। শাল, শিশু, শিরীষ, কাঞ্চন গাছগুলি দেখেই চিনলাম। উঁচু গাছগুলির তলায় বেত আর ল্যাপ্‌টানার ঝোপ, মাঝে মাঝে দু-একটি খেজুর গাছ মাথা তুলে আছে। এমনটি চললো হাজার তিনেক ফুট পর্যন্ত।

কিছু পথ উঠতেই ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপ্‌টা এসে কাঁপিয়ে দিল বাসশুদ্ধ সবাইকে। বাইরের হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গাছের চেহারা পাল্টে গেছে বিলকুল। মাটি আর হাওয়ার গুণে গাছের প্রকৃতি ঠিক হয় জানি, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি চোখের সামনে এমন পরিবর্তন দেখবো ভাবি নি। সারি সারি চির গাছ (Pine), পথের পাশে শাল-শিশুরা জায়গা দখল করে নিয়েছে। হিমালয়ের নিম্ন বা গ্রীষ্মবলয় ছেড়ে যে নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে উঠে এসেছি, বুঝতে পারলাম। সরলবর্গের গাছ ছাড়াও চওড়া পাতার গাছ দেখছি, তবে উঁচু থেকে উঁচুতে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে গাছের গড়ন-ধরণ যেন বদ্‌লে গেল। টেহরী শহরে এসে দেখি পাহাড়ের গড়নও যেন একটু বদ্‌লেছে। হিমালয়ের প্রথম সারি, যাকে ভূতাত্ত্বিকেরা শিবালিক শ্রেণী নাম দিয়েছেন, সেটা পেরিয়ে এবার মধ্য সারির ভিতর দিয়ে চলেছি—টেহরীর পর কিছু পথ ন্যাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে। পাহাড়গুলির চূড়া অবধি কোথাও গাছ বলতে কিছু নেই। আর তাতেই আগাগোড়া পাহাড়গুলির খাঁজ, ফাঁটল স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পাহাড়ের উচ্চতা অবশ্য এমন নয়, যেখানে গাছের সীমানা শেষ হয়ে যেতে পারে। টেহরীতে গাছপালা, চাষ-আবাদ দেখলাম। কিন্তু তারপরেই এই পথটুকুর দু-পাশের পাহাড়গুলি শুধু ঘাসে ঢাকা রয়েছে কেন—বাসে বসে অনেক ভেবেও তার কারণ খুঁজে পেলাম না। আসলে হয়তো বড় গাছের শিকড় ধরে রাখবার মত মাটি ছিল না পাথরের উপর, আর নয় তো মাটির গুণই এমন, যাতে ঘাস ছাড়া আর কিছু হয় নি। সব কিছু খুঁটিয়ে দেখবার সুযোগ পাই নি। একটা পাহাড়ের বাঁক ঘুরতেই আবার গাছের দেখা পেলাম। এবার চওড়া পাতার শাল গাছের মাঝে মাঝে চির-ঝাউ মিশে গেছে। এই বনের শেষে ধরাসু গ্রাম। বাস দাঁড়ালো। জড়তা কাটাতে নেমে এলাম পথে।

খুব কাছ থেকে ভাগিরথীকে এবার দেখতে পেলাম। সাদা ঘোলা জলের স্রোত বয়ে চলেছে। নদীর জলের রং এমন সাদা কি করে হলো বুঝতে পারলাম না। পাশেই ঝর্ণার জল কিন্তু পরিষ্কার। ঝর্ণার জল যেখানে ফেনা হয়ে নদীর বুকে পড়ছে, তার কাছেই একটি হল্‌দে খঞ্জন (Yellow wagtail) লেজ নাচিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। টেলিগ্রাফের তারের উপর বসে ছিল যে পাখীটা, ঝুপ করে জলে পড়েই আবার উঠে এলো। তাকে চিনলাম—ফট্‌কা মাছরাঙা (Pied kingfisher)। মনে মনে খুসী হলাম—হিমালয়ের পাখীর দেখা পাচ্ছি বলে।

ধরাসু থেকে চড়াই বেয়ে বাস ছুটলো উত্তরকাশীর দিকে। যে পথ ধরে এসেছি, ভেবেছিলাম সামনের পথও তেমনি, কিন্তু তা নয়। পাহাড়ের গায়ে ঝোপ-ঝাড় কমে এসেছে। পাহাড়ের গায়ের খাঁজ এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে হামেশাই পাল্টে যাচ্ছে—এমন কি, চূড়াও। তীরের ফলার মত—তাবুর মত চূড়া দেখলাম, দেখলাম টেবিলের মত চ্যাপ্‌টা চূড়া। পাহাড়ের গায়ের রঙেরও কত রকমফের! লাল্‌চে, নীল, সাদাটে, কালো কত রঙের পাহাড়। কেন এমন হয়? গাছপালার জন্যে—না, পাথরের রঙের পাহাড়ে হেরফের হয় বলে? পাহাড়ের রূপ নিয়ে এমন ভাবনায় পড়েছিলাম যে, বাস কখন বনের পথে ঢুকে পড়েছে, খেয়াল করি নি। সূর্যাস্তের আগেই পৌঁছে গেলাম উত্তরকাশী।

গঙ্গোত্রী-গোমুখ যাবার অনুমতি নেবার জন্যে থাকতে হলো সেদিন সেখানে। সন্ধ্যায় হোটেলের বারান্দায় বসে চোখ বুজে অলস সময় কাটাচ্ছিলাম। সামনেই ছোট্ট সব্‌জী বাগান। বুলবুলির ডাক শুনে কানখাড়া করে চোখ মেললাম। দেখি সাদা গাল ছুটি বুলবুল ঢ্যাড়স গাছে বসে ডাকাডাকি সুরু করেছে। এই জাতের বুলবুল সমতলে দেখি নি আগে। ভাল করে দেখবো বলে একটু নড়তেই উড়ে গেল।

উত্তরকাশীর পর ঝালা অবধি পথের দু-পাশের পাহাড় দেখি শক্ত কাল্‌চে পাথরের। এমনটি তার আগের পথে দেখি নি। নদী এই পাথরের বুক কেটে গভীর খাত বানাতে পারে নি। ঝালার কাছেই সুখা পাহাড়—নরম মাটি আর পাথরের টুক্‌রা অনবরত ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ছে। ভাগীরথী বিশাল চওড়া হয়েছে পাড় ভেঙ্গে ভেঙ্গে। ঝালা থেকে পা বাড়ালাম চির-দেওদার বনের ভিতর দিয়ে।

হিমালয়ের পথ চলতে গাছপালা ও পশুপাখী দেখে উচ্চতার আন্দাজ করা যেতে পারে। দেওদার আর চির গাছের সুন্দর গন্ধ পাচ্ছি। দেওদারের এমন ঘন বন ছয় হাজার ফুটের নীচে দেখি নি। আর দেখি নি থিরথিরা পাখীটিকে (Whiteheaded Red Start)। একটি সাদা-মাথা থিরথিরা পাখী ঝর্ণার ধারে পাথরের পর পাথরে ঘুরে ঘুরে খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছে।

পেরিয়ে গেলাম হরসিল, ধরালী গ্রাম। পেরুলাম জংলা চটি। তারপর দিনের শেষে প্রায় হামা দিয়ে উঠে এলাম ভৈরবঘাঁটি। ছয় হাজার থেকে ন' হাজার ফুট। নদীর ক্ষয়ের জন্যে হরসিল ও ধরালী বরাবর বিরাট এক উপত্যকা গড়ে উঠেছে। জংলা চটির কাছে ভাগীরথী সরু নালার মত পথে বেরিয়েছে। ছোট পুলের উপর দিয়ে পার হলাম। তারপর বুকভাংগী চড়াই উৎরে ভৈরবঘাঁটি। দেওদার ঘেরা। বাতাসে তেমন ঠাণ্ডা ভাব নেই। জলে যেন একটু গন্ধকের গন্ধ। আমার চোখে হিমালয়ের ধরণ-ধারণটাই

কেমন যেন অচেনা ঠেকছে। যত উঁচুতে উঠছি, সবকিছুই যেন নীচের থেকে বদ্‌লে যাচ্ছে। সামনে আরও নতুন কত কি যে দেখবো! উঠে দাঁড়ালাম। গঙ্গোত্রী আর মাত্র সাত মাইল।

এই সাত মাইল পথ যেন হাওয়ায় ভেসে চলে এলাম। প্রায় সবটা পথই চির আর দেওদার বনের ভিতর দিয়ে চলে গেছে। মাঝে মাঝে কয়েকটি ভূর্জ (Birch) আর মন্দার বা রডোডেনড্রনগাছ। ভূর্জ গাছ জীবনে এই প্রথম দেখলাম। পরতে পরতে বাদামী বাকল জড়ানো, কিন্তু উপরের বাকল সাদা ও মসৃণ। পাতা চওড়া। চওড়া পাতার আর কোন গাছ নজরে পড়লো না। ঝরে-পড়া শুক্‌নো চির-দেওদারের পাতার উপর দিয়ে হাঁটবার সময় মনে হলো, সারা পথ যেন কার্পেট বিছানো। গঙ্গোত্রী পৌঁছে এক আশ্রমিকের কুটীরে গরম কম্বলের নীচে শুয়ে আরামে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালেই এক আশ্রমিককে হিম-কপোতের কথা জিজ্ঞেস করলাম। ইনি হিমালয়ের প্রাণী ও উদ্ভিদের একজন সার্থক পর্যবেক্ষক। বললেন, গঙ্গোত্রী থেকে আরও উঁচুতে প্রায় এগারো হাজার ফুটেরও উপরে, যেখানে মেষপালকেরা ভেড়া চরায়, সেখানে কোন কোন সময় তিনি হিম-কপোতের ঝাঁক দেখেছেন। ধৈর্য ধরলে আমিও দেখতে পাব। পথ দেখাবার সঙ্গী ঠিক করে দিলেন বিখ্যাত পাহাড়-চড়ুয়া দলীপ সিংজীকে।

পিঠের ঝোলায় দিনের খাবার আর কাঁধে দূরবীন ঝুলিয়ে গোমুখের পথে রওনা হলাম। যত এগুলাম গাছপালা কমে এলো। মাইলের পর মাইল নেড়া বালু বালু পাহাড় শুধু ঘাস গায়ে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড়গুলির রং সাদাটে, মনে হয় যেন চুন মেশানো। হয়তো জুরাসিক যুগ থেকেই এখানে এমনি দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভূর্জবাসায় যখন পৌঁছুলাম তখন পড়ন্ত বিকেল। চারদিক নিঝুম। দূর থেকে এক মেষপালকের শিস্ শুনতে পেলাম। তারপরেই কুকুরের ডাক। সেদিকে দূরবীন ফেরাতেই এক ঝাঁক পায়রা দেখতে পেলাম। গলা ও মাথা কালো। পালকের রং নীলাভ সাদা। ওড়বার ভঙ্গী পায়রার মত। বরফের চূড়া পেরিয়ে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল।

সেই রাত ভূর্জবাসায়। ভুমো ভুমো পাথরের চাঁই ডিঙ্গিয়ে মাইল দুই হেঁটে পরদিন এক বিরাট বরফের চাঁইয়ের উপর দাঁড়িয়ে গোমুখ দেখলাম। বরফের বিরাট এক গুহা থেকে রাশি রাশি জল ঘর্ঘর শব্দে বেরিয়ে আসছে। আশেপাশের ছাই রঙের মাটি মিশে মিশে জল ঘোলাটে সাদা হয়ে গেছে। দলীপ সিং বললেন, গঙ্গোত্রী হিমবাহ আরও উপরে। এই জল আসছে রক্তবরণ, চতুরঙ্গী, গঙ্গোত্রী, কীর্তিবামক প্রভৃতি হিমবাহ থেকে। তিনি আমাকে সুদর্শন, শিবলিঙ, কেদারনাথ শৃঙ্গগুলি চিনিয়ে দিলেন। তারপর ঘরের দিকে রওনা হলাম। আমার চোখ খুঁজে বেড়াচ্ছিল একটি সাদা পাখী—হিম-কপোত।

ভূর্জবাসার কুটির থেকে পথ একটু উঁচুতে। কয়েকটি বেঁটে বেঁটে দেওদার কিম্বা চিরগাছ একটি সাদা পাথরের পাশেই উঠেছে, যার উপর ভর দিয়ে আমাকে পথে উঠতে হবে। হাত বাড়াবো কি, পাথরের গায়ে মিশে আছে ধবধবে সাদা পায়রা একটি। লেজের প্রান্তটুকু কালো। এমন করে ডানা গুটিয়ে বসে আছে যে, তার কালচে পিঠ গাছের ছায়া আর পাথরের রং তাকে প্রায় অদৃশ্য করে রেখেছে। আমাকে দেখবামাত্র ধবধবে সাদা ডানা মেলে সেটা উড়ে গেল। সেদিন ছিল রবিবার, পাঁচই আশ্বিন, তেরো-শ' পচাত্তর সাল।

জীবন সর্দার

জেনে রাখ

ক। এক সময়ে বজ্রপাত সম্বন্ধে অনেক রকমের কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। অনেকেই বিশ্বাস করতো, দানা-দৈত্য ও অশুভ শক্তির প্রভাবে বজ্রপাত ঘটে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিক-বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনই আকাশে ঘুড়ি উড়িয়ে প্রমাণ করেন যে, বজ্রপাত বিদ্যুৎশক্তিরই এক প্রকার অভিব্যক্তি মাত্র। বজ্রপাতের প্রকৃত কারণ ও তার প্রকৃতি সম্বন্ধে সব কিছুই জানা যায় নি। যুক্তরাষ্ট্রের বনবিভাগের কর্তৃপক্ষ যান্ত্রিক উপায়ে ঝড়-ঝঞ্ঝার সময় নির্দোষ ও অগ্নিপ্রজ্বালক বজ্রপাতের পার্থক্য নির্ণয়ের চেষ্টা করছেন।



ক



খ



গ

খ। এই বিষয়ে সাফল্যলাভ করা সম্ভব হলে সর্বাধিক বিপজ্জনক এলাকায় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা করা সম্ভব হতে পারে। অপরাহ্নের পরেই সাধারণতঃ বিপজ্জনক বজ্রপাত ঘটে থাকে। তখন যে দাবানল প্রভৃতি গুরুতর অবস্থার সূত্রপাত হয়, তা অনেক ক্ষেত্রেই প্রথমে জানা যায় না। পরের দিন যখন আগুন বিপজ্জনক অবস্থায় উপনীত হয়, তখন প্রতিকারের উপায় থাকে না। এখন ইনফ্রারেড স্ক্যানিং-এর সাহায্যে সামান্যতম আগুনের উত্তাপও সহজেই জানা যেতে পারে। বনবিভাগের কর্তৃপক্ষ এখন ইনফ্রারেড সরঞ্জামসহ এরোপ্লেনের সাহায্যে বজ্রপাতের ফলে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড ঘটবার অনেক পূর্বেই তা জানতে পারে।

গ। এইসব পর্যালোচনার ফলে বোঝা যায়—পজিটিভ এবং নেগেটিভ বিদ্যুৎআধান শূন্যস্থানের মধ্যদিয়ে লাফিয়ে যাবার মতন শক্তিশালী না হওয়া পর্যন্ত সঞ্চিত হতে থাকে। বজ্রাগ্নি দৈর্ঘ্যে অনেক মাইল পর্যন্ত হতে পারে, কিন্তু পাশের দিকে এক ইঞ্চি থেকে ছয় ইঞ্চির বেশী হয় না। এই বজ্রপাত এক মেঘ থেকে অন্য মেঘে এবং মেঘ থেকে পৃথিবীতে অথবা পৃথিবী থেকে মেঘেও যেতে পারে। বজ্রপতনের গতিবেগ সেকেণ্ডে 55 মাইলের মতন।

পারদর্শিতার পরীক্ষা

বিভিন্ন ধরণের বুদ্ধির সমস্যার সমাধানে তোমরা কে কেমন পারদর্শী, তা বোঝবার জন্যে নীচে 5টি প্রশ্ন দেওয়া হলো। প্রত্যেকটি প্রশ্নের জন্যে নম্বর হচ্ছে 20। কোন প্রশ্নের মধ্যে ভাগ থাকলে প্রত্যেকটি ভাগেই সমান নম্বর। উত্তর দেবার জন্যে মোট সময় 10 মিনিট। তোমরা যে যেমন নম্বর পাবে, সেই অনুযায়ী পারদর্শিতার পরিমাপ এইভাবে করা যেতে পারে :—

নম্বর	পারদর্শিতা
80—100	খুব বেশী
60—79	বেশী
40—59	চলনসই
20—39	কম
0—19	খুব কম

প্রশ্ন 1—মনে করো, তোমার এক বন্ধুকে বলা গেল, তার পকেটে যত পয়সা আছে, তাকে 2 দিয়ে গুণ করে তার সঙ্গে 5 যোগ করতে এবং সেই যোগফলকে আবার 50 দিয়ে গুণ করতে। তারপর তার বয়স যত বছর, সেই সংখ্যাকে যোগ করতে বলা হলো ঐ গুণফলের সঙ্গে। এবার যে সংখ্যা পাওয়া গেল, তা থেকে বিয়োগ করতে বলা হলো 1971 সালের মোট দিনের সংখ্যা। বন্ধু জানালো, ফল দাঁড়াচ্ছে 2100। বলো তো তোমার ঐ বন্ধুর পকেটে কত পয়সা ছিল এবং তার বয়সই বা কত ?

প্রশ্ন 2—24 জন সৈন্যকে কি ভাবে 6টা সারিতে দাঁড় করানো যেতে পারে, যাতে প্রত্যেক সারিতে সৈন্য থাকবে 5 জন করে ?

প্রশ্ন 3—(ক) ধরা যাক, a ও b দুটি ধনাত্মক সংখ্যা এবং $a>b$। এখন, একজন লিখলো

$$ab>b^2$$

$$\therefore\ (ab-a^2)>(b^2-a^2)$$

অর্থাৎ $a\,(b-a)>(b+a)\,(b-a)$

সুতরাং $a>(b+a)$

কিন্তু তা তো হতে পারে না। উপরের ধাপগুলির মধ্যে কোথায় ভুল হচ্ছে, বলতে পারো ?

(খ) আমরা জানি

$\frac{1}{4}$ টাকা = 25 পয়সা

দু-দিকেরই বর্গমূল নিয়ে যদি আমরা লিখি

$\frac{1}{2}$ টাকা = 5 পয়সা,

তাহলে সেটা তো আর ঠিক হতে পারে না! বলতে পারো, ভুলটা কোথায় হচ্ছে?

প্রশ্ন 4—50 পয়সা, 25 পয়সা ও 5 পয়সার মোট 20টি মুদ্রায় যদি কাউকে 4 টাকা দিতে হয়, তাহলে তাকে কোন্ মুদ্রা ক'টি দিতে হবে?

প্রশ্ন 5—নীচের অঙ্কগুলি কি ভাবে ব্যবহার করলে প্রতি ক্ষেত্রেই 100 পাওয়া যাবে?

(ক) 5টি 1

(খ) 5টি 3

(গ) 5টি 5

(উত্তরের জন্যে 627 নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

ব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত ও জয়ন্ত বসু*

* সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9

জানবার কথা

খাদ্যের সন্ধানে হাতী যখন দলবদ্ধভাবে বনে বিচরণ করে, তখন তারা ভীষণ শব্দ করে সারা বন তোলপাড় করে তোলে। কিন্তু এই সময়ে তারা যদি কোন বিপদের সম্ভাবনা দেখে—তখন তারা আত্মরক্ষার জন্যে নিঃশব্দে প্রস্থান করে—সামান্য একটু পাতার শব্দও শোনা যায় না।

সোনা

আদিম প্রস্তর যুগ থেকে সুরু করে আজকের নিউক্লিয়ার যুগ পর্যন্ত সোনাই একমাত্র ধাতু—যা মানুষকে সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে। সোনার সন্ধানে মানুষ ঘর ছেড়ে দুর্গম পথে পাড়ি দিয়েছে—এমন কি, অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করতেও ইতস্ততঃ করে নি।

সোনা শুধু ধাতুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ নয়—ব্যবহারের দিক দিয়েও খুবই প্রাচীন—যদিও স্বর্ণযুগের সঠিক হিস'ব এখনো ঐতিহাসিকেরা নির্ধারণ করতে পারেন নি।

তোমরা শুনলে আশ্চর্য হবে যে, পীরেনীজ পর্বতের একটি গুহার মধ্যে পাথরের নীচে চাপা পড়া অবস্থায় নব্য প্রস্তর যুগের পাথরের হাতিয়ারের সঙ্গে পাওয়া গেছে প্রচুর সোনা এবং সেই সঙ্গে আবিষ্কৃত হয়েছে একটি সোনার হার—যা একটি যুবতী মেয়ের কঙ্কালের গলায় পরানো ছিল। এথেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে—সেই সুদূর নব্য প্রস্তর যুগ—যে যুগ আরম্ভ হয়েছিল আজ থেকে প্রায় বারো-চৌদ্দ হাজার বছর আগে—তখনো মানুষ সোনা সংগ্রহ করবার কৌশল জানতো এবং পাথরের পালিশ করা অলঙ্কারের সঙ্গে সোনার অলঙ্কারও ব্যবহার করতো। তবে সকলেই নয়—কারণ বর্তমানের মত তখনো সোনা ছিল দুষ্প্রাপ্য এবং সংগ্রহ করাও ছিল কঠিন।

এছাড়া সাত-আট হাজার বছর আগের যে সব প্রত্ন-সামগ্রী আবিষ্কৃত হয়েছে, তার সঙ্গে সোনার গহনাও পাওয়া গেছে। খুব প্রাচীন গ্রীক গাথায়—বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া মিশরীয় প্যাপিরাসে লেখা কাহিনীতে সোনার উল্লেখ পাওয়া যায়। খৃষ্টের জন্মের 6000 হাজার বছর আগেও এশিয়া মাইনরের লিডিয়াতে রাজার ছবিসমেত সোনার শীলমোহর ব্যবহারের প্রথা চালু ছিল। এর জের কিছুদিন আগে পর্যন্ত কয়েকটি দেশে চলেছিল। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, পৃথিবীর প্রাচীনতম সোনার খনি-গুলিতে খৃষ্টের জন্মের 3000 হাজার পূর্বেও কাজ চলতো।

সোনা সাধারণতঃ কোয়ার্ট্‌জ্‌ নামক খনিজের সঙ্গে সংলগ্ন থাকে। এরূপ স্বর্ণধর (Auriferous) কোয়ার্ট্‌জ্‌ যখন প্রাকৃতিক কারণে চূর্ণিত হয়ে জলস্রোতের সঙ্গে প্রবাহিত হয়, তখন সোনার কণা বালি ও নুড়ির সঙ্গে নদীপথে কিংবা নদীপ্লাবিত ভূমিতে ছড়িয়ে পড়ে। এই রকম বালি আর নুড়ি থেকে এককালে সোনা সংগ্রহ করা হতো—এখনো হয়। তবে এই স্রোতবাহিত সোনার পরিমাণ সাধারণতঃ খুবই কম—বিস্তর বালি ধুয়ে সামান্য কিছু স্বর্ণকণা পাওয়া যেতে পারে। অবশ্য দৈবক্রমে গুটিকতক বড় ডেলাও মিলতে পারে।

আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ এবং মহীশূরের অনেক নদীর বালিতে স্বর্ণকণা আছে। স্থানীয় দরিদ্র অধিবাসীরা এখনো কিছু কিছু স্বর্ণকণা উদ্ধার করে থাকে। পদ্ধতি অতি সরল। পাতলা একটি ডালা—তাতে কিছু বালি রেখে জল মিশিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ধোয়া হয়। সোনার কণা বালির চেয়ে ভারী—সে জন্যে নাড়ানোর ফলে বালি জলের সঙ্গে মিশে ক্রমশঃ বেরিয়ে যায় এবং বার বার ধোয়ার পর অবশেষে ডালাতে শুধু সোনার কণা পড়ে থাকে। সুবর্ণরেখা নদীর বালি থেকে এখনো এই উপায়ে সোনা সংগ্রহ করা হয়।

এ তো গেল নদীর বালিকণা থেকে স্বর্ণকণা সংগ্রহ করবার পদ্ধতির কথা। এবার শোন, খনিজ পদার্থ থেকে সোনা বের করবার আধুনিক পদ্ধতির কথা। প্রথমেই বলেছি, যে খনিজ আকরের মধ্যে সোনা পাওয়া যায় তার নাম কোয়ার্ট্‌জ্‌। স্বর্ণধর কোয়ার্ট্‌জ্‌ পাথরের সূক্ষ্ম চূর্ণ জলের সঙ্গে মিশিয়ে বড় বড় তামার চাদরের উপর দিয়ে স্রোতের মত প্রবাহিত করানো হয়। তামার চাদরে পারদ মাখানো থাকে। তাতে সোনার কণা আট্‌কে যায়। তারপর পারা চেঁচে নিয়ে পাতন যন্ত্রে রেখে তাপ দেওয়া হয়। পারা বাষ্পাকারে পৃথক হয়ে অন্য পাত্রে জমা হয় এবং পাতন যন্ত্রে শুধু সোনা পড়ে থাকে। পাথরের গুঁড়া থেকে সব সোনা পারায় আট্‌কে থাকে না—কিছু পাথরের সঙ্গে থেকে যায়। পটাসিয়াম বা সোডিয়াম সায়ানাইড মিশ্রিত জলে সোনা দ্রবীভূত হয়। সে জন্যে সায়ানাইড যৌগের সাহায্যে পাথরের গুঁড়া থেকে অবশিষ্ট সোনা বের করা হয়। কোন কোন কোয়ার্ট্‌জের সঙ্গে কিছু পরিমাণ রূপা মিশ্রিত থাকে—তাও বিশেষ প্রক্রিয়ায় পৃথক করা হয়।

ধাতু হিসাবে সোনা যেমন শ্রেষ্ঠ, তেমনি তার এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, যা অন্যান্য অনেক ধাতুরই নেই। যেমন—সাধারণ অ্যাসিডে এর কোন ক্ষতি হয় না। সে জন্যেই বিজ্ঞানীরা একে নোবেল মেটাল বলে থাকেন। একমাত্র ক্লোরিন, অ্যাকোয়া রিজিয়া মিশ্র অ্যাসিড আর কয়েকটি বিষাক্ত অ্যাসিড ছাড়া অন্য কিছুতেই এই ধাতু দ্রবণীয় নয়।

সোনা যেমন নমনীয় তেমনই ঘাতসহ। আর এজন্যেই সোনাকে পিটিয়ে 1 ইঞ্চির 250,000 ভাগ পাতলা করা যায়। শুধু কি তাই, তোমরা শুনলে আশ্চর্য হবে যে, এক আউন্স সোনা থেকে 35 মাইল লম্বা তার করা যায়। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যে খুব অল্প পরিমাণ সোনাও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ধরা শক্ত নয়। আধুনিক রসায়নবিদেরা অন্য ধাতুর 1,000,000,000 অণুর সঙ্গে সোনার একটি অণু মেশানো থাকলেও সেটা ধরতে পারেন। সোনা সাধারণতঃ 1063° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় গলতে সুরু করে এবং এর বেশী তাপ প্রয়োগ করলে বেশ তরল হয়ে যায়। স্বর্ণকারেরা এই তরল সোনাকে ছাঁচে

ফেলে প্রথমে সোনার বাট তৈরি করে, তারপর সেই বাটকে পুনরায় উত্তাপ প্রয়োগে নরম করে পিটিয়ে পিটিয়ে তৈরি করে নানারকম অলঙ্কার।

পৃথিবীতে সোনার যেরূপ চাহিদা, সে তুলনায় সোনা খুব কমই আছে। এত হাজার বছর ধরে চেষ্টা করে মানুষ আজ পর্যন্ত মাত্র 50,000 হাজার টন সোনা উদ্ধার করেছে। এখন সমগ্র বিশ্বে বছরে আনুমানিক 2000 হাজার টন সোনা বিভিন্ন খনি থেকে উত্তোলন করা হয়। এই পরিমাণের শতকরা 70 ভাগ আসে দক্ষিণ আফ্রিকার 11000 ফুটের বেশী গভীর র‍্যাণ্ড নামক খনি থেকে। মোট শতকরা 25 ভাগ আসে সোভিয়েট রাশিয়া থেকে। ভারতবর্ষে সবচেয়ে বড় সোনার খনি আছে মহীশূরের কোলার অঞ্চলে। তাছাড়া নিজাম রাজ্যের হট্টি অঞ্চলের খনি থেকেও সোনা উত্তোলন করা হয়, তবে পরিমাণে কম।

ভূতাত্ত্বিকদের মতে, ভূত্বকের উপাদানের মধ্যে গড়ে শতকরা 0·000,0005 ভাগ সোনা আছে, রূপা আছে এর দ্বিগুণ। অথচ চাহিদা আর মূল্যের হিসাবে এই সম্পর্ক মেলানো যায় না। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মতে, সমুদ্রের জলে 1 ঘন কিলোমিটারে 5 টন সোনা পাওয়া যেতে পারে। শুধু পৃথিবীতেই নয়, সূর্যের চতুষ্পার্শ্বে—এমন কি, উল্কার মধ্যেও সোনার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেছে। হয়তো বা অদূর ভবিষ্যতে বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহে পৃথিবীর মানুষের চাহিদা মেটাবার জন্যে সোনার খনি খোলা সম্ভব হবে।

চাহিদা অনুযায়ী সোনা কম বলে মানুষ অন্য ধাতু থেকে সোনা তৈরি করবার চেষ্টা বহু প্রাচীনকাল থেকেই করে আসছে—অবশ্য কৃত্রিম সোনা। এই ব্যাপারে আজকের মানুষ কিছুটা এগিয়েছে—আধুনিক বিজ্ঞানীরা সাইক্লোট্রন যন্ত্রে পরমাণুর ভাঙ্গনের সাহায্যে সেই স্বপ্ন সফল করতে প্রয়াসী। হয়তো এমনি করেই বৈজ্ঞানিকদের স্বপ্ন একদিন বাস্তবে রূপায়িত হবে।

সুনীল সরকার

জানবার কথা

একটি গরিলার দৈহিক শক্তি কুড়িটি মানুষের দৈহিক শক্তির সমান। মজার কথা হলো—গরিলারা সিংহের মত গর্জন করে না—তারা চীৎকার করে।

উত্তর

(পারদর্শিতার পরীক্ষা)

1. বন্ধুটির পকেটে পয়সা ছিল 22 এবং তার বয়স 15 বছর।

[ধরা যাক, বন্ধুটির পকেটে পয়সার সংখ্যা x এবং তার বয়স y বছর।

তাহলে

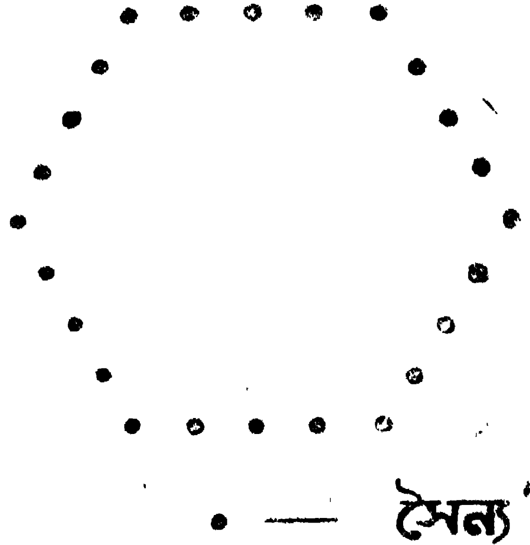
$$(2x+5)\times 50+y-365=2100$$

বা $100x+y=2100+115=2215$

$\therefore\ x=22$ ও $y=15$

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, বন্ধু যে ফল বললো, তার সঙ্গে 115 যোগ করে যে সংখ্যা পাওয়া যাবে, তার শেষের দু'টি অঙ্ক নির্দেশ করবে তার বয়স আর আগের অঙ্ক বা অঙ্কগুলি নির্দেশ করবে পয়সার সংখ্যা।]

2. সৈন্যদের সারিগুলি নীচের ছবির মত একটি সুষম ষড়ভুজ গঠন করবে।



• — সৈন্য

3. (ক) $(b-a)$ হচ্ছে একটি ঋণাত্মক সংখ্যা। সে জন্যে $a(b-a)>(b+a)(b-a)$ হলে $a<(b+a)$ হবে।

[একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে। $-6>-10$ অর্থাৎ $3\times(-2)>5\times(-2)$। এক্ষেত্রে $3<5$।]

(খ) বর্গমূল নির্ণয় করাটা ভুল হচ্ছে, কারণ এককেরও বর্গমূল নিতে হবে।

[প্রথম সমীকরণটির দু-দিকের সঠিক বর্গমূল লিখলে দাঁড়ায়

$$\tfrac{1}{2}\sqrt{\text{টাকা}}=5\sqrt{\text{পয়সা}}$$

এটা ঠিক আছে, কেন না

$$\sqrt{\text{টাকা}} = \sqrt{100 \text{ পয়সা}} = 10\sqrt{\text{পয়সা}}$$ ।

4. 50 পয়সার 4টি মুদ্রা, 25 পয়সার 6টি মুদ্রা ও 5 পয়সার 10টি মুদ্রা।

[ধরা যাক 50 পয়সা, 25 পয়সা ও 5 পয়সার মুদ্রাসংখ্যা যথাক্রমে x, y ও z।

তাহলে

$$x+y+z=20 \cdots\cdots\cdots\cdots (1)$$

আবার পয়সার হিসাবে

$$50x+25y+5z=400$$

বা $$10x+5y+z=80 \cdots\cdots\cdots (2)$$

(2) থেকে (1) বিয়োগ করলে

$$9x+4y=60 \cdots\cdots\cdots\cdots (3)$$

যেহেতু x ও y দুটি পূর্ণসংখ্যা, (3)-এর সমাধান হচ্ছে

$$x=4 \text{ ও } y=6$$

$$\therefore \quad z=20-(4+6)=10$$]

5. (ক) $111-11$

(খ) $33\times3+\frac{3}{3}$

(গ) $(5+5+5+5)\times5$

বা $(5\times5\times5)-(5\times5)$

জানবার কথা

নিশাচর প্রজাপতিকে মথ বলা হয়। এদের ডানা ভারী এবং সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শোঁয়ায় আবৃত। মথেরা কোন জায়গায় বসবার সময় ডানা মেলে রাখে। মথের শোঁয়া-পোকার গুটি থেকে রেশম, তসর, মুগা, এণ্ডি, মটকা প্রভৃতি কাপড়ের সূতা প্রস্তুত করা হয়। এদের বাচ্চাদের ভোজন ক্ষমতার কথা শুনলে বিস্মিত হতে হয়। মাত্র ছয়টা মথের বাচ্চা এক বছরের মধ্যে যে পরিমাণ খাদ্য খায় তার ওজন হচ্ছে একটা ঘোড়ার সমান।

বিভিন্ন উদ্ভিদের বিস্তৃতি

প্রাচানকালে ভারতের বিচিত্র গাছপালা বিশ্বের কাছে আকর্ষণীয় ছিল। ভারতবর্ষ থেকে অনেক গাছপালা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে গেছে। আবার কোন কোন গাছ বিদেশ থেকে ভারতে বিস্তার লাভ করেছে।

ধান ঃ—ধানের চাষ আজকাল পৃথিবীর সব গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই করা হয়। অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষ ও চীনে ধানের প্রচলন আছে—তার প্রমাণ আমরা পাই হিন্দুশাস্ত্রে এবং বিভিন্ন প্রাচীন নিদর্শন থেকে। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন যে নিদর্শন পাওয়া যায়, সেটা খৃষ্টপূর্ব 1000-750 সালের। এই নিদর্শন পাওয়া গেছে হস্তিনাপুরে (উত্তর প্রদেশ)।

আলেকজাণ্ডারের ভারতে আসবার পরেই গ্রীকরা এর সন্ধান পায়। তারা আরব-বণিকদের আরও আগে ভারতের পশ্চিম উপকূলে আসে এবং ধানের সন্ধান লাভ করে।

তুলা ঃ—হেরোডটাসের বর্ণনায় আছে—ভারতে এক রকম গাছ পাওয়া যায়, যার ফল থেকে ভারতীয়েরা কাপড়-চোপড় তৈরি করে। এই বর্ণনায় শিমুল গাছের তুলার কথাই বলা হয়েছে।

সবচেয়ে প্রাচীন লিখিত নিদর্শন পাওয়া যায় ঋক্‌বেদে—ঋক্‌বেদের রচনাকাল খৃষ্টপূর্ব পঞ্চদশ সাল। পাঁচ হাজার বছর আগে মহেঞ্জোদারোর যুগেও এর প্রচলন ছিল এবং সেখানে তুলার তৈরি কাপড়ের টুক্‌রার কথাও জানা গেছে, যার মধ্যে পাওয়া গেছে প্রাচীন রৌপ্য মুদ্রা। তুলার চাষ, কাপড় তৈরি, কাপড়ে রং করা—মধ্যযুগে এগুলি এত তাড়াতাড়ি উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছিল যে, ভারতবর্ষ কিছুদিনের মধ্যেই এদিক থেকে একাধিপত্য অর্জন করে এবং সুদূর জিনিসের সঙ্গেও তার বাণিজ্য চলে।

দক্ষিণ আমেরিকায়ও প্রাচীনকালে তুলার প্রচলন ছিল। পেরু এবং দক্ষিণ-পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্রের কোন কোন অঞ্চলের সমাধিক্ষেত্রে তুলা দিয়ে তৈরি কাপড়ের সন্ধান পাওয়া গেছে। কিন্তু একথা ঠিক যে, তুলার প্রচলন সর্বপ্রথম হয় ভারতবর্ষে। ইজিপ্টে শণ গাছের আঁশ থেকে কাপড় বোনা হতো, তুলার চাষ আরম্ভ হয় অনেক পরে।

চা ঃ—চা আজ পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের লোকেরই পানীয়। চা-এর চাষ প্রথম আরম্ভ হয় চীনে। ভারত চীন থেকে প্রথম বীজ আমদানী করে' চা-এর চাষ আরম্ভ করে। ভারতের উত্তরাংশে চা-এর প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও এখানকার লোকেরা পরে তা জানতে পারে। আসাম ও বর্মার উত্তরাংশে এখন প্রচুর চা জন্মায়, যা পৃথিবীর সব জায়গায় আজ রপ্তানী করা হচ্ছে।

চা-এর প্রসার হয়েছে খুব ধীরে ধীরে। চা-এর প্রচলন হয় জাপানে—দশম শতাব্দীতে, ইউরোপে ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে। সপ্তদশ শতাব্দীতে বৃটেনে চা বিক্রী হয় এক পাউণ্ড দশ গিনিতে। 1664 খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় চার্লসের স্ত্রী রাণী ক্যাথেরিনকে কিছু চা উপহার দেওয়া হয়। তিনি চায়ের প্রশংসা না করে পারেন নি এবং তারপর থেকেই ইংল্যাণ্ডের অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে চায়ের প্রচলন বেড়ে যায়। চীন, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, সিংহল, ফরমোসা প্রভৃতি স্থানেও এখন যথেষ্ট পরিমাণ চা উৎপন্ন হয়। ভারতই পৃথিবীতে চা উৎপাদনে প্রথম।

আম ঃ—প্রাচীন ভারতীয় কবির বর্ণনায় আমের উল্লেখ অনেক জায়গায় আছে; যেমন—কামদেবের বাসস্থান আম্রকুঞ্জ। চতুর্দশ শতাব্দীতে আমির খসরু বলেছিলেন, ভারতে এমন একটা ফল (অর্থাৎ আম) জন্মায়, যা কাঁচা-পাকা সব অবস্থাতেই উৎকৃষ্ট।

শোনা যায়, সম্রাট আকবর দ্বারভাঙ্গার নিকটে বাগান তৈরি করে সেখানে দশ হাজার আমগাছ লাগিয়েছিলেন। আইন-ই-আকবরীতে আম সম্বন্ধে অনেক কথা লিপিবদ্ধ আছে।

আজ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটা প্রধান ফল বলতে আমকেই বোঝায়। মালয়, ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে প্রচুর আম জন্মায়। হাওয়াই ও ফ্লোরিডা অঞ্চলেও যথেষ্ট আমের চাষ হয়।

কলা ঃ—ভারত, থাইল্যাণ্ড, মালয়ে প্রচুর পরিমাণে কলা জন্মায়। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে খৃষ্টপূর্ব 500-600 সালে কলার উল্লেখ আছে। তাই অনেক জায়গায় দেখা যায়, কলাকে 'Horn Plantain' বলা হয়েছে—কারণ এর আকৃতি শিং-এর মত।

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বিভিন্ন দেশে কলা বিস্তৃতি লাভ করে। অনুমান করা হয়, আরবীয়দের দ্বারা ভারত থেকে প্যালেষ্টাইন ও মিশরে কলার প্রচলন হয় সপ্তম শতাব্দীতে। মিশর থেকে কিছু দিনের মধ্যেই গোটা মহাদেশে কলার প্রচলন হয়, কারণ পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয়ানরা যখন আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে যায়, তখন সেখানে কলার প্রচলন ছিল। আমেরিকায় কলার চাষ হয় 1516 খৃষ্টাব্দে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই এত প্রসার লাভ করে যে, আজ আমেরিকা পৃথিবীর মধ্যে কলা উৎপাদনে প্রথম স্থানের অধিকারী।

কলার জনপ্রিয়তার কারণ দুটি—প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং পুষ্টিকারক তো বটেই। এর মধ্যে আছে 22% কার্বোহাইড্রেট। ভিটামিন A এবং C।

আখ ঃ—অতি প্রাচীনকালে পাশ্চাত্য দেশে মিষ্টি জিনিষ বলতে ছিল শুধু মৌচাকের মধু। আখের প্রচলন হয় স্পেনে অষ্টম শতাব্দীতে, মাদেইরা, আজোর, কেপ ভার্ডে দ্বীপে পঞ্চদশ শতাব্দীতে। সপ্তদশ শতাব্দীতে পৃথিবীর সমস্ত গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই আখের চাষ আরম্ভ হয়। এক-শ' বছর আগে চিনি তৈরির একমাত্র উপায় জানা ছিল আখ

থেকে। আজকাল বিট থেকেও চিনি তৈরি হয়। আজ পৃথিবীতে চিনি উৎপাদনে ভারতের স্থান উল্লেখযোগ্য।

মরিচ ঃ—মালাবার ও কেরালায় প্রচুর মরিচ জন্মায়। বহু বছর ধরে এটা ছিল পশ্চিমের সঙ্গে ভারতের প্রয়োজনীয় বাণিজ্য পণ্যের মধ্যে একটি।

মরিচ ইউরোপে আসে পারস্য উপসাগর, মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া কিংবা লোহিত সাগর ও সুয়েজ উপসাগরের মধ্য দিয়ে। আলেকজান্দ্রিয়ায় 176 খৃষ্টাব্দে রোমানরা মরিচ দিত রাজস্ব হিসাবে। ভিনিসের উন্নতির মূলে তাদের মরিচের উপর একচেটিয়া ব্যবসায়। তাদের ব্যবসায় নষ্ট করবার জন্যেই পর্তুগীজরা চেয়েছিল জলপথে ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের একটা পথ। ক্রমে তাদের অনুসরণ করে ওলন্দাজ, ফরাসী ও বৃটিশ। সকলের কাছেই ব্যবসায়টি লোভনীয় হয়ে উঠেছিল। পর্তুগীজদের সেই স্মৃতি আমরা আজ দেখতে পাই—গোয়ায়।

এছাড়া আরও যে সব উদ্ভিদ ভারতবর্ষ থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে গেছে তার মধ্যে আছে, অড়হর ডাল, বেগুন, শশা, পাট, নীল, নারকেল, আদা, দারুচিনি, হলুদ, শন, জায়ফল, খাম আলু ইত্যাদি। কাজুবাদাম, আলু, বাদাম, টোম্যাটো, সাগু, আনারস, পেয়ারা, মিষ্টি আলু, লঙ্কা, অ্যারারুট, ভুট্টা, খরমুজ প্রভৃতি আজ বাজার ছেয়ে গেছে, কিন্তু ভারত এগুলির কোনটারই জন্মস্থান নয়—সুদূর আমেরিকা হচ্ছে এদের আদি বাসভূমি।

শ্রীচঞ্চল রায়

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন 1. : ধ্রুবতারা স্থির থাকে অথচ অন্য সব নক্ষত্র আকাশে দিক পরিবর্তন করে—এর কারণ কি ?

জীবনকৃষ্ণ মণ্ডল, উষারঞ্জন সিংহ, বহরমপুর

প্রশ্ন 2. : অ্যাপেণ্ডিসাইটিস রোগটা কি ?

অভিজিৎ দেবনাথ, কলিকাতা-37

উত্তর 1. : পৃথিবী নিজের অক্ষের উপর পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে আবর্তিত হচ্ছে। তাই পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে দূরের স্থির নক্ষত্রদের মনে হয় যেন এগুলি পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে সরে যাচ্ছে। উপরের আকাশে ঠিক পৃথিবীর অক্ষ বরাবর রয়েছে

ধ্রুবতারা। এই কারণেই পৃথিবীর আবর্তন সত্ত্বেও ধ্রুবতারাকে দিক পরিবর্তন না করে একই জায়গায় স্থির থাকতে দেখা যায়। ধ্রুবতারার এরূপ অবস্থানের জন্যে দক্ষিণ মেরু থেকে একে দেখা যায় না। অবশ্য নক্ষত্রদের আপেক্ষিক গতি থাকা সত্ত্বেও নিজস্ব একটা গতি আছে; কিন্তু পৃথিবী থেকে এদের অবস্থান অনেক দূরে হওয়ায় এদের মোটামুটি স্থির বলে ধরে নেওয়া হয়।

উত্তর 2. আমাদের দেহের অভ্যন্তরে $\frac{1}{4}$ ইঞ্চি মোটা ও 4 ইঞ্চি লম্বা একটা নলের মত বস্তু বৃহদন্ত্রের সিকাম নামক অংশের গা থেকে নীচের দিকে ঝুলে থাকে। এই বস্তুটিকে বলা হয় অ্যাপেনডিক্স। শরীরে অ্যাপেনডিক্সের উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা এখনও আমাদের অজানা। তবে এই অ্যাপেনডিক্স রোগাক্রান্ত হলে শরীরে যথেষ্ট অসুবিধা ও যন্ত্রণার সৃষ্টি হয়। অ্যাপেনডিক্স রোগাক্রমণের ফলে যে যন্ত্রণা বা প্রদাহের সৃষ্টি হয়, তাকেই বলা হয় অ্যাপেণ্ডিসাইটিস। সাধারণতঃ শিশু, বৃদ্ধ ও স্ত্রী লোকেরা এই রোগে কম সংখ্যায় আক্রান্ত হয়। যুবকদের ক্ষেত্রেই এই রোগাক্রমণের সংখ্যা বেশী। নিরামিষাশীদের তুলনায় মাংসাশী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী।

কোনও কারণে যদি অ্যাপেনডিক্সের ভিতর খাদ্যকণা ঢুকে পড়ে, তবে তা আর বেরিয়ে আসতে পারে না এবং অ্যাপেনডিক্সের ভিতরে থেকে পচতে থাকে। এই বস্তুকণার উপস্থিতির জন্যে অ্যাপেনডিক্সের আয়তন বাড়তে থাকে এবং এই বর্ধিত আয়তন প্রদাহের সৃষ্টি করে। বিভিন্ন রোগজীবাণু আক্রমণের ফলেও অনেক সময় অ্যাপেনডিক্স রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এই সব জীবাণুর মধ্যে ষ্ট্রেপ্‌টোকক্কাস ও কোলন ব্যাসিলাসের নাম উল্লেখযোগ্য। যে কোনও কারণে রোগাক্রান্ত হবার ফলে অ্যাপেনডিক্সের রক্ত সরবরাহকারী ধমনীগুলিতে বাধার সৃষ্টি হয়। যদি অ্যাপেনডিক্সটি সম্পূর্ণভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে, তবে অ্যাপেনডিক্সের রক্ত চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় এবং গ্যাংগ্রিনের সৃষ্টি হয়। এর ফলে তীব্র যন্ত্রণা ও প্রদাহের সৃষ্টি হয়। কোন কোন সময় অ্যাপেনডিক্স রোগাক্রান্ত হয়ে ফেটে যায়, যার ফলে সমস্ত শরীরই রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় জীবনহানির সম্ভাবনাও থাকে।

শ্যামসুন্দর দে*

* ইনস্টিটিউট অব রেডিও-ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-9

প্রধান সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

চতুর্বিংশ বর্ষ | নভেম্বর, 1971 | একাদশ সংখ্যা

[পাইনিয়েলের সঙ্গে দেহভিত্তিক বহু পরিবর্তনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সবে সুরু হয়েছে, কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে স্নায়ুরসায়নে যে সব কাজ হচ্ছে, তাথেকে মনে হয়, পাইনিয়েল মানুষের ইন্দ্রিয়বিষয়ক গবেষণায় বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করবে।]

মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রক পাইনিয়েল গ্রন্থি

শ্রীদেবব্রত নাগ ও শ্রীজগৎজীবন ঘোষ*

ভূমিকা

বহু পূর্বে অনেকের ধারণা ছিল, পাইনিয়েল গ্রন্থি মস্তিষ্কের বিভিন্ন কোটরে চিন্তার প্রবাহ নিয়ন্ত্রক। গ্রীক দার্শনিক Descartes তাঁর লেখা এক বইতে (De Homine) উল্লেখ করেছিলেন যে, আত্মানুভূতির পীঠস্থান হলো পাইনিয়েল গ্রন্থি। তাঁর মতে, দেহ হলো যন্ত্রস্বরূপ এবং দেহরূপ যন্ত্রকে পরিচালনা করছে পাইনিয়েল গ্রন্থি। প্রাচীন গ্রীকদের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি বললেন যে, বহির্বিশ্বের ঘটনাগুলি, যা মনুষ্য-দৃষ্টির অন্তরালে অনবরত হয়ে চলেছে, তা কতক-গুলি ফাঁপা স্নায়ুপথে দেহপেশীতে সাড়া জাগায়। এসব ধারণার সত্যতা যাচাই করবার বৈজ্ঞানিক প্রস্তুতি তখন সবে সুরু হয়েছে। মাত্র আট বছর আগেও পাইনিয়েল সম্পর্কে বহু ধারণা ছিল রহস্যাবৃত। উল্লেখযোগ্য হলো, পাইনিয়েল দেহ-ভিত্তিক বিভিন্ন ঘটনার সময় নিয়ন্ত্রকরূপে কাজ করে।

*প্রাণরসায়ন বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-19।

পাইনিয়েলের পরিচয়

পাইনিয়েল গ্রন্থি (Pineal gland) মস্তিষ্কের দুই অর্ধগোলকের মধ্যে অবস্থিত একটি অতি ক্ষুদ্র বস্তু। জানা গেছে একজন প্রাপ্তবয়স্কের পাইনিয়েল গ্রন্থি মোটামুটি দৈর্ঘ্যে 5-9 মি. মি, প্রস্থে 3-6 মি. মি. এবং উচ্চতায় 3-5 মি. মি.। ওজন 100 থেকে 180 গ্রাম। এখন পর্যন্ত এই গ্রন্থিটির বিষয় খুব কমই জানা গেছে। মস্তিষ্কের অধিকাংশ গ্রন্থি যদিও যুগ্ম অবস্থায় থাকে, কিন্তু গ্রীক বৈজ্ঞানিকেরা বহুদিন আগেই এটির অযুগ্ম গঠন-প্রকৃতির পরিচয় জানিয়েছিলেন।

স্তন্যপায়ী জীবদের পাইনিয়েল গ্রন্থি বিভিন্ন সময়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, পাইনিয়েল গ্রন্থিতে তিনটি মুখ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করবার মত।

(ক) পাইনিয়েলে প্যারেনকাইম্যাল (Parenchymal) কোষ নামে এক নতুন কোষের আবির্ভাব হয়। এই কোষগুলির বৈশিষ্ট্য হলো, অতি কঠিন আবরণ দিয়ে ঢাকা না থাকায় সাধারণতঃ এরা গোলাকৃতির হয়ে থাকে। এক-একটি কোষে বহু সংখ্যক subcellular organelles থাকে। আর ঐ organelles-এর মধ্যে উত্তেজক রস (Hormones) প্রস্তুতকারক উপাদান এবং উত্তেজক রস নিঃসৃত হবার ব্যবস্থাও আছে।

(খ) পাইনিয়েল গ্রন্থিতে কোষবিভাগ বিশেষ প্রকৃতিতে হয়ে থাকে।

(গ) স্তন্যপায়ী জীবের পাইনিয়েল গ্রন্থি যদিও মাতৃগর্ভে মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশের মতই প্রথমে যুগ্ম অবস্থায় থাকে, কিন্তু ক্রমশঃ অযুগ্ম গ্রন্থিতে পরিবর্তিত হয়। জন্মের ঠিক পরেই পাইনিয়েল গ্রন্থি মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক হারায়। মস্তিষ্কের কোন খবরই তখন সরাসরি পাইনিয়েল গ্রন্থিতে পৌঁছে না। এখন জানা গেছে, কোন একটি বিশেষ স্নায়ুপথে বিভিন্ন ঘটনা পাইনিয়েলে প্রবাহিত হয়, যদিও মস্তিষ্কের অন্যান্য স্থানে সাধারণতঃ রক্তের মাধ্যমেই তা হয়ে থাকে।

পাইনিয়েলের দেহভিত্তিক পরিচয়

1898 সনে নিদানশাস্ত্রবিদ্ (Pathologist) O. Heubner প্রথম পাইনিয়েলের দেহভিত্তিক পরিচয় দিতে সক্ষম হন। তিনি দেখালেন যে, একটি ছয় বছরের ছেলের পাইনিয়েল গ্রন্থি টিউমারের সাহায্যে নষ্ট করে দিলে তার যৌনপ্রাবল্য প্রচণ্ডরূপে বেড়ে যায়। এর পর গোনাডের সঙ্গে পাইনিয়েলের সম্পর্ক জানবার চেষ্টা অনেকেই করেছেন। অনেক মতপার্থক্যও দেখা দিল। জানা গেল, পাইনিয়েল গ্রন্থি বয়ঃসন্ধিস্থলে ক্যালসিয়ামে ভরে যায়। অনেকের ধারণা হলো, পাইনিয়েল একটি অকেজো গ্রন্থি। পরে দেখা গেল calcified পাইনিয়েল গ্রন্থি যথেষ্ট সক্রিয়।

1918 সালে শারীরবিদ্ N. Holmgren কতকগুলি উভচর প্রাণী এবং মাছের পাইনিয়েল গ্রন্থিতে বিশেষ অনুভূতি বহনক্ষম কোষ খুঁজে পেলেন। এগুলি দেখতে অনেকটা প্রাণীদের চোখের আলোকগ্রাহী (Photoreceptor) কোষের মত। এরপর Lamprey জাতীয় মাছ এবং টিকটিকি জাতীয় প্রাণীদের পাইনিয়েল গ্রন্থিতেও অনুরূপ আলোকগ্রাহী কোষের সন্ধান পাওয়া গেল। D. E. Kelly ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ ব্যবহার করে ব্যাঙের অক্ষিপট এবং পাইনিয়েলের আলোকগ্রাহী কোষগুলির মধ্যে একটা অত্যাশ্চর্য মিল দেখতে পেলেন। স্নায়ু-শারীরবিদ্ (Neurophysiologist) E. Dodt এবং তাঁর সহকর্মীরা দেখালেন যে, ব্যাঙের পাইনিয়েল গ্রন্থি বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোর প্রভাবে বিভিন্ন রকম স্নায়বিক সাড়া দেয়। তাঁরা দেখতে পেলেন, গরুর পাইনিয়েল নির্যাস (Pineal extract) যদি ব্যাং এবং ব্যাঙাচিদের খাওয়ানো যায়, তবে তাদের চামড়া ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

1958 সালে একাধারে প্রাণরসায়নবিদ্ এবং চর্মবিদ্ A. B. Lerner গবাদি পশুর পাইনিয়েল নির্যাস থেকে উভচর প্রাণীদের চর্মকে সাদা করে দেবার মূল বস্তুটি পেতে সক্ষম হলেন। নানা পরীক্ষা থেকে প্রমাণ হলো, বস্তুটি ইন্‌ডোল শ্রেণীভুক্ত, 5-হাইড্রোক্সি-N-অ্যাসিটাইল ট্রিপ্‌টামিন, যদিও মেলাটোনিন নামেই বেশী পরিচিত। পাইনিয়েল গ্রন্থিতে এই বস্তুটি আবিষ্কারের পর মস্তিষ্কে এই গ্রন্থিটির মূল্য আরও অনেক বেড়ে গেল।

পাইনিয়েলের প্রাণরসায়ন—মেলাটোনিনের ভূমিকা

জানা গেছে মেলাটোনিন একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন রাসায়নিক পদার্থ। এটি ব্যাঙের চামড়ার কালোর মাত্রা সংকোচনে অংশগ্রহণ করে। নর-অ্যাড্রিন্যালিন (Noradrenaline) বস্তুটি সম্পর্কেও এরকম জানা ছিল। এখন দেখা যাচ্ছে, মেলাটোনিন নরঅ্যাড্রিন্যালিন অপেক্ষা প্রায় 10^5 গুণ বেশী ক্ষমতাসম্পন্ন। মাত্র 10^{-13} গ্রাম/সি.সি. মেলাটোনিনেই উপরিউক্ত ফল পাওয়া যায়। অত কম মেলাটোনিন প্রয়োগ করলেই অন্ধকারে বহু মাছ এবং উভচর প্রাণীদের চর্মের রং খুব দ্রুত ফ্যাকাশে হয়ে যায়। Xenopus ব্যাঙাচি কিংবা গিরগিটি (Salamander) জাতীয় প্রাণীদের পাইনিয়েল গ্রন্থি কিংবা পাইনিয়েলসংলগ্ন স্থানগুলি অপসারণ করলে ঐ প্রাণীগুলি অন্ধকারে ফ্যাকাশে হবার ক্ষমতা হারায়। উভচর প্রাণীদের পাইনিয়েল গ্রন্থিতে মেলাটোনিন তো আছেই—এমন কি, মেলাটোনিন সংশ্লেষণক্ষম প্রয়োজনীয় জৈব অনুঘটকগুলিও আছে। চর্মের উপর মেলাটোনিনের প্রভাব সম্পর্কিত বিভিন্ন পরীক্ষা এবং উপরিউক্ত পর্যবেক্ষণগুলি থেকে মনে হচ্ছে, আলোর প্রভাবে মেলাটোনিন সংশ্লেষণের সঙ্গে চর্মের রং পরিবর্তনের একটা সম্পর্ক আছে। এও জানা গেছে যে, প্রাণীদের গোনাডে (Gonad) মেলাটোনিনের বিশেষ ক্ষতিকারক প্রভাব আছে। মেলাটোনিন স্বল্পবয়সী বলিষ্ঠ ইঁদুরগুলির যোনিনালী উন্মুক্ত করতে বিলম্ব ঘটায় এবং ডিম্বকোষের (Ovary) ওজন কমিয়ে দেয়। দৈনিক vaginal smear নিয়ে দেখা গেছে, মেলাটোনিন স্ত্রী-ঋতুচক্রের (Estrous cycle) সময় কমিয়ে দেয়। মেলাটোনিন ইঁদুরের মস্তিষ্কে median of eminence নামক স্থানটিতে প্রয়োগ করে দেখা গেছে যে, মস্তিষ্কে পিটুইটারি গ্রন্থিতে lutenising উত্তেজক রসের সঞ্চয় কমিয়ে দেয়। কেবল তাই নয়, চর্মের রং যে সব উত্তেজক রসের উপর নির্ভরশীল, মেলাটোনিন সেই সব উত্তেজক রসের ঘনত্ব পিটুইটারিতে কমিয়ে দেয়। পাখীদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, মেলাটোনিন ওদের অণ্ডকোষ (Testis), ডিম্বকোষ (Ovary) এবং ডিম্বনালীর (Oviduct) ওজন কমায়। এও দেখা গেছে, মেলাটোনিন মস্তিষ্কের পিটুইটারি গ্রন্থিতে MSH (Melanophore Stimulating Hormone) নামক উত্তেজক রসের পরিমাণ কমিয়ে দেয়। কেবল তাই নয়, থাইরয়েড গ্রন্থিতে তেজস্ক্রিয় আয়োডিন এবং হাইড্রোজেন গ্রহণক্ষমতা হ্রাস করে দেয়। লোহিত কণিকা বাদ দিলে রক্তের জলীয় দ্রবণকে serum বা রক্তমস্তু বলে। রক্তমস্তুতে বীজকোষ উত্তেজক রসের (Follicle Stimulating Hormone পরিমাণও কমে যায়। পেনসিল মাছে দেখা গেছে, মেলাটোনিন কতকগুলি রঙের বৃদ্ধি এবং অন্য কতকগুলির সংকোচনে অংশগ্রহণ করে।

পুরুষ তীক্ষ্ণ দন্তবিশিষ্ট বড় ইঁদুর (Hamstar) এবং নকুলজাতীয় জন্তুদের (Ferrets) ক্ষেত্রে দেখা গেছে, ওদের গোনাডের উপর পাইনিয়েল গ্রন্থির বিশেষ প্রভাব আছে। ঐ প্রাণীগুলিকে অন্ধ করে দিলে ওদের অণ্ডকোষের ওজন কমে যায়, কিন্তু পাইনিয়েল গ্রন্থি অপসারণ করলে কিংবা

পাইনিয়েলের স্নায়ু-যোগ ছিন্ন করলে ঐ পরিবর্তনগুলি দেখা যায় না। Lamprey জাতীয় মাছে মনে হয়, পাইনিয়েল গ্রন্থি ওদের গঠন-প্রকৃতির নিয়ন্ত্রকরূপে কাজ করে। চড়ুই পাখীর পাইনিয়েল গ্রন্থি একটি অতি প্রয়োজনীয় সময়-নির্ধারক যন্ত্রের কাজ করে।

মেলাটোনিন সংশ্লেষণ

পাইনিয়েলে মেলাটোনিনের আবিষ্কার এবং তার পরিচয় জানবার পর বস্তুটি কিভাবে সেখানে বিভিন্ন জৈব অনুঘটকের দ্বারা সংশ্লেষিত হয়, তা জানবার চেষ্টা সুরু হয়। প্রাণরাসায়নিক পদ্ধতিটি সংক্ষেপে দেখানো হলো।

ʟ ট্রিপটোফ্যান

↓ ʟ ট্রিপটোফ্যান হাইড্রক্সিলেজ (1)

5-হাইড্রোক্সি ট্রিপটোফ্যান

↓ অ্যামিনো অ্যাসিড ডিকার্ক্সিলেজ (2)

সেরোটোনিন

↓ সেরোটোনিন অ্যাসিটাইলেজ (3)

N-অ্যাসিটাইল সেরোটোনিন

↓ O-মিথাইল ট্রান্সফারেজ (4)

মেলাটোনিন

মেলাটোনিন সংশ্লেষণের (1) থেকে (4) পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপগুলি প্রাণরাসায়নিক নানা পরীক্ষা থেকে জানা গেছে।

পাইনিয়েলের প্রাণরাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ

পাইনিয়েল সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হলো গ্রন্থিটির রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলি পরিবেশ-জনিত আলোকের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই প্রভাব বিশেষ স্নায়ুপথে পরিচালিত হয়; অর্থাৎ স্নায়ুরাসায়নিক পরিবর্তকরূপে এই গ্রন্থিটি আলোক-সংবাদকে রাসায়নিক সংবাদে রূপান্তরিত করে। 1960 সালে V. Fiske এবং তাঁর সহকর্মীরা প্রথম দেখালেন যে, ক্রমাগত আলোকের প্রভাবে ইঁদুরের পাইনিয়েলের ওজন ক্রমশঃ কমে যায়। প্রথমে দেখা গিয়েছিল যে, অপরিবর্তিত আলোক-উজ্জ্বলতায় ইঁদুরের স্ত্রী-ঋতুচক্রের নিয়মিত পরিবর্তন ঘটে না। এর পর দেখা গেল, Bovine পাইনিয়েল গ্রন্থির নির্যাস ইঁদুরে প্রয়োগ করলে অপরিবর্তিত আলোক-উজ্জ্বলতায় থাকা অবস্থাতেও স্ত্রী-ঋতুচক্রের পরিবর্তন হয়। এসব পর্যবেক্ষণ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, পাইনিয়েল গ্রন্থিতে এমন বস্তু আছে, যা গোনাডকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং যার সংশ্লেষণ ও নিঃসরণ অপরিবর্তিত আলোক-উজ্জ্বলতায় কমে যায়। 1960 সালে Axelrod পাইনিয়েল গ্রন্থিতে মেলাটোনিন সংশ্লেষক জৈব অনুঘটকের সন্ধান দিলেন। এর কিছু দিন পরে তাঁরা দেখালেন, মেলাটোনিন স্ত্রী-ঋতুচক্রের সময় মন্দীভূত করে দেয়। এসব পরীক্ষা পাইনিয়েলে মেলাটোনিনের সংশ্লেষণ এবং নিঃসরণের উপর পরিবেশজনিত আলোর প্রভাব এবং স্ত্রী-ঋতুচক্র নিয়ন্ত্রণে পাইনিয়েল গ্রন্থির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা স্মরণ করিয়ে দেয়; অর্থাৎ ক্রমাগত অপরিবর্তিত আলোক-উজ্জ্বলতায় গোনাড নিরোধক বা মেলাটোনিন সংশ্লেষণে বাধাদানই স্ত্রী-ঋতুচক্রের পরিবর্তন না হবার কারণ।

এখন প্রশ্ন হলো, আলোক পরিবেশ প্রাণীদের পাইনিয়েল গ্রন্থিতে বিশেষ বার্তা কিভাবে পৌঁছে দেয় এবং প্রাণরাসায়নিক যন্ত্রগুলিই বা কিভাবে প্রভাবিত হয়?

Lamprey জাতীয় মাছ, উভচর প্রাণী (যেমন, ব্যাং) এবং সরীসৃপজাতীয় প্রাণী (যেমন, টিকটিকি) ইত্যাদির মস্তিষ্কের উপরিভাগের কাছাকাছি একটি পাইনিয়েল সহযোগী গ্রন্থি দেখা যায়। এটিকে বলা হয় প্যারা-পাইনিয়েল গ্রন্থি। এই গ্রন্থিটি আলোর প্রভাবে সাড়া দেয়। পাখীদের পাইনিয়েল গ্রন্থিতেও এমন কোষ আছে, যে আলোর প্রভাবে সাড়া দেয়।

submammalian vertebrate-দের মত স্তন্যপায়ী প্রাণীদের পাইনিয়েলে কোন আলোক-গ্রাহী কোষ পাওয়া যায় নি। sympathetic স্নায়ুকোষের প্রান্তভাগগুলি সরাসরি parenchymal কোষের সঙ্গে যুক্ত থাকে। সবচেয়ে সম্ভাব্য যে পথে আলো পাইনিয়েলের প্রাণ-রাসায়নিক যন্ত্রকে প্রভাবিত করে, তা মনে হয় sympathetic nerves-এর মাধ্যমে হয়ে থাকে। এর সম্ভাব্যতা প্রমাণ করবার জন্যে ইঁদুরের পাইনিয়েল গ্রন্থি থেকে উর্ধ্বতন cervical ganglia অপসারণ করে দেখা গেল, সাধারণ ইঁদুরের মত উপরের ইঁদুরটিকে সর্বক্ষণ আলো অথবা অন্ধকারে রেখে দিলে 5-হাইড্রোক্সি ইন্‌ডোল-O-মিথাইল ট্রান্সফারেজ বা সংক্ষেপে HIOMT নামক জৈব অনুঘটকটির সক্রিয়তার কোন রকম পরিবর্তন হয় না। অন্য একটি পরীক্ষায়—যে সব স্নায়ুকোষগুলি উত্তেজিত হলে নরঅ্যাড্রিনালিন কিংবা সেরোটোনিন উত্তেজক রস নিঃসৃত হয়, তা কেটে যোগাযোগ নষ্ট করে দেওয়া হলো। দেখা গেল, এর ফলে আলোর প্রভাবে পাইনিয়েলে HIOMT-এর কোন রকম পরিবর্তন হয় না। আলো মস্তিষ্কের কোন্ স্নায়ু-পথে পাইনিয়েলে সাড়া জাগায় তবু জানা গেল না। প্রাণরসায়ন পদ্ধতির সাহায্যে যদিও এখন অনেকটা জানা গেছে।

বিভিন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণী—যেমন, তীক্ষ্ণ দন্তবিশিষ্ট বড় ইঁদুর, নকুলজাতীয় জন্তু এবং বাঁদর প্রভৃতিতে দেখা গেছে—পরিবেশজনিত আলোক-সঙ্কেত sympathetic nervous system-এর পথে পাইনিয়েলে পৌঁছে। ইঁদুরের স্ত্রী-ঋতুচক্রের, তীক্ষ্ণ-দন্তবিশিষ্ট বড় ইঁদুরের অণ্ডকোষের ওজন, গোনাডের কার্যপ্রণালী ইত্যাদি পরিবেশজনিত আলোর দ্বারা পরিচালিত হয়। আলো অক্ষিপটকে উত্তেজিত করে এবং স্নায়ুসঙ্কেত নির্দিষ্ট স্নায়ু-পথে পাইনিয়েল গ্রন্থিতে পৌঁছে। এর ফলে স্নায়ুসঙ্কেতের প্রকৃতি অনুযায়ী পাইনিয়েলে মেলাটোনিন সংশ্লেষণ ত্বরান্বিত বা মন্দীভূত হয়।

স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রে আলো যে পথে পাইনিয়েলে সাড়া জাগায়, পাখীদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই কাজটি ভিন্ন পথে হয়। দেখা গেছে, মুরগীর পাইনিয়েল গ্রন্থিতে মেলাটোনিন প্রস্তুতকারক জৈব অনুঘটকগুলি নিয়মিত অপরিবর্তিত আলোকে অনেক বেশী উত্তেজিত থাকে। মুরগীর চোখ অন্ধ করে দিলে কিংবা তাদের sympathetic ganglia অপসারণ করলেও নিয়মিত আলো বা অন্ধকারে ওদের পাইনিয়েল গ্রন্থিতে HIOMT-এর পরিবর্তন হয়। সুতরাং পাখীদের ক্ষেত্রে অক্ষিপট এবং sympathetic nerve কোনটাই পাই-নিয়েলে আলোক এবং মেলাটোনিন সংশ্লেষণের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নয় বলেই মনে হয়। বিশেষ একটি পরীক্ষায় এক ধরণের জাপানী শিকারী পাখীর মাথার ঠিক উপরিভাগে তেজস্ক্রিয় প্রলেপ দিয়ে দেখা গেল, উচ্চ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলো ঐ পাখীর পাইনিয়েল গ্রন্থিতে সাড়া জাগায়, কিন্তু স্বল্প তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোতে সেরূপ হয় না। এও দেখা গেল যে, সদ্যোজাত ইঁদুরের পাইনিয়েল গ্রন্থিতে আলো অক্ষিপট ছাড়া অন্য পথে সেরো-টোনিনের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। যদিও 27 দিন পরে ইঁদুরের অক্ষিপট ছাড়া অন্য পথটি আলোর প্রভাবে আর সাড়া দেয় না।

স্তন্যপায়ী জীবদের ক্ষেত্রে মেলাটোনিন সংশ্লেষণকে প্রভাবিত করে sympathetic transmitter, যেমন—নরঅ্যাড্রিনালিন। ট্রিপটো-ফ্যান থেকে মেলাটোনিন সংশ্লেষণের পথটি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। দেখা গেছে, নর-অ্যাড্রিনালিন, cyclic AMP ইত্যাদি পদার্থগুলি ট্রিপটোফ্যান থেকে মেলাটোনিন সংশ্লেষণ বাড়িয়ে দেয়। এথেকে মনে হয়, আলোর প্রভাবে যে স্নায়ুস্পন্দনের সূচনা হয়, তা স্নায়ুকোষে বিশেষ পরিবর্তন ঘটিয়ে নরঅ্যাড্রিনালিন আরও বেশী

নিঃসৃত করে। অতিরিক্ত নরঅ্যাড্রিনালিন তখন মেলাটোনিন সংশ্লেষণকে পরিবর্তিত করে। হয়তো মেলাটোনিন সংশ্লেষণে সরাসরি অংশগ্রহণ না করে নরঅ্যাড্রিনালিন অধিক পরিমাণ cyclic AMP সংশ্লেষণে অংশগ্রহণ করে। Wurtman এবং Axelrod 14C-ট্রিপটোফ্যান ব্যবহার করে দেখিয়েছেন যে, নরঅ্যাড্রিনালিন পাইনিয়েল কোষের দুটি পৃথক স্থানে কাজ করে। একটি কেন্দ্রে নরঅ্যাড্রিনালিন ট্রিপটোফ্যান-এর পরিবহন ক্ষমতা বাড়ায় আর অন্য একটি কেন্দ্রে cyclic AMP সংশ্লেষণে অংশ গ্রহণ করে। অতিরিক্ত cyclic AMP তখন বিভিন্ন ধাপে কাজ করে অধিক পরিমাণ মেলাটোনিন তৈরি করে।

প্রাত্যহিক ছন্দ

স্তন্যপায়ী প্রাণীদের পাইনিয়েল গ্রন্থিতে সেরোটোনিন খুব বেশী পরিমাণে থাকে। parenchymal কোষ এবং sympathetic স্নায়ু-প্রান্তের মধ্যে এই সেরোটোনিন সমানভাবে ছড়িয়ে আছে—কোথাও কম বা বেশী নেই। সাধারণতঃ দেখা গেছে, দিনের বেলায় সেরোটোনিনের পরিমাণ পাইনিয়েল গ্রন্থিতে সবচেয়ে বেশী থাকে, কিন্তু দিনের আলো কমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সেরোটোনিনের পরিমাণ কমতে থাকে। কোন্ বিশেষ কলকাঠির মাধ্যমে পাইনিয়েল গ্রন্থিতে দিনের আলো এবং অন্ধকারের সঙ্গে সেরোটোনিনের পরিমাণ যথাক্রমে বাড়ে বা কমে, তা জানবার জন্যে কয়েকটি পরীক্ষা করা হলো। কতকগুলি ইঁদুরকে অনবরত হয় সম্পূর্ণ অন্ধকারে, নয়তো সম্পূর্ণ আলোতে রেখে পাইনিয়েলে সেরোটোনিনের পরিমাণ মেপে দেখা গেল—যদি ইঁদুরগুলিকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে সর্বক্ষণ রাখা যায় কিংবা ইঁদুরগুলিকে অন্ধ করে দেওয়া হয়, তবু দিনের সঙ্গে সেরোটোনিনের পরিমাণগত পরিবর্তন হতে দেখা যায়। সুতরাং মনে হয়, সেরোটোনিনের বাড়া বা কমা নির্ভর করছে একটি অন্তঃস্থ জৈবিক ঘড়ির (Biological clock) উপর। যদি বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি করে জৈবিক ছন্দের (Biological rhythm) পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হয়, অর্থাৎ দিনের বেলায় অন্ধকার পরিবেশে রেখে কিংবা রাত্রি বেলায় আলোর পরিবেশ সৃষ্টি করে দেখা গেছে, সেরোটোনিনের পরিমাণগত পরিবর্তন সাধারণ দিন বা রাত্রির বিপরীত নিয়মে বাড়ে বা কমে। পরীক্ষা থেকে এই প্রমাণ হয় যে, যদিও সেরোটোনিনের বাড়া বা কমা নির্ভর করছে একটি কেন্দ্রস্থ জৈবিক পরিচালন ব্যবস্থার উপর, কিন্তু ঐ পরিচালন ব্যবস্থা পরিবেশজনিত আলো এবং অন্ধকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। HIOMT-এর উপর যে সব কাজ হয়েছে, তাথেকে বোঝা যাচ্ছে যে, সেরোটোনিনের বাড়া বা কমার যে ছন্দ নিয়ন্ত্রিত হয়, তা স্নায়ুপথেই নির্দেশিত হয়। স্নায়ুপথ রোধ করে দিলে কিংবা স্নায়ুপথ ছিন্ন করে দিলে দেখা যায়, নিয়মিত সেরোটোনিনের বাড়া বা কমার ছন্দে পতন ঘটে। সদ্যোজাত ইঁদুরে এই ধরণের প্রাত্যহিক ছন্দ দেখা যায়, যদিও ছয় দিন পরে তা প্রকাশ পায়।

পাইনিয়েলে নরঅ্যাড্রিনালিনও ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে একটি নিয়মিত নিয়মে বাড়ে বা কমে। স্নায়ুপ্রান্তে এই বস্তুটি প্রচুর পরিমাণে থাকে। নরঅ্যাড্রিনালিন রাত্রি বেলায় সবচেয়ে বেশী, কিন্তু দিনের বেলায় সবচেয়ে কম থাকে। যদি ইঁদুরগুলিকে সম্পূর্ণ অন্ধ করে আলো কিংবা অন্ধকারে রাখা যায়, তবে ওদের নরঅ্যাড্রিনালিনের বাড়া বা কমার ছন্দে পতন ঘটে। সুতরাং সেরোটোনিনের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাচ্ছে, নরঅ্যাড্রিনালিনের বাড়া বা কমা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে বাইরে থেকে। পরিবেশজনিত বার্তা পাইনিয়েলে পৌঁছাবার পর HIOMT-এর মত নরঅ্যাড্রিনালিনেরও পরিবর্তন ঘটায়।

পাইনিয়েল গবেষণার ভবিষ্যৎ

পাইনিয়েলের উপর বর্তমান পরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণ থেকে মনে হচ্ছে, পাইনিয়েল মস্তিষ্কের একটি অতি ক্ষুদ্র স্থান অধিকার করা সত্ত্বেও এটি নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে বহু প্রাণ-রাসায়নিক ঘটনার মূলে কাজ করছে। মানসিক রোগ, নিদ্রা, চর্মের রং, স্ত্রী-ঋতুচক্রের পরিবর্তন, আলোর প্রভাব প্রভৃতি পাইনিয়েলের সঙ্গে উল্লেখযোগ্যভাবে জড়িত। স্বতঃস্ফূর্ত তেজস্ক্রিয় পদার্থের ন্যায় পাইনিয়েলও মনের বিভিন্ন প্রকাশ সৃষ্টি করে কিনা, জানা নেই। এও জানা নেই, মস্তিষ্ক থেকেই মনের সৃষ্টি, না মন বহির্জগতের কোন বস্তু এবং মস্তিষ্করূপ যন্ত্রে ধরা পড়ছে। দুইয়ের মধ্যে মতপার্থক্য যাই হোক না কেন, দেখা যাচ্ছে পাইনিয়েল শব্দ, আলো, তাপ এবং সময়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং পরিবেশজনিত অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে মস্তিষ্কে যে সব প্রাণরাসায়নিক ঘটনা ঘটছে, তার মূলে যে পাইনিয়েল গ্রন্থি কাজ করছে, তা অস্বীকার করা যায় না। বিশেষ করে মানসিক রোগগুলি কোন্ কোন্ স্তরে পরিবর্তন ঘটায় এবং তা পাইনিয়েল গ্রন্থির সঙ্গে কতটা জড়িত, তাও পরীক্ষা করে দেখা উচিত। কারণ আগেই বলেছি, পাইনিয়েল যেন বিভিন্ন চিন্তার প্রবাহ নিয়ন্ত্রক যন্ত্র। আবার যেহেতু পাইনিয়েল প্রাত্যহিক জৈবিক ছন্দ নিয়ন্ত্রক যন্ত্র, সেহেতু বিভিন্ন ঔষধ দিনের কোন্ সময়ে, কতটা, কিভাবে কার্যকরী হবে, সে বিষয়ে পরীক্ষা করে তবে প্রয়োগ করা উচিত। আমরা যখন অতি দ্রুত গতিতে এক দেশ ছেড়ে অন্য দেশে যাওয়া-আসা করি, তখনও কিন্তু কিছু সময়ের জন্যে পাইনিয়েলের নিয়মিত জৈবিক ঘড়ির বিপরীত দিকে কাজ করি। পাইনিয়েল যে এর জন্যে খানিকটা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, তা বলাই বাহুল্য। তাই মনে হয়, যান্ত্রিক উন্নতি যদিও মানুষের সময় বাঁচিয়ে দিয়েছে, কিন্তু মানুষের জীবনে আরও অনেক সমস্যার সৃষ্টি করেছে। মানুষের সুখ-দুঃখ এবং ভালবাসার জীবনে ভাটা পড়ুক, বিজ্ঞান কখনই তা চায় না। দৈনন্দিন জীবনে যে সব কারণ মানুষের সুস্থ জীবনযাপনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তা সংশোধনের পথই আজ সবাই খুঁজছে। মানসিক রোগগ্রস্ত মানুষেরা সমাজে কিভাবে সুস্থ জীবনযাপন করতে পারে, সেই জন্যেই মস্তিষ্কের প্রতিটি কলকাঠি ভাল করে পরীক্ষা করে দেখবার সময় হয়েছে। এই ক্ষেত্রে পাইনিয়েলের মূল্য যথেষ্ট বলেই আমাদের ধারণা।

পদার্থ ও জীবন

শ্রীপ্রদীপকুমার দত্ত*

কোনো এক সুদূর অতীতে পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের প্রকাশ ঘটে। তার পর থেকে পৃথিবীর কত পরিবর্তন হয়েছে, কত প্রাণীর মৃত্যু হয়েছে, নতুন প্রাণী জন্ম নিয়েছে। প্রাণের বিকাশের পথে একদিন জন্ম হয়েছে মানুষের। আজ পর্যন্ত মানুষই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। মানুষের আবির্ভাবের পর থেকে আজ পর্যন্ত যে প্রশ্নের মীমাংসা সর্বজনগ্রাহ্য হয় নি, তা হলো জীবনকে কেন্দ্র করেই—জীবনের অস্তিত্বের সূচনা নিয়ে। এই সম্বন্ধে দেশে দেশে, যুগে যুগে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকেরা নানাভাবে চিন্তা করেছেন এবং তাঁদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন। প্রাচীন দার্শনিকদের সিদ্ধান্ত হলো এই যে, প্রাণের সৃষ্টির পিছনে রয়েছে এক অজ্ঞেয় সর্বশক্তিমান পুরুষ—ঈশ্বর। তিনিই সমগ্র জীব-জগতের স্রষ্টা। তারপর থেকে ঈশ্বরের ধারণা আজও মানুষের মনে বদ্ধমূল হয়ে বসে আছে। আর যুগে যুগে প্রতিক্রিয়াশীল শোষক শ্রেণী মানুষের এই ধারণাকে তাদের শোষণ অব্যাহত রাখবার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছে। কিন্তু আজ দিন পাল্টেছে। বিজ্ঞান হয়েছে উন্নত। আর তাই আজকের বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে, জীবজগৎ ঈশ্বর-নামক অলৌকিক কোনও শক্তি বা পুরুষের সৃষ্টি নয়। জীবনের অস্তিত্ব ও তার নানা ক্রিয়াকলাপ ব্যাখ্যা করবার জন্যে ঈশ্বরের ধারণা সম্পূর্ণরূপে বাতিল করে দিয়ে তাঁরা বলেছেন যে, পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন ও জীব-বিজ্ঞানই সম্পূর্ণরূপে জীবনের নানা ক্রিয়াকলাপ ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। জীবনের সৃষ্টি আমাদেরই চেনা পরিচিত পদার্থ থেকে। নানা জটিল রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার দ্বারাই পদার্থের রূপান্তরের মধ্য দিয়ে প্রাণের সৃষ্টি। প্রাণিদেহের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার সঙ্গে আমাদের জানা পরীক্ষাগারের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মূলগত কোনও পার্থক্য নেই, পার্থক্য শুধু এই যে, প্রথমটি দ্বিতীয়টি অপেক্ষা অনেক জটিল।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ নানা জৈব পদার্থের ব্যবহার করে এসেছে। এই সকল জৈব পদার্থ তখন কেবলমাত্র প্রাণিদেহ থেকে পাওয়া যেত। প্রাণিদেহ ছাড়া কৃত্রিম উপায়ে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও এদের পাওয়া সম্ভব ছিল না। তাই এদের বলা হতো জৈব পদার্থ। মানুষের ধারণা ছিল, জীবদেহে কোন অজ্ঞাত প্রাণশক্তির সাহায্যেই এই সকল জৈব পদার্থের সৃষ্টি হয়। প্রাণহীন বস্তু থেকে ধাতু, লবণ, ক্ষার প্রভৃতি যে সমস্ত জিনিষ পাওয়া যেত, তাদের বলা হতো অজৈব পদার্থ। অজৈব পদার্থের সংযুতি বা গঠন (Structure) জৈব পদার্থের গঠন অপেক্ষা অনেক সরল। তাই তখন বৈজ্ঞানিকদের ধারণা ছিল যে, জৈব পদার্থের সৃষ্টি অজৈব পদার্থ থেকে হওয়া সম্ভব নয়। এই ধারণার মূলে প্রথম কুঠারাঘাত হয় 1828 সালে, যখন অজৈব পদার্থ অ্যামোনিয়াম সায়ানেট থেকে জৈব পদার্থ ইউরিয়া প্রস্তুত করা সম্ভব হয়। এর পর থেকে বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষাগারে আরও যে কত জৈব পদার্থ প্রস্তুত করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই; অর্থাৎ জড় পদার্থ থেকে জৈব পদার্থের সৃষ্টি হতে কোনও

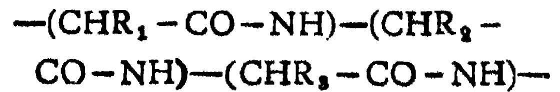
---

* পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগ, আচার্য বি. এন. শীল কলেজ, কোচবিহার।

বাধা নেই এবং তা হওয়া একান্তভাবেই সম্ভব। একই নিয়মের সূত্রে জৈব ও অজৈব উভয় পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়া গ্রথিত।

জীবন-রহস্যের উদ্ঘাটন আজও সম্পূর্ণ হয় নি। এর কারণ বিজ্ঞানের তিন শাখার (পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন ও জীব-বিজ্ঞান) মধ্যে দীর্ঘদিন পর্যন্ত কোন সংযোগসূত্র ছিল না। তিন শাখার বৈজ্ঞানিকেরা পৃথক পৃথকভাবে নিজেদের শাখায় গবেষণা করতেন, অন্য শাখাগুলি সম্বন্ধে তাঁরা বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন না, অথচ এক শাখার প্রগতি অন্য শাখার উপর নির্ভরশীল। একের সঙ্গে অপরের সম্পর্ক নিবিড়। প্রাসঙ্গিক একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। প্রাণিদেহের অণুগুলির মধ্যে যে পারস্পরিক বল ক্রিয়া করে, তা করে পদার্থ-বিজ্ঞানের মূল তত্ত্বানুযায়ী। তাই অণুগুলির মধ্যেকার বল সম্বন্ধে জানতে হলে পদার্থ-বিজ্ঞানের সাহায্য নিতেই হবে। এখানেই জীব-বিজ্ঞানী ও পদার্থ-বিজ্ঞানীর মধ্যে একাত্মতা। এরকম আরও অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যায়। সুখের বিষয় বর্তমানে বৈজ্ঞানিকেরা বিভিন্ন শাখার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে নানা রহস্য উদ্ঘাটনে ব্রতী হয়েছেন।

জীবনের কথায় ফিরে আসা যাক। প্রশ্ন হতে পারে, জীবনের প্রধান ধর্ম কি? জীবনের অস্তিত্ব কিভাবে বোঝা যাবে? এই সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, যার জীবন আছে, তার জনন ক্ষমতা (Reproduction) ও বৃদ্ধি থাকবে। প্রাণিদেহের বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ এই দুটি সংঘটিত করে। প্রাণিদেহে অসংখ্য রাসায়নিক পদার্থ আছে। সেগুলির সব কয়টির ভূমিকা বা ক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করা বর্তমান প্রবন্ধের পরিসরে সম্ভব নয়। বোধ হয় বর্তমান প্রবন্ধে তার বিশেষ প্রয়োজনও নেই। কারণ প্রাণিদেহে প্রাণের প্রকাশ ও প্রাণের ধর্মাবলী নিয়ন্ত্রিত হয় দুই বা তিন শ্রেণীর রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা। সেগুলির সব কয়টিই উচ্চ পলিমার (High polymer)। উচ্চ পলিমারের সঙ্গে সাধারণ রাসায়নিক পদার্থের পার্থক্য হলো এই যে, এদের আণবিক গঠন অপেক্ষাকৃত জটিল এবং এদের অণুসমূহ অনেকগুলি পরমাণুর (কোনও কোনও ক্ষেত্রে দশ লক্ষেরও বেশী) দ্বারা গঠিত। প্রাণিদেহের অন্যতম প্রধান উপাদান হলো প্রোটিন। প্রোটিন অণুতে দীর্ঘ শৃঙ্খলের ন্যায় মূলকগুলি (Units) সজ্জিত থাকে। নিম্নে একটি প্রোটিন অণুর সজ্জা দেখানো হলো। বন্ধনীর মধ্যেকার পরমাণুগুলি এক-একটি মূলক। R_1, R_2, R_3 ইত্যাদি হলো বিভিন্ন পরমাণুসমষ্টির (Group) দ্যোতক।



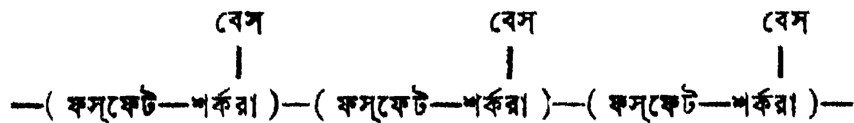
$$—(CHR_1-CO-NH)—(CHR_2-CO-NH)—(CHR_3-CO-NH)—$$

R_1, R_2, R_3-এর বিভিন্নতার জন্যেই প্রোটিনের বিভিন্নতা দেখা যায়। এই পরমাণুসমষ্টিগুলির বিভিন্ন ধর্মাবলীর জন্যে প্রোটিনের ধর্মের বিভিন্নতা দেখা যায়। তাছাড়া প্রোটিনের মূলকগুলির পার্থক্যের জন্যেও বিভিন্ন ধরণের প্রোটিন পাওয়া যায়। তবে এই মূলকগুলির সংখ্যা খুব বেশী নয়। কিন্তু বিভিন্ন মূলক ও পরমাণু-সমষ্টিগুলির বিভিন্ন সমবায়ে অসংখ্য প্রোটিন অণু গঠিত হতে পারে। এদের ধর্মাবলীও স্বভাবতঃই বিভিন্ন হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, প্রকৃতিতে জীবনের নানা বৈচিত্র্যের জন্যে অণুগুলির মূল গঠন-কাঠামো বা সংযুক্তির বৈচিত্র্যতার প্রয়োজন নেই; অর্থাৎ একই শ্রেণীর অণুর দ্বারাই জীবনে নানা বৈচিত্র্যের প্রকাশ ঘটতে পারে, সে জন্যে সম্পূর্ণ নতুন ধরণের অন্য কোনও অণুর প্রয়োজন নেই। প্রাণী-জগতে এখানেই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য বিরাজ করছে।

প্রাণিদেহের মূল উপাদান প্রোটিন জীবদেহে বিচিত্ররূপে কাজ করে। অনেক পশুদেহে তারা দেহাংশ গঠনে অংশগ্রহণ করে। আয়

এক ধরণের প্রোটিন, যার নাম হিমোগ্লোবিন—পূর্বোক্ত মূলকগুলি ছাড়াও যাদের মধ্যে কিছু লৌহ পরমাণু থাকে। দেহের বিভিন্ন স্থানে এরা অক্সিজেন পৌঁছে দেয়। এক কথায় প্রাণিদেহে হাজার হাজার প্রোটিন তাদের নিজেদের বিচিত্র কর্মসাধনে তৎপর রয়েছে।

প্রাণের অস্তিত্বের জন্যে প্রোটিন অপরিহার্য। উদ্ভিদ-জগৎ, প্রাণী-জগৎ—এমন কি, ক্ষুদ্র জীবাণু বা ততোধিক ক্ষুদ্র ভাইরাস প্রভৃতি সকলের ক্ষেত্রেই একথা সত্য। প্রোটিন ছাড়াও জীবনের প্রকাশের জন্যে আর একটি অপরিহার্য জিনিষ হলো নিউক্লিক অ্যাসিড (Nucleic acid)। জীবকোষের কেন্দ্রীনের (Nucleus) গঠনে এদের ভূমিকা থেকেই এই পদার্থটির নামকরণ হয়েছে। যদিও জীব-বিজ্ঞানীরা জানতেন যে, জীবজগতের বংশগতির জন্যে জীবকোষের কেন্দ্রীন দায়ী এবং কেন্দ্রীনে নিউক্লিক অ্যাসিড প্রচুর পরিমাণে থাকে, তবুও কেবলমাত্র বর্তমান শতাব্দীর পঞ্চদশ দশকের বৈজ্ঞানিকেরা নিশ্চিতভাবে সিদ্ধান্তে আসেন যে, বংশগতির জন্যে নিউক্লিক অ্যাসিডই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নিউক্লিক অ্যাসিডও একটি উচ্চ পলিমার এবং এদের মূলকগুলি প্রোটিনের মূলক অপেক্ষা আরও জটিল। এখানে মূলক হলো ফস্‌ফেট ও শর্করা (Sugar) শৃঙ্খল। প্রোটিনের R-পরমাণুসমষ্টির মত এখানেও একটি উপাদানের বিভিন্নতা আছে—যেটিকে বলা হয় বেস (Base)। বেসের বিভিন্নতার জন্যেই নিউক্লিক অ্যাসিডের ধর্মের বিভিন্নতা দেখা দেয়। তবে এখানে বিভিন্ন বেসের সংখ্যা বেশী নয়—মাত্র চার ধরণের বেস আছে। DNA বা Deoxyribonucleic acid এবং RNA বা Ribonucleic acid হলো দুই ধরণের নিউক্লিক অ্যাসিড, যাদের পার্থক্য শুধু উভয়ের শর্করার পার্থক্যের জন্যে। নিম্নে একটি নিউক্লিক অ্যাসিডের শৃঙ্খল দেখানো হলো।



জননকারী নিউক্লিক অ্যাসিড শৃঙ্খল খুবই দীর্ঘ এবং তাতে দশ লক্ষেরও বেশী সংখ্যক বেস থাকে। সুতরাং সহজেই বুঝতে পারা যায় যে, মাত্র চারটি বিভিন্ন রকমের বেসের দ্বারাই প্রাণিদেহে কত বৈচিত্র্যের সমাবেশ ঘটতে পারে। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে, ক্রোমোসোমে DNA-এর ক্রিয়াকলাপের দ্বারাই জীবন ও জীবজগৎ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

আগেই বলা হয়েছে যে, জীবনের প্রধান লক্ষণ হলো তার বৃদ্ধি ও জননক্ষমতা। গভীরভাবে বিচার-বিবেচনা করলে দেখা যাবে, এই দুটি লক্ষণ একই বিষয়ের দুটি ভিন্ন প্রকাশরূপ মাত্র এবং বৃদ্ধিকে জননক্ষমতার দ্বারা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ব্যাক্টিরিয়া এককোষী প্রাণী। এই কোষটি জীবনের ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করে এবং কোষটি বৃদ্ধি পেতে পেতে উপযুক্ত সময়ে একদিন দুটি অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং অংশ দুটিতে তাদের পূর্ববর্তীদের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে। এই ভাবেই তাদের বংশবৃদ্ধি ঘটে। আর উচ্চ-শ্রেণীর জীবের ক্ষেত্রেও জীবনের সুরু একটি মাত্র কোষ থেকেই। কিন্তু এখানে কোষগুলি বিভক্ত হবার পর নিম্নস্তরের জীবের কোষের ন্যায় প্রাথমিক (Parent) কোষ থেকে পৃথক হয়ে যায় না বরং প্রাথমিক কোষের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে প্রাণী-দেহের আকৃতি গড়ে তোলে। জননকারী পদার্থের (Genetic material) একটি অবশ্য কর্তব্য হলো নতুন কোষের সৃষ্টি। সুতরাং DNA-এর দুটি কাজ—(1) প্রয়োজনীয় প্রোটিন তৈরি

করা ও (2) নিজের বৃদ্ধি ঘটানো। 1952 সালে DNA-এর আণবিক গঠন আবিষ্কৃত হবার পরেই DNA-এর বৃদ্ধির (Duplication) প্রক্রিয়াটি জানা সম্ভব হয়। সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের পরিধি বহির্ভূত। DNA থেকে প্রোটিন সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া সম্বন্ধেও বর্তমানে জানা গেছে।

জীবজগতে প্রাণীর বৈচিত্র্য ও বিবর্তন (Evolution) DNA-এর পরিবর্তনের জন্যেই হয়ে থাকে। কোনও রাসায়নিক ক্রিয়া বা সৌর বিকিরণের ফলে DNA-এর মধ্যে কিছু পরিবর্তন সংঘটিত হলে জীবের স্থায়ী পরিব্যক্তি (Mutation) ঘটতে পারে। DNA-এর মধ্যে পরিবর্তন বলতে এই কথাই বোঝানো হচ্ছে যে, DNA-এর মধ্যেকার কোনও বেসের অন্য কোনও বেসে রূপান্তরিত হওয়া কিংবা কোন মূলকের যোগ বা বিয়োগ ঘটা। এর ফলে সংশ্লেষণের পর উৎপন্ন প্রোটিনের মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখা দিতে পারে। আর এর ফলেই প্রাণীর বৈশিষ্ট্যেরও পরিবর্তন দেখা দিতে পারে—এমন কি, সম্পূর্ণ পৃথক জীবকোষের সৃষ্টি বা জীবকোষের মৃত্যু হতে পারে। সুতরাং পৃথিবীতে এমন সব প্রাণীই টিকে থাকবে, যারা প্রকৃতির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারবে। আর তা না হলে তাদের পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে—যেমন সৃষ্টির আদিকাল থেকে হয়ে এসেছে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, DNA ও প্রোটিন যখন জীবদেহের মূল উপাদান এবং তারাই যখন প্রাণের প্রকাশে মূল ভূমিকা পালন করে, তখন পরীক্ষাগারে প্রাণ সৃষ্টির সম্ভাবনা কতটুকু? প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করবার আগে আরও একটি বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রাণের অস্তিত্ব আছে, ক্ষুদ্রতম এমন জিনিষ হলো ভাইরাস। ভাইরাসকে প্রাণী ও জড়ের মাঝামাঝি একটা অবস্থা বলা যেতে পারে—কারণ প্রাণীর মূল একটি ধর্ম এদের নেই, এরা নিজে থেকে বংশবৃদ্ধি করতে পারে না, এর জন্যে অন্য জীবদেহের সাহায্যের প্রয়োজন। কিন্তু প্রাণিদেহের পক্ষে অপরিহার্য অন্য দুটি জিনিষ, যথা—নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিন এদের মধ্যে আছে। প্রায় দশ বছর আগে ভাইরাসের নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিন পৃথক করবার জন্যে পরীক্ষা চালানো হয়। তা থেকে জানা যায় যে, নিউক্লিক অ্যাসিডই প্রাণের মূল চাবিকাঠি। পরীক্ষা থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, ভাইরাসের নিউক্লিক অ্যাসিড শৃঙ্খল কৃত্রিম উপায়ে সংশ্লেষণের (Synthesis) দ্বারা আমরা কৃত্রিমভাবে ভাইরাসের জন্ম দিতে পারি। নিউক্লিক অ্যাসিড শৃঙ্খলের বৃদ্ধির জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা জীবকোষের মধ্যে থাকে। কোষ থেকে সেই সব রাসায়নিক পদার্থ কোষের বাইরে এনে পরীক্ষা-নলের মধ্যে রেখেও বৃদ্ধির কাজ করা সম্ভব হয়েছে। এইভাবে কৃত্রিম উপায়ে পুনঃসংশ্লেষিত ভাইরাসের নিউক্লিক অ্যাসিডকে জীবদেহের কোষে অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দেখা গেছে যে, প্রাকৃতিক ভাইরাসের মতই এরা জীবদেহের অভ্যন্তরে বংশবৃদ্ধি করে। এভাবে পরীক্ষা-নলে সৃষ্ট ভাইরাসকে অনেকাংশে কৃত্রিম উপায়ে উৎপন্ন ভাইরাস বলা যেতে পারে। ভবিষ্যতে হয়তো কোষের রাসায়নিক পদার্থের সাহায্য ছাড়াই সম্পূর্ণ কৃত্রিম উপায়ে ভাইরাসের নিউক্লিক অ্যাসিড শৃঙ্খল সংশ্লেষণ করা সম্ভব হবে। তত্ত্বগত ভাবে তা সম্ভব। ডক্টর খোরানা নিউক্লিক অ্যাসিড শৃঙ্খল সংশ্লেষণ করবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। অবশ্য তিনি ভাইরাসের নিউক্লিক অ্যাসিড নয়—জিন সংশ্লেষণের চেষ্টা করছেন। জিন হলো DNA শৃঙ্খলের একটি অংশ, যা একটি প্রোটিন শৃঙ্খল তৈরি করে। ভাইরাসের সম্পূর্ণ DNA শৃঙ্খল সংশ্লেষণের সমস্যা হলো এই যে, এই শৃঙ্খলে দশ লক্ষের মত মূলক আছে। সেই সমস্যার সমাধান একদিন

হবেই। সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, পরীক্ষাগারে কৃত্রিম উপায়ে প্রাণ সৃষ্টি করা সম্ভব।

সর্বশেষে যে প্রশ্ন উঠতে পারে, তা হলো পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের প্রকাশ কিভাবে সম্ভব হয়েছিল? ঈশ্বর-বিশ্বাসীরা তা ঈশ্বরের সৃষ্টি বলে মনে করে। বিজ্ঞান তা স্বীকার করে না। বিজ্ঞান বলে পৃথিবীতে বর্তমানে যে সব গ্যাস পাওয়া যায়, পৃথিবীর আদিকালে তা ছিল না। তখন ছিল মার্স গ্যাস, অ্যামোনিয়া, জলীয় বাষ্প প্রভৃতি। এই সব গ্যাস থেকে কিভাবে প্রথম প্রাণের সৃষ্টি হয়—সেটা দেখবার জন্যে একটি বদ্ধ পাত্রে কৃত্রিম উপায়ে প্রাচীন পৃথিবীর আবহাওয়া সৃষ্টি করে তার মধ্যে বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন করা হয়। উৎপন্ন পদার্থগুলিকে পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, সেগুলি প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিডের পূর্বগামী (Precursors) কয়েকটি সরল রাসায়নিক পদার্থ। সুতরাং সুদূর অতীতে কোনও এক সময় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে বিদ্যুৎ-চমকের ফলে এই সব পদার্থের সৃষ্টি হয় এবং সেগুলি চাপ, তাপ প্রভৃতির কোনও বিশেষ অনুকূল অবস্থায় মিলিত হয়ে উচ্চ পলিমারে পরিণত হয়। এই রকম পরিস্থিতির উদ্ভব একবার হবার পর রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এগুলি থেকে প্রথম প্রাণী-কোষের সৃষ্টি হয়। যে সকল বৈজ্ঞানিক এই বিষয় নিয়ে গবেষণা করছেন, তাঁরা পরীক্ষাগারে অতীত পৃথিবীর পরিবেশ সৃষ্টি করে আদি প্রাণিকোষ গঠনের উপরিউক্ত তত্ত্বের সমর্থনে তথ্য সংগ্রহ করছেন। হয়তো অদূর ভবিষ্যতেই এই তত্ত্বের সত্যতা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হবে।

প্রাকৃতিক নানা ঘটনা মানুষের মনে যে ভয় ও বিস্ময়ের সঞ্চার করেছিল, তা মানুষের অজ্ঞতার সুযোগে ঈশ্বরের ধারণার জন্ম দিয়েছিল। নানা ঘটনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ধীরে ধীরে মানুষের সেই ধারণা অনেকটা দূর করতে সক্ষম হয়েছে। জীবন-রহস্য উদ্ঘাটনের প্রচেষ্টাকেও তা ত্বরান্বিত করবে।

সমুদ্র-বিজ্ঞান

অলকরঞ্জন বসুচৌধুরী

মানুষ আজ চন্দ্রজয়ী হয়েছে। সুদূর মঙ্গলগ্রহ আর শুক্রগ্রহ থেকে উড়ে আসা ইঙ্গিত শুনতেও সে সক্ষম হয়েছে। আবহমণ্ডল ও তার বাইরের অন্তহীন মহাশূন্যের বহু রহস্য আজ তার সন্ধানী দৃষ্টির সামনে উদ্ঘাটিত। জনহীন দুর্গম মেরুপ্রদেশ, তুষারমণ্ডিত পাহাড়-চূড়া—সর্বত্রই মানুষের পদচিহ্ন পড়েছে, কিন্তু যে তিন ভাগ জলরাশির উপর তার একভাগ বাসভূমি ভেসে রয়েছে, সেই মহাসমুদ্র সম্পর্কে তার জ্ঞানের পরিধি খুবই সীমিত।

সমুদ্র-সম্পদ ও সমুদ্র-বিজ্ঞান

অতীতে একদিন সমুদ্র থেকে স্থলভূমি উঠে এসেছিল কিনা বা ভবিষ্যতে কোন দিন সেই স্থলভূমি আবার সমুদ্রের অতলগর্ভে চলে যাবে কিনা, সে সব বিজ্ঞানীদের বিতর্কের বিষয়। তবে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, সৃষ্টির প্রথম প্রত্যূষে আদি প্রাণের বিকাশ হয়েছিল সমুদ্রেরই বুকে, আর সৃষ্টির শেষ দিন পর্যন্ত হয়তো প্রাণধারণের জন্যে নির্ভর করতে হবে সমুদ্রের উপরেই। সর্বত্রই স্থলভাগকে ঘিরে রেখেছে সমুদ্র এবং সে

কারণে সমুদ্রের সঙ্গে মানুষের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক, সমুদ্রকে জানা তার পক্ষে অপরিহার্য। দক্ষিণ গোলার্ধের চার পঞ্চমাংশ এবং উত্তর গোলার্ধের তিন পঞ্চমাংশই সমুদ্র। ভূমণ্ডলে সমগ্র সমুদ্র জলের পরিমাণ 137 কোটি কিউবিক কিলোমিটার আর গভীরতা প্রায় তিন থেকে ছয় কিলোমিটারের মধ্যে।

এই সমুদ্রের কাছে মানুষের ঋণের অন্ত নেই। মানুষের খাদ্য, পরিবহন ইত্যাদি বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে সমুদ্র তাকে সহায়তা করে এসেছে। জলপথে যাতায়াত ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা ছেড়ে দিলেও আমাদের খাদ্যের অন্যতম মূল উপাদান প্রোটিন আমরা সমুদ্রজল থেকে সংগ্রহ করে থাকি। গৃহপালিত পশুদের জন্যে আমিষ খাদ্য ও নানা ওষুধপত্র তৈরির উপাদানও সমুদ্র থেকে সংগৃহীত হয়। বিভিন্ন রকমের মাছ, তিমি, চিংড়ি, কাকড়াজাতীয় প্রাণী, শামুক, গুগ্‌লি ইত্যাদি মানুষ সমুদ্র থেকে লাভ করে। বছরে কোটি কোটি টাকার তেল ও গ্যাস উৎপন্ন করা হয় সমুদ্র থেকে।

কৃষি-উন্নয়নেও সমুদ্রের দান অপরিসীম। সমুদ্রের জলে যে জোয়ার-ভাটা খেলে, তা পৃথিবীর নদীগুলিকেও প্রভাবিত করে। সমুদ্র তার বিরাট জলসম্পদ, লবণসম্পদ ও সমুদ্রতলে ছড়ানো খনিজসম্পদও মানুষকে দান করছে। তাছাড়া সমুদ্রগর্ভ থেকে বিভিন্ন রাসায়নিক লবণ, সালফার, পটাশ, কিছু পরিমাণে ধাতব পদার্থ, আর সমুদ্র ও উপকূল থেকে কয়লা ও আকরিক লৌহ ইত্যাদি সামগ্রী আহৃত হবার ফলে মানবসভ্যতার অগ্রগতিতে উল্লেখযোগ্য সহায়তা হয়েছে। বিজ্ঞানীদের মতে আমাদের পরিচিত যত রকম খনিজ পদার্থ আছে, তার সবচেয়ে বড় আকর হলো সমুদ্র।

সমুদ্র সম্পর্কে আমাদের সামান্য জ্ঞানই যখন এত রকম সম্পদের সন্ধান দিয়েছে, তখন তাকে আরও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানতে পারলে না জানি আরও কত সম্পদের সন্ধান মিলবে! সমুদ্রগর্ভের বিভিন্ন সম্পদ আহরণ করবার জন্যে চাই ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা, পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান ও শক্তিশালী প্রযুক্তিবিদ্যা। সমুদ্রতলের উদ্ভিদ বা শ্যাওলা ইত্যাদি থেকে প্রতিজৈবিক ওষুধপত্র তৈরির বিরাট সুযোগ, দুষ্প্রাপ্য জলজ উদ্ভিদ ইত্যাদি থেকে নূতন ওষুধ তৈরির সম্ভাবনা—এসবের সদ্ব্যবহারের জন্যে চাই পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে বিজ্ঞানী সমাজের অনলস সাধনা। সমুদ্রগর্ভের রহস্য-সন্ধান ও তাকে মানবকল্যাণে নিয়োগের এই লক্ষ্য নিয়েই গড়ে উঠেছে বিজ্ঞানের এই আধুনিক শাখা—সমুদ্র-বিজ্ঞান বা Oceanography। অবশ্য এই বিজ্ঞান এখনও তার প্রাথমিক স্তরেই রয়েছে।

সমুদ্রচর্চার ইতিহাস

সমুদ্র সম্পর্কে জানবার জন্যে মানবমনের স্বাভাবিক অভীপ্সার প্রথম প্রকাশ দেখা যায় সমুদ্রযাত্রার মধ্যে। গত শতাব্দীতেও ইউরোপীয়েরা এরকম বহু জাহাজী অভিযান চালিয়েছেন। এই রকমেরই এক অভিযানে ডারুইন তাঁর 'প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব' আবিষ্কার করেন।

আধুনিক কালে সমুদ্রের উপকূলবর্তী দেশগুলির বিজ্ঞানীদের আগ্রহে সমুদ্র-বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে এবং এর পরিধি বিস্তৃত হয়েছে। তবে দু-তিন দশক আগেও পৃথিবীর সমুদ্র-বিজ্ঞানীদের সংখ্যা সীমিত হওয়ায় বিজ্ঞানীরা সবাই সবার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ চালাতে পারতেন। কিন্তু তারপর এই সংখ্যা ক্রমশঃ বর্ধিত হওয়ায় যোগাযোগ রক্ষার জন্যে আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে ওঠে। ইউরোপে কয়েকটি সংস্থা বিভিন্ন সমুদ্রবিজ্ঞানীর সংগৃহীত তথ্যাদি বিনিময়ের মাধ্যমে সমুদ্রবিদ্যা গবেষণায় সাহায্য করে আসছে। এই রকমেরই একটি সংস্থা—Hydrographic Service of the International Council for the

Exploration of the Sea—1902 সাল থেকে কাজ করে আসছে। 1957-'58 সালে আন্তর্জাতিক ভূপদার্থ-বিজ্ঞান বর্ষে সমুদ্র-বিজ্ঞানীদের তথ্যাদি বিনিময়ের সুসংগঠিত আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার জন্ম হয়। রাষ্ট্রপুঞ্জের UNESCO-এর অধীনস্থ একটি শাখা Oceonographic Commission রূপে সরকারী প্রচেষ্টায় প্রচুর কাজ করছে, মস্কো আর ওয়াশিংটনে সমুদ্রবিদ্যার তথ্যকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। আমেরিকার বিভিন্ন দেশের প্রায় 1700 জাহাজ ভ্রাম্যমান স্টেশনরূপে সমুদ্র থেকে নানাবিধ নমুনা সংগ্রহ করেছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের বাইরেও এই বিষয়ে নানা প্রতিষ্ঠান কাজ করছে; যেমন—International Hydrographic Organisation, Scientific Committee on Oceanic Research, International Association of Oceanic Biography, Commission of Marine Geology প্রভৃতি। বর্তমানে রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, জার্মেনী, জাপান ফ্রান্স, ক্যানাডা প্রভৃতি দেশ সমুদ্র-বিজ্ঞানে উন্নতি করেছে। সাম্প্রতিক কালে মার্কিন নৌবাহিনীর ব্যাথিস্কিয়ার 'ত্রিয়েস্ত'-এর আরোহী হয়ে ঐ বাহিনীর লেঃ ওয়াল্‌শ ও ডক্টর পিকার্ড পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের প্রায় 11 কি. মিঃ গভীরে নেমেছিলেন, পরীক্ষার জন্যে। এত গভীরে এর আগে কেউ নামতে পারেন নি। সমুদ্রতলের অভ্যন্তরের ভূগর্ভ সম্পর্কে জানবার জন্যে সমুদ্রের তলদেশে ড্রিলের সাহায্যে গর্ত করবার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। মার্কিন বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই প্রশান্ত মহাসাগরে একাধিক গর্ত করেছেন। রাশিয়াতেও এই ব্যাপারে ব্যাপক তোড়জোড় চলছে।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

সমুদ্রবিদ্যা এমনই একটি বিজ্ঞান, যাতে একক প্রচেষ্টায় কোন দেশের উন্নতি বিশেষ সম্ভব নয়। কারণ সমুদ্র বিশাল হবার ফলে যে কোন একটি দেশের পক্ষে সেখানে সব রকম পরীক্ষা চালানো সম্ভব নয়। তাছাড়া একই সমুদ্র একাধিক দেশের সঙ্গে যুক্ত। সে জন্যে সমুদ্র-বিজ্ঞান প্রথম থেকেই মহাকাশ-বিজ্ঞানের মত প্রতিযোগিতামূলক না হয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। এই আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টায় সহায়তা করছে রাষ্ট্রপুঞ্জ। সমুদ্রের বিষয় গবেষণার রাজনৈতিক বাধা দূর করবার জন্যে 1958 সালে জেনেভাতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, প্রত্যেক দেশের সমুদ্র-উপকূল থেকে 200 মিটার এলাকা বাদ দিয়ে বাইরের সমুদ্রে যে কোন দেশের বিজ্ঞানী স্বাধীনভাবে পরীক্ষা চালাতে পারবেন। সংশ্লিষ্ট দেশের বিজ্ঞানীরা অবশ্য ঐ সীমানার ভিতরে পরীক্ষা চালাতে পারেন।

সমুদ্রের উপকূলবর্তী দেশগুলির আগ্রহ সমুদ্র-বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করতে পারে। এই বিষয়ে তাই ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ভারতের উপকূল সংলগ্ন রয়েছে বঙ্গোপসাগর, আরব সাগর ও সুবিশাল ভারত মহাসাগর। ভারত মহাসাগরের অনেক সম্পদই এখনও অনুদ্‌ঘাটিত রয়েছে। 1960 সালে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সমুদ্র-বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে ভারত মহাসাগরে 1960 থেকে 1964 সাল পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক গবেষণা চালাবার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া নিজস্ব উন্নতির খাতিরেও ভারতের সমুদ্র-বিজ্ঞান গবেষণায় অগ্রণী হওয়া উচিত।

মহাকাশ-বিজ্ঞান ও সমুদ্র-বিজ্ঞান

মহাকাশ-বিজ্ঞান সমুদ্র-বিজ্ঞানকেও নানাভাবে সহায়তা করছে। যোগাযোগ ও আবহবিদ্যা—এই দুটি শাখায় মাধ্যমেই সমুদ্র-বিজ্ঞান লাভবান হচ্ছে। 1965 সালের অগাষ্ট মাসে জেমিনি-5 মহাকাশযানে ভূপরিক্রমারত দু-জন মার্কিন

মহাকাশচারী কুপার ও কনরাড মহাকাশ থেকে সমুদ্রতলে অবস্থানরত আর একজন মার্কিন মহাকাশচারী কার্পেন্টারের সঙ্গে বেতারযোগে কথাবার্তা বলেন। উনিশ-শ' বাষট্টির মহাকাশচারী কার্পেন্টার উনিশ-শ' পঁয়ষট্টিতে প্রশান্ত মহাসাগরের 205 ফুট নীচে নেমে একটি ক্যাপসুলে আরও কয়েকজনের সঙ্গে তিরিশ দিন বসবাস করেন—মানবদেহের উপর সমুদ্রজলের তাপ ও চাপ ইত্যাদির প্রতিক্রিয়া পরীক্ষার জন্যে। সমুদ্রের অভ্যন্তরের পরিবেশ বর্ণনা করতে গিয়ে কার্পেন্টার বলেছেন—অসম্ভব, অবিশ্বাস্য অন্ধকার। জলের উষ্ণতা মাত্র 50 ডিগ্রি ফারেনহাইট এবং বিশেষভাবে তৈরি রবারের পোষাক পরে থাকা সত্ত্বেও শীতের প্রভাবে ভীষণ কাঁপুনি লাগে। তবে দু'-তিন দিনে এই অবস্থা সয়ে যায়।

সমুদ্রের আবহাওয়ায় অভিযাত্রীদের প্রত্যেকেরই হঠাৎ মাথা ধরবার উপসর্গ দেখা দিত। কেউ কেউ হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যেতেন, কেউ বা কথা বলবার সময় যুক্তি খুঁজে পেতেন না। যদিও তাঁরা সমুদ্রের উপরের পৃথিবীতে সবাই যুক্তিবাদী মানুষ। রাত্রিতে হঠাৎ সারা শরীর ঘেমে উঠতো আর ঘুম ভেঙে যেত। এই সমুদ্রবাস থেকে কার্পেন্টার এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, সমুদ্রগর্ভে বসবাস করা সম্ভব।

কিন্তু এ তো গেল মহাকাশচারীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা। পরোক্ষভাবেও মহাকাশ অভিযান থেকে সমুদ্রবিদ্যা নানাভাবে উপকৃত হচ্ছে। সামুদ্রিক আবহাওয়া লোকালয়ের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। সমুদ্রের উপরের মেঘ ও আবহমণ্ডল সম্পর্কে কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে নানা তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং হচ্ছে। এর ফলে সমুদ্র সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান ক্রমশঃ বাড়বে ও সমুদ্রসম্পর্কিত প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর কার্য-কারণ সূত্র ও সাধারণ নিয়মাবলী উদ্ঘাটন করে সে সব ঘটনা আমরা নিয়ন্ত্রণও করতে পারবো। সামুদ্রিক ঝড়ের পূর্বাভাস দিয়ে কৃত্রিম উপগ্রহ একাধিক ক্ষেত্রে জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করেছে।

সমুদ্র থেকে মৎস্য-আহরণের ব্যাপার বর্তমানে একটি বিরাট বাণিজ্যে পরিণত হয়েছে। এই ব্যাপারেও কৃত্রিম উপগ্রহ মানুষকে সাহায্য করে থাকে। মহাসাগরের গভীরে কোথায় মাছের ঝাঁক ঘুরে বেড়াচ্ছে, তা কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটি কৃত্রিম উপগ্রহ বলে দিতে পারে। অবলোহিত রশ্মির ফটোগ্রাফির সাহায্যে মাছ ও জলজ উদ্ভিদবাহী স্রোত ও অন্য স্রোতের মিলন সীমান্ত এবং মাছের দেহ থেকে নির্গত তেল কৃত্রিম উপগ্রহের চোখে—এমন কি, রাত্রিবেলাতেও স্পষ্ট ধরা পড়ে। সমুদ্রগর্ভে বা সমুদ্রতলেরও নীচে কোন তৈল বা গ্যাসবাহী স্তর থাকলে তা কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে তোলা ফটোর সাহায্যে ধরা যায়। সমুদ্রের মানচিত্র রচনার কাজেও ঐ ফটো খুব ভাল কাজ দেয়। আর সমুদ্রের লুকানো বরফপিণ্ড ইত্যাদি সম্পর্কে কৃত্রিম উপগ্রহ সচেতন করে দিলে সমুদ্রযাত্রা আরও নিরাপদ হয়।

তাছাড়া মহাকাশের অজানা পরিবেশে পরীক্ষার জন্যে নির্মিত বিভিন্ন তাপ-চাপ সহনক্ষম মহাকাশযানের যন্ত্রগুলিকে মহাসমুদ্রের বিভিন্ন তপ-চাপের পরিবেশে গবেষণার জন্যেও ব্যবহার করা যেতে পারে। রাশিয়ার সাম্প্রতিক চান্দ্রযান লুনোখোদ সম্পর্কে জনৈক রুশ বিশেষজ্ঞ একথা বলেছেন।

উপসংহার

সমুদ্র-বিজ্ঞান একটি নূতন বিজ্ঞান এবং এর সামনে রয়েছে বিরাট সম্ভাবনা। সমুদ্র সম্পর্কে মানুষের বিস্তৃত জ্ঞান তার জীবনকে আরও সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরে তুলবে সন্দেহ নেই। সামুদ্রিক

ঝঞ্ঝাবাত্যা যদি মানুষ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তবে মহাসাগরের বিরাট এলাকা জুড়ে শান্ত আবহাওয়া বিরাজ করবে, ফলে বিমান ও জাহাজ চলাচল ও বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা নির্বিঘ্ন হবে। সমুদ্রতলের অনেক অনাবিষ্কৃত সম্পদ হয়তো আবিষ্কৃত হয়ে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের আরও অনেক চাহিদা মেটাবে, তৈরি হবে নানারকম শক্তিশালী ওষুধ। গভীর সমুদ্রে যে সব আলোক-উদ্ভাসী মাছ আছে, তাদের সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে মানুষ হয়তো পৃথিবীতেই জৈব আলো ব্যবহারোপযোগী করতে পারবে।

কিন্তু এই উজ্জ্বল সম্ভাবনার একটি নেতিবাচক দিকও আছে। বিভিন্ন দেশ নিজের রাজনৈতিক স্বার্থে সমুদ্রের অপব্যবহার করছে। সমুদ্রগর্ভে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাবার ফলে, তেজস্ক্রিয় পদার্থ সমুদ্রজলকে দূষিত করছে। তাছাড়া নানারকম আবর্জনা ও কীটনাশক পদার্থ সমুদ্রজলে ফেলায় ক্রমশঃ সমুদ্রজল বিষাক্ত হয়ে পড়ছে। এর ফলে সমুদ্র থেকে খাদ্যবস্তু ও লবণ সংগ্রহ করা বিপজ্জনক হয়ে পড়ছে। তাই নানা অনাবিষ্কৃত শুভ ফল, সম্ভাব্য ওষুধ ও রত্নরাজি—সমুদ্রমন্থনের এই অমৃতের অধিকার লাভ করবার জন্যে যেমন বিজ্ঞানকে অনলস প্রচেষ্টা চালাতে হবে, তেমনই নানা অনাবিষ্কৃত অশুভ ফল, মহাসাগরের দুরন্ত ঝটিকার তাণ্ডবলীলা ও সমুদ্রজলের বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া—সমুদ্রমন্থনের এই বিষকে ধারণ করবার সামর্থ্যও বিজ্ঞানকে অর্জন করতে হবে।

প্রাচীন মৌর্য যুগের নগর-বিন্যাস

শ্রীঅবনীকুমার দে*

পাটলীপুত্র

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বিন্দুসার এবং বিন্দুসারের পর অশোক মগধের রাজা হন। বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু শোণ ও গঙ্গানদীর সঙ্গমস্থলে যে প্রাচীন পাটল নগর তৈরি করেছিলেন, তা কি ভাবে ক্রমে ক্রমে সম্প্রসারিত হয়ে সম্রাট অশোকের সময়ের রাজধানী পাটলীপুত্রে পরিণত হয়েছিল, তার বিবরণ পাওয়া যায় না।

সেলুকাসের গ্রীক দূত মেগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজধানী পাটলীপুত্র শহরে (আধুনিক পাটনা) দীর্ঘকাল বাস করেছিলেন। মেগাস্থিনিস ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একখানি বই লিখেছিলেন। মূল বইখানি এখন আর পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রাচীন লেখকেরা সেই বই থেকে অনেক বিবরণ নিজেদের লেখা বইয়ে উদ্ধৃত করেছেন। এই সব বিবরণ থেকে প্রাচীন পাটলীপুত্র শহরের ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্যের কিছু আভাস পাওয়া যায়।

তদানীন্তন ভারতবর্ষের এই সর্বপ্রধান শহরটি হিরণ্যবতী (আধুনিক শোণ) ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ছিল। পাটলীপুত্র শহর দৈর্ঘ্যে নদীতীর বরাবর প্রায় দশ মাইল প্রসারিত ছিল। শহরটি প্রস্থে ছিল প্রায় দেড় মাইল বিস্তৃত। নদীর ধার বরাবর বাঁধ নির্মিত ছিল। শহরের চারদিকে অল্প দূর অন্তর অবস্থিত পর পর তিনটি ইট-বাঁধানো জলপূর্ণ পরিখা ছিল। রাজধানীর প্রাচীর ছিল সুদৃঢ় ও কাষ্ঠনির্মিত।

* নগর ও আঞ্চলিক পরিকল্পনা বিভাগ, বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, শিবপুর।

শহর-প্রাচীরের মধ্যে চৌষট্টিটি বৃহৎ তোরণ-দ্বার ও তাদের উপর সুউচ্চ বুরুজ ছিল। প্রধান দ্বারগুলির মধ্যে মধ্যে প্রাচীরে কয়েক শত ছোট ছোট দরজাও ছিল। শহরের কেন্দ্রস্থলে রাজপ্রাসাদ অবস্থিত ছিল। প্রাসাদের চারদিক সুন্দর বাগান ও বনভূমি দিয়ে ঘেরা ছিল। বাগানে ছিল বহু ফোয়ারা ও মাছপূর্ণ পুষ্করিণী। প্রাসাদের স্তম্ভগুলি ছিল সোনার পাত দিয়ে মোড়া এবং তার উপর সোনা-রূপার কারুকার্যকরা পাখী ও লতাপাতার নক্সা দিয়ে অলঙ্কৃত। সিংহাসন, বহুমূল্য প্রস্তর-খচিত ও সোনা, রূপা ও তামার তৈরি বড় বড় পাত্র এবং অন্যান্য জাঁকজমকপূর্ণ আসবাবপত্র দিয়ে প্রাসাদ সুসজ্জিত ছিল।

আধুনিক পাটনা শহরের কাছে বুলন্দিবাগে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে পাটলীপুত্র শহরের কাঠের বেড়ার কিছু অংশ ও কাঠের তক্তার দ্বারা তৈরি ভূনিম্নস্থ পথের নিদর্শন পাওয়া গেছে। এই জায়গা থেকে কিছু দক্ষিণে আধুনিক কুমরাহার গ্রামেও প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য করে সুসমঞ্জসভাবে বিন্যস্ত কয়েকটি স্তম্ভের ভিতের নিদর্শন পাওয়া গেছে। মনে হয় এই স্তম্ভগুলি প্রাচীন রাজপ্রাসাদের ভিতরে অবস্থিত একটি হলঘরের মধ্যে ছিল। মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকেও এই রকম একটি হলঘরের বর্ণনা পাওয়া যায়। এই সব নিদর্শন থেকে প্রাচীন পাটলীপুত্র শহরের অবস্থান অনুমান করা যায়। প্রাচীন শহরের আকৃতি বা রাস্তা-ঘাট বিন্যাসের আর কোনও নিদর্শন এখন পাওয়া যায় না। বিগত প্রায় আড়াই হাজার বছরের মধ্যে এই জায়গা থেকে নদীও উত্তরে এবং পূর্বে এখন এক মাইলেরও বেশী দূরে সরে গেছে।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র

খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সমকালীন চাণক্য বা কৌটিল্য নামে তক্ষশীলার এক কূট-বুদ্ধি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত 'অর্থশাস্ত্র' রচনা করেন। এই গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। যাহোক, অর্থশাস্ত্রে তদানীন্তন গ্রাম ও নগর সন্নিবেশ রীতির যে সব বিবরণ দেওয়া আছে, সেগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

গ্রামে কেবলমাত্র কুটিরই থাকতো। নগরে বা শহরে বপ্র, সেতু, বিভিন্ন প্রকারের রাস্তাঘাট, হ্রদ, প্রমোদ-উদ্যান, গৃহ, সৌধ ইত্যাদি থাকতো।

এই সময়ের আগেই রাজ্য পরিচালনার জন্যে শাসন-কেন্দ্রে, বাণিজ্যের জন্যে বন্দরে ও বাণিজ্যকেন্দ্রে এবং ধর্মানুষ্ঠানের জন্যে তীর্থস্থানে নানা রকমের নগর গড়ে উঠেছিল। এই নগরগুলি সাধারণতঃ পরিখা, প্রাকার ও প্রাচীর দিয়ে ঘেরা থাকতো।

অর্থশাস্ত্রের মতে, প্রথমে নগরের জন্যে স্থান নির্বাচন করবার পর নগর সীমানার চারদিকে গভীর পরিখা খনন করতে হবে এবং ঐ পরিখা-কাটা মাটি দিয়ে বপ্র তৈরি করতে হবে। সম-কেন্দ্রিকভাবে ঐ রকম একাধিক পরিখা খনন করা যেতে পারে। পরিখা 60 ফুট থেকে 84 ফুট চওড়া এবং এই প্রস্থের $\frac{1}{2}$ থেকে $\frac{3}{4}$ অংশ গভীর হবে। ইট বা পাথর দিয়ে পরিখার ধার বাঁধাতে হবে। পরিখা জলপূর্ণ করে রাখা হতো, কিন্তু প্রয়োজনমত এই জল বদল করবার কোন রকম বন্দোবস্ত ছিল না।

পরিখাগুলির মধ্যে শহরের দিকের সবচেয়ে ভিতরের পরিখা ও তার বপ্রের মধ্যে 24 ফুট পরিমাণ চওড়া জমি ছেড়ে রাখতে হবে। বপ্রের মাপ উপরের দিকে 72 ফুট চওড়া এবং উঁচুর দিকে হবে 36 ফুট। বপ্রের উপর ইট বা পাথর দিয়ে উঁচু নগর-প্রাচীর তৈরি করা হবে। সহজেই কাঠে আগুন লেগে যাবার সম্ভাবনা থাকায় নগর-প্রাচীর কখনই কাঠ দিয়ে তৈরি করা হবে না। প্রাচীর 18

ফুট থেকে 36 ফুট চওড়া এবং 36 ফুট থেকে 72 ফুট উঁচু হবে। তীর নিক্ষেপ করবার জন্তে প্রাচীরের মধ্যে অনেক গর্ত থাকবে এবং প্রাচীরের উপর অনেকগুলি ছোট ছোট গম্বুজ বা ঘর থাকবে। প্রাচীরের উপর 180 ফুট দূরত্ব অন্তর বর্গাকার পর্যবেক্ষণ বুরুজ থাকবে। প্রাচীরের মধ্যে সুবিধাজনক জায়গায় নগরের ভিতর লোকজনের যাতায়াতের জন্তে বারোটি প্রবেশদ্বার থাকবে। এইগুলির মধ্যে চারটি হবে প্রধান প্রবেশদ্বার। প্রধান প্রবেশদ্বার 30 ফুট থেকে 48 ফুট পর্যন্ত চওড়া হতে পারে এবং এদের উচ্চতা প্রস্থের $1\frac{1}{8}$ থেকে $1\frac{1}{6}$ গুণ হবে। প্রবেশদ্বারের উপর গোপুরম (উঁচু মাটির ঢিবির আকারে) থাকবে। এর ভিতরে সিঁড়ি থাকবে এবং তীর নিক্ষেপ করবার জন্তে দেয়ালে ছোট ছোট গর্ত থাকবে।

মহাদ্বারের একদিকে মহাদ্বারাধীপ বা নগরপালের কর্মচারী ও দ্বাররক্ষীদের বাসগৃহ থাকতো এবং অপরদিকে থাকতো শুল্কাধ্যক্ষের দপ্তর ও শুল্কশালা। নগরের ভিতরে আসবার ও বাইরে যাবার সময় দ্বারপাল প্রত্যেককে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। আগন্তুকদের মুদ্রা বা পাসপোর্ট দেখাতে হতো।

Grid-iron বা Chess board বা দাবার ছকের আকৃতিতে নগরের রাস্তা-ঘাট বিন্যাস করতে হবে। নগরের মধ্যে পূর্ব-পশ্চিমমুখী তিনটি ও উত্তর-দক্ষিণমুখী তিনটি দীর্ঘ রাজপথ থাকবে। প্রশস্ত প্রধান প্রধান পথ ছাড়াও ছোট ছোট অনেক পথ থাকবে। প্রধান প্রধান রাস্তাগুলি নগর-প্রাচীরে গিয়ে শেষ হবে এবং এদের শেষে নগর-প্রাচীরে থাকবে প্রবেশদ্বার। বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্তে রাস্তাগুলির বিভিন্ন নাম ছিল, যথা—দেবপথ, মহাপথ, রাজপথ, রাজমার্গ, রথ্য এবং চর্য। কোন কোন প্রকার রাস্তা দিয়ে কেবলমাত্র রথ চলাচল করতে দেওয়া হতো এবং কোন কোন প্রকার রাস্তা কেবলমাত্র পশুদের জন্তে নির্দিষ্ট থাকতো। পথচারীদের রাস্তাসংলগ্ন ফুটপাথ ব্যবহার করতে হতো।

নগরের কেন্দ্রস্থলে থাকবে রাজপ্রাসাদ ও মন্দির। সমগ্র দুর্গের $\frac{1}{9}$ অংশ জুড়ে থাকবে রাজপ্রাসাদ। রাজপ্রাসাদের চারদিকে থাকবে চার বর্ণের লোকজনের বাসগৃহ। প্রাসাদের উত্তর দিকে রাজবংশের শিক্ষাগুরু, পুরোহিত ও মন্ত্রীদের বাসস্থান নির্দিষ্ট থাকবে। প্রাসাদের পূর্বদিকে থাকবে সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যবসায়ী ও কুশলী কারিগর এবং ক্ষত্রিয়দের বাসস্থান। নগরপাল, সৈন্যাধ্যক্ষ, বাণিজ্য ও শিল্প তত্ত্বাবধায়ক, সঙ্গীতজ্ঞ এবং বৈশ্যেরা প্রাসাদের দক্ষিণ দিকে বাস করবেন। শূদ্রেরা প্রাসাদের পশ্চিম দিকে বাস করবেন। শ্রমিকদের বাসস্থান নগরের কোণার দিকে নির্দিষ্ট করতে হবে। নগরে রাজকর্মচারীদের অধিকরণ, বিচারালয়, নগররক্ষকের দপ্তর ইত্যাদি থাকবে। কোষাগারের প্রধান অংশ মাটির উপরে থাকবে ও ইট দিয়ে তৈরি হবে। এই ইমারতের তিন তলার মত অংশ মাটির নীচে থাকতো। মাটির নীচের এই অংশের বাইরের দেয়াল এবং সবচেয়ে নীচের তলার দেয়াল বড় বড় পাথরের খণ্ড দিয়ে তৈরি হতো। আর ভিতর দিকের অংশ কাঠ দিয়ে তৈরি হতো। অস্ত্রাগার এবং কয়েদখানা ও কোষাগারের মত একই পদ্ধতিতে তৈরি হতো।

সাধারণ গৃহগুলিও সময় সময় পরিখার দ্বারা সুরক্ষিত থাকতো। বাড়ীর দেয়াল ইট দিয়ে তৈরি করা হতো। বাড়ীতে প্রবেশদ্বার ও ভূ-গর্ভস্থ সুড়ঙ্গপথ থাকতো। সুনিয়ন্ত্রিত বিধি অনুযায়ী ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে গৃহগুলি পরিকল্পিত ও নির্মিত হতো। কেউ এই সকল নিয়মাবলী লঙ্ঘন করলে সরকার কর্তৃক দণ্ডনীয় হতেন।

নর্দমার ব্যবস্থা রাখা, ময়লা ও আবর্জনা ফেলবার জন্যে নির্দিষ্ট স্থান ছেড়ে রাখা, পাশাপাশি দুটি বাড়ীর মাঝে ছেড়ে রাখবার জন্যে খোলা জমির পরিমাণ, ঘরের মধ্যে বাতাস চলাচল করবার ব্যবস্থা রাখা ইত্যাদি বিষয়ে পৌরসংস্থার উপবিধি বলবৎ ছিল।

সাধারণ বাড়ীতে দুটি পাশাপাশি ঘরের মাঝের দেয়াল বাঁশ দিয়ে তৈরি করা হতো। বাঁশের সঙ্গে শর ও খড় একসঙ্গে ঘনভাবে বয়ন করে সংযুক্ত করা হতো এবং সর্বশেষে তার উপরে কাদার প্রলেপ বা প্লাস্টার করা হতো।

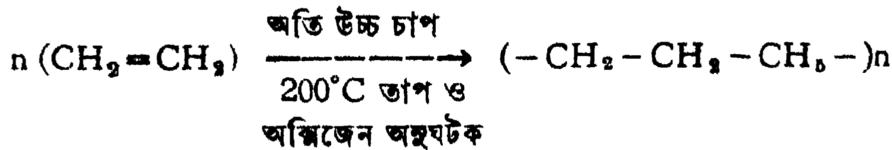
নগরের মধ্যে বিভিন্ন পল্লীতে মাঝে মাঝে দোকান, বাজার ইত্যাদির স্থান নির্দিষ্ট থাকতো। যে কোন লোক ইচ্ছামত যে কোন স্থানে দোকান খুলতে বা কোন রকম ব্যবসা-বাণিজ্য সুরু করতে পারতো না, এর জন্যে পণ্যাধ্যক্ষের অনুমতি নিতে হতো। এই থেকে দেখা যায় যে, আধুনিক নগর-পরিকল্পনা রীতির ন্যায় প্রাচীন মৌর্য যুগেও নগরের মধ্যে দোকান, বাজার বা ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে ব্যবহারের এলাকা° (Zone) নিয়ন্ত্রণ করা হতো।

প্লাষ্টিকের কথা

মনমোহন ঘোষ

প্লাষ্টিক বিশেষ একটি রাসায়নিক পদার্থের নাম নয়। প্লাষ্টিক বলতে কতকগুলি বিশেষ ধর্মবিশিষ্ট একশ্রেণীর জৈব যৌগকে বোঝায়; অর্থাৎ প্লাষ্টিক শব্দটা একটি রাসায়নিক জাতীয় পদার্থের সাধারণ নাম, যেগুলি একটি বিশেষ পর্যায়ে তাপে নমনীয়, কিন্তু সাধারণ অবস্থায় দৃঢ়। কাচের মত প্লাষ্টিকও আজ তৈরি হচ্ছে—ওজনে হাল্কা কিন্তু প্রয়োজনানুসারে ভারীও করা যায়। কোন তেল, অ্যাসিড বা ক্ষারের সংস্পর্শে প্লাষ্টিক অবিকৃত থাকে; তাছাড়া প্লাষ্টিক তাপ ও বিদ্যুৎ-অপরিবাহী। এর আরও সুবিধা এই যে, প্রয়োজনানুসারে মূল প্লাষ্টিকজাতীয় পদার্থের সঙ্গে ফিলার অথবা প্লাষ্টিসাইজার নামক বিশেষ কতকগুলি সাহায্যকারী পদার্থ মিশিয়ে অথবা যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় প্লাষ্টিক তৈরি হয়, তাকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে ইচ্ছামত প্লাষ্টিকের গুণ ও ধর্ম পরিবর্তিত করা যায়। প্লাষ্টিকজাতীয় পদার্থের সুতা থেকে তৈরি পোষাক-পরিচ্ছদও এখন খুবই প্রচলিত। তাপ ও চাপের প্রভাবে প্লাষ্টিকের এই নমনীয়তার জন্যে সেগুলিকে বিশেষ পর্যায়ে ছাঁচে ফেলে যে কোন আকার দেওয়া যায়। তাপ ও চাপের প্রভাবে প্লাষ্টিকের নমনীয়তার ভিত্তিতে সেগুলিকে দু-ভাগে ভাগ করা হয়। এক শ্রেণীর প্লাষ্টিক, যেগুলি তাপ ও চাপের প্রভাবে নমনীয় হয়, ঠাণ্ডা হলে শক্ত হবার পর সেগুলিকে পুনরায় তাপ ও চাপে নমনীয় করে বার বার ব্যবহার করা যায়—সেগুলিকে থার্মোপ্লাষ্টিক বলে। আর এক শ্রেণীর প্লাষ্টিক তাপ ও চাপে একবার মাত্র নমনীয় হয়; অর্থাৎ বিশেষ আকৃতিতে এগুলি একবার ঠাণ্ডা হয়ে শক্ত হবার পর তাদের আর তাপের প্রভাবে নমনীয় করা যায় না। সেগুলিকে থার্মোসেটিং প্লাষ্টিক বলে। সংশ্লেষণী রসায়নের বিরাট অবদান এই প্লাষ্টিক—শৃঙ্খলাকারে অবস্থিত বৃহৎ অণুর যৌগ। যে প্রক্রিয়ায় এই বৃহৎ

অণুশৃঙ্খল গঠিত হয়, রাসায়নিক বিচারে সেগুলি দুটি ভাগে বিভক্ত। একটি হচ্ছে পলিমারিজেসন, যে বিক্রিয়ায় ক্ষুদ্র অণু রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে নূতন রূপে পরস্পর শৃঙ্খলাকারে জুড়ে যায়—যেমন পলিথিন প্লাষ্টিকের ক্ষেত্রে—একটি ইথিলিন অণু নিম্নরূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়।



অপরটির নাম কণ্ডেনসেসন পলিমারিজেসন। এই বিক্রিয়ার দুটি ক্ষুদ্র অণু রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এক অণু জল অপসারিত করে যে নূতন অণু সৃষ্টি করে, সেই নূতন অণু পরস্পর শৃঙ্খলাকারে জুড়ে গিয়ে একটি বৃহৎ-অণুর প্লাষ্টিক তৈরি করে। উদাহরণস্বরূপ নাইলন প্রস্তুতির কথা বলা যেতে পারে। এখানে অ্যাডিপিক অ্যাসিড ও হেক্সা-মিথিলিন ডাইঅ্যামিন পারস্পরিক বিক্রিয়ায় যে মধ্যবর্তী যৌগ তৈরি করে, সেটাই এক অণু জল অপসারিত করে বৃহৎ নাইলন অণুশৃঙ্খলের একটি অণু তৈরি করে।

যদিও রসায়নবিদ্দের সঙ্গে প্লাষ্টিকের পরিচয় ঘটেছিল অনেক আগেই, কিন্তু সাধারণের সঙ্গে এর পরিচয় ঘটবার প্রথম সুযোগ করে দেন বেল-জিয়ামের রসায়নবিদ্ ডক্টর এল. ডব্লিউ. বেক্ল্যাণ্ড। তাঁর বৈজ্ঞানিক জীবন কাটে আমেরিকায়। তিনিই 1908 সালে প্লাষ্টিক শিল্পের গোড়াপত্তন করেন। কার্বলিক অ্যাসিড, ফর্মালডিহাইডের জলীয় দ্রবণ ফরম্যালিনের সঙ্গে মিশিয়ে তাতে অনুঘটক হিসাবে সামান্য অ্যামোনিয়া দিয়ে উত্তপ্ত করেন। এই রাসায়নিক বিক্রিয়ায় দুটি স্তরের সৃষ্টি হয়, তন্মধ্যে একটি জল ও অন্যটি হলুদ রঙের একটি আঠালো পদার্থ। এই আঠালো পদার্থটিই হলো বেক-ল্যাণ্ডের তৈরি প্রথম প্লাষ্টিক, যা শিল্পজগতে তাঁর নামানুসারে বেকেলাইট নামে পরিচিত। একক ভাবে ফিনল অথবা ফর্ম্যালডিহাইডের কথা চিন্তা করলে প্লাষ্টিক আমাদের ধরাছোঁয়ারও বাইরে, কিন্তু তাদেরই সংমিশ্রণে যে বিশেষ প্রক্রিয়ায় এই নতুন পদার্থটি আমাদের সামনে হাজির হলো, সেটাই রসায়নবিদের কৃতিত্ব। ফিলার হিসাবে তুলার ছাঁট অথবা কাঠের গুঁড়া মিশিয়ে এই বেকেলাইট আজ নানাভাবে ব্যবহৃত হয়, যথা—বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম, টেলিফোন যন্ত্র, ছুরির বাঁট, বোতাম ইত্যাদি। বর্তমানে অবশ্য প্রায় সমস্ত ফিন-লিক পদার্থ ও অ্যালডিহাইডিক পদার্থ মিশিয়ে এবং অনুঘটক হিসাবে সালফিউরিক অ্যাসিড ব্যবহার করে বেকেলাইটজাতীয় প্লাষ্টিক তৈরি করা হয়। এগুলি সাধারণতঃ উত্তাপে গলে না এবং সাধারণ কোন দ্রাবকে দ্রবীভূত হয় না। এই বিশেষ গুণের জন্যে জীবজন্তুর হাড় ও এবোনাইটের তৈরি জিনিষপত্রে আজকাল এই বেকেলাইট-জাতীয় প্লাষ্টিক ব্যবহার করা হয়।

আর একটি থার্মোসেটিং প্লাষ্টিক 1929 সালে ইউরিয়া ও ফর্ম্যালডিহাইডের বিক্রিয়ায় আমেরিকায় প্রথম তৈরি হয়। এর একটি বিশেষ গুণ হচ্ছে এই যে, এটি কাচের মত কঠিন ও স্বচ্ছ। কিন্তু কাচের মত কতকগুলি গুণ থাকা সত্ত্বেও একে কাচের বদলে ব্যবহার করা গেল না। কারণ এই জাতীয় প্লাষ্টিক ঠাণ্ডা হবার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কোচনের টান সহ্য করতে না পেরে ফেটে যায়। বৃটিশ বিজ্ঞানী প্লেসিটার ইউরিয়ার $[CO(NH_2)_2]$ বদলে থায়োইউরিয়া $[CS(NH_2)_2]$ ব্যবহার করে এই সমস্যার সমাধান করেন, কিন্তু এর স্বচ্ছতা নষ্ট হলো। পরবর্তী পর্যায়ে ইউরিয়া ও থায়োইউরিয়া মিশ্রণের সঙ্গে ফর্ম্যালডিহাইডের বিক্রিয়া ঘটিয়ে আরও উন্নত ধরণের প্লাষ্টিক তৈরি করা হয়। এই মিশ্র

প্লাষ্টিক কাচের মত স্বচ্ছ, বর্ণহীন এবং একে নানা রঙে রঞ্জিত করা যায়।

পারপেক্স—কাচ তৈরির প্রধান উপাদান সিলিকা ও সোডা বিন্দুমাত্র ব্যবহার না করেই সম্পূর্ণ জৈব উপাদানে গঠিত কাচের মত স্বচ্ছ একটি নূতন প্লাষ্টিকজাতীয় পদার্থের (পারপেক্স) উদ্ভাবন করেন ইংল্যাণ্ডের ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রির রসায়নবিদ্‌গণ। মিথাইল মিথাক্রাইলেট নামক একটা জটিল জৈব যৌগ থেকে এই প্লাষ্টিক জাতীয় পদার্থটি তৈরি করা হয়। এর ব্যবসায়িক নাম পারপেক্স। আমেরিকায় এটি লুসাইট নামেও পরিচিত। থার্মোপ্লাষ্টিক বলে একে কাচের মত একাধিক বার ছাঁচে ফেলা যায়। সাধারণ কাচ আঘাতে ভেঙ্গে গেলে তার টুক্‌রা যেমন বিপজ্জনক হতে পারে, এর ক্ষেত্রে সে ভয় নেই। কাচের চেয়ে হাল্কা কিন্তু সমান মোটা কাচ অপেক্ষা এর কাঠিন্য ও দৃঢ়তা অনেক বেশী। এর কাঠিন্য এত বেশী যে, বুলেটও এতে প্রতিহত হয়। এসব গুরুত্বপূর্ণ গুণের জন্যে পারপেক্স আজ অনেক ক্ষেত্রেই অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

সেলুলয়েড—বিজ্ঞানী জন ওয়েলেস্‌লি হায়াট 1869 সালে জীবজন্তুর হাড়ের মত সাদা ও শক্ত এক রকম নূতন ধরণের প্লাষ্টিকজাতীয় পদার্থ আবিষ্কার করেন। নাইট্রোসেলুলোজ থেকে তৈরি এই প্লাষ্টিকজাতীয় পদার্থটিই বর্তমানে সেলুলয়েড নামে পরিচিত। নাইট্রোসেলুলোজ একটি অতি বিস্ফোরক পদার্থ, তাই আংশিক নাইট্রেটেড সেলুলোজ (যাকে পাইরোকজিলিনও বলা হয়) অ্যালকোহলে গুলে তার সঙ্গে প্লাষ্টিসাইজার হিসাবে কর্পূর মিশিয়ে ও প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন রং মিশিয়ে উত্তপ্ত করলে মিশ্রিত রঙে রঞ্জিত সেলুলয়েড তৈরি হয়। সেলুলয়েড থার্মো-প্লাষ্টিকধর্মী—তাই সেলুলয়েডের তৈরী অকেজো ও পরিত্যক্ত জিনিষ পুনরায় গলিয়ে নূতন জিনিষ তৈরি করা যায়। হাতীর দাঁতের বিকল্প হিসাবে অনেক ক্ষেত্রে এই সেলুলয়েড ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া ছুরির বাঁট, সাবানদানী ও বহুবিধ নিত্যব্যবহার্য জিনিষ এর সাহায্যে প্রস্তুত হয়। সেলুলয়েড প্লাষ্টিকের অতি সূক্ষ্ম পাত ফটোগ্রাফীর ফিল্ম তৈরির জন্যে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বিশুদ্ধ সেলুলয়েড সহজদাহ্য পদার্থ। এর উপর কিছুক্ষণ সূর্যরশ্মি পড়লে জ্বলে উঠতে পারে।

নাইট্রোসেলুলোজের পরিবর্তে সেলুলোজ অ্যাসিটেট ব্যবহার করলে যে প্লাষ্টিক তৈরি হয়, তা কিন্তু সেলুলয়েডের মত দাহ্য নয়, উপরন্তু স্বচ্ছ এবং সেলুলয়েডের বিকল্প হিসাবে ব্যবহারযোগ্য। এর সাহায্যে রঙীন চশমা, বাস্তবযন্ত্রপাতি প্রভৃতি তৈরি করা হয়। অবশ্য সেলুলয়েডের চেয়ে এর দাম বেশী।

পলিথিন—ইথিলিন নামক একটি অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন অতি উচ্চ চাপে (প্রায় 2000 গুণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে) অক্সিজেনের উপস্থিতিতে প্রায় 200°C তাপমাত্রায় রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে একটি প্লাষ্টিকজাতীয় পদার্থের সৃষ্টি করে। এই প্লাষ্টিককে পলিইথিলিন বা পলিথিন বলে। থার্মো-প্লাষ্টিক শ্রেণীর মধ্যে সবচেয়ে সরল বৃহৎ অণুর যৌগ এই পলিথিন, কিন্তু এর প্রস্তুতি যতটা সরল মনে হচ্ছে, মোটেই তা নয়—বেশ কঠিন। বিভিন্ন রঙে একে রঞ্জিত করা যায়। সবচেয়ে হাল্কা প্লাষ্টিক জলে ভাসে। থার্মোপ্লাষ্টিকের বিশেষ দৃঢ়তা থাকা সত্ত্বেও পলিথিন এত নমনীয় যে, সাধারণ অবস্থাতেও একে ইচ্ছামত বাঁকানো যায়। এটি জলে ভেজে না, অ্যাসিড ও ক্ষারের সংস্পর্শে অবিকৃত থাকে। তাই এর সাহায্যে পাইপ, টিউব, অ্যাসিডের পাত্র ও গৃহস্থালীর নানারকম জিনিষপত্র তৈরি করা হয়।

প্লাষ্টিকের বস্ত্র—আমরা আগেই জেনেছি, প্লাষ্টিক সুতার আকারেও তৈরি করা সম্ভব এবং বস্ত্রশিল্পে যে বিভিন্ন প্লাষ্টিক ব্যবহৃত হয়, তার মধ্যে নাইলন ও টেরিলিনই উল্লেখযোগ্য।

নাইলন—নাইলন প্লাষ্টিককে তরল অবস্থায় অতি সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে উচ্চচাপে পরিচালিত করে নাইলনের সুতা তৈরি করা হয়। নাইলনের তৈরি সুতাই বর্তমানে সবচেয়ে দৃঢ় ও টান-শক্তিবিশিষ্ট সুতা। তাই এর সাহায্যে প্যারাসুটের কাপড় ও দড়ি তৈরি করা হয়। তাছাড়া নাইলন থেকে দাঁত মাজা ও রং করবার ব্রাসও তৈরি করা হয়। নাইলনের পোশাক-পরিচ্ছদও বাজার ছেয়ে ফেলেছে।

টেরিলিন—টেরিলিন একটি পলিএষ্টার। টেরাপথ্যালিক অ্যাসিড ও ইথিলিন গ্লাইকলের বিক্রিয়ায় অতি উচ্চ তাপে বায়ুশূন্য অবস্থায় তৈরি হয় এই (পলিএষ্টার যৌগ) প্লাষ্টিকজাতীয় পদার্থ টেরিলিন। নাইলন ও টেরিলিন উভয়েই থার্মোসেটিং প্লাষ্টিক ও দাহ্য। এথেকে তৈরি পোশাক-পরিচ্ছদে ভাঁজ পড়ে না, সহজে ময়লা হয় না এবং এগুলি বেশ টেকসই। বিভিন্ন রঙে এদের রঞ্জিত করা যায়। সহজদাহ্য-তার জন্যে সহজেই এতে আগুন লাগবার ভয় থাকে।

স্বরনালী

সত্যব্রত দাশগুপ্ত

স্বরনালী মানবদেহের একটি আশ্চর্য যন্ত্র। স্বরনালী থেকে নির্গত শব্দই ওষ্ঠ, তালু, জিহ্বা ইত্যাদির সাহায্যে কথার আকারে মনের ভাব প্রকাশ করে। স্বরনালীর সম্পূর্ণ পরিণতি হয়েছে স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে। মানবদেহে স্বরনালীর গঠনপ্রণালী এবং তার কাজ সম্বন্ধে আলোচনা করবার আগে স্বরনালীর বিবর্তনের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু আলোচনার প্রয়োজন।

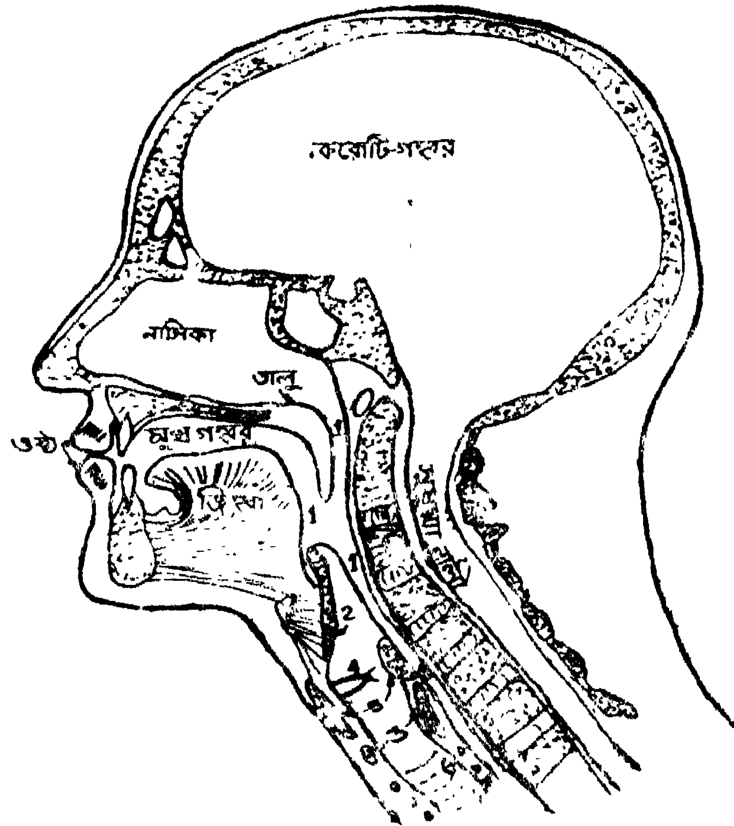
স্বরযন্ত্রের প্রথম ক্ষুদ্র সংস্করণ দেখা যায় একরকম মাছের মধ্যে, যার নাম লাং-ফিস (Lung-fish)। এই মাছ ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়। এদের স্বরনালী অত্যন্ত সরল এবং সংক্ষিপ্তভাবে গঠিত। গলবিলের (Pharynx) সামনের দেয়ালে যেখানে ফুসফুসের প্রবেশদ্বার, তার দুই পাশে মাত্র ভাঁজের আকারে স্বরনালী অবস্থিত। এখানে স্বরনালীর কাজ ফুসফুসে বাতাসের আগমন ও নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করা। এতে কোন স্বরের প্রকাশ হয় না।

স্বরপ্রকাশ প্রথমে হয় উভচর প্রাণীদের ক্ষেত্রে অর্থাৎ বিবর্তনের পরের ধাপে। এদের স্বরযন্ত্রে একটি দ্বিধাবিভক্ত প্রকোষ্ঠ আছে। প্রকোষ্ঠের দুটি কক্ষের মাঝখানে স্বরযন্ত্রটি অবস্থিত। এদের স্বরযন্ত্রে এরিটিনয়েড (Arytenoid) নামে একটি তরুণাস্থির সংযোজন হয়েছে।

আরও উন্নতি দেখা যায় সরীসৃপজাতীয় প্রাণীদের মধ্যে। সাধারণতঃ সরীসৃপের স্বর নেই, কিন্তু কোন কোন সরীসৃপের শব্দ করবার ক্ষমতা আছে; যেমন—গেকো (Gecko), বার্কিং বার্ড, টিকটিকি ইত্যাদি। এদের স্বরযন্ত্রে এরিটিনয়েড ছাড়া ক্রিকয়েড (Cricoid) তরুণাস্থিও পাওয়া যায়। পাখীদের ক্ষেত্রে স্বরযন্ত্রের বিবর্তন একটু বিশেষ ধরণের। এখানে স্বরনালী আছে, তবে তা থেকে কোন স্বর নির্গত হয় না। এই স্বরনালীর গঠনপ্রণালী সরীসৃপদের মতই অর্থাৎ এখানেও এরিটিনয়েড এবং ক্রিকয়েড তরুণাস্থি পাওয়া যায়। কিন্তু এদের স্বরনালীতে আর একটি নূতন সংযোজন হয়েছে, যার নাম সিরিংস (Syrinx)। এই সিরিংস্ একমাত্র পাখীদের দেহেই পাওয়া যায়। স্তন্যপায়ীদের দেহে এর আবার অবলুপ্তি ঘটেছে। এই সিরিংস স্বরনালী থেকে আলাদ-

ভাবে আছে এবং এখান থেকেই পাখীদের স্বরের প্রকাশ হয়। প্রধান শ্বাসনালী দুটি ফুসফুসে প্রবেশ করবার জন্যে যেখানে দ্বিধাবিভক্ত হয়, সিরিংস সেখানে অবস্থিত।

স্বরনালীর সর্বশেষ এবং সম্পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে স্তন্যপায়ী প্রাণীতে। এখানে শ্বাসনালীর অনেক উন্নত ধরণের পরিবর্তন দেখা যায়। স্বরনালী শ্বাসনালীটি আমাদের খাদ্যনালীর সামনের দিকে রয়েছে। যদিও নাসিকা থেকে শ্বাসনালীর এবং মুখগহ্বর থেকে খাদ্যনালীর আরম্ভ, তবুও এই দুটি পথই একটি সাধারণ পথ গলবিলে (Pharynx) এসে পড়েছে। গলবিলটি মুখ-গহ্বর এবং নাসিকার পিছন দিকে আছে। ঐ দুটি বিভিন্ন নালীর অন্তর্বর্তী পথ হিসাবে গলবিল



লম্বভাবে দ্বিখণ্ডিত নাসিকা, মুখগহ্বর, গলবিল এবং স্বরনালী।
1—গলবিল, 2—এপিগ্লটিস, 3—কৃকয়েড, 4—স্বররজ্জু, 5—থাইরয়েড, 6—প্রধান শ্বাসনালী।

এবং শ্বাসনালী অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্মিলিত হয়ে এখানে আছে। শ্বাসপথের সুরু হয়েছে নাসিকা থেকে এবং শেষ হয়েছে ফুসফুসে। এই পথেরই একটি মধ্যবর্তী অংশের নাম স্বরনালী বা স্বরযন্ত্র। এই স্বরযন্ত্র গলার উপরিভাগে অবস্থিত। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে মানুষের স্বরযন্ত্রের গঠনপ্রণালী এবং তার কাজ সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

কাজ করে। খাদ্যনালীতে গলবিলের পরের অংশের নাম অন্ননালী (Oesophagus) এবং তার পরের অংশই পাকস্থলী (Stomach)। গলবিলের সামনের দেয়ালের নীচের দিক থেকে শ্বাসনালীর বাকী অংশ আলাদাভাবে স্বরযন্ত্র নামে ভিন্ন নালী দিয়ে নীচের দিকে নেমে গেছে। গলবিলের সামনেই স্বরযন্ত্র অবস্থিত। গলার নীচের দিকে

স্বরযন্ত্র নামে শ্বাসনালীর এই অংশটুকু শেষ হয় এবং তার পরের অংশ প্রধান শ্বাসনালী (Trachea) সুরু হয়।

গলবিলের সামনের দেয়ালে যেখানে স্বর-নালীর সুরু, সেই ছিদ্রপথকে স্বরনালীর প্রবেশদ্বার বলে। প্রধান শ্বাসনালী কণ্ঠ থেকে বক্ষে প্রবেশ করে এবং তারপর দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। এই দুটি ভাগ দু-পাশের দুটি ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করে। সুতরাং বাতাস নাক থেকে গলবিলে প্রবেশ করে। তারপর স্বরযন্ত্রের প্রবেশদ্বার দিয়ে প্রধান শ্বাসনালীতে এবং সেখান থেকে ফুস্‌ফুসে যায়।

এদিকে খাদ্য আবার মুখগহ্বর থেকে গলবিল, গলবিল থেকে অন্ননালী এবং তারপর পাকস্থলীতে পৌঁছায়। তবে খাদ্য চলাচলের সময় স্বরনালীর প্রবেশদ্বার বন্ধ থাকে, নতুবা খাদ্যের কণা শ্বাসনালীতে ঢুকে পড়তে পারে।

স্বরনালীর প্রবেশদ্বারের উপরে ও সামনের দিকে এবং জিহ্বার পিছনে একটি তরুণাস্থি আছে। তার নাম এপিগ্লটিস (Epiglottis), এর কাজ ঢাকনার মত। খাদ্য বা অন্য কোন বাইরের কিছু যাতে স্বরনালীতে ঢুকে না পড়ে, তার জন্যে এই এপিগ্লটিস ঠিক সময়মত প্রবেশ-দ্বারের উপর পড়ে স্বরনালীর মুখ বন্ধ করে দেয় এবং সেই মুহূর্তের জন্যে শ্বাসক্রিয়া বন্ধ থাকে। এপিগ্লটিসের নীচে এবং সামনের দিকে আর একটি তরুণাস্থি আছে। তার নাম থাইরয়েড (Thyroid) —ইংরেজী V অক্ষরের মত। এই V-টি এমনভাবে আছে যে, তার কোণটি সামনের দিকে এবং বাহু দুটি পিছনের দিকে (<) অর্থাৎ V-টি যেন শোয়ানো অবস্থায় রয়েছে। কৈশোর উত্তীর্ণ পুরুষের ক্ষেত্রে গলায় যে উঁচু মত কণ্ঠহাড় দেখা যায়, সেটাই থাইরয়েড তরুণাস্থি। এর নীচে ক্রিকয়েড নামে আংটির মত আর একটি তরুণাস্থি আছে। এর পরেই প্রধান শ্বাসনালীর সুরু। শ্বাসনালীর এই অংশ যাতে সব সময় খোলা থাকে, সে জন্যেই ক্রিকয়েড সম্পূর্ণ গোলাকার।

এই তরুণাস্থিগুলি ছাড়া আরও তিন জোড়া তরুণাস্থি আছে। তাদের নাম এরিটিনয়েড, কিউনিফর্ম (Cuneiform) এবং করনিকিউলেট (Corniculate)। এই সব তরুণাস্থি বিভিন্ন গ্রন্থি (Joint) এবং বন্ধনীর (Ligament) দ্বারা পরস্পর দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ। তাছাড়া অনেক মাংসপেশীও পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে রয়েছে। এই তরুণাস্থিগুলিকে মাংসপেশীর সঙ্কোচন ও প্রসারণের দ্বারা নানাভাবে নাড়ানো যায়।

থাইরয়েড তরুণাস্থির ভিতর দিকে দুটি স্বরতন্ত্রী (Vocal cord) পাশাপাশি অবস্থিত। এই দুটি তন্ত্রীর মাঝখানের জায়গাটিকে বলে গ্লটিস (Glottis)। প্রতিটি স্বরতন্ত্রীর আকৃতি একটি রজ্জুর ন্যায়। তার একটি প্রান্ত সামনের দিকে থাইরয়েডের ভিতর দিকে এবং অপর প্রান্ত পিছন দিকে এরিটিনয়েড তরুণাস্থিতে আটকানো আছে। যখন মাংসপেশীর সঙ্কোচন বা প্রসারণের দ্বারা বিভিন্ন তরুণাস্থিকে নাড়ানো হয়, তখন তার ফলে স্বরতন্ত্রীর অবস্থা এবং স্থানের পরিবর্তন ঘটে অথবা স্বরযন্ত্রের প্রবেশদ্বারের প্রসারণ বা সঙ্কোচন ঘটতে পারে। স্বরপ্রকাশ বা শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী এই সব পরিবর্তন ঘটানো হয়।

স্বরনালীর দৈর্ঘ্য পুরুষদের ক্ষেত্রে—44 মিঃ মিঃ এবং স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে—36 মিঃ মিঃ। এই দুটি মাপই প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে। শৈশব এবং কৈশোরে স্ত্রী এবং পুরুষের স্বরনালীর সামান্যই তফাৎ থাকে। কিন্তু কৈশোর এবং যৌবনের সন্ধিস্থলে স্বরনালীর দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে, বিশেষ করে পুরুষের ক্ষেত্রে যখন স্বর গভীর হতে গিয়ে স্বরভঙ্গ হয়। তখন এই পরিবর্তন অত্যন্ত দ্রুত এবং লক্ষণীয়। এরই ফলে পুরুষের কণ্ঠহাড় তখন উঁচু হয়ে দেখা দেয় এবং গলার স্বর পরিবর্তিত হয়।

এই স্বরনালীকে আবার বিবর্তন অনুসারে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—

1. স্বরতন্ত্রীর উপরের অংশ—একমাত্র স্তন্যপায়ীদেরই এই অংশটি আছে। অন্য কোন প্রাণীতে এর প্রতিরূপ দেখা যায় না; অর্থাৎ স্তন্যপায়ীদের এটা নূতন সংযোজন।

2. স্বরতন্ত্রী ও তার নীচের অংশ—বিবর্তনের যে স্তর থেকে স্বরতন্ত্রীর উদ্ভব, সেই স্তর থেকে স্তন্যপায়ী পর্যন্ত প্রত্যেক প্রাণীতেই এই অংশটি নানা ভাবে দেখা যায়। একথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

স্বরতন্ত্রীর উপরের অংশ কেবলমাত্র স্তন্যপায়ীদের মধ্যেই দেখা যায়। কারণ বিবর্তনের ফলে স্বরনালীর অবস্থানের কিছু পরিবর্তন ঘটে এবং খাদ্যনালীর সঙ্গে এমনভাবে যুক্ত থাকে যে, বহিরাগত কোন বস্তুর হঠাৎ প্রবেশ ঘটতে পারে। এই প্রবেশ বন্ধ করবার জন্যেই উপরের অংশটির উদ্ভব।

এপর্যন্ত যে স্বরনালী সম্বন্ধে এসব কথা বলা হলো সেই আশ্চর্য যন্ত্রের কাজ কি শুধুই স্বরসৃষ্টি করা? প্রশ্নটা একেবারেই অবান্তর মনে হতে পারে। কিন্তু বিবর্তনের ইতিহাসে স্বরযন্ত্রের প্রথম প্রকাশ থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এর সৃষ্টির প্রয়োজন হয়েছিল স্বরসৃষ্টির উদ্দেশ্যে নয়, অন্য কোন প্রয়োজনে। স্বরসৃষ্টি যেন অনেকটা উপজাত (Bye-product)। তাহলে স্বরযন্ত্রের কাজ কি?

স্বরযন্ত্রের কাজ

(1) শ্বাসনালী, ফুসফুস ইত্যাদি রক্ষা করবার প্রহরী হিসাবে কাজ করে। দুই ভাবে বা দুই উদ্দেশ্যে এই কাজ হয়।

(ক) খাদ্যগ্রহণ করবার সময় খাদ্যকণা বা অন্য কিছু বা অন্য সময়ে বাইরের কোন কিছু যাতে শ্বাসনালীতে প্রবেশ করে শ্বাসনালীর কোন ক্ষতি বা শ্বাসরোধ না করতে পারে।

খাদ্যনালী শ্বাসনালীর ঠিক পিছনেই আছে। খাদ্যনালীর সামনের দেয়ালে খাদ্যনালী এবং স্বরনালীর একটি যোগাযোগের পথ রয়েছে। তাকে স্বরনালীর প্রবেশপথ বলে (Inlet of larynx)। খাদ্যগ্রহণ করবার সময় এই প্রবেশদ্বার বন্ধ থাকে। ফলে খাদ্যদ্রব্য খাদ্যনালী থেকে শ্বাসনালীতে প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু কোন কারণে (যেমন—তাড়াতাড়ি খাওয়ার সময়) সেই প্রবেশদ্বার বন্ধ হতে যদি বিলম্ব হয়, তাহলে খাদ্যকণা স্বরনালীতে প্রবেশ করে এবং কাশির উদ্রেক হয়, যাকে আমরা 'বিষম খাওয়া' বলি।

(খ) যদি বাইরের কোন কিছু হঠাৎ স্বরনালীতে প্রবেশ করে, তবে তৎক্ষণাৎ তাকে বাইরে পাঠিয়ে দেবার জন্যে শ্বাসনালীতে কাশির উদ্রেক হয়। এভাবে সদাজাগ্রত প্রহরীর মত, বাইরের কিছু যাতে স্বরনালীতে প্রবেশ করে তার ক্ষতি না করতে পারে, তার জন্যে সজাগ থাকে। এই জন্যে স্বরনালীকে প্রহরী কুকুর (Watch dog) বলা হয়।

(2) নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের বায়ুর গতি এবং পরিমাণ নির্ধারণ করে—স্বরনালীর প্রবেশদ্বার এবং গ্লটিস অর্থাৎ দুটি স্বররজ্জুর মধ্যেকার অংশের ছোট ছোট মাংসপেশীর দ্বারা সঙ্কোচন এবং প্রসারণ করা যায়। এর ফলে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সময় বায়ুর আগমন ও নির্গমন আয়ত্তাধীন রাখা হয়।

(3) উদরের (Abdomen) আভ্যন্তরীণ চাপ বাড়ানো—এই কাজ অদ্ভুত মনে হলেও খুব সহজেই করা হয়। প্রাকৃতিক কতকগুলি শারীরিক কারণে সময়ে সময়ে উদরের আভ্যন্তরীণ চাপ বাড়াবার প্রয়োজন হয়, যেমন—মলত্যাগ, মূত্রত্যাগ কিংবা প্রসবকাল বা কোন ভারী কাজ করবার সময়। তখন স্বরনালীর প্রবেশদ্বার বন্ধ করা হয় এবং তার ফলে শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়। সে জন্যে বক্ষদেশ (Thorax) এবং উদরের মধ্যবর্তী মধ্যচ্ছদা (Diaphragm) স্থির থাকে

এবং তখন উদরের মাংসপেশীর সঙ্কোচনের দ্বারা আভ্যন্তরীণ চাপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

(4) স্বরনালী এবং শ্বাসনালীর অনেকটা অংশের ভিতরের দেয়াল থেকে শ্লেষ্মা (Mucus) নির্গত হয়। এই শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী (Mucus membrane) শ্বাসনালীকে তপ্ত এবং শুষ্ক বায়ু থেকে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা রোধ করে।

(5) শ্বাসক্রিয়ার মাংসপেশীগুলিকে অনেকক্ষণ ধরে ক্রমাগত একটানা কাজ করা থেকে রেহাই দেওয়া। এমন কিছু কাজ আছে যখন শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত এবং একটানা করবার প্রয়োজন হয়; যেমন—গাছে ওঠা, সাঁতারকাটা, পাহাড়ে ওঠা ইত্যাদি। কিন্তু যদি একটানা অনেকক্ষণ শ্বাস-প্রশ্বাসের মাংসপেশীর কাজ করতে হয়, তাহলে সহজেই সেই সব মাংসপেশী পরিশ্রান্ত হয়ে কাজের ব্যাঘাত ঘটাবে। কিন্তু এই মাংসপেশীগুলিকে কিছুক্ষণের জন্যে রেহাই দিয়ে বিশ্রাম নেবার সুযোগ দেওয়া যায়। স্বরনালীর এই ভূমিকা অত্যন্ত সহজ এবং প্রয়োজনীয়। একটানা দ্রুত শ্বাসক্রিয়া চলবার সময় স্বরনালী কিছুক্ষণের জন্যে প্রবেশদ্বার বন্ধ করে। ফলে শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হয়, অর্থাৎ ঐ সব মাংসপেশী, যারা শ্বাসক্রিয়া ঘটাবার জন্যে নিয়োজিত, তাদের অব্যাহতি দেওয়া হয়। সুতরাং এই ক্ষণিক বিশ্রাম আবার কাজের শক্তি যোগাবার জন্যে বেশ উপযোগী। এভাবে কিছুক্ষণ পর পর দম বন্ধ করবার ফলে শ্বাসক্রিয়ার মাংসপেশী অনেক বেশী সময় কাজ করতে পারে।

(6) স্বরপ্রকাশ—যদিও নাম স্বরনালী, তবুও স্বরপ্রকাশ যে তার প্রধান কাজ নয়, সেটা সহজেই বোঝা যায়। কারণ প্রথম স্বরনালীর প্রকাশ যে Lung fish-এ, তাদের কোন স্বর নেই বরং ফুস্‌ফুসের প্রবেশদ্বারে থেকে ফুস্‌ফুসে বাতাসের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করাই প্রধান কাজ। তাছাড়া অন্যান্য প্রাণীদের ক্ষেত্রেও স্বরপ্রকাশের আবির্ভাব থেকে স্তন্যপায়ীদের মধ্যে তার পূর্ণ পরিণতি পর্যন্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, স্বরপ্রকাশের কাজ স্বরনালীতে সংযোজিত হয়েছে ধীরে-ধীরে।

সঞ্চয়ন

খাদ্য-সমস্যা সমাধানে ফল ও সব্জী

প্রায় এক যুগ আগে ইডেন গার্ডেনে নিখিল ভারত কলা প্রদর্শনীতে বিধানচন্দ্র রায়ের ভাষণ শোনবার সৌভাগ্য অনেকেরই হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন যে, ভাতের বদলে কলা খেয়েই মানুষ সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারে। খাদ্য-সমস্যায় জর্জরিত ভারতের পক্ষে কথাটা খুবই মূল্যবান বলে মনে হয়েছিল। অবশ্য অনেকে বলতে পারেন যে, কথাটা দুর্ভিক্ষজর্জরিত ফ্রান্সের রাণীর কথার মত—ওরা রুটির জন্যে চিৎকার করছে কেন, কেক খেলেই তো পারে। অনেকে হয়তো ভাবতে পারেন, যেখানে ভাত খাবার পয়সা নেই, সেখানে ফল খেতে বলা বিলাসিতা মাত্র। অবশ্য কথাটা একটু ঘুরিয়েও বলা যায়; যেমন—যাদের ক্ষমতা আছে, তারা যদি গম অথবা চালের ভাগ কমিয়ে বেশী সব্জি ও ফল খান, তাহলে বেশ খানিকটা খাদ্যশস্য বেঁচে যেতে পারে, যা অন্যের কাজে লাগবে। আর ফল বলতে আমরা বাঙালীরা আপেল, আঙ্গুরের দিকে নজর দিয়ে থাকি, অথচ একটা পেয়ারা বা এক টুকরা পেঁপে যে অনেক সময় আপেল বা

আঙুরের চেয়েও উপকারী, সে কথাটা আমরা ভুলে যাই।

প্রকৃতির দান হিসেবে ভারতের মাটি এবং আবহাওয়া বৈচিত্র্যময়, যার ফলে নাতিশীতোষ্ণ, উপগ্রীষ্মমণ্ডল এবং গ্রীষ্মমণ্ডলের উপযোগী ফলের চাষ করা যেতে পারে। আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আম, জাম, আপেল, আনারস, আঙুর, ন্যাসপাতি প্রভৃতি নানা রকমের ফল জন্মায়।

ভারতে ফলোৎপাদনের জন্যে ভূমির পরিমাণ প্রায় 12 লক্ষ হেক্টর, যা সমস্ত চাষের জমির মাত্র 0·8 ভাগ এবং ফল উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় 7·4 টন। আবার এই মোট উৎপাদনের বেশ কিছুটা অংশ বিক্রয়ের জন্যে বাজারে পৌঁছাবার আগে নানাভাবে নষ্ট হয়। এছাড়া খোসা, আঁটি প্রভৃতি বাদ দিলে খাবার জন্যে মোটামুটি 4 লক্ষ টনের মত ফল পাওয়া যায় এবং এই হিসেবে আমাদের দেশে প্রতিটি লোকের ভাগ্যে মাত্র এক আউন্স ফল জোটে, যেখানে দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় 3 আউন্স ফল থাকবার নির্দেশ আছে। একটি সুসমঞ্জস খাদ্য-তালিকায় একজন লোকের 4 আউন্স শাকজাতীয় সজী এবং 3 থাকা দরকার। কিন্তু নানা কারণে উৎপাদনের পরিমাণ কম হওয়ায় মাত্র 2 আউন্স সজী একজন মানুষের ভাগ্যে জোটে।

এক-একটি বিশেষ ফল বা সজী এক-একটি বিশেষ ঋতুতে জন্মায়। কোন কোন সময় এত বেশী পরিমাণে জন্মায় যে, প্রচুর অপচয় হয়ে থাকে। তাছাড়া দেশের সব জায়গায় সব রকম ফল সারা বছর ধরে জন্মায়ও না। কাজেই জ্যাম, জেলী, স্কোয়াশ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় ফল এবং সজী সংরক্ষণ করতে পারলে অপচয়ও বন্ধ করা যায় এবং সারা বছর ধরে বিভিন্ন রকমের ফল ও সজীর আস্বাদ গ্রহণ করা চলে। একটু নজর দিলে গৃহিণীরাও বাড়ীতে অনায়াসে ফল ও সজী অতি অল্প সময়ে ও অল্প খরচে সংরক্ষণ করতে পারেন। সুখের বিষয়, অধুনা ভারতের কৃষি মন্ত্রণালয় এই বিষয়ে গৃহিণীদের ব্যবহারিক শিক্ষা দানের জন্যে নানা স্থানে অনেক শিক্ষা-কেন্দ্র স্থাপন করেছেন। সেখান থেকে গৃহিণীরা অতি অল্প সময়ে এই বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। ফল এবং সজী মানুষের দৈনন্দিন খাদ্য-তালিকায় এক বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশ। এতে খাদ্যপ্রাণ এবং শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় এমন সব খনিজ লবণ আছে, যার অভাব শুধু শস্য এবং আমিষ খাদ্যগ্রহণে পূরণ হয় না। আম, পেঁপে, কাঁঠাল, খেজুর, পিচ, ধনেপাতা, পালং শাক, গাজর, টোম্যাটোয় মধ্যে আছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-এ। আপেল, লেবু, বেগুন, কমলা, পিচ, আনারস, শিম প্রভৃতিতে আছে প্রচুর থিয়ামিন। লেবুজাতীয় সমস্ত ফল, আমলকী, টোম্যাটো, বাঁধাকপি, সজনে, প্রভৃতিতে আছে ভিটামিন-সি। তাছাড়া ফল এবং সজীতে প্রচুর পরিমাণে আছে পটাশিয়াম, চুন, গন্ধক, লবণ, ম্যাগ্‌নেশিয়াম, ফস্‌ফরাস, লোহা এবং অন্যান্য খনিজ লবণ, যা শরীর রক্ষার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন।

কোন খাদ্যের মূল্যায়ন তার ক্যালরি উৎপাদন-ক্ষমতার পরিমাপে হয় এবং খাদ্যশস্যই এর প্রধান উৎস। কিন্তু ক্যালোরি উৎপাদনে সজীর ক্ষমতা কত বেশী, তা নীচের তালিকাটি লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে।

ফসলের নাম	প্রতি আউন্সে ক্যালরির পরিমাণ	প্রতি একরে উৎপাদন (টনে)	প্রতি একরে ক্যালরির পরিমাণ
গম	98	0·34	1,034880
কলা	42	10·00	15,052800
পেঁপে	11	48·00	18923520
মিষ্টি আলু	36	3·00	5500000

উপরের তালিকাটি লক্ষ্য করলেই জানা যাবে, ক্যালরি উৎপাদনের ক্ষমতা অনুযায়ী 1 একর গম, 0·45 একর আম এবং ·07 একর কলার সমান। অন্য ভাবে দেখলে প্রতিটি মানুষের প্রতি দিনে প্রয়োজনীয় 2500 ক্যালরি অনুযায়ী এক একর গম এবং এক একর কলা থেকে প্রায় 16 জন মানুষের প্রয়োজনীয় ক্যালরি পাওয়া যায় এবং এথেকেই ফল ও সব্জী চাষের উপযোগিতা কত বেশী, তা বোঝা যায়। বহু জনসংখ্যাপীড়িত ভারতে খাদ্যাভাব অনেক পরিমাণে দূর করা যেতে পারে, যদি ফলমূল উৎপাদনের ব্যবস্থা আরো বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে এগিয়ে যায় এবং শস্য চাষের সঙ্গে সঙ্গে ফল ও সব্জী চাষের দিকে নজর দেওয়া হয়।*

---

* ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ: (কৃষিভবন, নতুন দিল্লী) কর্তৃক প্রকাশিত।

মঙ্গলগ্রহ

আমরা মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে কি জানি? জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অনেকদিন থেকেই একথা জানেন যে, এই গ্রহের আয়তন পৃথিবীর আয়তনের এক-দশমাংশের কিছু বেশী। এর দুটি উপগ্রহ আছে। জোনাথন সুইফ্‌ট্‌-এর 'গালিভার্স ট্রাভেল্‌স্‌' গ্রন্থে এই দুটি উপগ্রহের উল্লেখ আছে। যাহোক, জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা 1877 সালে এই গ্রহ দুটি আবিষ্কার করেন। মঙ্গলগ্রহের এক বছর পৃথিবীর প্রায় দু-বছরের সমান। ঋতুগুলি প্রায় পৃথিবীর মতই। কিন্তু এক-একটি ঋতুর স্থায়িত্ব পৃথিবীর ঋতুর স্থায়িত্বের প্রায় দ্বিগুণ। মঙ্গলগ্রহের পৃষ্ঠদেশে সাদা এবং কালো দাগ আছে—তা জমি এবং সমুদ্র। অপেক্ষাকৃত ঘন আবহাওয়ায় মেঘও দেখা যায়।

শীতকালে মঙ্গলগ্রহের মাথায় একটা তুষারস্তূপ দেখা যায়। এই তুষারস্তূপ বসন্তকালে ধীরে ধীরে ছোট হয়ে আসে। আর গ্রীষ্মকালে তা পুরাপুরি অদৃশ্য হয়ে যায়। শরৎকালে এই তুষারস্তূপ আবার দেখা যায় এবং শীতেই তার আকার সবচেয়ে বড় হয়ে ওঠে।

বহুদিনের পরিশ্রম ও নিরীক্ষার ফলে এই সব তথ্য জানা গেছে। গ্রহের পৃষ্ঠদেশে কি ঘটছে, তার ছবি নেওয়া সহজ নয়। তাছাড়া পৃথিবীর বাধার জন্যে এবং আবহাওয়া মাঝে মাঝে যথেষ্ট স্বচ্ছ না থাকবার ফলে নিরীক্ষা ব্যাহত হয়।

পৃথিবী এবং মঙ্গলগ্রহের মধ্যে কিছু অবস্থাগত মিল থাকবার ফলে এই গ্রহ সম্পর্কে একটা অস্বাভাবিক আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। মঙ্গলগ্রহে উদ্ভিদ সম্পর্কে গবেষণার ফল প্রকাশিত হয়েছে। জলপূর্ণ খাল এবং একটি উন্নত সভ্যতার অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছে।

ষাটের দশকের সুরুতে বর্ণালী-বিশ্লেষণ পদ্ধতি বিকাশলাভ করবার ফলে জানা গেছে যে, মঙ্গলগ্রহের আবহাওয়ার ঘনত্ব পৃথিবীর আবহাওয়ার ঘনত্বের দশ গুণ কম। সে জন্যে সেখানে এর অস্তিত্বের সম্ভাবনা কম। মঙ্গলগ্রহের পৃষ্ঠদেশে গ্যাসের চাপ হলো পৃথিবীর 35 কিলোমিটার উচ্চতাসম্পন্ন স্থানের গ্যাসের চাপের প্রায় কাছাকাছি এবং তা হলো পৃথিবীপৃষ্ঠের গ্যাসের চাপের 0·5 শতাংশ।

সঙ্গে সঙ্গে এটাও জানা গেছে যে, মঙ্গলগ্রহের আবহাওয়ায় প্রধানতঃ কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস

আছে। আগে পৃথিবীর সঙ্গে এই গ্রহের যতটা মিল আছে বলে মনে হয়েছিল, এখন ততটা মিল আছে বলে মনে হচ্ছে না। এরকম আবহাওয়ার অভাব নিয়ে পৃথিবীর সঙ্গে যেমন মঙ্গলগ্রহের মিল আছে, তেমনি চাঁদের সঙ্গেও তার মিল থাকাই আজ স্বাভাবিক বলে মনে হয়। আয়তন এবং ব্যাসের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে, মঙ্গলগ্রহের স্থান পৃথিবী এবং চাঁদের মাঝামাঝি। মেরিনার-4 যে সব ফটো তুলেছিল, তাতে দেখা গেছে যে, মঙ্গলগ্রহে চাঁদের আগ্নেয়গিরির মুখের অনুরূপ অসংখ্য আগ্নেয়গিরির মুখ রয়েছে।

এটাও দেখা গেছে যে, এই গ্রহের উপরের স্তরের কিছু অংশের অবস্থা এমনই যে, তা কোনমতেই নিরূপণ করা যায় না। মহাকাশের যন্ত্রপাতির সাহায্যে মঙ্গলগ্রহের খুব নিকট থেকে যে ছবি তোলা হয়েছে, তাতে কোন খালবিলের অস্তিত্বের চিহ্ন দেখা যায় না। মঙ্গলগ্রহের জমিতে উচ্চতার যে ব্যবধান দেখা গেছে, তা দশ কিলোমিটারের কম নয়—অবশ্য গ্রহের অল্প পরিধির মধ্যেই উচ্চতার ব্যবধান মেপে দেখা হয়েছে।

এই গ্রহের আবহাওয়াও খুব অস্বাভাবিক। আবহাওয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইড থাকে। একটা বিশেষ উচ্চতায় এই গ্যাস তুষারপাতে নষ্ট হয়ে যায় এবং তৈরি হয় শুকনো বরফের স্ফটিক। মেরু অঞ্চলেই এরকম জমাটবাঁধা অবস্থার সৃষ্টি হয়। সেখানে তাপমাত্রা কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস জমানোর তাপমাত্রার নীচে থাকে। মঙ্গলগ্রহের সর্বোচ্চ জলবাষ্পের পরিমাণ নির্ণয়ের যে চেষ্টা করা হয়েছে, তাতে দেখা যায়, তা 0·06 মিলিমিটার জলস্তরের সমান। অবশ্য একথা মনে রাখতে হবে যে, একটা অঞ্চলের গড় হিসেবেই এই পরিমাণ নির্ণয় করা হয়েছে—যে অঞ্চলের ব্যাস কমপক্ষে কয়েক শত কিলোমিটার। অবশ্য অপেক্ষাকৃত ছোট অঞ্চলে বেশী পরিমাণ জল পাওয়া যেতে পারে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাফল্যের সম্ভবতঃ এখানেই পরিসমাপ্তি। মঙ্গলগ্রহের উপরের দিকের আবহাওয়া সেখানকার ভূমির তাপ-বৈশিষ্ট্য এবং তার উপরিভাগের ভূমিস্তরের সূক্ষ্ম বিন্যাস সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া গেছে, তা মহাকাশ সম্পর্কে গবেষণার ফল। আর তা শুধু জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত তথ্যাদি থেকেই পাওয়া যায় নি, সে জন্যে ভূ-পদার্থ, ভূতত্ত্ব এবং ভূ-রসায়ন-বিজ্ঞান সম্পর্কেও তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হয়েছে।

তার মানে এই নয় যে, মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে পরীক্ষা চালাবার কাজে জ্যোতির্বিজ্ঞানের আর কোন ভূমিকা নেই। পৃথিবী থেকে মঙ্গলগ্রহের আবহাওয়া সম্পর্কে গবেষণা চালাবার কাজ এখনও বেশ কিছুদিন অগ্রাধিকার পাবে। পৃথিবীর মানমন্দিরগুলি থেকে মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে গবেষণা চালাবার যে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে, এগুলি তারই অংশবিশেষ।

তাছাড়া একথা তো স্বীকার করতেই হবে যে, শুধুমাত্র জ্যোতির্বিজ্ঞান নির্দেশিত পদ্ধতিতে গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কে, বিশেষ করে মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে গবেষণা চালানো যায় না। মহাকাশে প্রযুক্ত কৌশলগুলি গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কে গবেষণার ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হচ্ছে। চাঁদ এবং শুক্রগ্রহের ক্ষেত্রে তার স্পষ্ট প্রমাণ আছে। সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা বিশেষ পদ্ধতিরও বিকাশ ঘটা দরকার, যা জ্যোতির্বিজ্ঞানের মত অত সাধারণভাবে গ্রহ-নক্ষত্রের বিচার-বিশ্লেষণ করবে না অথবা ভূতত্ত্ব বা ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞানের মত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবেও তথ্যাদির বিশ্লেষণ করবে না।

আসলে এই পদ্ধতিই হবে গ্রহতত্ত্বের ভিত্তি। আমাদের চোখের সামনে নতুন এই বিজ্ঞানের জন্ম হচ্ছে।

জিন-এনজাইম প্রক্রিয়া ও মানুষের রোগ

শ্রীঅসিতবরণ দাস-চৌধুরী*

এই প্রবন্ধে মানুষের দেহকোষের দুইটি অ্যামিনো অ্যাসিড, যথা—ফেনাইলঅ্যালানাইন (Phenylalanine) ও টাইরোসিন (Tyrosine) জিন নির্দেশিত এনজাইমের দ্বারা আদিষ্ট হইয়া কিভাবে আমাদের দেহে বিভিন্ন প্রক্রিয়া ঘটায় এবং তাহার ব্যতিক্রমে আমাদের দেহে যে কত বিভিন্ন ধরণের রোগের সৃষ্টি হইতে পারে—তাহা আলোচনা করিব। আমাদের দেহে কুড়িটি অ্যামিনো অ্যাসিড আছে এবং এই অ্যামিনো অ্যাসিডগুলিও সাধারণতঃ জিন-এনজাইম সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রক্রিয়ার পরিশেষে শক্তি উৎপন্ন করে, কিন্তু এই প্রক্রিয়াগুলি চলিবার সময় কোন পর্যায়ে জিন-এনজাইম সম্পর্কের কোন ব্যতিক্রম ঘটিলে আমাদের দেহে রোগের সৃষ্টি হইতে পারে। এইখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এখনও পর্যন্ত সবগুলি অ্যামিনো অ্যাসিডের জিন-এনজাইম সম্পর্কিত বিপাকের পথ সম্পূর্ণরূপে আবিষ্কৃত হয় নাই। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা অবশ্য কর্তব্য যে, জিন-এনজাইমের পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যতিক্রমজনিত মানবদেহের রোগগুলি সাধারণতঃ বংশানুক্রমিক। যদিও অনেক ক্ষেত্রে কৃত্রিম উপায়ে দেহে এনজাইম প্রবেশ করাইয়া রোগ নিরাময় করিয়া দেওয়া যায়, তথাপি ঐ এনজাইম সম্পর্কিত জিনের পরিবর্তন দুঃসাধ্য। আজ জৈব রাসায়নিক প্রজনন-বিজ্ঞানে (Biochemical genetics) এই জিনের রহস্য সমাধানকল্পে বিশ্বের বহু বিজ্ঞানী গভীর সাধনায় ব্যাপৃত আছেন, কারণ ইহা জৈব রাসায়নিক প্রজনন-বিজ্ঞানীদের নিকট গুরুতর এক সমস্যা।

জেনেটিক্সকে প্রজননবিদ্যা বলা হয়, তবে বর্তমানকালের জেনেটিক্স বলিতে প্রজননবিদ্যার বাহিরে আরও অনেক কিছু বুঝায়। প্রজননবিদ্যা আধুনিক ক্রমোন্নতিশীল জীব-বিজ্ঞানের এক বিশেষ শাখা। আমরা বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মেণ্ডেলের বংশসূত্রগুলি হইতেই জানিতে পারিয়াছি যে, জিন জীবের বংশানুগতির এক-একটি একক। বিগত প্রথম চার দশক বৈজ্ঞানিকেরা প্রধানতঃ বিশুদ্ধ জেনেটিক্সে জীবকোষে জিনের অবস্থান, জিনের অনুপাত ইত্যাদি লইয়া গবেষণা করিয়াছেন। কিন্তু জীবদেহে জিনের প্রক্রিয়া কিভাবে চলে, তাহার হদিশ পাইবার জন্য বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য কাজ হয় নাই। দুইজন আমেরিকান বিজ্ঞানী জর্জ বিডল ও ই. এল. টেটাম 1941 সালে Neurospora নামক ছত্রাকের উপর কাজ করিয়া জিন ও এনজাইমের সম্পর্কের বিষয় আলোচনার ফলে জীবদেহে জিনের প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে এক নূতন আলোক-পাত করিয়াছেন। এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য 1958 সালে উপরিউক্ত বিজ্ঞানী দুইজন যুগ্মভাবে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এই প্রসঙ্গে বৃটিশ ডক্টর এ. ই. গ্যারডের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গ্যারড 1909 সালে Inborn Errors of Metabolism নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনি এই গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিলেন যে, মানুষের কতকগুলি শারীরিক বৈলক্ষণ্য বংশানুক্রমিক। তিনি এই কথাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, কতকগুলি নির্দিষ্ট এনজাইমের অভাবে (যেগুলি সুস্থ ব্যক্তির দেহে পরিমাণমত থাকে)

* নৃতত্ত্ব বিভাগ, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-19

মানবদেহে ঐ বৈলক্ষণ্যের উৎপত্তি হয়। তিনি আরও বলিলেন যে, একটি জিন একটি বিশেষ এনজাইম প্রস্তুত করে, পরিব্যক্ত (Mutant) জিন সেই নির্দিষ্ট এনজাইম তৈয়ার করিতে পারে না। সুতরাং গ্যারডের আবিষ্কৃত মানবদেহে ব্যাধির কারণগত জিন-এনজাইম সম্পর্ক বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের জেনেটিক্সের এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আশ্চর্যের বিষয়—এই আবিষ্কার তখনকার যুগে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে নাই বরং অবহেলিত হইয়াই আসিয়াছে। কিন্তু বিডল্ ও টেটামের Neurospora-র উপর অনুরূপ জিন-এনজাইম সম্পর্ক আবিষ্কৃত হওয়ায় বিজ্ঞানীরা গ্যারডকেই জৈব রাসায়নিক প্রজনন-বিজ্ঞানের আবিষ্কর্তা বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন।

আজ এই কথা অনস্বীকার্য যে, Neurospora-র মত মানুষের দেহেও জিনের প্রক্রিয়া এনজাইমের মাধ্যমে হইয়া থাকে। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, মানুষের দেহে কুড়িটি অ্যামিনো অ্যাসিড আছে, ফেনাইলঅ্যালানাইন উহাদের মধ্যে একটি। দেখা যাক ফেনাইলঅ্যালানাইন এনজাইমের দ্বারা কিভাবে আমাদের দেহে ক্রিয়া করিয়া থাকে। আমরা খাদ্যের মাধ্যমে যে সকল প্রোটিন গ্রহণ করিয়া থাকি, সেইগুলির প্রত্যেকটির মধ্যেই প্রায় এই ফেনাইলঅ্যালানাইন থাকে। খাদ্য হজম করিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রোটিন ভাঙিয়া বিভিন্ন-

মানবদেহে ফেনাইলঅ্যালানাইন ও টাইরোসিন প্রক্রিয়া।

রকমের অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিণত হয়, যাহার মধ্যে ফেনাইলঅ্যালানাইন পাওয়া যাইবে। পাকনালীতে সেই অ্যামিনো অ্যাসিড অন্যান্য দ্রবণীয় বস্তুর সহিত প্রবেশ করে এবং ব্যাপন (Diffusion) ক্রিয়ার মাধ্যমে এক কোষ হইতে অন্য কোষে যাইয়া সমস্ত শরীরে ছড়াইয়া পড়ে। একবার ফেনাইলঅ্যালানাইন দেহকোষে আসিয়া পড়িলে ইহা কোন্ পথে যাইবে, তাহা সম্পূর্ণ নির্ভর করে জিন-নির্দিষ্ট যে এনজাইম ক্রিয়া করিবে, তাহার উপর। ফেনাইলঅ্যালানাইনের ভাগ্য তিনটি পথে প্রবর্তিত হইতে পারে—(1) ইহা দেহকোষে প্রোটিনে পরিবর্তিত হইতে পারে, (2) ইহা অ্যামিনো অ্যাসিড টাইরোসিনে পরিবর্তিত হইতে পারে, (3) ইহা ফেনাইলপাইরুভিক অ্যাসিডে (Phenylpyruvic acid) পরিবর্তিত হইতে পারে। এখন ফেনাইলঅ্যালানাইনকে এই তিনটির মধ্যে যে কোন একটিতে পরিবর্তিত হইতে হইলে পর্যায়ক্রমে অনেকগুলি জিন-নির্দেশিত এনজাইম মাধ্যমিক প্রক্রিয়ায় যাইতে হইবে এবং ইহার যে কোন একটি পর্যায়ে জিন-নির্দেশিত এনজাইমের পরিবর্তন হইলে উদ্দেশ্য সফল হইবে না, পরন্তু নির্দিষ্ট এনজাইমের অভাবে আমাদের দেহে তুমুল কাণ্ডের সৃষ্টি হইবে। দেহকোষের ক্রোমোসোমে (Chromosome) প্রচ্ছন্ন জিন (Recessive gene) p যখন হোমোজাইগাস (Homozygous)* অবস্থায় থাকে, তখন ফেনাইলঅ্যালানাইনকে যে নির্দিষ্ট এনজাইম টাইরোসিনে পরিবর্তিত করে তাহার উৎপত্তি হয় না, ফলে ফেনাইলঅ্যালানাইন নির্দিষ্ট এনজাইমের অভাবে উদ্দিষ্ট পথে পরিচালিত হইতে না পারিয়া দেহকোষে বেশী পরিমাণে জমিতে থাকে এবং কিছু-পরিমাণ ফেনাইলঅ্যালানাইন ফেনাইলপাইরুভিক অ্যাসিডেও পরিণত হয়। প্রয়োজনাতিরিক্ত এই দুইটি পদার্থ রক্তে সঞ্চারিত হয় এবং পরিশেষে প্রস্রাবের সহিত দেহ হইতে নির্গত হয়, যাহা অতি সহজেই রাসায়নিক পরীক্ষায় অনুধাবন করা যায়। যে ব্যক্তির প্রস্রাবে এই লক্ষণ দেখা যায়, তাহাকে ফেনাইলকেটোনিউরিয়া রোগী (Phenylketonuria সংক্ষেপে PKU) বলা হয় রোগটির নাম ফেনাইলকেটোনিউরিয়া। ফেনাইলকেটোনিউরিয়া রোগীর আরও অনেক মানসিক ও দৈহিক পরিবর্তন লক্ষণীয়। সাধারণতঃ এই রোগে আক্রান্ত রোগী শৈশবে সহজে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে না, কারণ পায়ের গোড়ালীর অস্থির গঠন খুব দুর্বল থাকে। এই রোগীর চুল ফ্যাকাশে রঙের হয় এবং বুদ্ধিও খুব কম থাকে।

আমাদের দেহকোষে ফেনাইলঅ্যালানাইনের মত টাইরোসিন আর একটি অ্যামিনো অ্যাসিড। পূর্বে একবার উল্লেখ করিয়াছি যে, ফেনাইলঅ্যালানাইন হইতে টাইরোসিন উৎপন্ন হইতে পারে অথবা খাদ্যের প্রোটিনের মাধ্যমে আমরা ইহা পাইয়া থাকি। টাইরোসিন বিভিন্ন জিন-নির্দেশিত এনজাইমের মাধ্যমে আমাদের দেহে চারভাবে ক্রিয়া করিতে পারে। প্রথমতঃ টাইরোসিন দেহকোষের প্রোটিনে পরিণত হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ টাইরোসিন থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডের আয়োডিনের সহিত মিশিয়া থাইরয়েড হরমোন থাইরক্সিন (Thyroxine) এবং ট্রায়োডোথাইরোনাইন (Triodothyronine) তৈয়ারি করে। আমাদের দেহের বিপাকের (Metabolism) উপর এই দুইটি হরমোনের কর্তৃত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সাধারণ দৈহিক ও মানসিক বিকাশে অবশ্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু আমাদের দেহকোষের

* কোন প্রাণীর ক্রোমোসোমের সঞ্চার পথে (Locus) যদি সমজিন (Alike gene) থাকে, তবে তাহাকে হোমোজাইগাস (Homozygous) বলা হয়। কিন্তু তাহারা যদি বি-সম (Different gene) হয়, তবে তাহাকে হেটেরোজাইগাস (Heterozygous) বলা হয়।

ক্রোমোসোমে যখন একজোড়া প্রচ্ছন্ন জিন cc থাকে, তখন তাহা দেহের প্রয়োজনীয় উপরিউক্ত সাধারণ থাইরয়েড হরমোন তৈয়ার করিতে পারে না, কারণ ঐ জিনগুলি হরমোনের প্রয়োজনীয় এনজাইম তৈয়ার করিবার ক্ষমতা নষ্ট করিয়া দেয়। ফলে Genetic goitrous cretinism রোগের সৃষ্টি হয়। এই রোগীর দৈহিক ও মানসিক অবক্ষেপ দেখা দেয় এবং থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড খুব বড় হইয়া যায়।

তৃতীয়তঃ টাইরোসিন ডাইহাইড্রোক্সিফেনাইলঅ্যালানাইনে (Dihydroxyphenylalanine) পরিণত হইতে পারে এবং উহা পুনরায় অনেকগুলি পর্যায়ে শেষ পর্যন্ত মেলানিনে (Melanin) পরিণত হয়। মেলানিন রংটি আমাদের ত্বক, চুল ও চোখে পাওয়া যায়। একজোড়া প্রচ্ছন্ন জিন aa টাইরোসিনকে ডাইহাইড্রোক্সিফেনাইলঅ্যালানাইনে পরিণত করিবার এনজাইম নষ্ট করিয়া দেয় এবং এই আগন্তুকের অনুপস্থিতিতে মেলানিন তৈয়ারি বন্ধ হইয়া যায়। মেলানিন আমাদের দেহের কোষে না থাকিলে আমাদের ত্বক, চুল ও চোখে কোন রং হয় না, ফলে ফ্যাকাশে দেখা যায়। যে ব্যক্তির দেহে এই লক্ষণগুলি দেখা দেয়, তাহাকে আমরা অ্যালবিনো বলি এবং এই রোগকে অ্যালবিনিজম (Albinism) বলা হয়।

চতুর্থতঃ বেশীর ভাগ টাইরোসিন পরিশেষে দেহকোষে শক্তি উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, জল ও নাইট্রোজেন নির্গমনে পরিণত হয়। কিন্তু টাইরোসিন এই পরিণতি লাভ করে অনেকগুলি এনজাইম মাধ্যমিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে। এই প্রক্রিয়াগুলির প্রথম পর্যায়ের ফল প্যারাহাইড্রোক্সিফেনাইলপাইরুভিক অ্যাসিড (Parahydroxyphenylpyruvic acid) এবং দ্বিতীয় পর্যায় হইতেছে ডাইহাইড্রোক্সিফেনাইলপাইরুভিক অ্যাসিড (Dihydroxyphenylpyruvic acid)। আমাদের দেহকোষে যখন একজোড়া প্রচ্ছন্ন জিন tt থাকে, তখন নির্দিষ্ট এনজাইমের অভাবে ঐ দ্বিতীয় পর্যায়ের ডাইহাইড্রোক্সিফেনাইলপাইরুভিক অ্যাসিড আর পরিবর্তিত হয় না। ফলে দেহকোষে উহা বেশী পরিমাণে জমিতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছু পরিমাণ টাইরোসিনও দেহে জমিয়া থাকে। এই দুইটি অতিরিক্ত পদার্থ যে ব্যক্তির প্রস্রাবের সহিত পাওয়া যায়, তাহাকে টাইরোনোসিস (Tyronosis) রোগী বলা হয়। টাইরোনোসিস রোগীর অন্যকিছু বিশেষ বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। এই প্রক্রিয়াসমূহের তৃতীয় পর্যায়ে হোমোজেনটিসিক অ্যাসিড (Homogentisic acid) তৈয়ারি হয়, কিন্তু একজোড়া প্রচ্ছন্ন জিন hh-এর উপস্থিতিতে নির্দিষ্ট এনজাইম তৈয়ারি হয় না। ফলে হোমোজেনটিসিক অ্যাসিড মেলিল্যাকটোঅ্যাসেটিক অ্যাসিডে (Maleylacetoacetic acid) পরিবর্তিত হইতে পারে না। সুতরাং এই হোমোজেনটিসিক অ্যাসিড দেহকোষে জমিতে থাকে। এই বেশী পরিমাণ হোমোজেনটিসিক অ্যাসিডকে অ্যালকাপটনও (Alkapton) বলা হয়। বেশী পরিমাণ অ্যালকাপটন যে ব্যক্তির প্রস্রাবে পাওয়া যায়, তাহাকে অ্যালকাপটোনিউরিয়া রোগী বলা হয় এবং এই রোগকে অ্যালকাপটোনিউরিয়া (Alkaptonuria) বলা হইয়া থাকে। অ্যালকাপটোনিউরিয়া রোগীকে চিহ্নিত করা খুবই সহজ ব্যাপার। কারণ যে ব্যক্তি এই রোগে আক্রান্ত হয়, তাহার প্রস্রাবের প্রতি একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে, ঐ প্রস্রাবের অ্যালকাপটন বাতাসের সংস্পর্শে আসিবার ফলে অক্সিডাইজড্ হইয়া প্রস্রাবের রং ধীরে ধীরে হলুদ, বাদামী ও পরিশেষে গাঢ় কালো হইয়া যাইতেছে। সাধারণতঃ এই রোগীর অন্য কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না, কিন্তু বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে অ্যালকাপটন শরীরের কার্টিলেজগঠিত জায়গাগুলিতে,

যথা—কান, নাক ইত্যাদিতে জমিয়া যায়; ফলে ধীরে ধীরে ঐ জায়গাগুলি গাঢ় কালো হইতে থাকে। কখনও কখনও এই লক্ষণ ত্বকের Fibrous tissue ও চোখের সাদা অংশে (Sclera) পর্যন্ত দেখা যায়।

উপরিউক্ত আলোচনা হইতে ইহা বুঝা যাইতেছে যে, দুইটি অ্যামিনো অ্যাসিডের বিপাকের পথ কত জটিল এবং ঐ বিপাকের পথে জিন-নির্দেশিত প্রকৃত এনজাইম প্রক্রিয়াগুলি চলিবার সময় কোন পর্যায়ে বিঘ্ন ঘটিলে আমাদের দেহে যে বিভিন্ন রোগ ও বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পায়—তাহা সত্যই বিস্ময়কর। মানুষের দেহের অন্যান্য অ্যামিনো অ্যাসিডগুলির ক্ষেত্রেও অনুরূপ কথাই প্রযোজ্য।

বিজ্ঞান-সংবাদ

সৌরজগতের উৎপত্তি সম্পর্কে নূতন মতবাদ

বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী ডক্টর হ্যারল্ড সি. উরি চাঁদ ও সৌরজগতের উৎপত্তি সম্পর্কে একটি নূতন মতবাদ উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর এই মতবাদ প্রমাণিত হলে অ্যাপোলো-15-এর চাঁদের পার্বত্য এলাকায় অভিযান খুবই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং বিজ্ঞানী মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করবে।

আমেরিকার চান্দ্র-বিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রধান ডক্টর উরি বলেছেন যে, সৌরজগতে যে সকল গ্রহ রয়েছে, আদিতে তারা ছিল চাঁদেরই মত গ্রহ। চাঁদ যে সব উপাদানে গঠিত, সেই সবই ছিল পৃথিবীসহ সকল গ্রহের মূলে। আদি সূর্য থেকে সে দিন যে সকল চাঁদ বেরিয়ে এসেছিল, তাদের মধ্যে আজ ঐ একটি মাত্রই অবশিষ্ট রয়েছে।

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নোবেল পুরস্কার-বিজয়ী বিজ্ঞানী ডক্টর উরি জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থার হিউস্টন কেন্দ্রে এক সাক্ষাৎকারে তাঁর নূতন মতবাদ সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করে বলেন। চাঁদ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে প্রচলিত মত—একই সময়ে পৃথিবীর মতই সৌরজগতের অপর অংশে সৃষ্ট হয় চাঁদ, পরে পৃথিবীর আকর্ষণে তারই আওতায় এসে চাঁদ বন্দী হয়ে পড়ে।

কিন্তু ডক্টর উরির মতে, অ্যাপোলো-15-এর অভিযাত্রীরা যে চাঁদে তথ্যসন্ধানী অভিযান চালান, সেই চাঁদ ও পৃথিবী একই সময়ে সৃষ্ট হয় নি; বরং সৃষ্টির উষাকালে সকল গ্রহ ও পৃথিবীর আদি মাতা হিসাবে যে সকল চাঁদের সৃষ্টি হয়েছিল, তাদের মধ্যে অবশিষ্ট ঐ শেষ চন্দ্র গ্রহটিতেই মার্কিন মহাকাশচারীরা আর একবার অবতরণ করেছেন। মহাকাশচারী ডেভিড স্কট ও জেম্‌স্‌ আরউইন চাঁদের বিশুষ্ক হেড্‌লী নদী ও অ্যাপেনাইন পার্বত্য এলাকায় অবতরণ করেন। এটিই চাঁদের প্রাচীনতম এলাকা—মানুষ এই প্রথম ঐ এলাকা সম্পর্কে কেবলমাত্র প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞান সঞ্চয়েই সক্ষম হয় নি, তারা যে সকল তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তা সূর্যের চারদিকে যে সকল গ্রহ আবর্তিত হচ্ছে, তাদের সৃষ্টি-রহস্য ও উৎসের উপরও আলোকপাত করবে।

গ্রহমণ্ডলী ও চাঁদের উৎপত্তি নিয়ে ডক্টর উরি বহুকাল ধরে গবেষণা করছেন। আজ এক্ষেত্রে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ডক্টর উরি অন্যতম বিশিষ্ট বিজ্ঞানী। তাঁর ধারণা, এই মতবাদ বিজ্ঞানী মহলে বিতর্ক সৃষ্টি করবে। তবে তিনি

মনে করেন, গ্রহমণ্ডলীর সৃষ্টি সম্পর্কে এটাই একমাত্র যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা হতে পারে।

ডক্টর উরি বলেন যে, পদার্থ-বিজ্ঞানের নিয়মের সঙ্গে এবং পূর্ববর্তী অ্যাপোলো চন্দ্রাভিযানের সাহায্যে চন্দ্র সম্পর্কে যে সকল তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, সেই সকল তথ্যের সঙ্গে এই মতবাদের সামঞ্জস্য রয়েছে।

মোটামুটিভাবে ডক্টর উরি বলতে চেয়েছেন যে, সাড়ে চার-শ' কি পাঁচ-শ কোটি বছর পূর্বে অতি প্রচণ্ড বেগে ঘূর্ণায়মান মহাকাশের আদি সূর্য ঘন গ্যাসে পূর্ণ গোলাকার একটি বিরাট বর্তুলের রূপ ধারণ করে। কোন গতিশীল বস্তুর ভর বা মাস এবং তার গতিবেগের গুণফল হচ্ছে মোমেণ্টাম। জ্যোতিঃপদার্থ-বিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে কৌণিক মোমেণ্টাম (অ্যাঙ্গুলার মোমেণ্টাম) সংরক্ষণের জন্যে আদি সূর্যের ভর বা মাস গ্যাস বিপুল পরিমাণে ছাড়তে হয়েছে। এই সকল তেজস্ক্রিয় গ্যাস মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ে ও বিভক্ত হয়ে যায়। এরাই চন্দ্রগ্রহের মূল উপাদান। ঐ সকল গ্যাস প্রথম চাঁদের মত গ্রহে এবং পরে ঐ সকল চন্দ্রগ্রহ সৌরমণ্ডলীর অন্যান্য গ্রহে রূপান্তরিত হয়।

ডক্টর উরি বলেন যে, মহাকাশে যে ধূলিকণা ছিল, তাদের সঙ্গে সূর্য থেকে বিচ্ছুরিত ঐ বাষ্পের সংঘর্ষ ঘটে। ফলে ঐ সকল ধূলি উত্তপ্ত হয় এবং বাষ্পপুঞ্জ ভেঙ্গে ভেঙ্গে খণ্ডিত হয়ে যায়। যে অভিকর্ষ শক্তির ক্ষেত্র তারা প্রস্তুত করেছিল, তারা তারই প্রভাবাধীন হয়ে পড়ে। যদি কোন বস্তু ঐ সকল বাষ্পের মত লক্ষ লক্ষ মাইল জুড়ে বিরাজ করে, তবে তার অভিকর্ষ শক্তি প্রচণ্ড হয়ে ওঠে। কোন একটি স্থানে সামান্য একটি বস্তুর অভিকর্ষ শক্তি খুব প্রবল হয় না।

সেই উত্তপ্ত বালুকারাশি আশেপাশের আরও ধূলিকণাকে টেনে নেয় এবং চন্দ্রগ্রহের মত গ্রহে পরিণত হয়। ডক্টর উরির মতে, চাঁদ যে অবিকৃত রয়েছে, অন্য গ্রহের সঙ্গে চাঁদের যে কোন রকম সংঘর্ষ হয় নি, তার মূলে রয়েছে কোন আকস্মিক কারণ। তিনি বলেন যে, সৃষ্টির আদিতে যে সকল চাঁদের সৃষ্টি হয়েছিল, তাদের মধ্যে ঐ একটি মাত্রই আজও বেঁচে রয়েছে। ঐ চাঁদেই সৌরমণ্ডলীর বিভিন্ন গ্রহ গঠনের মূল উপাদান রয়েছে।

ডক্টর উরি বলেন, এই অভিমত একান্তভাবে তাঁরই। তবে বিশ্ববিখ্যাত বৃটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডক্টর জেম্‌স্ জীন্স বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রথম এই আভাস দিয়েছিলেন। তারপর তিনিই এই বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করেন।

পশুখাদ্য হিসাবে খবরের কাগজ

ভবিষ্যতে এমন দিন হয়তো আসবে, যখন গবাদি পশু, ভেড়া ও ছাগলকে খাদ্য হিসাবে পরিত্যক্ত খবরের কাগজও দেওয়া হবে। তার ফলে আজ চাষের জমি নিয়ে যে এত কাড়াকাড়ি, তার অনেকখানি সুরাহা হয়ে যাবে। তাছাড়া, পরিত্যক্ত খবরের কাগজ জলবায়ু দূষিতকরণের ক্ষেত্রে যে সমস্যার সৃষ্টি করে, সেই সমস্যারও সমাধান হবে।

আমেরিকার খবরের কাগজের সংখ্যা দিন দিনই বেড়ে যাচ্ছে। পড়া হয়ে যাবার পর এই সকল খবরের কাগজ যে কোথায় ফেলা হবে, কোথায় রাখা হবে, সে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমেরিকার মেরিল্যাণ্ডের বেল্টস্‌ভিলের কৃষিগবেষণা কৃত্যকের পশু-বিজ্ঞানী ডক্টর ডেভিড এ. ডিনিয়াস খবরের কাগজ পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায় কিনা, সে বিষয়ে পরীক্ষা করে দেখছেন। তিনি কৃত্রিম উপায়ে শীতকালীন পরিবেশ সৃষ্টি করে অন্যান্য খাদ্যের সঙ্গে খড়ের বদলে খবরের কাগজের গুঁড়া ও গুড় মিশিয়ে গবাদি পশুকে খাইয়েছেন। অন্যান্য খাদ্যবস্তুর মধ্যে ছিল সয়াবীন ও ভুট্টার গুঁড়া, কিছুটা সৈন্ধব লবণ,

টিমোথি ঘাস ও ডিক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট। শতকরা 8, 16 ও 24 ভাগ—এই হারে খবরের কাগজের গুঁড়া ঐ সকল বস্তুর সঙ্গে মেশানো হয়েছিল।

বলদের বেলায় দেখা গেছে, খবরের কাগজের পরিমাণের তুলনায় গুড়ের পরিমাণ কম থাকলে তারা তা গ্রহণ করে নি। খবরের কাগজের কালি কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে নি। এই খাদ্য গ্রহণের ফলে তাদের দৈহিক ওজনও হ্রাস পায় নি। তারপরে তাদের মাংস, হাড় ইত্যাদি পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। এসব খাদ্যের কোন রকম বিরূপ প্রতিক্রিয়ার প্রমাণ ঐ সকল পশুর দেহের কোন অংশেই পাওয়া যায় নি।

ডক্টর ভিনিয়াস এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, পশুদের খাদ্যের অন্ততঃ 8 শতাংশ খড়ের বদলে খবরের কাগজ দেওয়া যেতে পারে। এতে কোন রকম ক্ষতি হবার আশঙ্কা নেই।

গোলমাল বন্ধ করবার উপায়

যে সকল চিকিৎসক সোভিয়েট ইউনিয়নের চিকিৎসা-বিজ্ঞান আকাডেমির শ্রমজীবী মানুষের রোগ ও স্বাস্থ্যরক্ষা, গোলমাল ও স্পন্দন সংক্রান্ত গবেষণাগারে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন, তাঁরা কোরপোস্ত পদার্থ-রাসায়নিক ইনস্টিটিউটের গবেষকদের সহযোগে গোলমাল নিয়ন্ত্রণের একটি কার্যকরী যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য হলো, শিল্পসংস্থার গোলমালের হাত থেকে কানকে রক্ষা করা। নতুন পদ্ধতিটি সোভিয়েট ইউনিয়নের বড় বড় কলকারখানায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

শিল্প-সংস্থা এবং অন্যান্য জায়গায় গোলমাল বন্ধ করবার জন্যে চেষ্টা চালানো হচ্ছে, কারণ মানুষের উপর গোলমালের প্রভাব খুবই ক্ষতিকর। এতে শুধু যে কানেরই ক্ষতি হয়, তা নয়। এতে হৃদ্‌যন্ত্র এবং স্নায়ুতন্ত্রেরও ক্ষতি হয়। গবেষণার ফলাফল থেকে জানা যায় যে, অতিরিক্ত মাত্রায় গোলমাল শরীরের পক্ষে বিশেষভাবে ক্ষতিকর।

সাম্প্রতিক কালে এটা দেখা গেছে—যে সকল লোককে অত্যন্ত গোলমালের মধ্যে কাজ করতে হয়, তাঁরা উচ্চ রক্ত চাপ এবং পেটের আলসারে ভোগেন। তাছাড়া গোলমালের জন্যে মনঃসংযোগ নষ্ট হয়, ক্লান্তি বাড়ে, ফলে উৎপাদনক্ষমতা কমে যায়।

শ্রমিকদের রক্ষণ-ব্যবস্থা, বিশেষ করে গোলমালজাত রোগ থেকে তাদের রক্ষা করাই হলো প্রতিষেধক ব্যবস্থার কাজ। প্রতিষেধক ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য হলো, গোলমাল যথাসম্ভব কমিয়ে আনা। যাহোক, আলাদাভাবেও যে কেউ রক্ষণ-ব্যবস্থা করতে পারে। অনেক ক্ষেত্রেই তা সহজে ও সস্তায় করা যায়। তার মধ্যে আছে গোলমাল নিয়ন্ত্রণের জন্যে বিশেষ তুলামিশ্রিত পশমের প্যাড, প্লাগ ও চাকৃতি প্রভৃতি।

বর্তমানে সোভিয়েট ইউনিয়ন গোলমাল কমাবার জন্যে একটি কার্যকরী যন্ত্র প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করছে। এই যন্ত্রটি পলিমার তন্তু দিয়ে তৈরি। এই তন্তু দেখতে অনেকটা নরম ফ্লানেলের মত। এই বস্তুটি যখন ভাঁজ করে কানে লাগানো হয়, তখন গোলমালের আওয়াজ অনেক কমে যায়। তার ফলে হট্টগোলের জায়গায়ও একজন মানুষ দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করতে পারে এবং তাতে তার স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি হয় না।

সমাজ-বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞানী

মিনতি চক্রবর্তী

কতকগুলি মানুষ নিয়ে গঠিত হয় এক-একটি পরিবার, যাদের মধ্যে থাকে আত্মীয়তার এক নিবিড় বন্ধন। এরকম বহুসংখ্যক পরিবার নিয়ে গঠিত হয় এক-একটি সমাজ আর এই সমাজসম্পর্কিত যে বিজ্ঞান, তার নাম হলো সমাজ-বিজ্ঞান। বর্তমানে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হলো এই সমাজ-বিজ্ঞানের প্রকৃত অর্থ ও সমাজ-বিজ্ঞানীর বিভিন্ন ভূমিকা সম্পর্কে।

প্রাণী-জগতের অন্যান্য প্রাণী থেকে মানুষের রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহার সম্পূর্ণ ভিন্ন। মানুষ হলো সামাজিক জীব, সে গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন-যাপন করে। মানুষের এই গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের বিভিন্ন রকমের আকৃতি আছে, সে সামাজিক রীতি-নীতি ও আইন-শৃঙ্খলাকে অনুসরণ করে, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও তার প্রতিটি কাজের সামাজিক মূল্য ও স্বীকৃতি তৈরি করে। সমাজ-বিজ্ঞান মানুষের এই প্রতিটি কাজকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে অনুসন্ধানের জন্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ করে।

প্রতিটি মানবগোষ্ঠী অপর মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতায় জীবনধারণ করে, অতএব সমাজ-বিজ্ঞানের মুখ্য শিক্ষার কেন্দ্র হলো মানুষের এই গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন বা সমাজময়তাকে (Socialness) শিক্ষা করা। এই গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনকে কোনও সূত্রের উপর নির্ভর করে সাধারণ শ্রেণীভুক্ত করতে সমাজ-বিজ্ঞানীরা এই গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপকে পুঙ্খানুপুঙ্খ-ভাবে লক্ষ্য করেন। এক কথায় মানবজাতির সামাজিক জীবনের গঠন-প্রণালীকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে ব্যাখ্যা করা ও অনুশীলন করাকে বলা হয় সমাজ-বিজ্ঞান।

মানুষের সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করবার প্রবণতা রয়েছে বলে সে একটি সমাজের সৃষ্টি করে। সেই সমাজের মধ্যে থাকে সংস্থা (Organisation), প্রতিষ্ঠান (Institution), জনসংখ্যা, স্থান ও কালের প্রভাব এবং সর্বোপরি মানবজাতির জীবনধারণের প্রচেষ্টা। জনসংখ্যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় প্রতিটি মানুষ—স্ত্রী ও পুরুষ। সমাজ-বিজ্ঞানীরা এই সমাজেরই বৈজ্ঞানিক অনুশীলন করেন—কিভাবে একে অপরকে জীবন-ধারণের জন্যে পারস্পরিক সহযোগিতা করছে। সুতরাং সমাজ-বিজ্ঞানকে সংযোগ-সাধনকারী বা শ্রেণীবদ্ধকারী বিজ্ঞান বলা যেতে পারে, যা মানবগোষ্ঠীর বিভিন্ন ধারা ও আকৃতিকে অনুশীলন করে তাথেকে কি সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, তা মানবগোষ্ঠীর সামনেই তুলে ধরে এক নতুন মতবাদ ও প্রকল্পের সৃষ্টি করে। সমাজ-বিজ্ঞান সমাজের মত জটিল জিনিষের বিভিন্ন তথ্য লোকসমক্ষে প্রকাশিত করে, যা না করলে সমাজের সংস্কারসাধন সম্ভব নয়। সমাজ-বিজ্ঞানের মতবাদ ও তথ্যের উপর ভিত্তি করেই কাজ করেন সমাজ-সংস্কারক, সমাজসেবী ও কল্যাণব্রতী পরিকল্পক (Welfare-planners)।

সমাজ-বিজ্ঞানের পাঠের যে সব ক্ষেত্র আছে, তা হলো 1) সংবাদ জ্ঞাপন ও জনমত, 2) অপরাধ-বিজ্ঞান, 3) গণ-আকৃতি (Demography), 4) পরিবার, 5) শ্রমশিল্প সংক্রান্ত সমাজবিজ্ঞান, 6) চিকিৎসাবিদ্যা বিষয়ক সমাজ-বিজ্ঞান, 7) সামাজিক অনুসন্ধানের রীতিতত্ত্ব,

8) পেশা সংক্রান্ত সমাজ-বিজ্ঞান, 9) রাজনৈতিক সমাজ-বিজ্ঞান, 10) জাতিগত সম্পর্ক, 11) গ্রামীণ সমাজ-বিজ্ঞান, 12) সামাজিক বিশৃঙ্খলা, 13) সামাজিক মনস্তত্ত্ব, 14) সামাজিক স্তরবিন্যাস, 15) সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ, 16) শিল্পকলার সমাজ-বিজ্ঞান, 17) জটিল সংস্থার সমাজ-বিজ্ঞান, 18) শিক্ষার সমাজ-বিজ্ঞান, 19) আইনের সমাজ-বিজ্ঞান, 20) ধর্মের সমাজ-বিজ্ঞান, 21) ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর সমাজ-বিজ্ঞান প্রভৃতি।

উপরিউক্ত অংশগুলিতে যে কেবল সমাজ-বিজ্ঞানের একচেটিয়া অধিকার আছে তাই নয়, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যেও এগুলির কিছু কিছু অন্তর্ভুক্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ সংবাদ জ্ঞাপন ও জনমত বিভাগটি মনোবিজ্ঞান, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান ও পুলিশ-বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাছাড়া সমাজ-বিজ্ঞানের শিক্ষার ক্ষেত্র মনোবিজ্ঞান ও নৃ-বিজ্ঞানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হওয়ায় এদের মধ্যে সীমারেখা টানা খুব কঠিন।

সমাজ-বিজ্ঞানের কাজ কি ?

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এর প্রধান কাজ হিসাবে বিবেচিত। সমাজের কৃত্রিম পরিবর্তনের জন্যে এর দায়িত্ব খুব বেশী। এর অন্যতম প্রধান আর একটি কাজ হলো, বৃহত্তর মানবজাতির কল্যাণ-সাধনের জন্যে সমাজকে রক্ষা করা। সেই জন্যে সমাজে নিয়ত যে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে, তা অনুশীলন করে—সেই পরিবর্তন কেন হচ্ছে, এবং তার গতিই বা কোন্ দিকে ও তার ফলাফলই বা কি, তা নির্দেশ করা এর অন্যতম প্রধান কর্তব্য। সমাজ-বিজ্ঞান সেই সামাজিক প্রক্রিয়ারই অনুসন্ধান করে, যা কোনও নতুন প্রতিষ্ঠানের জন্ম দেয় বা পুনর্গঠনের সাহায্য করে অথবা সমাজের বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করে। এই অনুসন্ধানের উপর ভিত্তি করেই সৃষ্টি হয় সামাজিক প্রকল্প বা সামাজিক নীতি। মানবজাতির বাস্তব জীবন সম্পর্কে অনুশীলন করে এবং তার বিভিন্ন সমস্যাবলী সম্পর্কে আলোকপাত করে বলেই এই বিজ্ঞানের নাম বাস্তব-বিজ্ঞান। রসায়ন, পদার্থবিদ্যার অনুশীলনের ক্ষেত্র যেমন পরীক্ষাগার এবং পরীক্ষাগারের যন্ত্রপাতি, সমাজ-বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারও সেই রকম মানবসমাজ এবং বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী হলো তার বিভিন্ন যন্ত্রপাতি।

বিশুদ্ধ সমাজ-বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক সমাজ-বিজ্ঞান

প্রতিটি বিজ্ঞানেরই যেমন দুটি দিক থাকে—একটি বিশুদ্ধ দিক ও অপরটি ব্যবহারিক দিক, সমাজ-বিজ্ঞানেরও সেই রকম দুটি দিক আছে। বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের অর্থ হলো জ্ঞানের অনুসন্ধান। এই জ্ঞানের বাস্তব ব্যবহারের দিকে খুব বেশী নজর দেওয়া হয় না। বাস্তব-বিজ্ঞান হলো মানুষের দৈনন্দিন বা বাস্তব জীবনের ব্যবহারিক সমস্যা দূরীকরণের জন্যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অনুসন্ধান। একজন সমাজ-বিজ্ঞানী যখন বস্তী-বাসীদের সামাজিক গঠন সম্পর্কে শিক্ষালাভ করেন, তিনি তখন হলেন বিশুদ্ধ সমাজ-বিজ্ঞানী আর যখন তিনি শিক্ষালাভ করেন—কিভাবে বস্তীবাসীদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা দূর করা যায়, তখন তিনি হলেন প্রযুক্তি সমাজ-বিজ্ঞানী।

সমাজ-বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য যেহেতু বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর কল্যাণসাধনের উপায় স্থির করা, প্রযুক্তি সমাজ-বিজ্ঞানের দায়িত্ব সেই জন্যে খুব বেশী। প্রযুক্তি সমাজ-বিজ্ঞানের প্রধান কাজ সমাজের পুনর্গঠন।

ব্যবহারিক সমাজ-বিজ্ঞানের কাজের ক্ষেত্র দেশ থেকে দেশে, সমাজ থেকে সমাজে, সংস্কৃতি থেকে সংস্কৃতিতে তফাৎ হয়। কোনও এক দেশের সামাজিক সমস্যা অন্য দেশ থেকে

তফাৎ হয় বা কোনও একটি বিশেষ সময়ে দেশের সামাজিক সমস্যা অন্য দেশের সেই সময়ের সামাজিক সমস্যা নাও হতে পারে। কিন্তু এর মধ্যে কতকগুলি সামাজিক সমস্যা আছে, যা সমস্ত দেশেই এক; যেমন—যুদ্ধের পরে দেশে দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি হয়ে যে সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হয়, তা সমস্ত দেশের ক্ষেত্রেই এক।

প্রযুক্তি সমাজ-বিজ্ঞানে সামাজিক সমস্যাকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—(1) সামাজিক বিশৃঙ্খলার সমস্যা, (2) সামাজিক পুনর্গঠনের সমস্যা। প্রথম শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হয় বিপথ-গামীদের সমস্যা, অপরাধপ্রবণতা, অনাথা, মানসিক বিপর্যয়, অন্ধ, বিকৃত মস্তিষ্ক ও পঙ্গু সমস্যা। এইখানে কাজের জন্যে যে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত, তা হলো উপশমকারী, আরোগ্য-কারী ও পুনর্বসতিকারী; অর্থাৎ এমন কিছু করতে হবে, যা গরীবকে করবে সাহায্য, পঙ্গু বা অন্ধদের দেবে শিক্ষা, অপরাধীদের করবে মানসিক পুনর্গঠন। সুতরাং এই পদ্ধতিটিতে রক্ষাকারী অপেক্ষা আরোগ্যকারীর ভূমিকা অনেক বেশী।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হয় শিশু, যুবা, নারী ও শ্রমিকের উন্নতিসাধন, গৃহ-সমস্যার সমাধান, শিক্ষা-সমস্যার সমাধান প্রভৃতি। এই সব ক্ষেত্রে রক্ষাকারী ও গঠনকারীর ভূমিকাকে অবলম্বন করা হয় আর এক্ষেত্রে যে সব মানুষের দিকে নজর দেওয়া হয়, তারা সকলেই স্বাভাবিক কিন্তু দুর্বল।

আগে আমাদের দেশে ব্যবহারিক সমাজ-বিজ্ঞানের দিকে খুব বেশী নজর দেওয়া হয় নি। বর্তমানে গত কয়েক বছরের মধ্যে কিছু কিছু সংস্থা এদিকে বিশেষভাবে নজর দিয়েছেন, যথা দিল্লীতে Council for Social Development ও Delhi School of Social Work, বম্বেতে Tata Institute of Social Science, কলিকাতায় ও আমেদাবাদে Indian Institute of Business Management, কলিকাতায় Statistical Institute, হায়দরাবাদে National Institut of Community Development, পাটনাতে Anugraha Narayan Sinha Institute of Social Science, আগ্রাতে Institute of Social Science, মেদিনীপুরে Institute of Social Science & Applied Anthropology প্রভৃতি। এছাড়াও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতাত্ত্বিক নৃতত্ত্ব বিভাগ ও ভারত সরকারের Anthropological Survey of India-র সমাজতাত্ত্বিক নৃতত্ত্ব বিভাগ প্রযুক্তি সমাজ-বিজ্ঞানের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করেছেন।

কিন্তু আমাদের দেশের সাধারণ নাগরিক এখন পর্যন্ত তার সামাজিক সিদ্ধান্তের জন্যে সমাজতাত্ত্বিক জ্ঞানের উপর নির্ভর করেন না বা আশ্রয়গ্রহণ করেন না। যদি উপরিউক্ত সংস্থাসমূহ প্রযুক্তি সমাজ-বিজ্ঞানের দিকে যথেষ্ট দৃষ্টিপাত করেন ও জাতি হিসেবে আমরা আমাদের সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্যে সামাজিক নীতির আশ্রয় গ্রহণ করি, তবে আমাদের অসংখ্য সমস্যাজর্জরিত সমাজকে ভবিষ্যতে আমরা অনেকাংশে সমস্যামুক্ত করতে সক্ষম হবো।

সমাজসেবামূলক কাজ

অনেকে সমাজসেবামূলক কাজকে ও প্রযুক্তি সমাজ-বিজ্ঞানকে এক শ্রেণীভুক্ত করেন। দুটিরই উদ্দেশ্যে যদিও এক, পদ্ধতি কিন্তু ভিন্ন। সমাজ সেবার প্রধান লক্ষ্য হলো সামাজিক কাজের সঙ্গে সহযোগিতা করা, তা বিশ্লেষণ করে কোনও নীতি বা পদ্ধতি নির্ধারণ নয়। বরং সমাজসেবীরা তাঁদের কাজের সুবিধার জন্যে সমাজ-বিজ্ঞানের পদ্ধতি বা বিশ্লেষণের সহায়তা নিতে পারেন,

কিন্তু তাঁরা কোন প্রকল্প বা মতবাদ দিতে পারেন না। সমাজসেবাকে সমাজ-বিজ্ঞানের এক অঙ্গ হিসেবে ধরা যেতে পারে।

জনপ্রিয় সমাজ-বিজ্ঞান

আমাদের দেশে যে সব জনপ্রিয় পত্র-পত্রিকা আছে, তাতে অনেক সময় অনেক লেখকের সমাজতাত্ত্বিক বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা দেখতে পাওয়া যায়। এই সব রচনার মধ্যে অধিকাংশ রচনাই হলো অপরাধতত্ত্ব, পারিবারিক জীবন, যৌনসংক্রান্ত সমস্যা, শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্যা, সামাজিক শ্রেণীবৈষম্য প্রভৃতি বিষয়ে। অনেক-সময় এই সকল রচনা সমাজ-বিজ্ঞানীদের কাছে খুব মূল্যবান হয়ে ওঠে। সেগুলি থেকে তাঁরা বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা সম্পর্কে অনেক সূত্রের সন্ধান পান, যা তাঁদের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

বিভিন্ন ভূমিকায় সমাজ-বিজ্ঞানী

মানবসমাজে বিজ্ঞানীর দায়িত্ব খুব বেশী, সেই-জন্যে ভূমিকাও তাঁর খুব গুরুত্বপূর্ণ। সমাজ-বিজ্ঞানীর ভূমিকা একদিকে যেমন সমাজতত্ত্বের বিজ্ঞানী হিসাবে বা কলাকুশলী ব্যক্তি (Technician) হিসাবে, তেমন নাগরিক হিসাবে তাঁর ভূমিকা হলো সমাজের সভ্য হিসাবে। প্রতিটি ভূমিকাই একে অন্য থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হলেও সমাজ-বিজ্ঞানীকে প্রতিটি ভূমিকাই অবলম্বন করতে হবে।

বৈজ্ঞানিক হিসাবে সমাজ-বিজ্ঞানী

বৈজ্ঞানিক হিসাবে সমাজ-বিজ্ঞানীর প্রাথমিক কর্তব্য হলো সমাজ ও মানবমন থেকে অমূলক, অযৌক্তিক ধারণা ও কুসংস্কারের আবর্জনা বুদ্ধিমত্তা দিয়ে পরিষ্কার করা। এই সকল আবর্জনাস্বরূপ চিন্তাধারা আমাদের সামাজিক উন্নতির ব্যাঘাত-স্বরূপ। সমাজ-বিজ্ঞানীরা এই ভাবে আমাদের সাহায্য করতে পারেন—বংশগতি, জাতিগত পার্থক্য প্রভৃতি সম্পর্কে যে অমূলক ধারণা আমাদের মধ্যে আছে, তার খবর দিতে।

সমাজতাত্ত্বিক ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে

বিজ্ঞানী হিসাবে সমাজ-বিজ্ঞানীর অন্যতম আর এক কর্তব্য হলো, সামাজিক নীতি নির্দেশের মাধ্যমে সমাজতাত্ত্বিক ভবিষ্যদ্বাণী তৈরি করা। উন্নয়নশীল দেশসমূহ, বিশেষতঃ পাশ্চাত্যদেশসমূহের বড় বড় কর্মস্থানসমূহ ও আইনসংস্থাসমূহ সমাজ-বিজ্ঞানীর সামাজিক নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে। প্রতিটি বড় বড় নীতিরই সমাজের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সংগঠন সম্পর্কে কতকগুলি সিদ্ধান্ত থাকে। উদাহরণস্বরূপ, যখন এক আইন প্রণয়নকারী ব্যবস্থাপক বলেন যে, 'বিদ্যালয়গুলিকে তাদের বর্তমান উপার্জনের অর্থ থেকে কাজ করতে হবে', আইন প্রণয়নকারী তখন এই ধারণা করে নেন যে, বর্তমান বিদ্যালয়গুলির তহবিল যথেষ্ট—শিশুদের সমাজের জন্যে তৈরি করবার পক্ষেও এই তহবিলের উপর নির্ভর করেই তাকে আরও পঁচিশ বা তিরিশ বছর জীবন কাটাতে হবে। কিন্তু সেই একই আইন প্রণয়নকারী যখন বলেন যে, 'আমরা আমাদের বিদ্যালয়ের তহবিল যথেষ্ট বাড়াবো' তখন তিনি আগের মন্তব্য থেকে ঠিক বিপরীত মন্তব্যই পেশ করলেন। এই ভাবে প্রতিটি নীতি-নির্দেশযুক্ত রায়ের মধ্যেই এক অনুমিত সিদ্ধান্ত তৈরি করা থাকে, যা ভবিষ্যতের সমাজ সম্পর্কে আলোকপাত করে। শুধু তাই নয়, এই ভবিষ্যদ্বাণী আমাদের সামাজিক যোজনার ধারা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে, যার মধ্যে আমাদের পরবর্তী দুই বা তিন বংশকে বসবাস করতে হবে।

সমাজতাত্ত্বিক ভবিষ্যদ্বাণী কোনও বিশেষ নীতির সম্ভাব্য ফলাফল সম্পর্কেও আমাদের আলোকপাত করে। প্রতিটি সামাজিক নীতির

সিদ্ধান্তই হলো এক-একটি ভবিষ্যদ্বাণী। আমাদের সমাজ এখনও সমাজ-বিজ্ঞানীকে সামাজিক নীতি নির্ধারক বিষয়ের কারিগরী বিশেষজ্ঞের পদমর্যাদা দেয় নি, যা দেওয়া হয়েছে পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে। সেখানে কোনও কোনও অঞ্চলে, বিশেষতঃ অপরাধতত্ত্ব ও জাতিগতসম্পর্ক বিষয়ে সমাজ-বিজ্ঞানীর উপসংহারের উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। সমাজ-বিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীদের রায়ের উপর নির্ভর করে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বিচারালয়কে (Supreme Court) নিয়ম করতে হয়েছিল যে, স্বতন্ত্রীকৃত বিদ্যালয়গুলি সহজাতভাবে অসমান (Segregated schools are inherently unequal)। তাছাড়া আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের Desegregation movement-এর বর্তমান রণকৌশল সমাজ-বিজ্ঞানীর ভবিষ্যদ্বাণীর উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল এবং সেই আন্দোলন অনেকাংশে সফল হয়েছে।

ব্যক্তি ও নাগরিক হিসাবে সমাজ-বিজ্ঞানী

বিজ্ঞানী হিসাবে সমাজ-বিজ্ঞানীর কর্তব্য সামাজিক নীতি তৈরি করা। ব্যক্তি ও নাগরিক হিসাবে সমাজ-বিজ্ঞানীর কর্তব্য হলো সমাজে তার মূল্য ও স্বীকৃতি দেওয়া এবং সেই নীতি পালন করা ও অপরকে দিয়ে পালন করানো। ব্যক্তি হিসাবে তার প্রাথমিক কর্তব্য হলো এই সব সামাজিক নীতির কর্মক্ষমতা (Workability) ও কাম্যতাকে (Desirability) বাড়িয়ে তোলা ও উদ্দীপিত করা।

নাগরিক হিসাবে সমাজ-বিজ্ঞানীর কর্তব্য হলো সমাজে যে সব কু-জিনিষ ঘটছে, তার কারণ খোঁজবার কাজে পৃষ্ঠপোষকতা করা, সামাজিক সংস্কার ও উন্নতির কাজে সহায়তা করা ও কোনও ভাল কাজের সামাজিক মূল্যকে উপলব্ধি করা।

সমাজ-বিজ্ঞানী যখন বিজ্ঞানীর ভূমিকা অবলম্বন করেন, তখন তিনি বলতে পারবেন না যে, সিনেমা বা থিয়েটারে হিংসাত্মক ছবি শিশুদের পক্ষে ক্ষতিকারক কি না, কিন্তু পিতা হিসাবে তিনি তাঁর নিজস্ব মতামত বলতে পারবেন যে, এই সব ছবি শিশুমনে কি রকম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে। বিজ্ঞানী হিসেবে সমাজ-বিজ্ঞানী হয়তো এমন এক সামাজিক নীতির বিশ্লেষণ করতে পারেন, যা হয়তো বিবাহ-বিচ্ছেদের হারকে কমাতে পারবে বা ঐ সম্পর্কিত অনেক সমস্যা দূরীকরণে সাহায্য করবে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক হিসাবে তিনি কখনই সুপারিশ করতে পারবেন না যে, কোনও এক বিশেষ পাত্র বা পাত্রীকে কি রকম সমাজের পাত্র বা পাত্রী পছন্দ করলে বিবাহ-বিচ্ছেদ সমস্যার উদ্ভব হবে না, যা নাগরিক হিসাবে তার পক্ষে বলা খুব সহজ। বিজ্ঞানী হিসাবে সমাজ-বিজ্ঞানী হয়তো দেখাতে পারেন যে, অতিরিক্ত ওষুধ সেবন ও মদ্যপান সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। কিন্তু সমাজের নাগরিক ও সভ্য হিসাবে সমাজ-বিজ্ঞানীর কর্তব্য হলো, এই নীতির অর্থ মানব-সমাজে বুঝিয়ে দেওয়া।

এই জন্যে তিনি অর্ধ-জনপ্রিয় প্রবন্ধ বা তথ্য-মূলক চলচ্চিত্র, রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতির আশ্রয় নিতে পারেন। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই সমাজ-বিজ্ঞানীকে এমন ভূমিকা অবলম্বন করতে হবে, যাতে তিনি সামাজিক নীতির মূল্যের ব্যাঘাত না ঘটিয়ে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সমাজ-বিজ্ঞানী ও উৎসুক নাগরিক হতে পারেন। সমাজ-বিজ্ঞানীর এই উভয় ভূমিকা অবলম্বনের ফলে হয়তো সমাজে এমন দিন আসবে, যখন সমাজের জন্যে সমাজ-বিজ্ঞানী যে সামাজিক নীতিকে সর্বাপেক্ষা ভাল মনে করবেন, সেই সামাজিক নীতিই সমাজের পক্ষে সর্বাধিক শুভ ও মঙ্গলময় বলে বিবেচিত হবে।

কলাকুশলী ব্যক্তি হিসাবে সমাজ-বিজ্ঞানী

সমাজ-বিজ্ঞানীরা যখন কোন দেশের সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে নিযুক্ত থাকেন, তখন

তাঁদের প্রধান ভূমিকা হলো প্রযুক্তি সমাজ-বিজ্ঞানী হিসাবে। এই প্রযুক্তি সমাজ-বিজ্ঞানীর তখন সবচেয়ে বড় কাজ হলো, সামাজিক নীতির মূল্যকে কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করা। উদাহরণস্বরূপ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের যেমন কর্তব্য জ্ঞানানুসন্ধানের মাধ্যমে সত্যানুসন্ধান ও সত্যকে শিক্ষা দেওয়া আর বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিগরের কর্তব্য হলো অধ্যাপক বা গবেষকের আগ্রহ ও আদর্শকে মেনে চলা ও সেবা করা। তাঁর বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক বিজ্ঞানের যে তথ্য বা আলো তাঁকে দিয়েছেন, তিনি নিশ্চয়ই তার মূল্যের অপব্যয় করবেন না বরং তার সদ্ব্যবহার করে তার যথার্থ স্বীকৃতি দেবেন। ঠিক সেই রকম সমাজ-বিজ্ঞানী যখন প্রযুক্তি সমাজ-বিজ্ঞানীর ভূমিকা অবলম্বন করবেন, তখন তিনি কলাকুশলী ব্যক্তি, সমাজ-বিজ্ঞানীকৃত সামাজিক নীতি বা প্রকল্পকে হাতে-কলমে কাজে পরিণত করে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার সমাধান করবেন।

আমাদের দেশে এতদিন পর্যন্ত সমাজ-বিজ্ঞানের উপর খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয় নি, যা করা হয়েছে পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে। তবে গত কয়েক বছরের মধ্যে আমাদের দেশে সমাজ-বিজ্ঞানের উন্নতির দিকে নজর দেওয়া হয়েছে ও ভবিষ্যতে হয়তো আরও দেওয়া হবে। সমাজ কোনও দিনই সম্পূর্ণ সমস্যামুক্ত হতে পারে না, সমাজ থাকলেই সমস্যাও থাকবে। তবে আমাদের লক্ষ্য হলো—কম সমস্যাজর্জরিত সমাজ, যা অধিক সংখ্যক সমাজভুক্ত মানুষকে দেবে সুখ, সম্পদ ও শান্তি। আমাদের দেশে সমাজ-বিজ্ঞানের উন্নতির দিকে যে নজর দেওয়া হয়েছে, তা যদি আরও বৃদ্ধি পায়, তা হলে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশসমূহের মত আমরাও একদিন সমানতালে পা ফেলে উন্নতির পথে এগিয়ে যাব।

"......বিজ্ঞান যাহাতে দেশের সর্বসাধারণের নিকট সুগম হয় সে উপায় অবলম্বন করিতে হইলে একেবারে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার গোড়াপত্তন করিয়া দিতে হয়।..... যাহারা বিজ্ঞানের মর্যাদা বোঝে না তাহারা বিজ্ঞানের জন্য টাকা দিবে, এমন অলৌকিক সম্ভাবনার পথ চাহিয়া বসিয়া থাকা নিষ্ফল। আপাতত মাতৃভাষার সাহায্যে সমস্ত বাংলা দেশকে বিজ্ঞানচর্চায় দীক্ষিত করা আবশ্যক। তাহা হইলেই বিজ্ঞান সভা সার্থক হইবে।"

রবীন্দ্রনাথ

ভারতীয় নৃ-বিজ্ঞানের পথিকৃৎ—রায়বাহাদুর শরৎচন্দ্র রায়

রেবতীমোহন সরকার*

ভারতীয় নৃ-বিজ্ঞানের ইতিহাসে শরৎচন্দ্র রায় একটি উল্লেখযোগ্য নাম। নৃ-বিজ্ঞানের সাধনায় ইনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। ভারতীয় নৃ-বিজ্ঞান তাঁর ঐকান্তিক গবেষণা, মনন ও বিশ্লেষণের ফলে নবরূপ লাভে সক্ষম হয়েছিল। দেশ-বিদেশের নৃ-বিজ্ঞানীমহলে শরৎচন্দ্র রায় ছিলেন একজন জ্ঞানতপস্বী। এই বছরই তাঁর জন্ম-শতবার্ষিকী। এই প্রসঙ্গে দেশবন্দিত এই নৃ বিজ্ঞানীর কর্মজীবন সম্বন্ধে দু চার কথার অবতারণা করে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে প্রয়াসী হয়েছি।

শরৎচন্দ্র রায়ের জন্ম 1871 খৃষ্টাব্দের 4ঠা নভেম্বর। তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা কলকাতায়। সিটি কলেজিয়েট স্কুল থেকে 1888 খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা এবং 1892 খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন জেনারেল অ্যাসেমব্লি ইনস্টিটিউট (বর্তমানে স্কটিশ চার্চ কলেজ) থেকে ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে বি. এ. পাশ করেন। তারপর ইংরেজীতে এম. এ. ও পরে বি. এল. পাশ করবার পর তিনি আইন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। 1897 খৃষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র রায় আলিপুরে চব্বিশ পরগণা ডিষ্ট্রিক্ট কোর্টে ওকালতি সুরু করেন, কিন্তু এক বছর পরেই রাঁচির উদ্দেশ্যে পাড়ি দেন এবং ওখানে Judicial Commissioner's Court-এ যোগদান করে অল্পদিনের মধ্যেই নিজেকে আইন ব্যবসায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। শহর হিসেবে তখনকার রাঁচি খুব ছোট ছিল। শহরের চারদিকে ওরাওঁ, মুণ্ডা, বিরহোর প্রভৃতি আদিবাসী সম্প্রদায় ছড়িয়ে ছিল। এই শহরে শরৎচন্দ্র রায় অচিরেই একজন প্রথিতযশা উকিল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

কিন্তু তিনি যে সব সময়ে কেবল আইনের ব্যাপারেই নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন অথবা তাঁর দৃষ্টি আদালত প্রাঙ্গণের চার দেয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, তা নয়। তাঁর দৃষ্টি ছিল উদার, মানুষের প্রতি, বিশেষ করে নিপীড়িত জনগণের উপর তাঁর ছিল সহৃদয় সমবেদনা। মানুষের প্রতি তাঁর এই অকৃত্রিম ভালবাসা, মায়া-মমতাই তাঁকে নৃ-বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। সুপ্রতিষ্ঠ আইনব্যবসায়ী আস্তে আস্তে হয়ে পড়লেন প্রকৃত নৃ-বিজ্ঞানী। ভারতীয় বিজ্ঞান সাধনার ইতিহাসে এটি নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়।

প্রথম থেকেই রাঁচি শহরের সন্নিকটে বসবাসকারী উপজাতি গোষ্ঠীর উপর বহিরাগতদের অত্যাচার ও অনাচারের প্রতি শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল। তিনি দেখলেন এই সব অবহেলিত মানবগোষ্ঠী ঠিকমত বিচার পায় না এবং তার মুখ্য কারণ শাসন ও বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের উক্ত জনগোষ্ঠীর সামাজিক জীবনযাত্রা ও রীতি-নীতি সম্পর্কে অজ্ঞতা। বিদেশী শাসকগোষ্ঠী স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয় উপজাতি সমাজ সম্পর্কে যথাযোগ্য আলোকপ্রাপ্ত হয় নি। ফলে আইনের প্রয়োগ ও বিচার সংক্রান্ত বিষয়ে বহুবিধ সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল। অপর দিকে দেশীয় শিক্ষিত সমাজেরও এই সব উপজাতি গোষ্ঠীর প্রকৃত জীবন-দর্শনের রহস্য উদ্ঘাটনের প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ ছিল না। একমাত্র শরৎচন্দ্র রায়ই আবির্ভূত

* নৃতত্ত্ব বিভাগ, বঙ্গবাসী কলেজ, কলিকাতা।

হলেন প্রত্যক্ষ ব্যতিক্রম হিসেবে। ছোটনাগপুর মালভূমির বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে মুণ্ডা উপজাতির সমাজ, ধর্ম, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার এবং ভাষা প্রভৃতি বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে অনুসন্ধানের জন্যে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর গড়িয়ে চললো, শরৎচন্দ্র একাগ্রচিত্তে সংগ্রহ করে চলেছেন তাঁর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের উপকরণ। অবশেষে 1912 খৃষ্টাব্দে তাঁর অক্লান্ত কর্মপ্রচেষ্টা রূপলাভ করলো 'The Mundas and their country' নামক পুস্তকে। এটিকে কেবলমাত্র পুস্তক বললে এর যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয় না। এটি হলো তদানীন্তন নৃ-বিজ্ঞান পঠন ও গবেষণার ক্ষেত্রে একটি মূর্তিমান বিপ্লব। শরৎচন্দ্রের পূর্বে খৃষ্টান ধর্মপ্রচারকেরা ছোটনাগপুরের উপজাতিদের জীবনের কোন কোন অংশে আলোকপাত করেছিলেন বটে, কিন্তু শরৎচন্দ্রই প্রথম বিশুদ্ধ নৃ-বিজ্ঞানের ভিত্তিতে বৃহদাকারে উপজাতি জীবন ইতিহাস পর্যালোচনা করেছিলেন। তাই শরৎচন্দ্র রায় ভারতীয় নৃ-বিজ্ঞানের পথ-প্রদর্শক। 1912 খৃষ্টাব্দ থেকে 1937 খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাঁর লিখিত ছয়খানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। ছোটনাগপুরের মুণ্ডা, বিরহোর, ওরাওঁ, খাড়িয়া এবং উড়িষ্যার পার্বত্য অঞ্চলের ভুঁইয়াদের জীবনযাত্রা প্রণালীর প্রত্যক্ষ বিবরণ এগুলিতে লিপিবদ্ধ হয়।

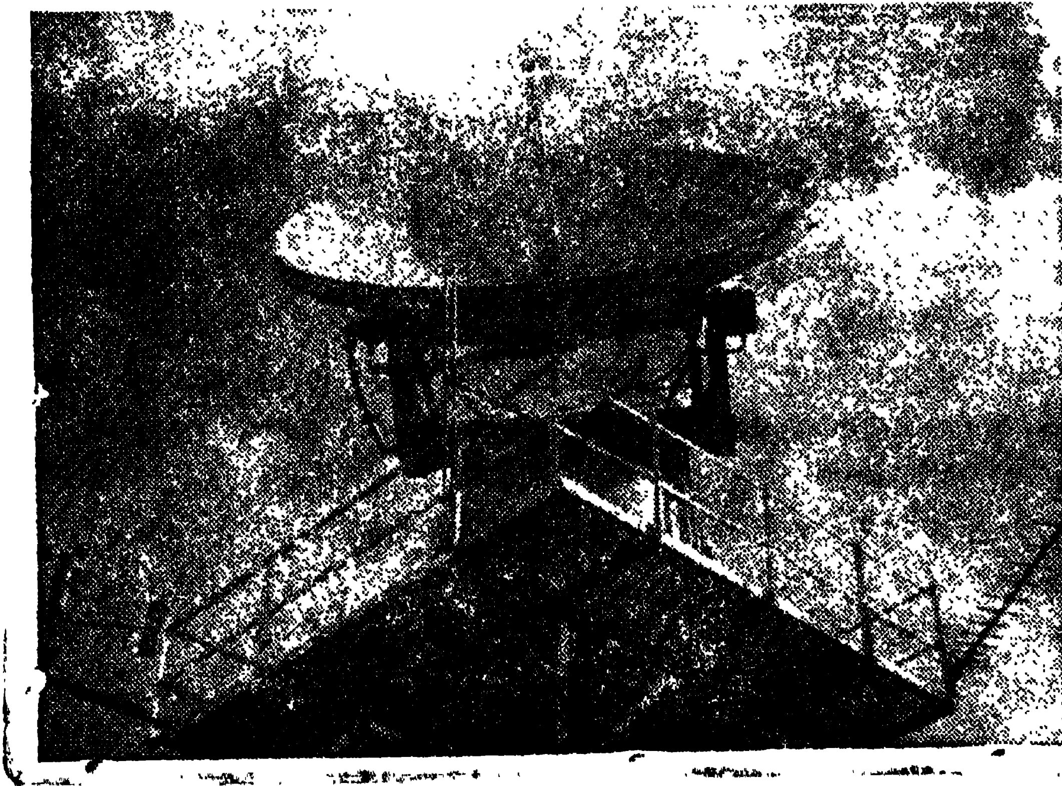
শরৎচন্দ্র প্রথম থেকেই চেষ্টা করেন, যাতে এই সব উপজাতি সম্প্রদায় শাসকগোষ্ঠীর যথাযোগ্য দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়—বিচারের বিধান যেন এদের বিচিত্র জীবনাদর্শের মূলে কুঠারাঘাত না করে।

শরৎচন্দ্র ছিলেন প্রকৃত অনুসন্ধানী। লোকগাথা, গীতিকা, ধর্ম, যাদুবিদ্যা, কুসংস্কার প্রভৃতির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ কি ভাবে অনুসন্ধানীকে জ্ঞানরাজ্যের মুক্তাঙ্গনে পৌঁছে দেয়—শরৎচন্দ্র তা দেখিয়েছেন। ছোটনাগপুরের মুণ্ডা উপজাতির সৃষ্টিতত্ত্বের বিশ্লেষণ কেমনভাবে তাঁকে সুদূর প্রাগৈতিহাসিক যুগের এক স্তম্ভিত জনজীবনের ধারার উৎসমুখ খুলে দিয়েছিল, সে কথা তিনি তাঁর জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধে প্রকাশ করেছেন। তাঁর দৃষ্টি ছিল সুদূরপ্রসারী। ভারতে নৃতত্ত্বের উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা তিনি বহু পূর্বেই বিদ্বৎসমাজে উপস্থাপিত করেছিলেন। 1920 খৃষ্টাব্দে তিনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শারীরিক নৃ-বিজ্ঞানে বক্তৃতা (Readership lectures) দেবার জন্যে আমন্ত্রিত হন। সেই বক্তৃতামালার শিরোনাম ছিল 'Principles and Methods of Physical Anthropology। নৃ-বিজ্ঞানের এই বিশেষ শাখাটিরও প্রতি শরৎচন্দ্রের জ্ঞানের পরিধি তদানীন্তন নৃ-বিজ্ঞানীদের চমকিত করেছিল। প্রখ্যাত শারীরিক নৃ-বিজ্ঞানী Sir Arthur Keith বলেছেন—"The lectures form one of the best introductions into the study of anthropology in the English language"। যাহোক শরৎচন্দ্র যেখানেই বক্তৃতাদান করেছেন, সেখানেই নৃ-বিজ্ঞানের উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা বলেছেন। সেই সঙ্গে বিজ্ঞানের এই শাখাটির প্রতি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গের নির্লিপ্ততার কথা উল্লেখ করে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীর জীবনযাত্রা প্রণালীর বিবরণ ছাড়াও শরৎচন্দ্র লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়ে মৌলিক অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। 1921 খৃষ্টাব্দে তিনি 'Man in India' নামে একটি ত্রৈমাসিক ইংরেজী পত্রিকার প্রকাশ সুরু করেন। তাঁর নিজস্ব সম্পাদনায় এটিতে নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব এবং লোকসংস্কৃতির বহুবিধ রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। গর্বের বিষয় এই যে, সেই 'Man in India' পত্রিকাটি আজ ভারত এবং ভারতের বাইরে একটি আদর্শ পত্রিকা হিসেবে পরিগণিত হয়ে চলেছে। ভারতীয় লোকসংস্কৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ

এবং মূল্যবান অনুসন্ধানের জন্যে লণ্ডনের লোকসংস্কৃতি পরিষদ (Folklore Society of London) শরৎচন্দ্রকে 1920 খৃষ্টাব্দে একজন সম্মানিত সভ্য হিসেবে মনোনীত করে। তখনকার দিনে তিনিই প্রথম ভারতীয়, যিনি এই দুর্লভ সম্মানলাভে সক্ষম হয়েছিলেন। ঐ বছরেই তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব শাখায় বিভাগীয় সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। পরে 1932 ও 1933 খৃষ্টাব্দে তিনি All India Oriental Conference-এর নৃতত্ত্ব ও লোকসংস্কৃতি বিভাগের সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন। সভাপতির ভাষণে তিনি নৃতত্ত্ব ও লোকসংস্কৃতির গবেষকদের মৌলিক গবেষণার প্রতি দৃষ্টিদানে এবং ভারতের সমাজ-জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে, প্রতিটি চিন্তাধারায় নৃতত্ত্ব ও লোকসংস্কৃতির যে রত্নরাজি লুকিয়ে আছে, তার উদ্ধারকার্যে অনুসন্ধানীদের ব্রতী হবার জন্যে আহ্বান করেছিলেন। আজকের নৃতত্ত্ব ও লোকসংস্কৃতির পঠন-পাঠন এবং গবেষণা যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছে বললে অত্যুক্তি হয় না এবং দিনে দিনে এর পরিধি বেড়েই চলেছে। শরৎচন্দ্রের জীবনকালে কেবলমাত্র একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) নৃতত্ত্বের পঠন-পাঠন সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু আজ ভারতের 16/17টি বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ত্বের পঠন-পাঠন প্রসারলাভ করেছে এবং ভারতীয় ভিত্তিভূমির প্রতি নৃ-বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। সুতরাং শরৎচন্দ্রের সেই উদাত্ত আহ্বান উপেক্ষিত হয় নি এবং ভারতীয় ভিত্তিভূমির উপর নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের প্রতিষ্ঠার বিষয়টি সাদরেই গৃহীত হয়েছে। শরৎচন্দ্রের দূরদৃষ্টি, জনজীবনের বিভিন্ন আচার-ব্যবহারের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এবং প্রচুর কর্মক্ষমতা পৃথিবীর বিজ্ঞানীমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রখ্যাত নৃ-বিজ্ঞানী এবং ভারততত্ত্ববিদ্ জে. এইচ. হাটন শরৎচন্দ্রকে "ভারতীয় মানবজাতি তত্ত্বের জনক" (Father of Indian Ethnology) বলে অভিহিত করেছিলেন। তাছাড়াও শরৎচন্দ্র 'International Congress of the Anthropological and Ethnological Sciences'-এর কার্যকরী সমিতির সভ্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁর সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক রচনাবলীর জন্যে তদানীন্তন ভারত সরকার তাঁকে 1913 খৃষ্টাব্দে 'কাইজার-ই-হিন্দ' রৌপ্যপদক এবং 1919 খৃষ্টাব্দে 'রায়বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করেন।

মৃত্যুর আট বছর আগে শরৎচন্দ্র আইন-ব্যবসায় থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাই বলে তিনি তাঁর নৃতাত্ত্বিক গবেষণার ক্ষেত্র থেকে বিদায় নেন নি বরং অবসর জীবনেই তিনি পুরোপুরিভাবে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছিলন। তাঁর রাঁচিস্থিত চার্চ রোডের বাড়ীতে 'Man in India' গ্রন্থাগারটি দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পুস্তক এবং পত্র-পত্রিকায় সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে এবং 'Man in India' পত্রিকাটিও ভারতের জনমানসের জীবনযাত্রার বিভিন্ন দিকের প্রতি আলোক সম্পাত করে। শরৎচন্দ্র ভারতের মানুষকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন—ভারতীয় আবহাওয়া, রীতি-নীতি, কর্মপদ্ধতিতে গড়ে উঠা মানুষের অন্তরে তিনি প্রবেশলাভে সক্ষম হয়েছিলেন। নিপীড়িত মানুষের হতাশা আর দীর্ঘশ্বাস শরৎচন্দ্রকে বিচলিত করেছিল। অসহায় নিরক্ষর মানুষের প্রতি তদানীন্তন জমিদার এবং মহাজনদের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, তাঁর কর্মপদ্ধতির মধ্যে। তাঁর আইন-ব্যবসায়ে প্রধানতম লক্ষ্যই ছিল, দরিদ্র এবং হতভাগ্য মানুষদের যথাসম্ভব সাহায্য করা, তাদের প্রাপ্য অধিকার লাভে তাদের সচেতন করা। তাই শরৎচন্দ্র যে কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক ছিলেন তাই নয়, তিনি ছিলেন প্রকৃত মানবদরদী। মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নায় তাঁর অন্তর আলোড়িত হতো গভীরভাবে এবং সেই আলোড়নই তাঁকে

নৃ-বিজ্ঞানীতে পরিণত করেছিল। মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসাই তাঁকে করেছিল মানব-বিজ্ঞানী। শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে লণ্ডনের 'Nature' পত্রিকা (28th October, 1939) সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করেছিল—"The dry light of pure science and disintegrated research was kept ablaze (in India) by a small band of devoted ethnologists among whom the veteran anthropologist, Sarat Chandra Roy will ever be held in honour."



প্লেসি টাইপ আবহ-রেডার

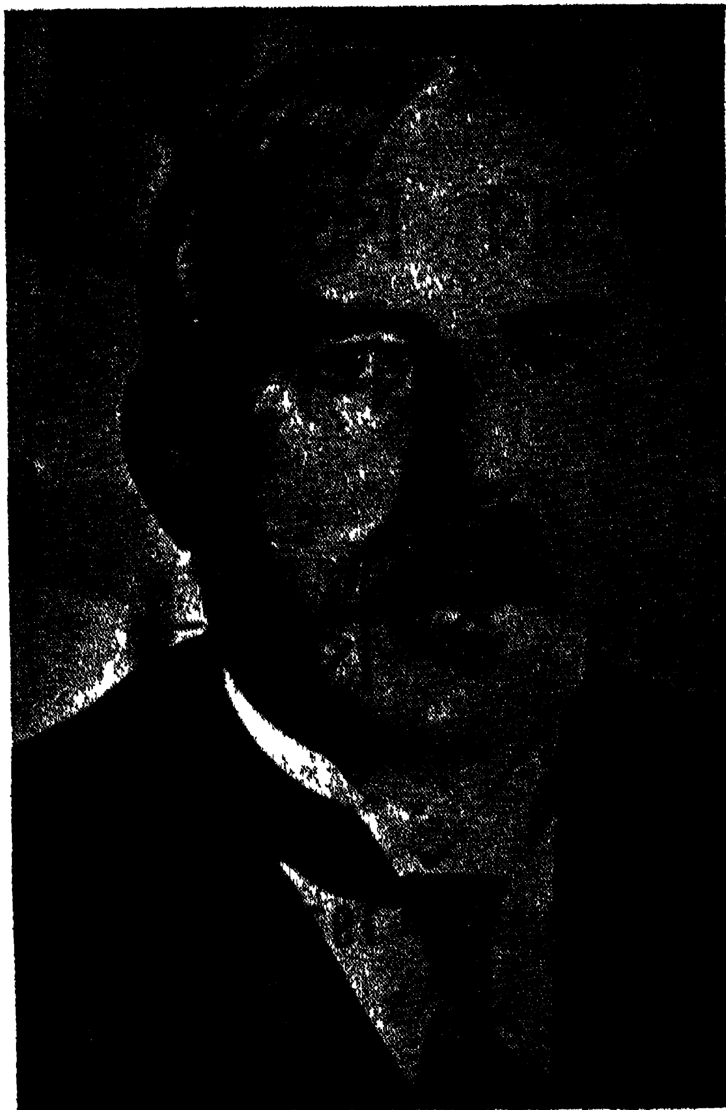
বিশেষ যান্ত্রিক কৌশলে স্থাপিত এই প্লেসি টাইপ আবহ-রেডারে বৃষ্টিবিন্দুর শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে সংখ্যার আকারে চৌম্বক ফিতার উপর অঙ্কিত হয়ে যায়। ইংল্যাণ্ডে এই রেডারের সাহায্যে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নির্ধারণ করে জলাধারসমূহ নিয়ন্ত্রণ করবার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

নভেম্বর — 1971

চতুর্বিংশ বর্ষ — একাদশ সংখ্যা



লর্ড আর্নেস্ট রাদারফোর্ড

জন্ম: 30শে অগাষ্ট, 1871　　　মৃত্যু: 19শে অক্টোবর, 1937

লর্ড আর্নেষ্ট রাদারফোর্ড

1937 সালে ইংল্যাণ্ডে অদ্ভুত শিরোনামের একটি বই প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানী মহলে সাড়া পড়ে যায়। বইটির নাম The Newer Alchemy এবং তার রচয়িতার নাম আর্নেষ্ট রাদারফোর্ড (Ernest Rutherford)। বইটির শিরোনামে স্বভাবতই মনে হতে পারে, বইটি বুঝি মধ্য যুগের কোন অ্যালকেমিষ্টের কাজের আধুনিক প্রতিবেদন। কিন্তু আসলে তা নয়, কারণ বইটি যিনি লিখেছেন তিনি হচ্ছেন আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যতম পথিকৃৎ লর্ড আর্নেষ্ট রাদারফোর্ড এবং বইটির প্রতিপাদ্য বিষয় তাঁর নিজেরই কাজ সম্পর্কে। তবে বইটির এই অদ্ভুত শিরোনাম কেন? মধ্যযুগের অ্যালকেমিষ্টদের কাজের সঙ্গে রাদারফোর্ডের নিজস্ব গবেষণার কি কোন সম্পর্ক আছে? অ্যালকেমিষ্টরা তো লোহা, সীসা ও অন্যান্য নিকৃষ্ট ধাতুকে মহামূল্য সোনায় রূপান্তরের স্বপ্ন দেখেছিল ও তার উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করেছিল এবং তাদের সে চেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। রাদারফোর্ড সে পথে চালিত হন নি, কিন্তু তিনি তাঁর সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও নিজস্ব গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার ফলে যে স্বর্ণ-পথের সন্ধান পান, তা হলো স্বয়ং প্রকৃতিই হচ্ছেন সবচেয়ে বড় অ্যালকেমিষ্ট। প্রকৃতির ভাণ্ডারের ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম ধাতু স্বতঃভাঙনের ফলে রূপান্তরিত হয় রেডিয়াম, পলোনিয়াম ইত্যাদি নূতনতর ও লঘুতর মৌলে। এই নতুন তেজস্ক্রিয় মৌলগুলি আবার ধীরে ধীরে আপনা-আপনি ভেঙে গিয়ে ক্রমশঃ আরও লঘুতর মৌলে পরিণত হয় এবং শেষ অবধি সোনায় নয়—স্থায়ী সীসায় রূপান্তরিত হয়ে এই স্বতঃভাঙন পালার পরিসমাপ্তি ঘটে।

রাদারফোর্ড যে পথের সন্ধান দিলেন, সে পথ ধরে আধুনিক বিজ্ঞান এক মৌলকে অন্য মৌলে রূপান্তরের চাবিকাঠি খুঁজে পেয়েছে। তাই রাদারফোর্ডের এই বইয়ের নামকরণ সার্থক। এখন রাদারফোর্ড ও তাঁর কাজ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

আজ থেকে এক-শ' বছর আগে 1871 সালের 30শে অগাষ্ট নিউজিল্যাণ্ডের দক্ষিণ দ্বীপের নেলসন শহরে আর্নেষ্ট রাদারফোর্ডের জন্ম। তিনি ছিলেন এক স্কটিশ কৃষিজীবী পরিবারের দ্বাদশ সন্তান-সন্ততির মধ্যে চতুর্থ। তাঁদের পরিবার নিউজিল্যাণ্ডে সর্বপ্রথম আসেন 1842 সালে। আর্নেস্টের মা-বাবা নিজেরা শিক্ষার বিশেষ সুযোগ না পেলেও বহু আত্মত্যাগ করে তাঁদের এই বুদ্ধিদীপ্ত সন্তানটিকে শিক্ষালাভের সবরকম সুযোগ করে দেন। এই সন্তানটিকে ঘিরে তাঁদের মনে যে উচ্চাশা জেগেছিল, আর্নেস্ট তা পুরোপুরি পূর্ণ করেন। ছাত্রজীবনে প্রথমাবধি তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দেন এবং ল্যাটিন, ফরাসী ও ইংরেজি সাহিত্য, ইতিহাস এবং পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও গণিতশাস্ত্রে পারদর্শিতার জন্যে নানা পুরস্কার ও বৃত্তিলাভ করেন। 1889 সালে নেলসন কলেজ

থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করে তিনি নিউজিল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার দ্বিতীয় বর্ষ থেকে পদার্থ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়।

নিউজিল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ দু-বছরে রাদারফোর্ড হার্ৎজের তড়িৎ-চৌম্বক বা বেতার-তরঙ্গ সংক্রান্ত গবেষণার দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। উচ্চ কম্পনাঙ্কের বিদ্যুৎক্ষরণের সাহায্যে লোহার চুম্বকীকরণ সম্পর্কে তিনি প্রথমে কিছু মৌলিক গবেষণা করেন। এই গবেষণার ফলে তিনি বেতার-তরঙ্গ সনাক্তীকরণের একরকম চৌম্বক ডিটেক্টর (Detector) উদ্ভাবন করেন। এই সময় সুদূর ইংল্যাণ্ডে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষানীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের ফলে রাদারফোর্ডের জীবনের মোড় ঘুরে যায়।

1851 সালের প্রদর্শনীর উদ্বৃত্ত অর্থে গঠিত তহবিল থেকে এতদিন বৃটিশ কমনওয়েলথভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিশেষ কৃতী ছাত্রদের শিক্ষাবৃত্তি দেওয়া হতো। 1895 সালে তহবিল কমিটি এই নিয়ম পরিবর্তন করে বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে দু-বছরকাল পঠন-পাঠনের সুযোগ করে দেন। একই সঙ্গে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিভাবান স্নাতক ছাত্রদের অনুমোদিত গবেষণা সম্পূর্ণ করে ডিগ্রী লাভের পথ সর্বপ্রথম উন্মুক্ত করে দিলেন। যেসব প্রতিভাবান ছাত্র এই সুযোগে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাভেণ্ডিশ বীক্ষণাগারে গবেষণায় প্রবেশাধিকার লাভ করেন, রাদারফোর্ড ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

ক্যাভেণ্ডিশ বীক্ষণাগারে রাদারফোর্ড প্রথমে তাঁর উদ্ভাবিত বেতার-তরঙ্গ নির্ণায়ক যন্ত্রের পরিধি সম্প্রসারণ সংক্রান্ত গবেষণায় সাফল্য অর্জন করেন। এই সময় অর্থাৎ 1895 সালের শেষদিকে এক্স-রশ্মির আবিষ্কার বিজ্ঞান-জগতে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করে। পদার্থ-বিজ্ঞানী সার জে. জে. টমসন (J. J. Thomson) গ্যাসের উপর এক্স-রশ্মির প্রতিক্রিয়া অনুধাবনের জন্যে রাদারফোর্ডকে তাঁর সহযোগী হতে আহ্বান জানালেন। রাদারফোর্ড তাঁর নিজস্ব কাজ ছেড়ে টমসনের সঙ্গে গবেষণায় যোগ দেন। তাঁদের যুগ্ম গবেষণার সার্থক পরিণতি ঘটলো গ্যাসের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ-শক্তি পরিচালন সংক্রান্ত টমসনের গবেষণার সম্পূর্ণতায় এবং 1897 সালে বস্তুর বৈদ্যুতিক গঠনের ঘোষণায়।

মাত্র দু-বছরের মধ্যে রণ্টগেন, বেকেরেল এবং টমসনের চমকপ্রদ দ্রুত আবিষ্কারের ফলে নানা নতুন প্রশ্নের উদ্ভব হলো—যার সদুত্তর খুঁজে পাবার জন্যে বহু বিজ্ঞানী গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। বেকেরেলের অদ্ভুত ও রহস্যময় বিকিরণকে রাদারফোর্ড তাঁর গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিলেন। তিনি দেখলেন, ইউরেনিয়াম থেকে যে বিকিরণ নির্গত হয়, তা এক্স-রশ্মির মত গ্যাসকে আয়নিত করে। তিনি আরও দেখলেন, গ্যাসের মধ্যে এই রশ্মির ভেদশক্তি গ্যাসের ঘনত্বের ব্যস্তানুপাতিক।

1898 সালে জে. জে. টমসন যখন ক্যানাডার মন্টিলে ম্যাক্‌গিল বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ-বিজ্ঞানের সদ্যোসৃষ্ট গবেষণা-অধ্যাপকের পদে যোগদানের জন্যে রাদারফোর্ডকে আহ্বান জানালেন, তখন রাদারফোর্ড অনিচ্ছার সঙ্গে ক্যানাডায় গেলেন। কিন্তু নতুন পদ গ্রহণ করবার অল্পকাল পরেই তিনি তাঁর যুগান্তকারী আবিষ্কারের প্রথমটি সম্পাদন করেন। বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক শক্তির প্রভাবে বেকেরেল রশ্মির ভেদশক্তি ও আপেক্ষিক বিক্ষেপণ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে তিনি ঘোষণা করলেন, এই বিকিরণ অন্ততঃ দু-ধরণের রশ্মি দিয়ে গঠিত। এক ধরণের রশ্মি, যা মোটা কাগজ ভেদ করে যেতে পারে না, তাদের বলা হলো আল্‌ফা রশ্মি। আর এক ধরণের রশ্মি, যা পাত্‌লা অ্যালুমিনিয়াম পাতের দ্বারা রোধ করা যায়, তাদের বলা হলো বিটা রশ্মি। পরবর্তী কালে দেখা গেল, এই বিটা রশ্মি উচ্চশক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রন কণিকা ছাড়া আর কিছুই নয় এবং আল্‌ফা রশ্মি উচ্চশক্তিবিশিষ্ট হিলিয়াম পরমাণু। তেজস্ক্রিয় বিকিরণকালে তৃতীয় আর একটি কণিকারও সন্ধান পাওয়া গেল, যা উচ্চশক্তির এক্স-রশ্মির অনুরূপ এবং তার নামকরণ হলো গামা রশ্মি।

ফ্রেডারিক সডির (Frederick Soddy) সহযোগে দু-বছর ব্যাপক গবেষণার পর রাদারফোর্ড জোরের সঙ্গে ঘোষণা করলেন, বেকেরেল আবিষ্কৃত তেজস্ক্রিয়ার ঘটনাকে স্বতঃভাঙনের ফলে এক রাসায়নিক মৌলের অন্য মৌলে রূপান্তর হিসাবেই শুধু ব্যাখ্যা করা যায়। প্রকৃতির এখানে-সেখানে কোন অস্থায়ী মৌলের লক্ষ পরমাণুর মধ্যে একটি পরমাণু হঠাৎ ভেঙে গিয়ে একটি আল্‌ফা বা বিটা কণিকা নির্গত করে সম্পূর্ণ নতুন এক পরমাণুতে পরিণত হয়।

1907 সালে রাদারফোর্ড ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করে ইংল্যাণ্ডে ফিরে আসেন এবং সেখানে প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয়া সম্পর্কে তাঁর গবেষণা চালিয়ে যান। 1908 সালে তিনি এবং তাঁর সহযোগী হানস্ গাইগার (Hans Geiger) পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ কণিকার সনাক্তীকরণ ও পরিমাপের একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। এই সময় রাদারফোর্ডকে তাঁর তেজস্ক্রিয়া সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার জন্যে রসায়নশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। যদিও রাদারফোর্ড ছিলেন পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক, তাঁকে রসায়নশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার দেওয়ায় কোন অসঙ্গতি ঘটে নি। কারণ তেজস্ক্রিয়া বিষয়টি পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র উভয় ক্ষেত্রের সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত।

জে. জে. টমসনের আর একজন কৃতী ছাত্র সি. টি. আর. উইলসন (C. T. R. Wilson) মেঘ প্রকোষ্ঠ নামে একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন, যার সাহায্যে পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ কণিকার পদরেখার আলোকচিত্র গ্রহণ করা যায়। এই পদ্ধতির সাহায্যে রাদারফোর্ড লক্ষ্য করলেন, অতিসূক্ষ্ম সোনার পাতের মধ্য দিয়ে বেশীর ভাগ আল্‌ফা কণিকা বিনা

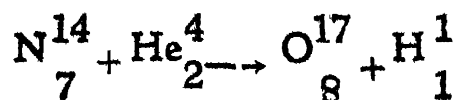
বিচ্যুতিতে বেরিয়ে আসে। সেই সঙ্গে তিনি আরও লক্ষ্য করলেন যে, দু-একটা আল্‌ফা কণিকা কিন্তু সোনার পাতের মধ্য দিয়ে আসবার সময় বেশ কিছুটা বিচ্যুত হয়।

পরমাণু গঠনের কোন প্রচলিত তত্ত্ব দিয়ে এই ঘটনার ব্যাখ্যা করা গেল না। উচ্চ শক্তিসম্পন্ন আল্‌ফা কণিকার এই আচরণ একমাত্র এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, তারা কোন অতিক্ষুদ্র অথচ কঠিন পদার্থকে আঘাত করেছে বা তার কাছাকাছি এসেছে।

1911 সালে রাদারফোর্ড তাঁর পরমাণু-কেন্দ্রীন সংক্রান্ত তত্ত্ব প্রকাশ করেন। তিনি বললেন, পরমাণুর কেন্দ্রে আছে ধনাত্মক বিদ্যুৎ-আধান বিশিষ্ট কণিকা, যার মধ্যে পরমাণুর ভরের প্রায় 99% ভাগ সন্নিবিষ্ট এবং তার চারপাশে আছে সমপরিমাণ বিপরীত বিদ্যুৎ-আধানের পরিবেশ। কেন্দ্রে অবস্থিত ধনাত্মক আধানের এই কণিকার তিনি নামকরণ করলেন প্রোটন। রাদারফোর্ড বললেন, পরমাণুর মধ্যে প্রোটনগুলি একত্রে দল বেঁধে থাকে, একে বলে পরমাণুর কেন্দ্রীন বা নিউক্লিয়াস (Nucleus)। পরমাণু যত ভারী নিউক্লিয়াসও তত ভারী, আল্‌ফা কণিকাকে ধাক্কা দেবার ক্ষমতাও তত বেশী।

আল্‌ফা কণিকার বিক্ষেপণ পরীক্ষা থেকে রাদারফোর্ড সিদ্ধান্ত করলেন, প্রোটন পিণ্ডটি পরমাণুর কেন্দ্রীনে অবস্থিত, বিপরীত বিদ্যুৎ-আধানের কণিকা ইলেকট্রনগুলি এই কেন্দ্রীনের চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহগুলি যেমন ঘুরে বেড়ায়, অনেকটা সেই রকম। পরমাণুর গঠনের এই চিত্র অবলম্বন করে নীলস্ বোর (Niels Bohr) হাইড্রোজেন আলোর বর্ণালীর বিশেষত্ব মীমাংসা করে দিলেন। তখনই হলো বোর-রাদারফোর্ডের কেন্দ্রীন পরমাণু মতবাদের (Theory of nuclear atom) অবিসংবাদী জয়। আধুনিক আবিষ্কারের আলোকে এই মতবাদ আরও সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

1919 সালে রাদারফোর্ড তাঁর যুগান্তকারী আবিষ্কার—পরমাণু-কেন্দ্রীনকে ভাঙবার উপায় উদ্ভাবন করেন। আল্‌ফা কণিকা দিয়ে নাইট্রোজেন গ্যাসকে আঘাত করে তিনি দেখতে পেলেন, জিঙ্ক সালফাইড পর্দার উপর কিছু উজ্জ্বল উদ্ভাসন দেখা যাচ্ছে। যেহেতু নাইট্রোজেন গ্যাস বা আল্‌ফা কণিকা নিজেরা এই উদ্ভাসন সৃষ্টি করতে পারে না, সেহেতু রাদারফোর্ড এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, আল্‌ফা কণিকা দিয়ে নাইট্রোজেন পরমাণুকে আঘাতের ফলে একটি আহিত হাইড্রোজেন পরমাণু বা প্রোটনের সৃষ্টি হয়েছে এবং পর্দার উপর উদ্ভাসন এই প্রোটনজনিত। নাইট্রোজেন ও আল্‌ফা কণিকার সংঘাতের ফলাফল সংক্ষেপে এভাবে লেখা যায়:



$$N^{14}_{7} + He^{4}_{2} \rightarrow O^{17}_{8} + H^{1}_{1}$$

N মানে নাইট্রোজেন পরমাণু। He হলো আল্ফা কণিকা, যা হিলিয়াম কেন্দ্রীনের সমান। O মানে অক্সিজেন, আর H হলো হাইড্রোজেন।

আল্ফা কণিকা দিয়ে আঘাতের পর অতি সূক্ষ্ম পরিমাণ হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের সন্ধান রাদারফোর্ড তাঁর ব্যবহৃত নাইট্রোজেন গ্যাসের মধ্যে পেয়েছিলেন। রাদারফোর্ডের এই পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হলো, মানুষ প্রকৃতিতে পাওয়া এক মৌলকে অন্য এক মৌলে রূপান্তরিত করতে পারে। মৌলান্তরীকরণের চাবিকাঠি রাদারফোর্ড তুলে দিলেন বিজ্ঞানীদের হাতে। আধুনিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো।

1919 সালে সার জে. জে. টমসন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাভেণ্ডিশ লেবরেটরীর অধ্যক্ষের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করবার পর রাদারফোর্ড সেই পদে যোগদান করেন। সেখানে বিশেষ কৃতিত্ব ও যোগ্যতার সঙ্গে তিনি গবেষণা পরিচালন করেন। সারা বিশ্ব থেকে বহু প্রতিভাবান ছাত্র এসে তাঁর অধীনে গবেষণা করে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁদের মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়ার পিটার ক্যাপিৎজা (Peter Kapitza) এবং জেমস স্যাডউইকের (James Chadwick) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 1932 সালে স্যাডউইড বিদ্যুৎবিহীন তৃতীয় মৌলিক কণা নিউট্রন আবিষ্কার করেন। স্যাডউইকের এই আবিষ্কার পরমাণু-কেন্দ্রীন বিজ্ঞানে যুগান্তর এনেছে। রাদারফোর্ড যেমন আল্ফা কণিকাকে পরমাণু চূর্ণ করবার অস্ত্ররূপে প্রয়োগ করেছিলেন, বর্তমানে নিউট্রনকে সেইভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

দেশ-বিদেশ থেকে নানা সম্মান লাভের পর 1937 সালের 19শে অক্টোবর রাদারফোর্ড আকস্মিকভাবে পরলোকগমন করেন। 1938 সালের গোড়ায় কলকাতা মহানগরীতে আয়োজিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের রজত জয়ন্তী অধিবেশনে তাঁর সভাপতিত্ব করবার কথা ছিল, কিন্তু অধিবেশনের আগেই তাঁর তিরোধান ঘটে। আজ রাদারফোর্ডের জন্মশতবার্ষিকীতে বিজ্ঞানে তাঁর অমূল্য অবদানের কথা আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়*

* দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং; কলিকাতা-29

পারদর্শিতার পরীক্ষা

নীচে পদার্থবিদ্যা সম্পর্কিত 5টি প্রশ্ন দেওয়া গেল। উত্তর দেবার সময় 5 মিনিট। তোমাদের মধ্যে যে 5টি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে, পদার্থবিদ্যায় তার জ্ঞান খুবই ভাল। 4, 3, 2 ও 1টি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে পদার্থবিদ্যায় জ্ঞান যথাক্রমে ভাল, সাধারণ ভাল, কম ও খুব কম। কেউ যদি একটিও প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারে, তাহলে পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে তার পড়াশুনা করা প্রয়োজন।

1. ধরা যাক, 1000 কিলোগ্র্যাম ওজনের কোন কৃত্রিম উপগ্রহ ভূপৃষ্ঠের ঊর্ধ্বে 1000 কিলোমিটার উপরে থেকে (ভূকেন্দ্র থেকে উপগ্রহের দূরত্ব প্রায় 7400 কি. মি.) বৃত্তাকার পথে পৃথিবীর চতুর্দিকে আবর্তন করছে। তুমি কোন উপায়ে মাত্র 1 মিলিগ্র্যাম ইলেকট্রন সংগ্রহ করে ভূকেন্দ্রে রাখলে এবং অনুরূপ 1 মিলিগ্র্যাম ইলেকট্রন কোনক্রমে কৃত্রিম উপগ্রহে রেখে দেওয়া হলো। একটি ইলেকট্রনের ভর $9{\cdot}1 \times 10^{-28}$ গ্র্যাম এবং তার আধান $-4{\cdot}8 \times 10^{-10}$ (ইলেকট্রোস্ট্যাটিক একক)। সম আধানযুক্ত ইলেট্রনসমূহ বিকর্ষণ করবে। ভূকেন্দ্রস্থিত ইলেকট্রনসমূহ সম্মিলিতভাবে কৃত্রিম উপগ্রহস্থিত ইলেকট্রন-সমূহের উপর যে বিকর্ষণ বল প্রয়োগ করবে তার পরিমাণ পৃথিবী এবং কৃত্রিম উপগ্রহের মধ্যে মাধ্যাকর্ষণ বল (এক্ষেত্রে অভিকর্ষজ বল) অপেক্ষা বেশী, না কম? পৃথিবীর ভর $5{\cdot}976 \times 10^{27}$ গ্র্যাম।

2. সূর্যের আলোকময় বহিরাবরণ বা ফটোস্ফিয়ারের ব্যাস 1,390,000 কিলো-মিটার এবং পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব 150,000,000 কিলোমিটার। চন্দ্রের ব্যাস 3480 কিলোমিটার এবং ভূপৃষ্ঠ থেকে চন্দ্রের দূরত্ব পরিবর্তনশীল। চন্দ্র ভূপৃষ্ঠ থেকে 399,000 কিলোমিটার থেকে 357,000 কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থান করে। সূর্যগ্রহণের সময় চন্দ্রের দূরত্ব কিরূপ থাকলে বলয়গ্রাস সূর্যগ্রহণ হওয়া সম্ভব?

3. একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় 16 গ্র্যাম অক্সিজেন গ্যাসের আয়তন V_1 সি. সি. এবং চাপ প্রতি বর্গ সেন্টিমিটার P_1 ডাইন। সেই তাপমাত্রায় 32 গ্র্যাম অক্সিজেন গ্যাসের চাপ 4 P_1 ডাইন (প্রতি বর্গ সে. মি. তে) হলে আয়তন কত হবে?

4. একটি লম্বা লোহার রডের একপ্রান্তে কোন শব্দের সৃষ্টি করা হলো। আমরা জানি শব্দ-তরঙ্গ বিভিন্ন মাধ্যম দিয়ে বিভিন্ন গতিতে গমন করে। তুমি যদি লোহার রডের অন্য প্রান্তে কান পেতে থাক, তাহলে তুমি শব্দটি আগে শুনবে, না তোমার পাশে দাঁড়ানো কোন বন্ধু বাতাসের মাধ্যমে শব্দটি আগে শুনবে?

5. 5 কিলোগ্রাম এবং 10 কিলোগ্রাম ভরবিশিষ্ট দুটি গোলক একটি সরল রাবার সূত্রের দ্বারা আবদ্ধ আছে। গোলক দুটিকে দু-দিকে টেনে ছেড়ে দেওয়া হলো। কোন্ গোলকটির উপর অধিক বল ক্রিয়া করবে?

(উত্তর—689 পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত ও জয়ন্ত বসু*

* সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স; কলিকাতা—9

অপরাধী নির্ণয়ে যান্ত্রিক ব্যবস্থা

সন্দেহভাজন ব্যক্তি প্রকৃতই অপরাধী কিনা, জানবার জন্যে শান্তিরক্ষকেরা নানা-প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকেন। কিন্তু তাতেই যে সর্বক্ষেত্রে সন্দেহভাজন ব্যক্তির অপরাধ প্রমাণিত হয়—এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু প্রকৃতই অপরাধী কিনা অথবা দুষ্কার্য অনুষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই অপরাধীকে ধরে ফেলবার জন্যে আজকাল বিশেষ বিশেষ যান্ত্রিক ও রাসায়নিক কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছে। এসব যান্ত্রিক ব্যবস্থা শান্তিরক্ষকদের কাজে বিশেষ সহায়ক হয়েছে বলে জানা গেছে। এই রকমের কয়েকটি ব্যবস্থার কথা এস্থলে আলোচনা করবো।

পলিগ্রাফ বা লাই-ডিটেক্টর—বিদেশে অপরাধ তদন্তের কাজে পুলিশ বিভাগে এটি বহুল ব্যবহৃত হয়। অপরাধ তদন্তের কাজে আমাদের দেশেও এর প্রচলন হয়েছে। সন্দেহভাজন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে সত্য গোপন করছে কিনা, এই যন্ত্রের সাহায্যে তা বোঝা যায়। এই যন্ত্রটি ছোট্ট একটি সুটকেসের মধ্যে থাকে। এই কাজে শিক্ষাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি যন্ত্রটি পরিচালনা করেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে যে কোন ব্যক্তির শ্বাস-প্রশ্বাসের ধরণ, রক্তের চাপ, নাড়ীর গতি এবং সামান্য বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে তার সমগ্র শরীরের প্রতিক্রিয়া সূক্ষ্মভাবে অনুধাবন করা যায়। এর সাহায্যে যে কোনও ব্যক্তির মানসিক বৈলক্ষণ্য বা অনুভূতির তারতম্য লক্ষ্য করা যায়—যাতে বোঝা যায়, সে সজ্ঞানে বা ইচ্ছাকৃতভাবে সত্য গোপন করবার জন্যে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করবার চেষ্টা করছে কিনা। যন্ত্রে তার সেই মানসিক অস্থিরতা ধরা পড়ে, যন্ত্র-সংলগ্ন একটি সূক্ষ্ম পিনের সাহায্যে কাগজের উপর অঙ্কিত রেখাচিত্রের পর্যালোচনা করে।

প্রক্সিমিটি ডিটেক্টর—এই যন্ত্রের সাহায্যে 6 ফুট নাগালের মধ্যে কোন কিছুর গতিবিধির খবর জানা যায়। কোনও ব্যক্তি বা বস্তু প্রহরাধীন বা সংরক্ষিত এলাকার মধ্যে

এসে পড়লে বৈদ্যুতিক কৌশলে যন্ত্রের পাগলা ঘন্টি বেজে ওঠে। ফলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সাবধান হবার সুযোগ পাওয়া যায়। যেখানে দুষ্প্রাপ্য বা মূল্যবান দলিলপত্র পাহারা দেবার দরকার, সেখানে এই যন্ত্রের উপযোগিতা অসামান্য।

গোয়েন্দা ঘণ্টি—আজকাল বড় বড় দোকান বা বাজারে খদ্দেরের ভিড়ে বিক্রেতার ব্যস্ততার সুযোগে হাত সাফাই, চুরি বা চোরাই মাল পাচার করা খুবই সাধারণ ব্যাপার—বিশেষ করে পূজা, ঈদ, বড়দিন প্রভৃতি উৎসব উপলক্ষ্যে যখন স্বভাবতঃই লোকের ভিড় ও ব্যস্ততা বেড়ে যায় এবং বিক্রেতা হয়ে পড়ে অন্যমনস্ক।

এই ধরণের দুষ্কার্যকারীদের হাতেনাতে ধরবার জন্যে সম্প্রতি এক প্রকার বৈদ্যুতিক যন্ত্রের (গোয়েন্দা ঘন্টি) প্রচলন হয়েছে।

দুষ্কৃতকারী অথবা তার দলের লোকদের ফাঁদে ফেলবার উদ্দেশ্যে কোন দামী জিনিষ তাদের হাতের নাগালের মধ্যে ইচ্ছা করেই অসাবধানে রেখে দেওয়া হয়, যাতে দুষ্কৃতকারী নিজের হাতে সেটি সরাবার সুযোগ পায়। ফলে, মাল সরাতে গেলেই গোপন গোয়েন্দা ঘন্টি বেজে ওঠে আর চোরও হাতেনাতে ধরা পড়ে যায়।

কিন্তু এই কৌশলের একটা অসুবিধা এই যে, ঘন্টি বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই দুষ্কৃতকারীর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হচ্ছে—বামাল হাত থেকে ফেলে দেওয়া। সে ক্ষেত্রে অন্য বহু নিরাপরাধ খদ্দেরের উপস্থিতিতে প্রকৃত দুষ্কৃতকারীকে গুলিয়ে ফেলাই স্বাভাবিক।

এই অসুবিধা দূর করবার জন্যে টোপ হিসাবে মালের গায়ে মাখিয়ে দেওয়া হয় সিলভার নাইট্রেট। এর পর দরকার শুধু এক বোতল ফটোগ্রাফিক ডেভেলপার ও খানিকটা তুলার। ডেভেলপার প্রয়োগ করা হয় সন্দেহজনক লোকটির হাতে। সেই লোক প্রকৃত অপরাধী হলে তার হাত অবিলম্বে কালো হয়ে যাবে।

সিলভার নাইট্রেটের বদলে এর সহজতর বিকল্প হিসাবে সম্প্রতি ব্যবহৃত হচ্ছে আরেক ধরণের স্বচ্ছ বা অদৃশ্য পাউডার, যার নাম ফেনলপ্‌থেলিন (Phenolpthaline) পাউডার। এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—এই পাউডারের সংস্রবে আসা বস্তুমাত্রই জলে ডোবালে জল ও বস্তুটি উভয়ের রং-ই লাল হয়ে যায়। এই সুবিধার জন্যে আজকাল ছদ্মবেশী গোপন দুষ্কৃতকারীর অপরাধের তদন্তে এর প্রচলন হয়েছে। ঘুষের টোপ দিয়ে ফাঁদ পেতে ঘুষ-খাওয়া ব্যক্তিকে হাতেনাতে ধরবার জন্যে গোপন ব্যবস্থামত উৎকোচ আদায়কারীর হাতে অভিযোগকারী বা সাক্ষীর মারফৎ তুলে দেওয়া হয় কারেন্সি নোট, যাতে মাখানো থাকে এই গুঁড়া। ফলে ঘুষের টাকা হাতে নেবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে হাতেনাতে ধরা পড়ে। প্রমাণটাও অকাট্য—জলে ডোবানো মাত্র নোট ও তার হাত উভয়েই লাল রঙে রঞ্জিত হয়ে যায়।

ম্যাগ্‌নোমিটার—অধুনা বিশেষ পরিচিত হাইজ্যাকিং, স্কাইজ্যাকিং অর্থাৎ বিমান দস্যুতার প্রতিবিধানে এই যন্ত্রের উপযোগীতা বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে।

এই যন্ত্রের সাহায্যে কোন সন্দেহজনক ব্যক্তি তার শরীর বা পরিচ্ছদের গোপন অংশে মারাত্মক অস্ত্রাদি লুকিয়ে রেখেছে কিনা, তা বোঝা যায়। বিশেষ করে বিমান ও বিমানযাত্রীদের নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে প্রতিটি যাত্রীর দেহ ও মালপত্রের ব্যাপক তল্লাশী দরকার। এই যন্ত্র সে কাজে খুব সাহায্য করতে পারে। কেন না, এই যন্ত্রের ধাতু-চেতনা খুব তীব্র—এর সন্ধানী চোখে সামান্যতম ধাতুর পক্ষেও গোপন থাকা সম্ভব নয়। জেলখানা বা অন্যান্য সংরক্ষিত অঞ্চলে নিরাপত্তার জন্যে অন্তর্ঘাতী ও নাশকতামূলক কার্য নিবারণে এই জাতীয় যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হয়েছে। কেবলমাত্র বিমান ঘাঁটিই নয়, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেও এই ধরণের যন্ত্রের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে।

জীমূতকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন 1. : ফটো-ইলেকট্রিক প্রক্রিয়া কি ?

শ্যামল দস্তিদার, পুরুলিয়া
কল্যাণ বসাক, কলিকাতা-6

প্রশ্ন 2. : খশিয়োরকর রোগ সম্পর্কে কিছু বলুন।

শ্যামসুন্দর হাজরা, কলিকাতা-6

উত্তর 1. : যে প্রক্রিয়ায় আলো থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া যায়, তাকে ফটো-ইলেকট্রিক প্রক্রিয়া বলা হয়। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, অনেক পদার্থ আছে, যাদের উপর আলোক রশ্মি আপতিত হলে পদার্থ থেকে ইলেকট্রন নির্গত হয়। নির্গত ইলেকট্রনের সংখ্যা আপতিত আলোকের তীব্রতার উপর নির্ভর করে। বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোক রশ্মি ব্যবহার করলে নির্গত ইলেকট্রনের শক্তিও পরিবর্তিত হয়ে থাকে। পরীক্ষায় আরো জানা যায় যে, এই জাতীয় প্রত্যেক পদার্থের বেলায় আপতিত আলোকের কম্পনাঙ্ক একটা নির্দিষ্ট মানের হয়ে থাকে—যাকে বলা হয় প্রারম্ভিক কম্পনাঙ্ক। নির্গত ইলেকট্রনের প্রবাহ পেতে হলে আপতিত আলোকের কম্পনাঙ্ক পদার্থের প্রারম্ভিক কম্পনাঙ্ক অপেক্ষা বেশী হতে হবে।

1905 সালে বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সাহায্যে এই প্রক্রিয়ার একটা গাণিতিক সূত্র বের করেন, যা বিজ্ঞানী মিলিকান 1912 সালে পরীক্ষার দ্বারা এর

যাথার্থ্যতা প্রমাণ করেন। এই প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করেই তৈরি হয়েছে বিভিন্ন রকমের ফটো-ইলেকট্রিক সেল, যার বহুল প্রয়োগ আজ সুবিদিত।

উত্তর 2. : খশিয়োরকর রোগটি প্রধানতঃ শিশুদের মধ্যেই দেখা যায়। শিশুদের দৈহিক পুষ্টি ও বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী। সাধারণতঃ শিশুদের খাদ্যে যদি প্রোটিনের পরিমাণ খুবই কমে যায়, তাহলে এই রোগটি দেখা দেয়। এই রোগে ক্ষুধামান্দ্য, দেহের ওজন হ্রাস, ঝিমিয়ে পড়া, উদরাময় ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। খশিয়োরকর রোগটির গুরুতর আক্রমণে অনেক সময় শিশুর মৃত্যু ঘটে।

সাধারণতঃ মাতার স্তন্যদুগ্ধের উপর নির্ভরতার সময় পেরিয়ে গেলে শিশুদের শস্যের মণ্ড খাওয়ানো হয়। এগুলির মধ্যে রয়েছে ভাতের মণ্ড, সাগুর মণ্ড, কাঁচকলার মণ্ড ইত্যাদি। মোটামুটিভাবে এক বছরের একটি শিশুর ক্ষেত্রে দৈনিক প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তা প্রায় 30 গ্র্যামের মত। মায়ের স্তন্যদুগ্ধ ও এই মণ্ড থেকে যে পরিমাণ প্রোটিন পাওয়া যায়, তা শিশুটির পক্ষে যথেষ্ট নয়। প্রোটিনবহুল খাদ্য হিসাবে শিশুটি যদি গরুর দুধ খায়, তবে এই দুধ থেকেই সে প্রয়োজনীয় প্রোটিন পেতে পারে। দুধ ছাড়াও আজকাল শিশুদের বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের মিশ্রণ খাওয়ানো হয়। এই উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের মিশ্রণ এমনভাবে তৈরি করা হয়, যা শিশুরা সহজেই হজম করতে পারে। উপরিউক্ত উদ্ভিজ্জ প্রোটিনগুলির মধ্যে রয়েছে ছোলা, তিলের গুঁড়া, কলার ময়দা, গুড়, ঈষ্ট, চীনাবাদাম ও তুলা বীজের খইল প্রভৃতি। এগুলি ছাড়াও মাখন-তোলা দুধের গুঁড়া নির্দিষ্ট মাত্রায় খাইয়ে খশিয়োরকর রোগে বিশেষ উপকার পাওয়া গেছে।

শ্যামসুন্দর দে*

* ইনস্টিটিউট অব রেডিও-ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স ; বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-9

উত্তর

(পারদর্শিতার পরীক্ষা)

1. যেহেতু একটি ইলেকট্রনের ভর $9{\cdot}1\times10^{-28}$ গ্রাম, 1 মিলিগ্রাম ($=10^{-3}$ গ্রাম) ইলেকট্রনের মধ্যে $\frac{10^{-3}}{9{\cdot}1\times10^{-28}}$ টি ইলেকট্রন আছে। প্রতিটি ইলেকট্রনের আধান $4{\cdot}8\times10^{-10}$ (ইলেকট্রোষ্ট্যাটিক একক বা E. S. U.)। 1 মিলিগ্রাম

ইলেকট্রনের আধান $=\frac{1}{9{\cdot}1}\times10^{25}\times4{\cdot}8\times10^{-10}=\frac{4{\cdot}8}{9{\cdot}1}\times10^{15}$ E. S. U.

R সে. মি. দূরত্বের ব্যবধানের 1 মিলিগ্রাম ইলেকট্রন রাখলে তাদের বিকর্ষণ বল

$$\frac{\left(\frac{4{\cdot}8}{9{\cdot}1}\times10^{15}\right)^2}{R^2}\approx\frac{2{\cdot}9\times10^{29}}{R^2}\text{ ডাইন।}$$

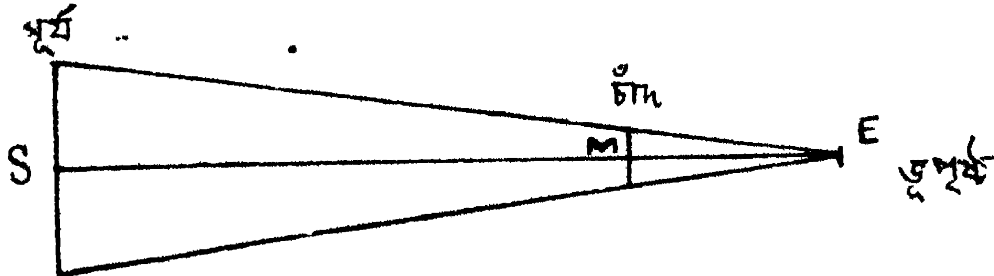
পৃথিবীর ভর $5{\cdot}97\times10^{27}$ গ্রাম এবং কৃত্রিম উপগ্রহের ভর 10^6 গ্রাম এবং ভূকেন্দ্র থেকে R সে. মি. দূরত্বে কৃত্রিম উপগ্রহ থাকলে তাদের আকর্ষণী বল $=G\frac{5{\cdot}97\times10^{27}\times10^{6}}{R^2}$

$$=\frac{6{\cdot}7\times10^{-8}\times5{\cdot}97\times10^{33}}{R^2}\text{ ডাইন}\approx\frac{3{\cdot}9\times10^{25}}{R^2}\text{ ডাইন।}$$

সুতরাং পূর্বোক্ত বিকর্ষণী বল আকর্ষণী বল অপেক্ষা প্রায় দশ হাজার গুণ জোরালো।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বৈদ্যুতিক বল মাধ্যাকর্ষণসঞ্জাত বল অপেক্ষা বহুগুণ তীব্র। এক মিলিগ্রাম ইলেকট্রন অন্য এক মিলিগ্রাম ইলেকট্রনকে যে বলের দ্বারা বিকর্ষণ করে, বিশাল পৃথিবী 1 হাজার কিলোগ্রামের বস্তুকেও তত জোরে আকর্ষণ করতে পারে না।

2. পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময় চন্দ্রের ছায়া পৃথিবীতে পৌঁছানো প্রয়োজন এবং চন্দ্রের সর্বাধিক দূরত্ব এমন হওয়া প্রয়োজন, যাতে চন্দ্রের প্রচ্ছায়ার শীর্ষ ভূপৃষ্ঠ স্পর্শ করে। চিত্র থেকে ব্যাপারটা বুঝা যাবে।



$$\frac{EM}{ES}=\frac{\text{চন্দ্রের ব্যাস}}{\text{সূর্যের ব্যাস}}$$

$\therefore$ $EM=\frac{3480}{1,3,90,000}\times150,000,000\approx376,000$ কি. মি.। চন্দ্রের দূরত্ব এর অধিক হলে ভূপৃষ্ঠের E বিন্দু থেকে সূর্যের বলয় গ্রাস দেখা যাবে।

3. আমরা জানি m গ্র্যাম গ্যাসের চাপ P, (ডাইন/বর্গ সে. মি.), আয়তন V সি. সি. ও তাপমাত্রা T°K হয় এবং M যদি আণবিক গুরুত্ব (Molecular weight) হয়, তবে

$PV = \frac{m}{M}RT$, অক্সিজেনের ক্ষেত্রে $M=32$

∴ 16 গ্র্যাম অক্সিজেনের চাপ P_1 এবং আয়তন V_1 সি. সি হলে $P_1V_1=\frac{1}{2}RT$।

32 গ্র্যাম অক্সিজেনের ক্ষেত্রে আয়তন V_2 সি. সি. হলে $4P_1V_2=RT$।

∴ $\frac{V_1}{V_2}=2$। ∴ $V_2=\frac{1}{2}V$।

4. কোন মাধ্যমে শব্দ-তরঙ্গের গতি মাধ্যমের স্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভরশীল। অধিক-স্থিতিস্থাপক মাধ্যমে শব্দ-তরঙ্গের গতি অধিক। লোহায় শব্দ-তরঙ্গে গতি প্রায় 5131 কিলোমিটার প্রতি সেকেণ্ডে। বায়ুতে শব্দের গতি সাধারণ অবস্থায় প্রায় 330 কিলোমিটার প্রতি সেকেণ্ডে। সুতরাং লোহার রডের মধ্য দিয়ে শব্দ আগে শোনা যাবে।

5. রাবারের সুতার মধ্য দিয়ে টান (Tension) দুদিকে সমভাবে থাকবে। অতএব গোলক দুটির উপর সমান বল ক্রিয়াশীল হবে।

শোক-সংবাদ

পরলোকে অধ্যাপক জে. ডি. বার্নাল

প্রখ্যাত বৃটিশ বিজ্ঞানী অধ্যাপক জন ডেসমণ্ড বার্নাল গত 15ই সেপ্টেম্বর (1971) লণ্ডনে পরলোকগমন করেছেন। তিনি 1901 সালের মে মাসে আয়ার্ল্যাণ্ডের নেনাঘে জন্মগ্রহণ করেন। 1922 সালে কেম্ব্রিজ থেকে তিনি এম. এ. ডিগ্রি লাভ করেন।

1938 সালে তিনি পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন এবং 1963 সালে লণ্ডনের বীরবেক কলেজে ক্রিস্ট্যালোগ্রাফীর অধ্যাপকের পদে যোগদান করেন। তিনি জল থেকে সুরু করে কার্বন, ধাতব পদার্থ ও অনেক জটিল ও সরল পদার্থের গঠন-রীতি সম্বন্ধে গবেষণা করেন। তারপর ভিটামিন, হর্মোন, প্রোটিন ও ভাইরাস প্রভৃতি সম্বন্ধে গবেষণায় প্রবৃত্ত হন। সম্প্রতি তিনি তরল পদার্থের গঠন-কৌশলের বিষয় অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়েছিলেন।

1934 সালে অধ্যাপক বার্নাল সর্বপ্রথম প্রোটিন ক্রস্ট্যালের আভ্যন্তরীণ গঠনের এক্স-রে ছবি গ্রহণে কৃতকার্য হন, যার ফলে অণুর আকৃতি ও আয়তন নির্ধারণ করা সম্ভব হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বৃটিশ গভর্ণমেন্টের উচ্চতম বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তিনি ইউনাইটেড ষ্টেটস-এর স্বাধীনতা পদক এবং 1953 সালে লেনিন শান্তি পুরস্কার লাভ করেন।

বিজ্ঞানের সামাজিক কার্যকারিতা সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ে বক্তৃতা প্রদানের জন্যে 1969 সালে তিনি 2,000 পাউণ্ড অনুদানে বার্নাল লেকচার ফাণ্ড-এর প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ক্রস্ট্যালোগ্রাফি এবং আণবিক জীববিদ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় বহু সংখ্যক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি 'The Social Function of Science' (1939); The

Physical Basis of Life (1951); Science in History (1954-65), Origin of Life (1967) প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন



অধ্যাপক জে. ডি. বার্নাল

1957 সালে তিনি মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের অবৈতনিক অধ্যাপক নিযুক্ত হন, 1958 সালে USSR সায়েন্স অ্যাকাডেমি, 1960 সালে চেকোশ্লোভাক সায়েন্স অ্যাকাডেমির নিয়মিত সদস্য, 1962 সালে বার্লিনের জার্মেন সায়েন্স অ্যাকাডেমির করেস্পণ্ডিং মেম্বার এবং 1966 সালে নরওয়ের সায়েন্স অ্যাকাডেমির সদস্য হন। 1959 সালে তাঁকে গ্রোটিয়াস পদক দানে সম্মানিত করা হয়।

পরলোকে অধ্যাপক বার্নার্ডো হোসে

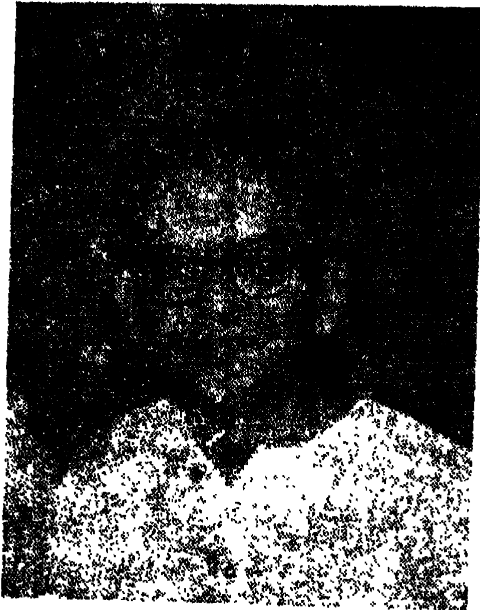
গত 22শে সেপ্টেম্বর (1971) অধ্যাপক বার্নার্ডো হোসে পরলোকগমন করেছেন। তিনি 1887 সালে এপ্রিল মাসে জন্মগ্রহণ করেন। বুয়েনস আয়ার্সে তিনি শিক্ষা লাভ করেন এবং 1911 সালে মেডিক্যাল গ্র্যাজুয়েট হবার পর বুয়েনস আয়ার্সের ভেটারিনারী স্কুলে শারীরবিদ্যার অধ্যাপকরূপে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। 1919 সাল পর্যন্ত তিনি এই কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তারপর তিনি ব্যুয়েনস আয়ার্সের মেডিক্যাল স্কুলে যোগদান করেন। এখানে তিনি 1943 সাল পর্যন্ত কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। 1948 সালে তিনি ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের হিচকক প্রোফেসার নিযুক্ত হন। 1947 সালে তিনি ভেষজ ও শারীরবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ঐ বছরেই তাঁকে আমেরিকান ডায়েবেটিস অ্যাসোসিয়েসনের ব্যাণ্টিং মেডাল এবং আমেরিকান ফার্মাসিউটিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েসনের গবেষণা পুরস্কার দানে সম্মানিত করা হয়।

1948 সালে তিনি লণ্ডনের রয়েল কলেজ অব ফিজিসিয়ানস্-এর ব্যালী পদক এবং সিডনির জেম্স্ কুক পদক লাভ করেন। এতদ্ব্যতীত অধ্যাপক হোসে প্যারিস, ষ্ট্রাসবার্গ, ব্রুসেলস, লাউভেন, মন্টেভিডো, ডুসেলডর্ফ এবং আরও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিনে অনারেরী ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। অক্সফোর্ড, হার্ভার্ড, সাও পাউলো, মেক্সিকো, টরন্টো এবং নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে বিজ্ঞানে সম্মানসূচক ডক্টরেট উপাধি দানে সম্মানিত করেন। ব্যুয়েনস আয়ার্সের ন্যাশন্যাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স এবং আর্জেন্টিনার সায়েন্স অ্যাসোসিয়েসনের তিনি ভূতপূর্ব সভাপতি ছিলেন। তিনি আর্জেন্টিনার ন্যাশন্যাল রিসার্চ কাউন্সিল এবং আর্জেন্টিনার বায়োলজিক্যাল সোসাইটিরও সভাপতি ছিলেন।

পরলোকে অরুণকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আকাশবাণীর মগরার উচ্চশক্তি ট্রান্সমিটারের ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি চীফ ইঞ্জিনীয়ার বিশিষ্ট বেতার-

বিজ্ঞানী শ্রীঅরুণকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় গত 19শে সেপ্টেম্বর আকস্মিকভাবে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র 55 বছর এবং তিনি তাঁর বৃদ্ধ



অরুণকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পিতা, স্ত্রী, এক পুত্র, এক কন্যা ও এক জামাতা, এক ভ্রাতা ('জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়) এবং চার ভগিনী রেখে গেছেন।

অরুণকৃষ্ণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি লাভ করেন এবং 1937 সালে এম. এস-সি পরীক্ষায় বিশুদ্ধ পদার্থ-বিজ্ঞানে শীর্ষস্থান অধিকার করেন ও বেতার বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এরপর প্রায় দু-বছর কাল তিনি পরলোকগত জাতীয় অধ্যাপক ডক্টর শিশিরকুমার মিত্রের অধীনে উচ্চ আয়নমণ্ডল ও বেতার বিষয়ে গবেষণা করেন এবং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা-নিবন্ধ প্রকাশ করেন। 1939-40 সালে তিনি আকাশবাণীতে বেতার প্রযুক্তিবিদ্‌ হিসাবে যোগদান করেন এবং কর্মকুশলতার পরিচয় দিয়ে ডেপুটি চীফ ইঞ্জিনীয়ারের পদে উন্নীত হন।

সোভিয়েট রাশিয়ার সহযোগিতায় পশ্চিম বাংলার হুগলী জেলার মগরায় প্রায় 4 কোটি টাকা ব্যয়ে আকাশবাণীর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী (1000 কিলোওয়াট) ট্রান্সমিটারটি অরুণকৃষ্ণেরই তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয় এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই বেতার কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। 1969 সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই কেন্দ্রটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়।

অরুণকৃষ্ণ আকাশবাণীর দিল্লী কেন্দ্রে প্রযুক্তি-বিদ্‌দের শিক্ষণ বিভাগে কিছুকাল অধ্যাপনাও করেন। তিনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রাক্তন সদস্য এবং বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ে একজন সুলেখক ছিলেন।

বিবিধ

বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান প্রদর্শনী

কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুলে 20শে থেকে 22শে সেপ্টেম্বর '71 পর্যন্ত সপ্তম বার্ষিক বিজ্ঞান প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসাবে যোগদান করেন সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এর ডক্টর জয়ন্ত বসু (বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কর্ম-সচিব) এবং প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন জুওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া-র ডক্টর কে. কে. তেওয়ারি।

বিজ্ঞান প্রদর্শনীটিতে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা ও গণিতের বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্যাদির পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যন্ত্রপাতি, মডেল, নমুনা, চিত্র প্রভৃতির মাধ্যমে চিত্তাকর্ষকভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে ছাত্রদের নিজেদের তৈরি কয়েকটি যন্ত্র ও মডেল সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ছাত্রদের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা এবং সেই ব্যাখ্যার কাজে তাদের অদম্য উৎসাহ প্রদর্শনটিকে বিশেষভাবে প্রাণবন্ত করে তুলেছিল। তবে দু-একটি ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ছাত্রদের ধারণা খুব স্পষ্ট বলে মনে হয় নি। প্রদর্শনীর প্রস্তুতির সময় ছাত্রদের কাছে বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আরো একটু বেশী যত্ন নিলে এই ধরণের প্রদর্শনী পরিপূর্ণভাবে সার্থক হয়ে উঠবে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, বিজ্ঞান প্রদর্শনীর পাশে কলা ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অবস্থায় তিনদিনব্যাপী প্রদর্শনীর আয়োজন করে এবং তা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুলের কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকবৃন্দ গঠনমূলক কাজে ছাত্রশক্তিকে নিয়োজিত করবার যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তার জন্যে তাঁরা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য।

সর্পোদ্যান

মাদ্রাজ (তামিলনাড়ু) থেকে ইউ. এন. আই. কর্তৃক প্রচারিত খবরে প্রকাশ—২রা অক্টোবর মাদ্রাজে ভারতের প্রথম সর্পোদ্যানটির উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন তামিলনাড়ুর অরণ্য দপ্তরের মন্ত্রী ও. পি. রামন। এই উদ্যানে বিভিন্ন শ্রেণীর সাপ ও সরীসৃপজাতীয় প্রাণীর পৃথক পৃথক ঘর থাকবে।

এখানে ভারতীয় সরীসৃপদের স্বভাব-চরিত্র পর্যবেক্ষণ করা হবে এবং ঔষধাদি প্রস্তুতের প্রয়োজনে সাপের বিষ সংগ্রহ করা হবে।

প্রাকৃতিক পরিবেশে আট হেক্টর এলাকা নিয়ে এই উদ্যানটি তৈরি হয়েছে।

1971 সালের শারীরবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার

হর্মোন সম্পর্কে গবেষণার জন্যে যুক্তরাষ্ট্রের নাসভিলের ভাণ্ডারবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর আর্ল উইলবার সাদারল্যাণ্ডকে শারীরবিদ্যা ও ভেষজ-বিজ্ঞানে 1971 সালের নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে।

হর্মোনের কার্যকারিতার সূত্র আবিষ্কারের জন্যে নোবেল পুরস্কার কমিটি তাঁকে এই পুরস্কার দিয়েছেন।

55 বছর বয়স্ক ক্যান্সাস নিবাসী ডক্টর সাদারল্যাণ্ডকে নিয়ে এপর্যন্ত 40 জন আমেরিকান নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পি 23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6

ত্রয়োবিংশ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন, 1971

পরিষদ ভবন

22শে সেপ্টেম্বর '71
বুধবার, 5-30 টা।

কার্যবিবরণী ও গৃহীত প্রস্তাবাবলী

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের এই ত্রয়োবিংশ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে মোট 31 জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে সভার কাজ সম্পন্ন হয়।

1. কর্মসচিবের বার্ষিক বিবরণী

পরিষদের কর্মসচিব শ্রীজয়ন্ত বসু মহাশয় এই অধিবেশনে উপস্থিত সভ্যগণকে স্বাগত জানাইয়া গত 1970-71 সালের জন্য পরিষদের বিবিধ কাজ-কর্ম ও আর্থিক অবস্থাদি সম্পর্কে তাঁহার লিখিত বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন। তিনি প্রারম্ভে বলেন যে, গত জুলাই মাসে পরিষদের ত্রয়োবিংশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস অনুষ্ঠানের সভায় পঠিত কার্যবিবরণীতে আলোচ্য বৎসরে পরিষদের বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টা ও আর্থিক অবস্থাদির বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছিল এবং তাহাই মোটামুটি ভাবে 1970-71 সালের বার্ষিক বিবরণী হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে। (উক্ত কার্যবিবরণী 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার অগাষ্ট'71 সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল)। যাহা হউক, তিনি পরিষদের বিবিধ কাজ-কর্ম ও আর্থিক অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া একটি নাতিদীর্ঘ বিবরণী দান করেন।

এই বিবরণীতে তিনি পরিষদের আদর্শানুযায়ী মাতৃভাষায় বাংলায় বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসার সাধনের উদ্দেশ্যে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' মাসিক পত্রিকা এবং জনপ্রিয় বিজ্ঞান পুস্তক ও বিদ্যালয়ের পাঠ্য-পুস্তক প্রকাশ, বিজ্ঞানবিষয়ক বক্তৃতার ব্যবস্থা গ্রন্থাগার ও পাঠাগার এবং হাতে-কলমে বিভাগ পরিচালনা প্রভৃতি বিভিন্ন কর্মধারা বর্ণনা করেন। এই প্রসঙ্গে পরিষদের কাজ-কর্মের মানোন্নয়নের জন্য যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে, তিনি সেইগুলির উল্লেখ করেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী বিবিধ কাজের বাস্তব রূপায়ণে যে সব আর্থিক দায়-দায়িত্ব বর্তিয়াছে, তাহার ব্যাখ্যা করিয়া কর্মসচিব মহাশয় সভ্যবৃন্দের সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য আহ্বান জানান।

2. হিসাব বিবরণী ও ব্যয়-বরাদ্দ

গত 1970-71 সালের পরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও উদ্বর্ত-পত্র (ব্যালান্স সিট) পরিষদের কোষাধ্যক্ষ শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ মহাশয় সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত করিয়া গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করেন। উপস্থিত সভ্যগণ-কর্তৃক উক্ত হিসাব-বিবরণী ও উদ্বর্ত-পত্র সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত ও গৃহীত হয়।

অতঃপর কোষাধ্যক্ষ মহাশয় পরিষদের বিদায়ী কার্যকরী সমিতি কর্তৃক রচিত ও অনুমোদিত বর্তমান 1971-72 সালের জন্য পরিষদের আনু-

মানিক ব্যয়-বরাদ্দ বা বাজেট পত্র সভ্যগণের অনুমোদনের জন্য সভায় পেশ করেন। যথোচিত আলোচনার পরে উক্ত ব্যয়-বরাদ্দ পত্র উপস্থিত সভ্যগণ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত ও গৃহীত হয়।

3. কার্যকরী সমিতি গঠন

1971-72 সালের জন্য পরিষদের নূতন কার্যকরী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মণ্ডলী ও সাধারণ সদস্যের মনোনয়ন পত্রের চূড়ান্ত তালিকা কর্ম-সচিব মহাশয় সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত করেন এবং সভ্যগণ কর্তৃক তাহা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। উক্ত তালিকা অনুযায়ী পরিষদের নূতন কার্যকরী সমিতির বিভিন্ন পদে ও সাধারণ সদস্যরূপে নিম্নলিখিত সভ্যগণ সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হইলেন বলিয়া সভায় ঘোষিত হয়।

কার্যকরী সমিতি

কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী :

সভাপতি—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু

সহঃ সভাপতি—শ্রীঅজিতকুমার সাহা
শ্রীঅনাদিনাথ দাঁ
শ্রীঅমূল্যধন দেব
শ্রীঅসীমা চট্টোপাধ্যায়
শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা
শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু
শ্রীমৃণালকুমার দাশগুপ্ত
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মৈত্র
শ্রীসতীশরঞ্জন খাস্তগীর

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীজয়ন্ত বসু

কর্মসচিব—শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ

সহযোগী কর্মসচিব—শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীশ্যামসুন্দর দে

সাধারণ সদস্য

1. শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
2. শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী
3. শ্রীদিলীপকুমার ঘোষ
4. শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
5. শ্রীব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত
6. শ্রীমণীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়
7. শ্রীরমাপ্রসাদ সরকার
8. শ্রীরমেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র
9. শ্রীরাধাকান্ত মণ্ডল
10. শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
11. শ্রীশঙ্কর চক্রবর্তী
12. শ্রীসমীরকুমার ঘোষ
13. শ্রীসুনীলকুমার সিংহ
14. শ্রীসূর্যেন্দুবিকাশ কর
15. শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

4. ন্যাসরক্ষক নির্বাচন

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের ন্যাসরক্ষক মণ্ডলীর অন্যতম সভ্য হিসাবে শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ীর নাম শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল কর্তৃক প্রস্তাবিত ও শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মৈত্র কর্তৃক সমর্থিত হয়। উক্ত প্রস্তাব অতঃপর সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত ও গৃহীত হয়।

5. হিসাব-পরীক্ষক নির্বাচন

পরিষদের বিভিন্ন তহবিলের 1971-72 সালের হিসাব-পত্র পরীক্ষা করিবার জন্য হিসাব পরীক্ষক (অডিটর) রূপে পরিষদের পূর্বতন হিসাব পরীক্ষক মেসার্স মুখার্জী, গুহঠাকুরতা অ্যাণ্ড কোং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টস-এর নাম প্রস্তাবিত হয় এবং তাহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

6. অনুসঙ্গ স্মারক-পত্র এবং বিধি ও নিয়মাবলী

পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটি অ্যাক্ট অনুসারে পরিষদের রেজিস্ট্রীকৃত অনুসঙ্গ স্মারক-পত্র এবং বিধি ও নিয়মাবলীর প্রয়োজনানুরূপ সংশোধনের খসড়া (কার্যকরী সমিতির 25. 8. 71 তারিখের অধিবেশনে প্রস্তাবিত) কর্মসচিব মহাশয় সভায় উপস্থাপিত করেন এবং যথোচিত আলোচনায়

পরে উক্ত সংশোধন উপস্থিত সভ্যগণ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত ও গৃহীত হয়।

7. অনুমোদক মণ্ডলী নির্বাচন

পরিষদের নিয়মতন্ত্রের বিধান অনুসারে এই বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনের কার্যবিবরণী ও গৃহীত প্রস্তাবলীর অনুলিপি চূড়ান্তভাবে অনুমোদনের জন্য নিম্নলিখিত সদস্যগণ অনুমোদক হিসাবে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হয়।

1. শ্রীদিলীপকুমার ঘোষ
2. শ্রীব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত
3. শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী
4. শ্রীরাধাকান্ত মণ্ডল
5. শ্রীরমেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র

নিয়মানুসারে অধিবেশনের সভাপতি ও পরিষদের কর্মসচিব সহ উপরিউক্ত নির্বাচিত পাঁচজন অনুমোদকের দ্বারা এই অধিবেশনের কার্য-বিবরণী ও গৃহীত প্রস্তাবাবলী অনুমোদিত ও স্বাক্ষরিত হইলে—তাহা চূড়ান্তভাবে গৃহীত বলিয়া গণ্য হইবে।

8. সভাপতির ভাষণ

পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় উপস্থিত সভ্যগণকে ও অন্যান্য ব্যক্তিদের পরিষদের প্রতি তাঁহাদের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। দেশের বর্তমান অবস্থায় বিজ্ঞান শিক্ষা ও বিজ্ঞান প্রচারের মত গঠনমূলক কাজের সবিশেষ গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি বিশদ আলোচনা করেন।

পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য যে সকল সরকারী উদ্যোগ পরিলক্ষিত হইতেছে, সেগুলিকে স্বাগত জানাইয়া তিনি বলেন যে, গত 23 বৎসর যাবৎ বিজ্ঞান পরিষদ অনুরূপ কার্যে নিয়োজিত রহিয়াছে; এবং পরিষদের নিজস্ব ভবন নির্মাণের পর অমরেন্দ্রনাথ বসু স্মৃতি পাঠাগার, হাতে-কলমে বিভাগ, বিজ্ঞানবিষয়ক বক্তৃতা প্রভৃতির মাধ্যমে পরিষদের কার্যাদি ক্রমশঃ ব্যাপক ও বিস্তৃত হইয়া উঠিয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সরকারী উদ্যোগগুলিতে পরিষদকে তাহার যথাযথ ভূমিকা পালনের দায়িত্ব অর্পণ করা হইবে বলিয়া তিনি আশা প্রকাশ করেন। সর্বস্তরে মূল্য বৃদ্ধির ফলে পরিষদের আর্থিক অনটনের বিষয় উল্লেখ করিয়া তিনি পরিষদের প্রত্যেক সভ্যকে বৎসরান্তে অন্ততঃ একদিনের আয় পরিষদকে দান করিবার জন্য আহ্বান জানান।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন

শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল পরিষদের সভাপতি, কর্মসচিব ও কোষাধ্যক্ষ এবং কার্যকরী সমিতির অন্যান্য সদস্যগণকে আলোচ্য বছরে পরিষদের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। উপস্থিত সভ্যদিগকেও তাঁহাদের সহযোগিতামূলক মনোভাবের জন্য তিনি ধন্যবাদ প্রদান করেন।

সত্যেন বোস
সভাপতি
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

জয়ন্ত বসু
কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

অনুমোদক মণ্ডলীর স্বাক্ষর

1. দিলীপকুমার ঘোষ 2. ব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত 3. জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী
4. রাধাকান্ত মণ্ডল 5. রমেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র

প্রধান সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

চতুর্বিংশ বর্ষ | ডিসেম্বর, 1971 | দ্বাদশ সংখ্যা

[শ্বেতিরোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধির দিকে চলেছে। শরীরের প্রকাশ্য স্থানে শ্বেতিরোগের আক্রমণ হলে রোগী স্বভাবতঃই মানসিক অশান্তির কবলে পড়ে। সময়ে সময়ে এর ফলে গুরুতর মনোবিকারও ঘটে থাকে। এই রোগের উৎপত্তির কারণ ও প্রতিকার সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা অনেককাল ধরেই অনুসন্ধান চালিয়ে আসছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এই রোগোৎপত্তির প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটিত হয় নি। বর্তমান প্রসঙ্গে এই রোগের উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণার মোটামুটি বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে]

শ্বেতিরোগের উৎস-সন্ধানে

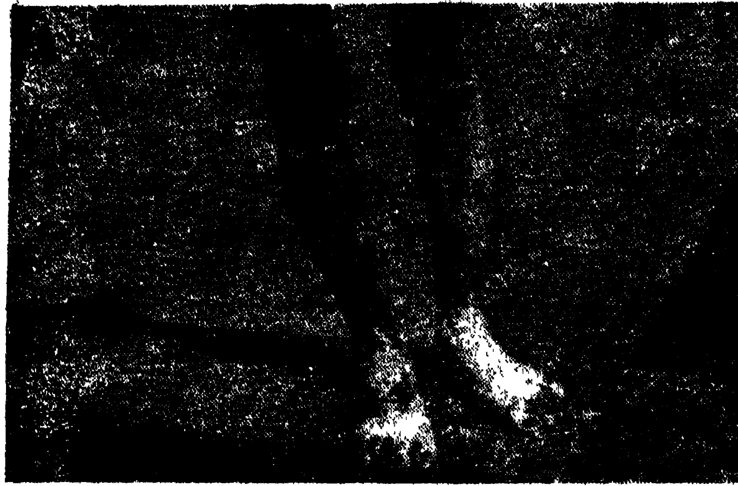
শ্রীসুধাংশুবল্লভ মণ্ডল ও শ্রীঅজিতকুমার দত্ত*

অবস্থার বিচারে দেহচর্মে আবির্ভূত সকল প্রকার সাদা দাগ বা রোগচিহ্নকেই শ্বেতি বলা যায়। আবার আক্ষরিক অর্থে vitiligo ও lucoderma এই উভয় শব্দের দ্বারাই শ্বেতিকে বোঝানো হয়। সে জন্যে প্রয়োগ-ক্ষেত্র ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে দুই শ্রেণীর শ্বেতিকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এভাবে চর্মরোগের চিকিৎসাশাস্ত্রে vitiligo শব্দের দ্বারা সেই সাদা

* স্নাতকোত্তর চর্মরোগ বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

দাগকেই শুধুমাত্র নির্দেশ করা হয়, যার কারণ অজ্ঞাত এবং যার আবির্ভাব ঘটে জন্মের পরে। তাছাড়া পুড়ে যাবার ফলে অথবা ছুলি, কালাজ্বর, উপদংশ, কুষ্ঠ প্রভৃতি একাধিক রোগের অনুষঙ্গরূপে কিংবা রবারের চটি, সিঁদুর, লিপষ্টিক, কুমকুম প্রভৃতির সংস্পর্শজনিত রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার ফলে যে সাদা দাগ বা শ্বেতি সংঘটিত হয়, তাকে secondary lucoderma রূপে চিহ্নিত করা হয় (1নং ও 2নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

কার্যক্ষমতা, বুদ্ধিমত্তা অথবা জীবনকালেরও কোন হেরফের ঘটে না। অথচ যে কোন চর্মরোগ অপেক্ষা এই সব রোগীদের ক্ষেত্রে মনের উপর অত্যধিক প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, যার ফলে সময় সময় রোগীর মানসিক বৈকল্যও ঘটতে পারে। বস্তুতঃ সমাজ-জীবনে মানুষের অহেতুক আতঙ্ক ও ঘৃণা থেকেই এই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এই দুর্ভাগ্যজনক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যে দায়ী প্রকৃতপক্ষে রোগ সম্বন্ধে বহুকালব্যাপী



1 নং চিত্র
শ্বেতিরোগের (Vitiligo) আলোকচিত্র। রোগীর দুই পায়ে রোগচিহ্ন দেখা যায়।

প্রথমোক্ত শ্রেণীর শ্বেতি বা vitiligo এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। এর প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধির ফলে (মোট চর্মরোগের 4·9 শতাংশ) ইদানীং পথেঘাটে প্রায়ই এরূপ শ্বেতিরোগীর সাক্ষাৎ মেলে। বস্তুতঃ এই শ্বেতিরোগ গাত্রচর্মের বর্ণবৈকল্যজনিত সমস্যাদির মধ্যে অন্যতম। নিদানিক বৈশিষ্ট্যের বিচারে শ্বেতিরোগের দ্বারা আক্রান্ত ত্বকের অংশবিশেষে একমাত্র সাদা দাগ ছাড়া অন্য কোন প্রকার পরিবর্তন ঘটে না। এমন কি, অন্যান্য চর্মরোগের মত আনুষঙ্গিক রোগলক্ষণও থাকে না। এই রোগের দ্বারা রোগীর

মানুষের ভ্রান্ত ও বিকৃত ধারণার প্রচার ও প্রসার। আসলে এখনও পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে জনসাধারণের মধ্যে শ্বেতিরোগ শ্বেতকুষ্ঠ বা ধবলকুষ্ঠ (White leprosy) নামে পরিচিত। এমন কি, 1400 খৃঃ পূর্বাব্দ পর্যন্ত অথর্ব বেদেও এই রোগ কুষ্ঠরোগ নামে উল্লেখিত আছে। প্রাচীন ত্রয়োদশ শতাব্দীর মিশরীয় ধর্মগ্রন্থাদিতেও শ্বেতিরোগের উল্লেখ পাওয়া যায়।

যেমন রোগীদের কাছে, তেমনিই সারা পৃথিবীব্যাপী রোগ-বিশেষজ্ঞদের কাছেও এই রোগ সমান উদ্বেগের বিষয়। কারণ বহুকাল

ধরে এর উৎস সন্ধানের পরেও আজ অবধি খুব একটা আশাপ্রদ আলোর সঙ্কেত পাওয়া যায় নি। তবুও এর মধ্যে দীর্ঘ প্রসারিত অনুসন্ধানের বিনিময়ে যে সকল তথ্য জানা গেছে, তারই আলোকে এর উৎসঘটিত বৃত্তান্ত বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যেই আলোচ্য প্রবন্ধের অবতারণা করা হয়েছে।

শারীরবৃত্তের পরিপ্রেক্ষিতে এই তথ্য সুবিদিত যে, বিভিন্ন মানুষের চর্মের বিভিন্ন বর্ণ প্রকাশের পশ্চাতে melanin, melanoid, haemoglobin ও carotene প্রভৃতি যে সকল জৈব রাসায়নিকের অবদান রয়েছে, তাদের মধ্যে মেলানিনের ভূমিকা প্রধানতম। গায়ের রঙের বিভিন্নতাও মুখ্যতঃ এই মেলানিনের পরিমাণের উপর নির্ভরশীল। তাছাড়াও মেলানিনের অবশ্য ভিন্ন কার্যকারিতা রয়েছে। সারা দেহের চর্মে বিস্তৃত এই মেলানিন ছাতার মত সূর্যাতপ নিয়ন্ত্রণের কাজেও যথেষ্ট সহায়তা করে।

প্রকৃতপক্ষে দেহচর্মের অংশবিশেষে এই মেলানিনের রহস্যজনক অনুপস্থিতিই শ্বেতিরোগের মূল কারণ। সুতরাং মেলানিনের অন্তর্ধানের কারণ অনুসন্ধানের আগে বরং এর স্বাভাবিক উৎপত্তি ও প্রসার সম্পর্কে আলোচনা করা প্রাসঙ্গিক হবে।

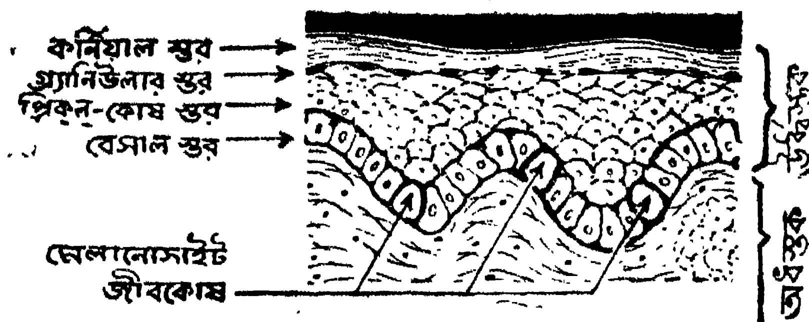


2 নং চিত্র
Secondary lucoderma রোগের আলোকচিত্র। দুই পায়ে রোগচিহ্ন দেখা যাচ্ছে। রবারের চটির সংস্পর্শে এই রোগের সৃষ্টি হয়েছে।

মেলানিনের উৎস

ত্বকে উপস্থিত মেলানোসাইট জীবকোষই আসলে মেলানিন (Melanin) উৎপাদনের আধার। চর্মের দুই মূল অংশ—ঊর্ধ্বত্বক (Epidermis) এবং অধত্বক (Dermis) এদের সংযোগ-সীমা চিহ্নিত হয় basement ঝিল্লীর দ্বারা। এই basement ঝিল্লীর উপর বরাবর সুবিন্যস্ত অবস্থায় ত্বকের সর্বাংশে বিস্তৃত রয়েছে ঊর্ধ্বত্বকের সর্বনিম্ন অংশ বা মূলস্তর (Basal layer)। আঁকাবাঁকা ঢেউয়ের আকারে 'বেসাল-জীবকোষ' দিয়ে রচিত এই স্তরের মধ্যেই উপস্থিত রয়েছে মেলানোসাইট

জীবকোষ। 3নং চিত্রে মানুষের দেহচর্মের অংশবিশেষের আণুবীক্ষণিক চিত্ররূপ প্রদর্শিত হয়েছে, যেখানে কেন্দ্রীনবিহীন শুভ্রগর্ভ জীবকোষগুলি নির্দেশ করছে মেলানোসাইটের অবস্থান। প্রায় প্রতি 5 থেকে 10টি জীবকোষের তাদের অভ্যন্তরে cytoplasm-এর মধ্যে মেলানোসোম নামে একপ্রকার বিশেষ সূক্ষ্ম বস্তুকণার সৃষ্টি করে। আবার এই মেলানোসোম মধ্যেই নিহিত থাকে tyrosinase নামে এক প্রকার অনুঘটক। 4নং চিত্রে মেলানোসাইট



3 নং চিত্র
ত্বকের অংশবিশেষের আণুবীক্ষণিক চিত্ররূপ এবং মেলানোসাইট জীবকোষের অবস্থান।

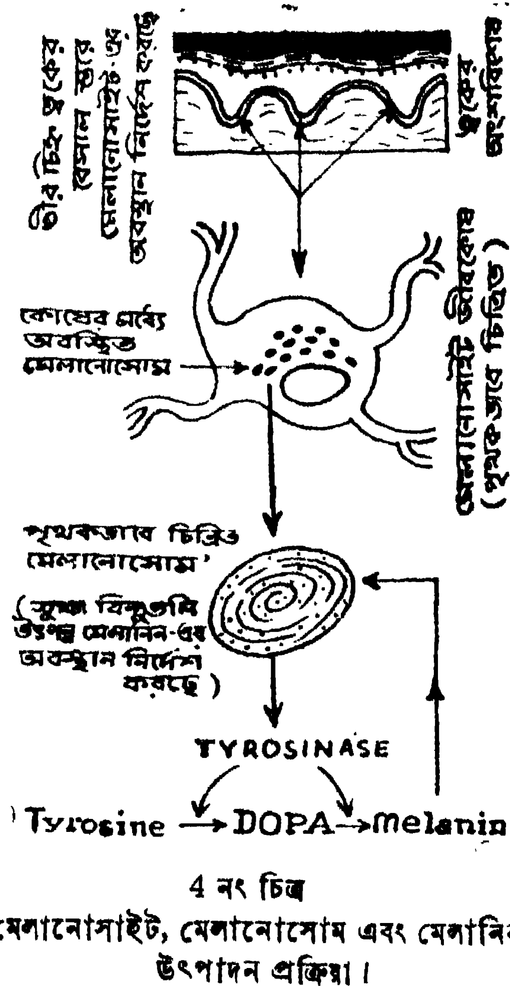
ব্যবধানে বেসাল-জীবকোষের মাঝে মাঝে কীলকের মত আঁকড়ে আছে 1টি করে মেলানোসাইট জীবকোষ। একাধিক শুঁড়বিশিষ্ট (Dendrites) এই সকল মেলানোসাইট (4নং চিত্র দ্রষ্টব্য) জীবকোষের মধ্যেই উৎপন্ন হয় মেলানিন নামক জৈব রাসায়নিক পদার্থ। বিভিন্ন গাত্রবর্ণের মানুষের ত্বকে কিন্তু এই জীবকোষের উপস্থিতির মোট সংখ্যার বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না। আসলে এই জীবকোষের মেলানিন উৎপাদনের তারতম্যই হলো মূল কথা। যেমন, কৃষ্ণকায় (নিগ্রো) মানুষের ত্বকে অবস্থিত মেলানোসাইট জীবকোষের মেলানিন উৎপাদনের ক্ষমতা খুবই বেশী। কিন্তু শ্বেতকায়দের ক্ষেত্রে এই ক্ষমতা খুবই সীমিত। সে জন্যেই বর্ণের এই বিভিন্নতা।

মেলানিন উৎপাদন-প্রক্রিয়া

মেলানোসাইট জীবকোষগুলি ক্ষরণধর্মী (Secretory) শ্রেণীভুক্ত। সূচনায় এই কোষগুলি ও মেলানোসোমকে পৃথকভাবে চিত্রিত করা হয়েছে। এই tyrosinase অনুঘটকের উপস্থিতিতে ও অক্সিজেনের সহায়তায় দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত tyrosine নামে যে প্রথম শ্রেণীভুক্ত অ্যামিনো অ্যাসিড রয়েছে, তা বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে পরিশেষে মেলানিনে রূপান্তরিত হয়। এভাবে উৎপন্ন মেলানিন অতঃপর মেলানোসোমে আশ্রয় নেয়। বিভিন্ন প্রকার উত্তেজনার দ্বারা সংকোচনের ফলে মেলানোসাইটের আভ্যন্তরীণ মেলানিনযুক্ত মেলানোসোম শেষ পর্যন্ত জীবকোষের শুঁড় বা dendron-এর মধ্য দিয়ে বের হয়ে আসে। নির্গত এই সব মেলানোসোম ঊর্ধ্বত্বকের কাছাকাছি নির্দিষ্ট সংখ্যক জীবকোষের মধ্যে প্রবেশ করে। এভাবে ঊর্ধ্বত্বকের বহু সংখ্যক জীবকোষে স্থান নিয়ে বিস্তৃত এই মেলানিনই দেহবর্ণ রক্ষায় প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে।

Tyrosine থেকে মেলানিনের রূপান্তরের

সুনির্দিষ্ট ও পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনের স্তর সম্পর্কে সঠিকভাবে এখনও জানা যায় নি। Mason, Nicolaus, Prota প্রমুখ অভিজ্ঞ গবেষক



4 নং চিত্র
মেলানোসাইট, মেলানোসোম এবং মেলানিন উৎপাদন প্রক্রিয়া।

এই বিষয়ে যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন। মোটামুটিভাবে স্বীকৃত হয়েছে যে, tyrosine যথাক্রমে DOPA → DOPA-Quinone → DOPA-Chrome→ 5, 6 di-hydroxy indole→indole 5, 6-Quinone প্রভৃতি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে মেলানিনে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু অন্তর্বর্তী পর্যায়ে আরো একাধিক যৌগিক পদার্থের আবির্ভাব ঘটে, যেগুলি অস্থায়ী ও যাদের চারিত্রিক ধর্ম ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে প্রামাণ্য তথ্য এখনও জানা সম্ভব হয় নি। আর এই ব্যাপারেই বিশেষ করে গবেষকদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়।

যাহোক, দেখা যাচ্ছে, মেলানোসোমরূপী সূক্ষ্ম বস্তুকণাগুলি প্রকৃতপক্ষে উৎপন্ন মেলানিনের আধার হিসাবে কাজ করে। এই মেলানোসোমসমূহ melanocyte জীবকোষের অভ্যন্তরে কেন্দ্রীনের উপরিভাগে টুপীর মত একত্রে জমাট বেঁধে থাকে। আগেই বলা হয়েছে যে, উপযুক্ত উত্তেজনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলে মেলানিন বহির্মুখী হয়। কোষের অভ্যন্তরে মেলানিন কণাসমূহের একত্রে সমাবেশ ও বহির্গমন—এই দ্বিবিধ বিপরীতমুখী ক্রিয়ার যথাযথ ভারসাম্যের দ্বারাই দেহচর্মে মেলানিনের স্বাভাবিক শারীরবৃত্তিক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়। আর কোন কারণে এই ভারসাম্যের ব্যাঘাত ঘটলে দেহচর্মে বর্ণবৈকল্য (অর্থাৎ মেলানিনের অভাবজনিত সাদা রং বা এর আধিক্যজনিত কালো রং) অবশ্যই দেখা দিতে পারে। ব্যাঙের দেহচর্ম পরীক্ষা করে জানা গেছে—α ও β MSH (Melanocyte stimulating hormone), ACTH (Adrenocorticotrophic hormone), Progesterone, Caffeine, Apresolin, Mesantoin, Mersilid ইত্যাদি বস্তুসমূহ এই মেনানিন কণার একত্রে সন্নিবেশের ব্যাপারে অংশ নেয়, আর এদের জীবকোষের বাইরে নির্গত হতে সাহায্য করে—Nor-adrenaline, Adrenaline, Acetylcholine, Serotonin, Melaton'n, Tri-iodo-thyroxine প্রভৃতি বস্তুসমূহ। অবশ্য মানুষের দেহে এদের কার্যকারিতা এখনও নির্ধারণ করা সম্ভব হয় নি।

মেলানোসাইট (Melanocyte) জীবকোষ প্রসঙ্গে

Berzelius-এর কার্যকাল 1840 সাল থেকে সুরু করে আজ পর্যন্ত শতাধিক বছরের প্রচেষ্টার পরেও মেলানিন সম্পর্কে জ্ঞাত তথ্য যেমন হতাশাব্যঞ্জক, মেলানোসাইট জীবকোষের উৎস-

স্থল সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাবও ঠিক সমান দুর্ভাগ্যজনক। কারণ সমস্যাসঙ্কুল এই শ্বেতি বা vitiligo রোগ সৃষ্টির পশ্চাতে মেলানিন তথা মেলানোসাইটের যে নির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে—এই তথ্য আজ সর্বত্র স্বীকৃত; অর্থাৎ এই মেলানোসাইটের উৎস তাই স্বভাবতঃই অনেক অজানা রহস্যের কিনারা করতে সক্ষম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ গবেষকবৃন্দ এখনও এই সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সক্ষম হন নি। এই বিষয়ে গবেষক-বিজ্ঞানীদের মতামত দুই ভাগে বিভক্ত। একদলের মতে, neural crest থেকেই এই মেলানোসাইটের আবির্ভাব ও প্রান্তীয় স্নায়ুর সঙ্গে নির্দিষ্ট স্থান অর্থাৎ চর্মাংশে গমন। দ্বিতীয় দলের বিশ্বাস—উর্ধ্বত্বকের নিম্নতম স্তর অর্থাৎ basal layer থেকেই এর জন্ম। প্রথমোক্ত ধারণার সমর্থকদের মধ্যে আছেন Langerhans (1868), Pautrier (1928), Zimerman (1946), Moson (1948), Fitzpatrick (1952), Szabo (1954), Zelickson ও Hartman (1961) প্রভৃতি মনিষীবৃন্দ। তাছাড়া আবার Aaron Lerner-ও 1955 এবং 1959 সালে বিভিন্ন তাত্ত্বিক ও কিছু প্রামাণ্য তথ্যের দ্বারা এই মত সমর্থন তথা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বেশ জোরালো বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন। কিন্তু অপর মত সমর্থকদের দলে আছেন আবার বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী Arthur Allen, যিনি তাঁর স্বতন্ত্র ধারণা প্রমাণের অনুকূলে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি উপস্থাপিত করছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এমন অনেক যুক্তি ও তথ্যের অবতারণা করেছেন, যার দ্বারা প্রথমোক্ত মতের নির্ভুলতা সম্পর্কে নানান সংশয় দেখা যায়। তাছাড়াও রয়েছে আর এক তৃতীয় দল, যাঁদের বিশ্বাস ত্বকে অবস্থিত mast cell থেকেই মেলানোসাইট জীবকোষের উৎপত্তি। যাহোক, মতের বিভিন্নতা সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত কিন্তু মোটামুটিভাবে neural crest থেকে মেলানোসাইটের উৎসজনিত তত্ত্বটিই অধিকতর গ্রাহ্য বলে বিবেচিত হয়।

রোগের কারণ প্রসঙ্গে

বহুকাল ধরে বহু গবেষক বিজ্ঞানী এই শ্বেতি-রোগের কারণ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত রয়েছেন। রোগের বিভিন্ন নিদানিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে অনুমানসাপেক্ষ নানান সূত্র ধরে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে চূড়ান্ত ফল লাভ হয় নি ঠিকই, তবে আজ অবধি এই তথ্য নিশ্চিতভাবে জানা গেছে যে, শ্বেতিরোগগ্রস্ত অংশের ত্বকে বর্ণবৈকল্যের মূল কারণ হচ্ছে মেলানিনের অভাব। আর এই মেলানিনের অনুপস্থিতি বা অভাবের কারণ কিন্তু মেলানোসাইট জীবকোষের সংখ্যাল্পতা নয়; বরং সম্ভবতঃ এই জীবকোষের অভ্যন্তরে উপস্থিত মেলানোসোমে উৎপন্ন ও সঞ্চিত tyrosinase নামে অনুঘটকের (Enzyme) নিষ্ক্রিয়তা বা কর্মতৎপরতার হ্রাসপ্রাপ্তি। Block অনুসৃত পদ্ধতিতে DOPA-র দ্বারা পরীক্ষার ফল হিসাবে ঋণাত্মক প্রতিক্রিয়া (Negative-reaction) এই ঘটনার সত্যতা সঠিকভাবে প্রমাণ করেছে। সম্ভবতঃ মেলানোসাইট জীবকোষের আকৃতি বা প্রকৃতিগত অস্বাভাবিকতাই এর জন্যে প্রধানতঃ দায়ী। এই অস্বাভাবিকতার দায়িত্ব আবার gene-এর প্রভাবের উপর আরোপিত করবার প্রয়াস লক্ষণীয়—যদিও এর সঠিক প্রকৃতি এখনও সম্পূর্ণ রহস্যাবৃত। তাছাড়া আজ পর্যন্ত অনেক তত্ত্বই উপস্থাপিত হয়েছে, যার মধ্যে অনেকগুলিই শুধু কল্পনাভিত্তিক এবং এগুলির মধ্য দিয়ে মতানৈক্যের বিবিধ ছবিও স্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হতে দেখা যায়। সুতরাং বিস্তৃত বিবরণসাপেক্ষ ও বিতর্কমূলক আলোচনা পরিহার করে শুধুমাত্র প্রাসঙ্গিক কিছু উপস্থাপিত তত্ত্ব ও তথ্যের সারাংশই এখানে উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় হবে, যেগুলি বিশেষ করে এই শ্বেতিরোগের

কারণতাত্ত্বিক ঘটনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। যেমন—

(1) পুষ্টির গোলযোগ সংক্রান্ত অথবা বিপাকক্রিয়ার বৈকল্য :—কারণস্বরূপ উল্লেখিত হয়েছে খাদ্যে প্রোটিনের ঘাট্তি; আন্ত্রিক-গোলযোগ (বিশেষতঃ কৃমিঘটিত, পাকস্থলীতে অম্লের অভাবজনিত কিংবা যকৃতের গোলযোগ ঘটিত) এবং দেহে copper-এর ঘাট্তির কথাও এই সঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে। মোটামুটিভাবে 1945 সাল থেকে 1965 সাল পর্যন্ত অনেক বিজ্ঞানী-গবেষক এই বিষয়ে পরীক্ষা চালিয়েছেন। কিন্তু খুব সন্তোষজনক ফল লাভ হয় নি।

(2) Endocrine বা অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির বৈকল্য :—Addison-এর রোগ, Hyperthyroidsm, বহুমূত্র প্রভৃত বিবিধ রোগের সঙ্গে শ্বেতিরোগের সহঅবস্থানের ভিত্তিতেই এই ধারণার উৎপত্তি। কিন্তু এই সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্যের ভিত্তি খুবই অকিঞ্চিৎকর।

(3) বিষক্রিয়াঘটিত :—মেলানিন-বিধংসী কোন এক বিষাক্ত রাসায়নিক বা toxin-এর কাল্পনিক অবস্থানের ভিত্তিতেই এই তত্ত্ব উপস্থাপনের চেষ্টা হয়েছে।

(4) জীবাণু-ঘটিত :—প্রধানতঃ ছত্রাক ও ভাইরাসকে শ্বেতিরোগ সৃষ্টিকারী বলে অভিযুক্ত করলেও এর সত্যতা সঠিকভাবে প্রমাণ করা সম্ভব হয় নি।

(5) Autoimmunology সংক্রান্ত :—রক্তে মেলানিন-বিরোধী antibody নির্ধারণের অনুসরণে এই তাত্ত্বিক সূত্র উপস্থাপিত করা হয়েছে।

(6) স্নায়ু-সংক্রান্ত তত্ত্ব :—আপেক্ষিক বিচারে এই স্নায়ু-বৈকল্যজনিত তত্ত্বই এখনও পর্যন্ত সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। প্রাসঙ্গিক তত্ত্বে রোগের নিদানিক বৈশিষ্ট্যসমূহ ও পরীক্ষামূলক পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রান্তীয় সমবেদী (Peripheral sympathetic) স্নায়ুর ভারসাম্যহীনতার বিষয়কে শ্বেতিরোগের কারণ-রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ আরো বলা হয়েছে, sympathetic hypotonia কিংবা cholinergic nerve-এর বর্ধিত কর্ম-তৎপরতাই কোন না কোন উপায়ে মেলানিন উৎপাদনের স্বাভাবিক ক্রিয়াকে ব্যাহত করে। সমবেদী স্নায়ুপ্রান্তে অধিকমাত্রায় উৎপন্ন মেলাটোনিন নামে বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ (পূর্বেই যার বিষয় উল্লেখিত হয়েছে) সম্ভবতঃ এই বিঘ্ন সৃষ্টি করে। তাছাড়াও বলা হয়েছে, সম্ভবতঃ কোষের স্তরে MSH (Melanocyte stimulating hormone)-এর ক্রিয়া বন্ধ হবার ফলেও এই মেলানিন উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে।

উপসংহার

শ্বেতিরোগের উৎস-সন্ধানের পথে আজ পর্যন্ত যে সকল তাত্ত্বিক সূত্র বা তথ্যাদি উপস্থাপিত হয়েছে, তাদের মধ্যে স্নায়ুতন্ত্র-সংশ্লিষ্ট তত্ত্বটি সর্বাধিক মানুষের মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হয়েছে। অপেক্ষাকৃত অধিকতর গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবার ফলে এই তত্ত্বকে সামনে রেখে অনুপ্রাণিত বহু গবেষক এ-পর্যন্ত এই রহস্য সন্ধানের মরুভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাছাড়া স্নায়ুতন্ত্রকেন্দ্রিক তত্ত্বের ভিত্তিতে অনুসন্ধানের দ্বারা বিভিন্ন গবেষকের প্রতিবেদন থেকে আজ অবধি যে সব তথ্যাদি পাওয়া গেছে, তার ফলাফলও আশাব্যঞ্জক। কিন্তু তবুও চূড়ান্ত ফলাফলের জন্যে আরো সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। ধৈর্য ও সাধনার বিনিময়ে এই সমস্যার সমাধান করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব ও মহান কর্তব্য। কারণ ইতিমধ্যেই আমাদের দেশে এই শ্বেতিরোগের প্রাদুর্ভাব বেড়ে চলেছে। আর এভাবে বহু রোগাক্রান্ত মানুষ সমাজের ঘৃণা ও লাঞ্ছনার মধ্যে দিনাতিপাত করে চলেছে। ক্ষেত্রবিশেষে আবার কোন কোন

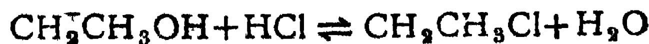
রোগী গভীর উদ্বেগের ভারে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে আরো দুর্ভাগ্যজনক পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে। রোগের সঠিক কারণ অনাবিষ্কৃত থাকবার ফলে স্বভাবতঃই সুষ্ঠু চিকিৎসার পথও রয়েছে অবরুদ্ধ। বর্তমান পটভূমিকায়, পৃথিবীব্যাপী যে চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রচলন আছে, তা প্রায় অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়বারই সামিল। অবশ্য এই চিকিৎসা যে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ, তা নয়। অনেক ক্ষেত্রেই, বিশেষতঃ অভিজ্ঞতার দ্বারা সুসংস্কৃত চিকিৎসার ফলে বহু ক্ষেত্রেই অত্যাশ্চর্য সুফল পাওয়া যায়। তথাপি এই সুফল প্রাপ্তির পশ্চাতেও যে কলাকৌশল রয়েছে, তাও আমাদের জ্ঞানের সীমানার অন্তরালে রহস্যাবৃত। সেই সব রহস্য সন্ধানের পথে অনেক তথ্যই যেমন জানা গেছে, তেমনি আবার জানাও যায় নি অনেক কিছুই। সেই সব অজানিত রহস্য যত সত্বর উদ্‌ঘাটিত হবে, ততই মানুষের পক্ষে মঙ্গলদায়ক হবে।

নাইলন

শ্রীতুহিনেন্দু সিন্‌হা*

বর্তমান যুগে নাইলনের সঙ্গে প্রায় সকলেরই পরিচয় আছে। দৈনন্দিন জীবনে নাইলনের নানা জিনিষ আমরা ব্যবহার করে থাকি। আমাদের ব্যবহারিক জীবনে যার এত প্রয়োগ, সেই জিনিষটি আসলে কি?

নাইলন সম্বন্ধে কোন কিছু আলোচনা করবার আগে আমাদের দুটি বিষয় সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। প্রথমতঃ এস্টার। যখন কোন জৈব অথবা অজৈব অ্যাসিড অ্যাল-কোহলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে এবং বিক্রিয়ায় জলের অণু বিযুক্ত হয়ে যে যৌগ গঠিত হয়, তাই এস্টার। অ্যালকোহল যখন অজৈব অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে, তখন অজৈব এস্টার তৈরি হয়, অনুরূপভাবে জৈব অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে জৈব এস্টার তৈরি করে। উদাহরণস্বরূপ—



$$CH_2CH_3OH + HCl \rightleftharpoons CH_2CH_3Cl + H_2O$$

অজৈব এস্টার
(ইথাইল ক্লোরাইড)



$$CH_2CH_3OH + CH_3COOH \rightleftharpoons CH_3COO\,C_2H_5 + H_2O$$

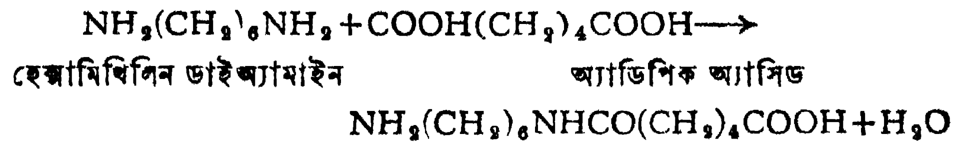
জৈব এস্টার
(ইথাইল অ্যাসিটেট)

এবার আমরা পলিমারিজেশন (Polymerisation) এবং পলিমার (Polymer) কি, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করবো। কোন কোন জৈব যৌগের মধ্যে অণু সমাবেশের একটি বিশেষ রীতি দেখা যায়। তাপ, চাপ ও অনুঘটকের সাহায্যে যদি কোন যৌগের একাধিক অণু পরস্পর সংযুক্ত হয়ে উচ্চতর আণবিক ওজনের যৌগ গঠন করে এবং সেই উচ্চতর যৌগে যৌলগুলির

*কলেজ অব টেক্সটাইল টেকনোলজি, শ্রীরামপুর, হুগলী

পারস্পরিক সংখ্যার অনুপাত যদি অপরিবর্তিত থাকে, তবে সেই প্রক্রিয়াকে বলা হয় পলিমারিজেশন। এই প্রক্রিয়ায় বর্ধিত আণবিক ওজনের যে উচ্চতর পদার্থটি গঠিত হয়, তাকে বলা হয় পলিমার।

নাইলন সম্বন্ধে বলতে গেলে এক কথায় বলা যেতে পারে, এটা একটা পলিঅ্যামাইড। তবে সব সময় আমাদের মনে রাখতে হবে, নাইলন কোন বিশেষ রাসায়নিক নাম নয়, বিশেষ একরকম প্লাস্টিক জাতীয় পদার্থের ব্যবসায়িক ও ব্যবহারিক নাম মাত্র। স্থানভেদে এর নামও পরিবর্তিত হতে পারে। যাহোক, একটা ডাই-অ্যামাইড ও ডাইঅ্যাসিড এক সঙ্গে মিশিয়ে অ্যামাইড তৈরি করা হয়। সাধারণতঃ ডাই-অ্যামাইড হিসাবে হেক্সামিথিলিন ডাইঅ্যামাইন (Hexamethylene diamine) এবং ডাই-অ্যাসিন হিসাবে অ্যাডিপিক অ্যাসিড ব্যবহার করা হয়। বিক্রিয়া ঘটে এইভাবে—



$$NH_2(CH_2)_6NH_2 + COOH(CH_2)_4COOH \longrightarrow$$

হেক্সামিথিলিন ডাইঅ্যামাইন অ্যাডিপিক অ্যাসিড

$$NH_2(CH_2)_6NHCO(CH_2)_4COOH + H_2O$$

এইবার বিক্রিয়ালব্ধ দুটি অণু এক সঙ্গে যুক্ত হয় এবং তার ফলে তৈরি হয়—



$$NH_2(CH_2)_6NHCO(CH_2)_4CONH(CH_2)_6NHCO(CH_2)_4COOH$$

এখন এই বৃহৎ অণুটি নিজেই নিজের সঙ্গে বিক্রিয়া করে এবং অতি জটিল ও বৃহৎ আণবিক ওজনের পলিমার গঠিত হয়। এই বৃহৎ আণবিক ওজনের পলিমারকেই নাইলন বলা হয়। শিল্পক্ষেত্রে এর প্রস্তুতি সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, হেক্সামিথিলিন ডাইঅ্যামাইন ও অ্যাডিপিক অ্যাসিডের জলীয় দ্রবণকে কাঠ-কয়লা বা কার্বনের গুঁড়ার সাহায্যে বিশোধিত ও বর্ণহীন করে নিয়ে তাদের পারস্পরিক বিক্রিয়ায় উৎপন্ন পদার্থকে অটোক্লেভের ভিতর রেখে বিশেষ চাপ ও তাপে পলিমারাইজ করা হয়। পলিমারিজেসনের ফলে উৎপন্ন যৌগটি একটি বিশেষ ঘনত্বে এলে বুঝা যায়, নাইলনের দীর্ঘ শৃঙ্খলাকার বৃহৎ অণুর উৎপত্তি ঘটেছে। এইভাবে উৎপন্ন নাইলন অত্যধিক উজ্জ্বল ও চকচকে হয় বলে এর সুতায় তৈরি কাপড় ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে। তাই এর চকচকে ভাব কমাবার জন্যে উৎপাদন কালে টাইটেনিয়াম ডাই-অক্সাইড নামক পদার্থ মেশানো হয়, যার জন্যে নাইলনের চাকচিক্য ভাব কিছুটা কমে। এই ব্যবহারযোগ্য উজ্জ্বলতা-বিশিষ্ট নাইলনকে বলা হয় ম্যাট নাইলন। উত্তপ্ত তরল অবস্থায় পদার্থটিকে যান্ত্রিক কৌশলে চাপের সাহায্যে সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে চালালে জিনিষটা শক্ত ও কিছুটা স্থিতিস্থাপক সূত্রাকারে বেরিয়ে আসে। সূত্রগুলি রেশম সূত্রের মত শক্ত ও চকচকে হয়।

নাইলন অনেক রকমের আছে। যেমন—নাইলন-66, নাইলন-610 প্রভৃতি। তবে সাধারণতঃ নাইলন হিসাবে যা আমরা ব্যবহার করি, তা হলো নাইলন-66। এই নাইলন-66 তৈরি হয় অ্যাডিপিক অ্যাসিড আর হেক্সামিথিলিন ডাইঅ্যামাইন থেকে। এই পর্যন্ত যত রকমের নাইলন আবিষ্কৃত হয়েছে, তাদের মধ্যে নাইলন-66-ই উৎকৃষ্ট। এই নাইলন-66-এর গড় আণবিক ওজন 12000 থেকে 20,000-এর মধ্যে। যদি এই পলিঅ্যামাইডের আণবিক ওজন 6,000-এর কম হয়, তবে তাকে আর নাইলন বলা হয় না—এমন কি, ঐ প্রকার পলিমারকে আদৌ সুতার আকারে প্রস্তুত করা যায় না। আবার যে সমস্ত নাইলনের আণবিক ওজন 6,000 থেকে 10,000-এর মধ্যে হয়, তাদের সুতার আকারে প্রস্তুত করতে পারলেও সেগুলি অত্যন্ত

দুর্বল ও ভঙ্গুর হয়। আবার পলিমারটির আণবিক ওজন যদি 20,000-এর বেশী হয়, তখন তার তরলীকরণ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে, যার জন্যে একে আর সূতার আকারে প্রস্তুত করা সম্ভব হয় না। অতএব আমাদের ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োজনীয় নাইলনের আণবিক ওজন 12,000 থেকে 20,000-এর মধ্যে রাখা হয়।

নাইলন প্রস্তুত করবার সময় যে কোন অনুপাতে ডাইঅ্যামাইন আর ডাইঅ্যাসিড মিশ্রিত করলে চলবে না। এদের একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে মিশিয়ে একটি নির্দিষ্ট আণবিক ওজনের নাইলন তৈরি করা হয়। আমাদের ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনীয় নাইলন সাধারণতঃ এক অণু ডাইঅ্যামাইন আর 1·02 অণু ডাই-অ্যাসিড (1 : 1·02) মিশিয়ে তৈরি করা হয় এবং এথেকে প্রস্তুত নাইলনের আণবিক ওজন প্রায় 12,000।

সাধারণতঃ নাইলন এভাবে তৈরি করা গেলেও শিল্পক্ষেত্রে কিন্তু এভাবে তৈরি করা হয় না। কারণ এভাবে তৈরি করলে অনেক বেশী খরচ পড়ে, যার জন্যে নাইলনের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়, যা সাধারণ লোকের আয়ত্তের বাইরে। যাহোক, এই পদ্ধতির মূল লক্ষ্য একই, শুধু সরাসরি ডাইঅ্যামাইন অথবা ডাইঅ্যাসিড ব্যবহার করা হয় না। কাঁচামাল হিসাবে ফেনল (Phenol) ব্যবহার করা হয়। তার ফলে সাইক্লোহেক্সানল (Cyclohexanol) প্রস্তুত হয়।

এই সাইক্লোহেক্সানল নাইট্রিক অ্যাসিডের দ্বারা জারিত হয়ে অ্যাডিপিক অ্যাসিড তৈরি করে। জারণকালে বদ্ধ শৃঙ্খলটি ভেঙ্গে যায়।

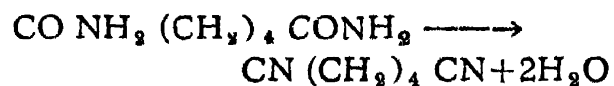
নাইলন প্রস্তুতের জন্যে প্রয়োজনীয় দুটি যৌগের মধ্যে একটি তৈরি হলো, আর দ্বিতীয় যৌগ হেক্সামিথিলিন ডাইঅ্যামাইন তৈরি করা হয়—উৎপন্ন অ্যাডিপিক অ্যাসিড ও অ্যামোনিয়ার সঙ্গে বিক্রিয়া করে অ্যাডিপ্যামাইড (Adipamide) তৈরি করে।



$$COOH\,(CH_2)_4\,COOH+2NH_3 \longrightarrow CO\,NH_2\,(CH_2)_4\,CONH_2+2H_2O$$

অ্যাডিপ্যামাইড।

এই অ্যাডিপ্যামাইডকে উপযুক্ত অনুঘটকের সাহায্যে বিশুষ্ক করা হয় এবং অ্যাডিপোনাইট্রাইল (Adiponitrile) তৈরি করা হয়।



$$CO\,NH_2\,(CH_2)_4\,CONH_2 \longrightarrow CN\,(CH_2)_4\,CN+2H_2O$$

অ্যাডিপোনাইট্রাইল

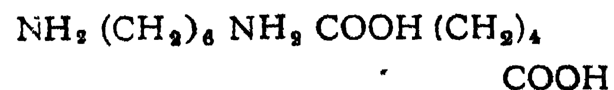
এই অ্যাডিপোনাইট্রাইল অটোক্লেভের মধ্যে কোবাল্ট নাইট্রেট অথবা নিকেলের উপস্থিতিতে জারিত করা হয়। জারিত হয়ে হেক্সামিথিলিন ডাইঅ্যামাইন তৈরি হয়।





$$CN\,(CH_2)_4\,CN+4H_2 \longrightarrow NH_2\,CH_2\,(CH_2)_4\,CH_2\,NH_2$$

এবার আলাদা আলাদা ভাবে মিথানলের সঙ্গে অ্যাডিপিক অ্যাসিড ও হেক্সামিথিলিন ডাইঅ্যামাইন মিশানো হয় এবং ঐ দ্রবণগুলি এক সঙ্গে মিশিয়ে নাইলন লবণ (Nylon salt) অথবা হেক্সামিথিলিন ডাইঅ্যামোনিয়াম অ্যাডিপেট (Hexamethylene diammonium adipate) তৈরি করা হয়।



$$NH_2\,(CH_2)_6\,NH_2\,COOH\,(CH_2)_4\,COOH$$

পরে এই নাইলন লবণকে পলিমারাইজ করে নাইলন প্রস্তুত করা হয়।

এখন আমরা নাইলন কি, কি ভাবে প্রস্তুত করা হয়—সে সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করতে পারলাম। এইবার এর কয়েকটা দোষ-গুণ আলোচনা করা যাক।

নাইলনের বিশেষ কয়েকটি গুণ আছে, যার জন্যে এর এত সমাদর। এর স্থিতিস্থাপকতা গুণ খুব বেশী। নাইলনের সূতা টানলে তার দৈর্ঘ্য

প্রায় পাঁচ গুণ বেড়ে গিয়ে অতি সূক্ষ্ম সূত্রে পরিণত হয়, ছেড়ে দিলে আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে। এর কারণ, পদার্থটির শৃঙ্খলাকার অণুগুলি দীর্ঘায়িত হয়, আর তার ফলে সুতার টানশক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। নাইলন সুতার দৃঢ়তা ও টানশক্তি এত বেশী যে, সমওজনের ইস্পাতের তারের চেয়েও তা অধিকতর টান সহ্য করতে পারে। মাত্র আধ ইঞ্চি মোটা নাইলনের দড়িতে তিন টনেরও বেশী ওজনের জিনিষ স্বচ্ছন্দে ঝুলিয়ে রাখা যায়। নাইলনের সুতা দিয়ে তাই প্যারাসুটের কাপড়, দড়ি প্রভৃতি তৈরি করা হয়। নাইলনের আর একটা বিশেষ গুণ হলো, সাধারণ অবস্থায় মাত্র 5% জল শোষণ করতে পারে। কারণ নাইলনের সুতার ভিতরে জল প্রবেশ করতে পারে না। সেজন্যে নাইলনের তৈরি জামাকাপড় শুকাবার জন্যে বেশী সময় লাগে না। এর আঃ গুঃ 1·14 এবং স্থায়িত্ব মোটামুটি বেশ ভালই। কারণ লঘু কোন অ্যাসিড এর বিশেষ কিছু ক্ষতি করতে পারে না। কিন্তু ঘন অ্যাসিডে এটি বিয়োজিত হয়ে অ্যাডিপিক অ্যাসিড ও ডাইঅ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্লোরাইড তৈরি হয়। ক্ষারের প্রভাবে নাইলন প্রায় অবিকৃত থাকে। কিন্তু ফরমিক অ্যাসিড, ক্রিসল, ফিনল প্রভৃতির মধ্যে নাইলন একেবারে দ্রবীভূত হয়। নাইলনের মধ্য দিয়ে বৈদ্যুতিক প্রবাহ পরিচালিত হয় না, সে জন্যে ভাল অপরিবাহী হিসাবে এর ব্যবহার দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে। তবে নাইলনের জামাকাপড় ব্যবহার করবার সময় কয়েকটা বিষয়ে খুব সজাগ থাকতে হবে, বিশেষতঃ ইস্ত্রি করবার সময়। এর গলনাঙ্ক 250°C, তবে ইস্ত্রি করবার সময় যাতে 180°C-এর বেশী তাপ কোনক্রমে না হয়, তার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে, তা না হলে ইস্ত্রি করবার সময় জামাকাপড় পুড়ে যাবে। আলোর প্রভাবে নাইলনের স্থায়িত্ব নষ্ট হয়। সে জন্যে যতদূর সম্ভব সূর্যের আলো এড়িয়ে চলা ভাল। নাইলনের জামাকাপড় ব্যবহার করবার ফলে কোন প্রকার চর্মরোগ হয় না।

পৃথিবী ও তার আবহাওয়া

মণিকুন্তলা মুখোপাধ্যায়

পৃথিবীর আবহাওয়া বদ্‌লাচ্ছে। বৈজ্ঞানিকেরা বলছেন—পৃথিবীর আবহাওয়ার বদল শুধু আজই হচ্ছে না, এই বদল চলছে পৃথিবীর জন্মকাল থেকেই; অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় 5 বিলিয়ন বছর ধরে পৃথিবীর জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে। জন্মের পর পৃথিবী ধীরে ধীরে শীতল হয়েছে। তারপর 100 মিলিয়ন বছর ধরে পৃথিবীতে মৃদু জলবায়ু ছিল। এরপর এসেছে তুষার যুগ। ভূতাত্ত্বিকদের পরীক্ষা থেকে জানা যায় যে, এমন একটা সময় ছিল, যখন উত্তর গোলার্ধের এক বৃহৎ অংশ তুষারে আবৃত ছিল। যতদূর জানা গেছে, এই তুষার আবরণ চার বার অগ্রসর হয়েছে এবং চার বার পশ্চাদপসরণ করেছে এবং প্রত্যেক বারেই পৃথিবীর আবহাওয়ার গুরুতর পরিবর্তন ঘটেছে। যখন এই হিমবাহ অগ্রসর হয়েছে, তখন দক্ষিণ গোলার্ধ ঠাণ্ডা এবং স্যাঁতসেঁতে জলবায়ুর সম্মুখীন হয়েছে। আবার যখন উত্তর গোলার্ধের তুষার রাশির পশ্চাদপসরণ ঘটেছে, তখন দক্ষিণের জলবায়ু হয়েছে উষ্ণ ও শুষ্ক। বিগত 8,000 থেকে 12,000 বছরের মধ্যে সর্বশেষ হিমবাহের পশ্চাদ-

পসরণ ঘটেছিল। তাহলে ঐ সময় পৃথিবী ছিল তুষারমুক্ত। তারপর 12,000 বছর ধরে ধীরে ধীরে পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণের মেরু অঞ্চলে তুষার সঞ্চিত হতে সুরু করেছে। বর্তমানে উত্তর মেরুর গ্রীনল্যাণ্ডের 840 হাজার বর্গমাইলের প্রায় 640 হাজার বর্গমাইল পরিমিত অঞ্চলই তুষারে আবৃত। এই তুষারের গভীরতা কোথাও কোথাও বোধ হয় 1 মাইলের মত। দক্ষিণ মেরুর তুষার আবরণের আয়তন কিন্তু আরো অনেক বৃহৎ। দক্ষিণ মেরুর প্রায় 5 মিলিয়ন বর্গমাইল পরিমিত স্থান তুষারাচ্ছন্ন।

তুষার যুগে চারবার হিমবাহের অগ্রগতি ও পশ্চাদপসরণ ঘটেছিল; অর্থাৎ তুষার যুগ চার বার সুরু ও চার বার শেষ হয়েছিল। কিন্তু কেন? তুষার যুগের এই সুরু বা শেষ হবার কারণ কি? বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের হ্রাস বা বৃদ্ধি, অর্থাৎ বাতাসের উত্তাপ হ্রাস বা বৃদ্ধিই তুষার যুগের সুরু বা অবসানের প্রধান কারণ। জলবায়ুর এই দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তনের কারণ দুটি প্রাকৃতিক ক্রিয়ার মধ্যে সীমিত থাকাই সম্ভব।

(1) যদি বেশী পরিমাণে অগ্ন্যুৎপাত হয়ে থাকে, তবে বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং পৃথিবী অধিক উত্তপ্ত হয়েছিল। ফলে পৃথিবীর উপরের হিমবাহের গলন সুরু হওয়া স্বাভাবিক। তাহলে হিমবাহের পশ্চাদপসরণ এই ভাবেই সম্ভব হতে পারে।

(2) আবার হয়তো পর্বত সৃষ্টির যুগে, যখন আজকের বড় বড় পাহাড়-পর্বতগুলি সবে তৈরি হতে সুরু করেছে, তখন বহু নতুন এবং বায়ুর সংস্পর্শে না-আসা শিলা বায়ুর সংস্পর্শে এসে বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইড হ্রাসে সাহায্য করেছিল এবং বায়ুর এই উত্তাপ হ্রাস পাওয়ার ফলে ভূপৃষ্ঠে তুষার সঞ্চিত হতে থাকে, অর্থাৎ তুষার যুগের সূচনা হয়।

গত 5 বিলিয়ন বছর ধরে পৃথিবীর জলবায়ুর যে পরিবর্তন হয়েছে, তার কারণ সম্পূর্ণ প্রাকৃতিকই ছিল, মানুষের তাতে কোন অংশই ছিল না। কিন্তু পৃথিবীর জলবায়ুর আগামী পরিবর্তনের জন্যে মানুষই বোধ হয় সম্পূর্ণরূপে দায়ী হবে। বর্তমান সভ্যতা ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ পৃথিবীর জলবায়ুকে এক চরম পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে মানুষ যে বিরাট পরিবর্তনের ঝুঁকি নিচ্ছে, তাতে আগামী 50 বছরের মধ্যে পৃথিবীর আবহাওয়া হয়তো এমন পাল্টে যাবে, যাতে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা যথেষ্টভাবে বিঘ্নিত হবে।

নানা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও কলকারখানার ময়লা আর পোড়াকয়লা এবং পেট্রোলের ধোঁয়া অহরহ বিপজ্জনকভাবে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে দূষিত করছে এবং আবহাওয়াকে পরিবর্তিত করছে। কিন্তু তা ছাড়াও বিচলিত হবার কারণ রয়েছে—পৃথিবীর বুকে যে সব বড় বড় পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হচ্ছে বা নেবার কথা চিন্তা করা হচ্ছে, সেগুলির পরিণতির মধ্যে।

পেট্রোলিয়ামের সন্ধানে এবং খাদ্য ও বাসস্থানের প্রয়োজনে অনেক দেশই এখন সাহারা মরুভূমিকে শ্যামল প্রান্তরে রূপান্তরিত করবার কথা চিন্তা করছেন। কিন্তু সাহারার রূপান্তরের ফলে পৃথিবীর অন্যান্য অংশের আবহাওয়ার যে কি ভীষণ পরিবর্তন হতে পারে, তা কল্পনাতীত। বালুকাময় সাহারা যদি শ্যামল হয়ে ওঠে, তবে বৃটেন এবং পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি গ্রীনল্যাণ্ডের মত তুষারাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে। সোভিয়েট ইউনিয়নের উত্তরবাহী নদীগুলি অর্থাৎ সাইবেরিয়ার নদীগুলিতে (ওব, ইউনেসি ও লেনা) বছরে প্রায় নয় মাস তুষার জমে থাকে। বছরের কোন সময়ই ঠিক নাব্য নয়। সোভিয়েট দেশ যদি এখন নদীগুলিকে নাব্য করে তোলবার উদ্দেশ্যে তাদের

পরিবর্তন করে নতুন পথে প্রবাহিত করে গতিপথ এবং গ্রীনল্যাণ্ডের তুষার গলিয়ে ফেলে তাদের তুষারমুক্ত করে, তবে উত্তর আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপের পক্ষে তা ক্রমে বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কারণ, সাইবেরিয়ার জলবায়ুর এই পরিবর্তনের ফলে সমগ্র উত্তর গোলার্ধের জলবায়ুর চরম পরিবর্তন ঘটবে। সমগ্র উত্তর আমেরিকা হয়ে পড়বে আলাস্কার মত হিমশীতল আর পশ্চিম ইউরোপ হবে সম্পূর্ণ শুষ্ক। মানুষের উপকারের জন্যেই বর্তমানে কৃত্রিম উপায়ে জলসেচের সাহায্যে কৃষিকার্যে বহু উন্নতি সাধন করা হয়েছে, কিন্তু এর ফলে মানুষের অপকারও কম হয় নি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সেচের প্রয়োজনে খাল, বিল কেটে নদীর জল যে ভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, তাতে আগে যে পরিমাণ জল বাষ্পরূপে বায়ুতে মিশতো, তার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণ জল প্রতিদিন এই সব বিস্তৃত জলাশয় থেকে বাষ্পীভূত হয়ে যাচ্ছে এবং এর ফলে পৃথিবীতে বৃষ্টির পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। শহরের অগণতি কলকারখানাগুলিও প্রতিদিন বেশ কিছু পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড বাতাসে মেশাচ্ছে এবং বায়ু উত্তাপ বৃদ্ধি করছে। এর ফলে বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ এবং আবহাওয়ার উত্তাপ যে ভাবে বেড়ে যাচ্ছে, তাতে আশঙ্কা করা যাচ্ছে, হয়তো আগামী 50 বছরের মধ্যেই পৃথিবীর আবহমণ্ডলের উত্তাপ প্রায় তিন ডিগ্রীর মত বৃদ্ধি পাবে। এই তিন ডিগ্রী উত্তাপ বৃদ্ধিই হিমবাহের অপসারণের পক্ষে যথেষ্ট। কাজেই এই পরিমাণ উত্তাপ বৃদ্ধি পেলেই কুমেরু ও গ্রীনল্যাণ্ডে বিশাল হিমমুকুট গলে কুমেরু ও গ্রীনল্যাণ্ড উন্মুক্ত শিলায় পরিণত হবে।

ভবিষ্যতে আবহাওয়ার এই পরিবর্তন বিশ্বের বৈজ্ঞানিকদের কাছে একটা বিরাট সমস্যা ও আশঙ্কার কারণ হয়ে উঠবে। তাঁদের ধারণা, পৃথিবীর জীবকুলের উপর এই আবহাওয়ার প্রতিফলন খুব শুভ হবে না।

সমাজ-বিজ্ঞানে গবেষণার বিভিন্ন ধারা

মিনতি চক্রবর্তী

বর্তমান প্রবন্ধে আমাদের আলোচনার বিষয়-বস্তু হলো—কি উপায়ে সমাজ-বিজ্ঞানীরা তাঁদের তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন। সমাজ-বিজ্ঞানীর পরীক্ষাগার হলো মানব সমাজ আর বিভিন্ন মানুষ হলো তাঁদের পরীক্ষিত বস্তু বা যন্ত্রপাতি। বিভিন্ন মানুষের প্রকৃতি বিভিন্ন। কেউ বেশী কথা বলে, কেউ বা কম কথা বলে, আবার কেউ মিথ্যা কথা বেশী বলে, কারও মেজাজ সপ্তমে চড়া আবার কেউ বা খুবই ঠাণ্ডা মেজাজের লোক। সুতরাং এই বিভিন্ন যন্ত্রপাতিরূপ মানুষকে নিয়ে কাজ করা খুব ধৈর্য ও সহনশীলতার ব্যাপার। সুতরাং সমাজ-বিজ্ঞানীকে খুব সন্তর্পণে মাথা ঠাণ্ডা রেখে তাঁর কাজে এগিয়ে যেতে হবে, কারণ তার পর্যবেক্ষণ ভুল হলে তাঁর তথ্য গ্রহণ হবে ভুল। আমরা এখনও পর্যন্ত এমন কোন যন্ত্র আবিষ্কার করতে সক্ষম হই নি, যার মধ্যে ধরা পড়বে পরীক্ষাধীন মানুষ ঠিক উত্তর দিচ্ছে, না সত্যকে চাপা দেবার জন্যে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে সমাজ-বিজ্ঞানীকে বিপথে চালিত করছে। সুতরাং সব দিক চিন্তা করে সমাজ-বিজ্ঞানীকে তথ্য গ্রহণ সুরু করতে হবে

এখন আলোচনা করা যাক, সমাজতত্ত্বের তথ্য গ্রহণের জন্যে কি কি কৌশল অবলম্বন করা হয়।

সুপরিকল্পিত পরীক্ষা

বিজ্ঞানের সব শাখাই এই পদ্ধতি অনুসরণ করে। পরীক্ষাটি খুব সহজ। এই পরীক্ষায় দুটি গোষ্ঠীর প্রয়োজন হয়। একটি পরীক্ষাধীন গোষ্ঠী (Test group) ও অপরটি নিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠী (Control group)। যাদের উপর পরীক্ষা করা হবে, সেই রকম কয়েকজন মানুষকে রাখা হয় পরীক্ষাধীন গোষ্ঠীর মধ্যে আর অন্য কয়েকজন মানুষকে রাখা হয় নিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর মধ্যে। এখন দুই গোষ্ঠীর মধ্যে যে পার্থক্য হবে, তা থেকে পরীক্ষার ফলাফল স্থির করা হয়। নীচে পদ্ধতিটি বর্ণনা করা হচ্ছে :—

অপরাধপ্রবণতার সংস্কার সাধনের জন্যে আমরা একটা পরীক্ষা স্থির করলাম। যে অপরাধীদের উপর পরীক্ষার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তাদের পরীক্ষাধীন গোষ্ঠী এবং যে অপরাধীদের উপর কোনও পরীক্ষার ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি, তাদের নিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর মধ্যে ফেলা হলো। এখন আবার আর এক অপরাধীর দল, যাদের উপর কোন পরীক্ষার ব্যবস্থা আরোপিত হয় নি, তাদেরও নিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর মধ্যে ফেলা হলো। ঐভাবে বিভিন্ন দলকে দুই গোষ্ঠীতে পরপর রেখে পরীক্ষার ফলাফল জানা হলো। এভাবে পরীক্ষার জন্যে বিভিন্ন রকমের গোষ্ঠী নির্বাচন করবার ফলে গবেষকের পক্ষে মোটামুটি নির্ভুল ফল পাওয়া সম্ভব।

কখনও কখনও গবেষণার পরিস্থিতি অনুযায়ী তৈরি পরীক্ষাধীন ও নিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর সহায়তা নেওয়া হয়। এই সম্পর্কে এক সুন্দর উদাহরণ এখানে দেওয়া যেতে পারে :—

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় একটা খুব বড় প্রশ্ন দেখা দেয় যে, নিগ্রো ও শ্বেতাঙ্গদের পৃথক শ্রেণীভুক্ত করা হবে কিনা। কিছু পরীক্ষিত একক স্থির করা হলো। কিছু সৈন্যগোষ্ঠীকে রাখা হলো শ্বেতাঙ্গ ও নিগ্রো পৃথক পৃথক করে আর কিছু সৈন্যগোষ্ঠীকে রাখা হলো শ্বেতাঙ্গ ও নিগ্রো মিশ্রিত করে। কিছুদিন পরে এই সব সৈন্যের অধিকর্তাদের জিজ্ঞাসা করা হলো, এরকম মিশ্রণে তাঁদের অভিজ্ঞতা কি? উত্তরে তাঁরা জানিয়েছিলেন যে, যাঁরা পৃথক আছেন, তাঁদের তুলনায় মিশ্রিত দলের সৈন্যেরা অধিকতর কর্মনিপুণ। এই পরীক্ষা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, জোর করে যে সংস্পর্শ ঘটানো যায়, তাতে মানুষের মনোভাবের অনেক পরিবর্তন ঘটে। তাছাড়া তৈরি পরীক্ষিত ও নিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর সহায়তায় জানা গেল—মিশ্রিত ও অমিশ্রিত গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য কি। এই উদাহরণ আরও প্রমাণ করে যে, সমাজ-বিজ্ঞানে সুপরিকল্পিত পরীক্ষা যে জ্ঞানের অনুসন্ধান দেয়, তা বাস্তব সামাজিক নীতি তৈরির পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

সমাজ-বিজ্ঞানে সুপরিকল্পিত পরীক্ষাকে কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। হাজার লোককে নিয়ে কোনও পরীক্ষা করতে গেলে তা ব্যয়সাপেক্ষ ও অনেক সময়ের প্রয়োজন। লোক যখন বুঝতে পারে তাদের নিয়ে পরীক্ষা করা হবে, তখন তারা পরীক্ষক বা গবেষকের সঙ্গে অসহযোগমূলক আচরণ করতে সুরু করে। এতে পরীক্ষার প্রভূত ক্ষতিসাধিত হয়। মানুষ যখন জানতে পারে না পরীক্ষার আসল উদ্দেশ্যটি কি, তখন তার কাছ থেকে যে ফল পাওয়া যাবে, তা আর কোন কিছুর মাধ্যমেই সম্ভব হয় না। এজন্যে তাকে কৌশলে এমন এক যুক্তি দেওয়া হবে, যাতে সে বুঝতে না পারে, পরীক্ষার আসল লক্ষ্যটি কি এবং পরীক্ষক কি করছে। তবে এই যুক্তিটি এমন হতে হবে যে, তা তার পক্ষে মোটেই ক্ষতিকারক নয়।

পর্যবেক্ষণমূলক পাঠ

এই পরীক্ষা অনেকটা সুপরিকল্পিত পরীক্ষার মত। সুপরিকল্পিত পরীক্ষাকে এমনভাবে সাজানো হয়, যাতে কোন কিছু ঘটে তারপর তা লক্ষ্য করা হয়। কিন্তু পর্যবেক্ষণের পরীক্ষায় যা নিজ থেকে ঘটছে বা ঘটে গেছে, বিজ্ঞানী তা লক্ষ্য করেন, কিন্তু উভয়ই নির্ভরশীল রীতিবদ্ধ পর্যবেক্ষণের উপর নিয়ন্ত্রিত সর্তে। উভয় পদ্ধতি সমস্ত পরীক্ষাতেই ব্যবহৃত হয়, কিন্তু কৌশলের একটু হেরফের হয় বিষয়বস্তুর তারতম্যের উপর।

ধারণাভিত্তিক পাঠ

এই পদ্ধতিটির মূলে হলো অনিয়মিত বর্ণনা ও বিশ্লেষণমূলক সিদ্ধান্ত, যা পর্যবেক্ষণের উপর গঠিত এবং অপেক্ষাকৃত কম নিয়ন্ত্রিত। মনে করা যাক, কোনও এক সমাজ-বিজ্ঞানী পারিবারিক সংগঠনের উপর কাজ করছেন। তিনি রাশিয়া ভ্রমণে গেলেন। তিনি রাশিয়ার মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করলেন, বিভিন্ন পত্রিকা থেকে পারিবারিক জীবনের ছবি পৃথক করলেন এবং বাড়ী ফিরলেন তিনি রাশিয়ার পারিবারিক জীবন সম্পর্কে এক নির্দিষ্ট ধারণা নিয়ে। কিন্তু এই যে তথ্যগুলি সমাজ-বিজ্ঞানী সংগ্রহ করলেন, তা কোনও নিয়মিত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের উপর নির্ভর করে নয়, প্রকাশিত সাহিত্য, অনুসন্ধান ও সংবাদ-দাতার কাছ থেকে প্রাপ্ত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত তথ্যের উপর নির্ভর করে। এখন বিচক্ষণ, দায়িত্ব-শীল ও সুকৌশলী গবেষক তাঁর উপসংহার তৈরি করবেন এই তথ্যের সঙ্গে তাঁর ধারণা, অভিজ্ঞতা ও চিন্তাধারাকে মিশ্রিত করে। যখন সংগৃহীত তথ্য পর্যবেক্ষকের ধারণাকে অন্তর্ভুক্ত করে, তখন তাকে ধারণাভিত্তিক পাঠ (Impressionistic study) হিসাবে গণ্য করা হয়।

সমাজ-বিজ্ঞানে এই পাঠের প্রয়োজন এক-দিকে খুব বেশী। এই পদ্ধতি অনুসন্ধানের তথ্যের উপর অনেক প্রকল্প ও মন্তব্য করতে বিশেষ সাহায্য করে এবং গবেষকের গভীর অন্তর্দৃষ্টির ইঙ্গিত দেয়, যা অন্য পদ্ধতির মাধ্যমে অনেক সময় সম্ভব হয় না।

পরিসংখ্যানগত তুলনামূলক পাঠ

শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতিটি পাঠ, যা কোনও পরীক্ষার মাধ্যমে দেখা হয়েছে বা কোথাও প্রকাশিত হয়েছে, গণবিদ্যার মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করা থাকে। প্রতিটি সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধানকেই এই গণবিদ্যার উপর নির্ভর করতে হয়। গণ-বিদ্যার এই তথ্য গবেষককে তুলনামূলক আলোচনা করতে ও একনজরে বিভিন্ন তথ্যের ফলাফল দেখতে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

কখনও কখনও গবেষককে কোনও এক বিশেষ সমস্যাকে যাচাই করে দেখবার জন্যে সোজাসুজি-ভাবে গণবিদ্যার তথ্যের সাহায্য নিতে হয়। যেমন গবেষককে এক প্রশ্নের উত্তর গণবিদ্যার সাহায্যে দেখতে হবে। প্রশ্নটি হলো, কেন কিছু বিবাহ অন্যান্য বিবাহ অপেক্ষা বেশী সুখের হয়? এই প্রশ্নের উত্তরের জন্যে কয়েক শত বিবাহিত দম্পতিকে বিভিন্ন পরিমাপে পৃথক পৃথক শ্রেণীভুক্ত করা হলো। এখন এই পৃথক পৃথক শ্রেণীগুলির একটিকে অপরটির সঙ্গে তুলনা করা হলো ডজন-খানেক বিষয়ের উপর ভিত্তি করে। এতে দেখা গেল, কিছু সুখী ও অসুখী বিবাহিত দম্পতি পৃথক শ্রেণীভুক্ত হয় তাদের পশ্চাৎ ঘটনাকে কেন্দ্র করে, আর কিছু হয়তো বা তাদের ব্যক্তিত্বের পার্থক্যের জন্যে। এও লক্ষ্য করা গেল যে, দুই দলের পার্থক্য এত বেশী যে, একটির সঙ্গে অপরটির মিল খুব কম। তুলনামূলক আলোচনার জন্যে গবেষকের কাছে এই পদ্ধতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্নভিত্তিক ও পারস্পরিক সাক্ষাৎমূলক পাঠ

এই পদ্ধতিতে সংবাদদাতাকে সোজাসুজি

প্রশ্ন করে সেই উত্তরের উপর নির্ভর করে তথ্য সংগৃহীত হয়। পদ্ধতিটি বৈজ্ঞানিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে এক সুসংবদ্ধ পথ। এই পদ্ধতিতে যে প্রশ্নতালিকাগুলি তৈরি হবে, তা সংবাদদাতাকে নিজে পূর্ণ করতে হয় বা তার সামনে প্রশ্ন-কারীকে পূর্ণ করতে হয়। কিন্তু এই পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহে একটি বড় অসুবিধা আছে এবং গবেষকের কর্তব্য সেদিকে বিশেষ নজর রাখা। এই পদ্ধতিতে একদিকে যেমন বাস্তব সংবাদ পাওয়া খুব সহজ, অন্যদিকে তেমন বিভিন্ন মানুষের মনোভাব ও মতের পার্থক্য হওয়ায় তথ্য ভুল হওয়া সম্ভব। সংবাদদাতা অনেক সময় প্রশ্ন নাও বুঝতে পারেন বা তারা অনেক প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যাবার জন্যে মিথ্যা বলতে পারেন। অনেক সংবাদদাতা বেশী কথা বলার দরুণ আসল উত্তর না দিয়ে তা অনেক রংচং দিয়ে বাড়িয়ে বলতে পারেন। সুতরাং এই পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করতে হলে উত্তরদাতার মনস্তত্ত্ব আগে বিশ্লেষণ করে তারপর তার উত্তরের উপর তথ্য সংগ্রহ করা উচিত। সুতরাং গবেষককে এই পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করবার সময় খুব বেশী সতর্ক থাকতে হবে—একমাত্র এই পদ্ধতিতে সংগৃহীত তথ্যের উপর নির্ভর করে কোনও মন্তব্য করা উচিত হবে না। তবুও এই পদ্ধতি প্রয়োগের বিশেষ প্রয়োজন আছে। কারণ এই পদ্ধতির মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য কল্পনা শক্তি অপেক্ষা অনেক বেশী বাস্তব।

অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষক পাঠ

এই পদ্ধতিতে গবেষককে নিজে তিনি যে বিষয়ের উপর তথ্য সংগ্রহ করবেন, তাতে অংশ গ্রহণ করে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। যদি কোনও গবেষক ইচ্ছা করেন শ্রমিক সমিতি (Labour union) সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে, তখন তিনি শ্রমিক সমিতির একটির মধ্যে নিজে যোগদান করে কারখানায় কাজ করবেন। যদি তিনি কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠান, বিবাহ বা কোনও পূজা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে চান, তবে তিনি সেই অনুষ্ঠানগুলিতে যোগদান করে আন্তরিকতার সঙ্গে অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ও কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক হয়ে তথ্য সংগ্রহ করবেন। এই পদ্ধতির মাধ্যমে যে তথ্য সংগ্রহ করা যায়, কোনও বাহ্যিক পর্যবেক্ষণ সেই তথ্য দিতে সক্ষম নয়।

এই পদ্ধতির কিছু অসুবিধার দিক আছে। অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষক কোনও অনুষ্ঠানে আবেগের প্রভাবে এমনভাবে জড়িয়ে পড়তে পারেন, যা তাঁকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারে বা এমনও হতে পারে যে, তিনি যে গোষ্ঠী দেখছেন, তা সব গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেই এক বলে তাঁর মনে হতে পারে।

আমাদের দেশে এই পদ্ধতির ব্যবহার এখনও পর্যন্ত খুব ব্যাপক নয়। যেমন ধরা যাক, কোনও এক ধর্মীয় বিপ্লবে কি ঘটে থাকে, কি ঘটে এক দাঙ্গায় বা যুদ্ধের পরে যুদ্ধক্ষেত্রে? এই সব ক্ষেত্রে হাতে কলম-পেন্সিল নিয়ে খুব কম সমাজ-বিজ্ঞানীই উপস্থিত থাকেন। এসব স্থানে সাধারণতঃ যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের চাক্ষুষ বর্ণনার উপর নির্ভর করে তথ্য সংগৃহীত হয়। এই চাক্ষুষ বর্ণনারও মূল্য আছে, যদিও তা অনভিজ্ঞ পর্যবেক্ষকের, কিন্তু সেই ঘটনার পরেই পর্যবেক্ষকের কাছ থেকে যদি তথ্য সংগ্রহ করা যায়, সেই তথ্য তথ্যানুসন্ধানের ক্ষেত্রে এক প্রয়োজনীয় উৎস।

ঘটনাভিত্তিক পাঠ

যখন কোনও ব্যক্তির জীবনবৃত্তান্ত বা কোনও প্রাচীন ঘটনার উপর নির্ভর করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়, তখন তাকে বলে ঘটনাভিত্তিক পাঠ (Case-study)। কোন এক বিশেষ ব্যক্তির

ঘটনামূলক ইতিহাস (Case-history) থেকে এক পরিবার, এক গোষ্ঠী, এক সমিতি বা এক ধর্মীয় আন্দোলনের উপর অনেক মন্তব্য করা যেতে পারে। এই পাঠের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান জিনিষ হলো কোনও প্রকল্পের উপর মন্তব্য করা। কোনও একটি ঘটনাভিত্তিক পাঠের তথ্যের উপর নির্ভর করে সাধারণ শ্রেণীবিভাগ করা যায় না, সাধারণ শ্রেণীবিভাগ করতে হলে সযত্নে সংগৃহীত প্রচুর ধারাবাহিক তথ্যের (Processed data) প্রয়োজন।

উপরে বর্ণিত পদ্ধতিগুলির মধ্যে পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহের মত আমাদের দেশে এখনও সবগুলিকে অবলম্বন করা হয় না। আমাদের দেশে যে পদ্ধতিগুলির মাধ্যমে সাধারণতঃ তথ্য সংগৃহীত হয়ে থাকে, সেগুলি হলো পর্যবেক্ষণমূলক পাঠ, প্রশ্নভিত্তিক ও পারস্পরিক সাক্ষাৎমূলক পাঠ, অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষক ও ঘটনাভিত্তিক পাঠ।

চোখে আলোর অনুভূতি

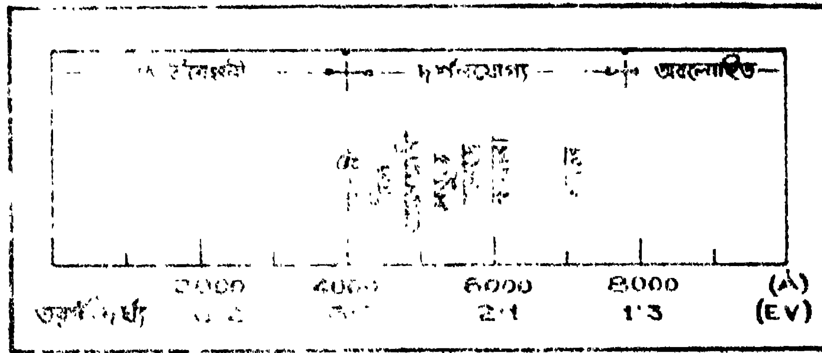
যোগেন দেবনাথ*

এক জোড়া চোখ, সূর্যের আলো আর বস্তুজগৎ—এই তিনের অস্তিত্বে বহির্জগতের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ। চাঁদ ঝলসানো রুটি, না অফুরন্ত সৌন্দর্যের কবি-কল্পনা—চোখ বা আলো না থাকলে এর কোনটারই মূল্য নেই। বস্তু থেকে ফিরে আসা আলো চোখে পড়ে বলেই তো বস্তুর হরেক রকম বৈচিত্র্য মানুষের কাছে ধরা পড়ে। তবে আলো নিছক চোখে এসে পড়লেই যে কোন বস্তুর দর্শনের অনুভূতি জাগবে—এমন কথা কেউ হলফ করে বলতে পারেন কি? পারেন না। কেন না, আলো চোখে এসে পড়া এবং অনুভূতি জাগবার মধ্যে যে রহস্যের বেড়াজাল রয়েছে, তার সঠিক সমাধানের উপরই নির্ভর করে কোন বস্তুর অনুভূতির ব্যাপারটা। ক্যামেরার মত চোখের অভ্যন্তরেও রয়েছে আলোকগ্রাহী একটি পর্দা, নাম তার রেটিনা বা অক্ষিপট। এই পর্দায় আলো কোন বস্তুর যে নিয়মমাফিক প্রতিবিম্ব বা ইমেজ সৃষ্টি করে তারও কিন্তু কানাকড়ি দাম নেই, যদি না পর্দায় অবস্থানকারী আলোক গ্রাহক-কোষে আলোর শোষণ ঘটে এবং সেখানে আলোক-শক্তির রূপান্তর ঘটে। আলোক গ্রাহক-কোষ ট্রান্সডুসারের মতই কাজ করে। রেটিনায় শোষণকারী আলোক-শক্তিকে তারা তাপ, রাসায়নিক ও তড়িৎ-শক্তিতে রূপান্তরিত করে—সৃষ্টি হয় স্নায়ু-প্রবাহের। এই স্নায়ু-প্রবাহ সুবাহী অপ্টিক স্নায়ুর মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে। মস্তিষ্কের মত এমন সুদক্ষ বৈচিত্র্যময় কম্পিউটর মানুষ আজও সৃষ্টি করতে পারে নি। সেখানে স্নায়ু-প্রবাহের হিসাব-নিকাশ ও বিচার-বিশ্লেষণ চলে। গড়ে উঠে বস্তুর রং, রূপ ও বৈচিত্র্যে ভরা নিখুঁৎ ও নির্ভেজাল ইমেজ বা ইমেজের অনুভূতি—যাকে আমরা বলি দেখা। আর একটা জিনিষও লক্ষ্য করা গেছে—চোখে এসে পড়া আলোকে যে পরিমাণ শক্তি থাকে, স্নায়ু-প্রবাহের সঙ্গে জড়িত শক্তি তার চেয়ে অনেক বেশী। কেন এই বৈষম্য? নিশ্চয়ই চোখে আলো শোষণের

* শারীরতত্ত্ব বিভাগ, মেদিনীপুর কলেজ, মেদিনীপুর

পর স্নায়ু-প্রবাহ শুরু হওয়া পর্যন্ত পর পর কতকগুলি অতি অবশ্যিক ঘটনা ঘটে, যার ফলে শক্তির এই তারতম্য হয়ে থাকে।

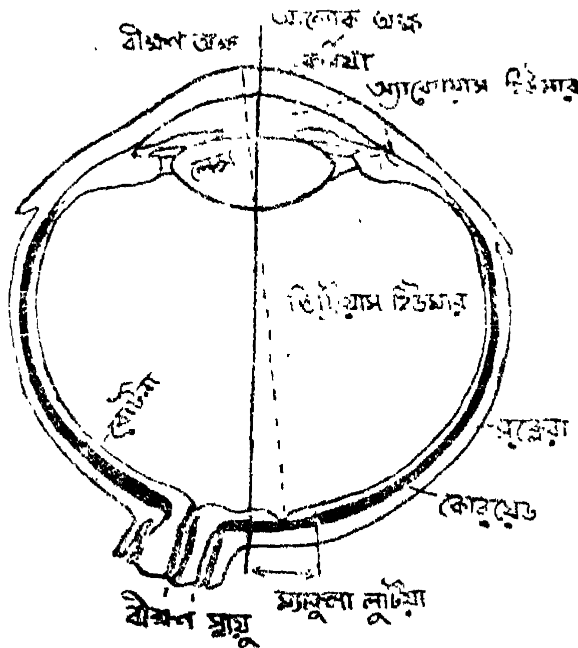
বস্তু থেকে ফিরে আসা কতটুকু আলো চোখে পড়লে বা নিদেনপক্ষে কি পরিমাণ আলোক-শক্তির রূপান্তর ঘটলে কোন বস্তুর শুধুমাত্র অনুভূতি জাগতে পারে? সব তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলো সমান শক্তির অধিকারী নয়। শক্তির হেরফের ঘটে তাদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের কম-বেশীতে। একটা আলোকণায় যে শক্তি নিহিত থাকে, তার পরিমাণ করা চলে শক্তিসূত্র থেকে অর্থাৎ $E=h\upsilon$, যেখানে h-কে বলা হয় প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক, যার মান আর্গ এককে মাপলে $6{\cdot}62\times10^{-27}$ আর্গ হয় এবং ইলেকট্রন ভোল্টে মাপলে 4·13 ইলেকট্রন ভোল্ট হয়। υ-কে বলা হয় কম্পনাঙ্ক, যা আলোর গতিবেগ ও আলোকণার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের ভগ্নাংশ-বিশেষ অর্থাৎ c/λ। স্পষ্টতঃই দেখা যাচ্ছে, তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য কম হলে আলোকণার মধ্যে নিহিত অনুভূতি জাগাতে সক্ষম নয়। বেগুনী থেকে লাল রঙের যে সাতটা আলো দর্শনের অনুভূতি জাগাতে পারে, তাদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য 4000Å থেকে 7500Å [এক $Å=10^{-8}$ সে. মি.] পর্যন্ত সীমিত [1নং ছবি]। এদের তাই দৃশ্য আলোর পর্যায়ে ফেলা হয়। অতিবেগুনী রশ্মি—যাদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য 4000Å থেকে নীচের দিকে এবং যাদের শক্তির পরিমাণ বেশী, তারাও কিন্তু দর্শনের অনুভূতি জাগাতে পারে না। তেমনি পারে না কম শক্তিসম্পন্ন অবলোহিত রশ্মি, যাদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য 7500Å থেকে উপরের দিকে। অবশ্য অতিবেগুনী রশ্মিকে সরাসরি রেটিনাতে ফেলে দেখা গেছে, তারা অনুভূতি জাগাতে সক্ষম। সাধারণভাবেই বা তা সম্ভব নয় কেন? কারণ অবশ্য রয়েছে। পৃথিবীর ঠিক উপরিভাগে অতিবেগুনী রশ্মির পরিমাণ খুব কম। দেখা গেছে মাত্র 2950Å তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলো অতি কষ্টে পৃথিবীর ঠিক উপরে পৌঁছুতে



1নং চিত্র

শক্তির পরিমাণ থাকে বেশী, তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বেশী হলে ঘটে তার বিপরীত। অবশ্য একটি মাত্র আলোকণাতে আলোক-শক্তির পরিমাণ নিতান্তই সামান্য। তবে দলে ভারী হলে এই প্রশ্ন অবান্তর। আবার সব তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলো দর্শনের পারে। অবশ্য পৃথিবী ও সূর্যের দূরত্বের তারতম্যে খানিকটা হেরফেরও ঘটে। এর চেয়ে কম দৈর্ঘ্যের আলোকণা ঠিক পৃথিবীপৃষ্ঠে এসে পৌঁছুতে পারে না। কারণ তাদের প্রতিবন্ধকতা অনেক। পৃথিবীর আবহাওয়ায় এসে পড়বার পরেই

তাদের শোষণ করে গ্যাস, অতি উচ্চে অবস্থানকারী ওজন স্তর (Ozone layer) এবং জলীয় বাষ্প। এমন কি, ধূলিকণাও তাদের ইতস্তত: ছড়িয়ে দেয়। বায়ুকণাগুলিও নানাভাবে বাধার সৃষ্টি করে। এর পরেও বাধা আসে। দেখা গেছে 3000Å কম দৈর্ঘ্যের সব আলোকণাকেই চোখের ভিতরকার লেন্স শোষণ করে নেয়। তেমনি 13000Å-এর বেশী তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সব আলোকে শোষণ করে নেয় চোখের ভিতরকার স্বচ্ছ তরল পদার্থ অ্যাকোয়াস হিউমার ও ভিট্রিয়াস হিউমার (2নং ছবি)। এই দু-রকমের আলো চোখের



2নং চিত্র

আলোক-সুগ্রাহী পর্দা রেটিনাতে গিয়ে পৌঁছুতে পারে না এবং আলোক গ্রাহক-কোষের দ্বারা শোষিত হতে পারে না। শোষণ না হলে শক্তির রূপান্তর ঘটে না। অতিবেগুনী ও অবলোহিত রশ্মি তাই দর্শনের অনুভূতি জাগাতে পারে না। কিন্তু চোখে এসে-পড়া সব দৃশ্য আলোই কি রেটিনাতে পৌঁছুতে পারে, না অনুভূতি জাগাতে পারে? না, তাও পারে না।

চোখের কর্মকাণ্ডের পদ্ধতি সম্বন্ধে আর একটা কথা জানা প্রয়োজন। সাধারণ আলোতে চোখের কাজকর্মের পদ্ধতি এক রকম, আবছা আলোতে অন্য রকম। প্রথম প্রকারে বেশী পরিমাণ আলো চোখে এসে পড়া চাই। কোন বস্তুকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখা ও তার রং, রূপ ও বৈচিত্র্যকে সুস্পষ্ট ও আলাদা করে বিচার-বিশ্লেষণ করা এবং বোঝবার জন্যে এর প্রয়োজন। অপর পক্ষে আবছা আলোতে শুধুমাত্র আলো-আঁধারের অনুভূতি জাগানোই চোখের কাজ। এই দু-রকম কাজের জন্যে দু-রকম গ্রাহক-কোষ রয়েছে রেটিনাতে। উজ্জ্বল আলোতে যারা সক্রিয়, তাদের বলা হয় কোণ্ (Cone) গ্রাহক-কোষ। আবছা আলোতে এরা নিস্তেজ ও নিষ্ক্রিয়। [1নং তালিকা]। আবছা আলোয় যারা সুদক্ষ ও কর্মচঞ্চল, তাদের নাম রড্ (Rod) গ্রাহক-কোষ। সাধারণ বা স্বাভাবিক আলোতে তারা অকেজো। এই দু-প্রকার গ্রাহক-কোষ কিন্তু রেটিনায় সমভাবে ছড়িয়ে নেই, চোখের পশ্চাৎ মেরুতে

1নং তালিকা

মিলি ল্যাম্বার্টে আলোর উজ্জ্বলতা		
0·0000001	চোখ সওয়া অন্ধকারে দর্শনমাত্রা	আবছা আলোর দৃষ্টি (রড্)
0·000001 0·00001 0·0001	চাঁদহীন অন্ধকার আকাশের নীচে রাখা সাদা বস্তু	
0·001		
0·01 0·1	চাঁদের আলোয় আলোকিত সাদা বস্তু	পরিবর্তনসূচক অঞ্চল (Zone)
1	কষ্টসাধ্য পত্রিকাপাঠ	
10 100	সহজ পঠনপাঠন	স্বাভাবিক আলোর দৃষ্টি (কোণ্)
1,000	নিখুঁতভাবে দেখবার পক্ষে যথেষ্ট	
10,000	পূর্ণ সূর্যালোকে সাদা কাগজের দীপন	
100,000		
1,000,000 10,000,000	অতি উজ্জ্বল ল্যাম্প ফিলামেন্ট	
100,000,000	কার্বন আর্ক	রেটিনার পক্ষে ক্ষতিকারক
1,000,000,000	সূর্য	
10,000,000,000	প্রথম তিন মি. সে.-এ এ বোমা	

হল্‌দে রঙের যে গোলাকার বিন্দুটি রয়েছে, যাকে ম্যাকুলা লুটিয়া (Macula lutea) বলে, কোণ্ গ্রাহক-কোষের প্রাধান্য সেখানেই বেশী। রড গ্রাহক-কোষ সেখানে অনুপস্থিত। ম্যাকুলা লুটিয়ার আওতার বাইরে যত এগুনো যায়, রডের সংখ্যা ততই বাড়তে থাকে এবং কোণ্ গ্রাহক-কোষের সংখ্যা তত কমতে থাকে। আলোক অক্ষের 20° থেকে 30° কোণের প্রশস্ত জায়গাটুকু নিয়ে যে বলয়ের সৃষ্টি হয়েছে, দেখা গেছে—তার মধ্যে রডের প্রাধান্য সবচেয়ে বেশী। এই দু-প্রকার গ্রাহক-কোষে রয়েছে দুই রকম রাসায়নিক পদার্থ। আলো এদের মধ্যেই শোষিত হয়। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আলোক-শক্তির রূপান্তর ঘটে, পরিশেষে জন্ম নেয় স্নায়ু-প্রবাহ।

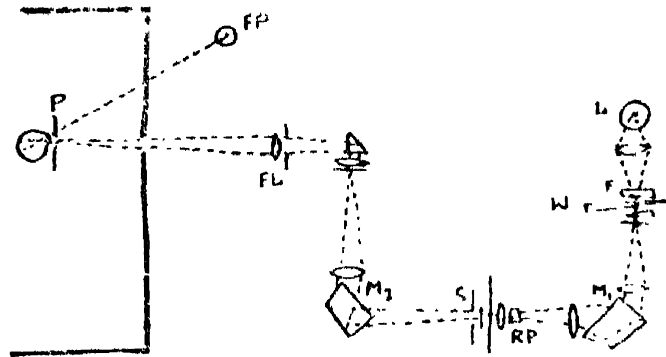
আগের কথাতেই আবার ফিরে আসতে হয়। কমপক্ষে কি পরিমাণ আলো চোখে এসে পড়লে দর্শনের অনুভূতি জাগে? মাপকাঠি দিয়ে এই আলোর পরিমাণকে, বা দর্শনের অনুভূতি জাগাতে সক্ষম হয়, বলা হয় নিরপেক্ষ দর্শনমাত্রা (Absolute visual threshold)। এই দর্শন-মাত্রাও অবশেষে ধার্য হয়েছে। জানা গেছে, কি পরিমাণ আলো চোখে এসে পড়া দরকার এবং তার কতটুকুই বা কাজে লাগে, গ্রাহক-কোষে শোষিত হয় এবং অনুভূতি জাগাতে সক্ষম হয়।

হেচ, স্ক্লেয়ার ও পাইরেনী এই মাত্রা নির্ধারণ করতে গিয়ে দেখেছেন, এর জন্যে সুরুতেই পর পর কতকগুলি ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন। যে লোকের উপর এই পরীক্ষা চালাতে হবে, তাকে অন্ততঃ পক্ষে মিনিট ত্রিশেক দুর্ভেদ্য অন্ধকারে রাখতেই হবে। এই সময় অতিক্রান্ত না হলে নাকি চোখের নিরপেক্ষ অনুভূতি (Absolute sensitivity) জাগা সম্ভব নয়। এর পরের ব্যবস্থা হলো আলোক সম্পাতের। এমনভাবে তা

কার্যকরী করতে হবে, যাতে আলো রেটিনার সেই অংশে গিয়েই পড়ে, যেখানে রড গ্রাহক-কোষের প্রাচুর্য রয়েছে। এরপর বেছে নিতে হবে সময়ের স্থায়িত্ব ও নির্দিষ্ট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোককে। দেখা গেছে, 5100Å তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলো এবং 0·001 সেকেণ্ড সময়ের স্থায়িত্বে আলোকসম্পাত ঘটলে রড্ গ্রাহক-কোষের অনুভূতির মাত্রা সবচেয়ে বেশী হয়।

হেচ ও তাঁর সহকর্মীরা এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে যন্ত্র ব্যবহার করেছেন 3নং ছবিতে তারই নমুনা দেওয়া হয়েছে। আলোর উৎস হলো নির্দিষ্ট তড়িৎ-প্রবাহে চালিত কার্বন ফিলামেন্টের একটি ল্যাম্প (L)। এই আলোর উৎসের বৈশিষ্ট্য হলো, একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় তার নিক্রমণ। এর পর আলোক-রশ্মিকে একটি নিরপেক্ষ ফিল্টার (F) এবং নিরপেক্ষ ঘনত্বের গোঁজ বা ওয়েজের (W) মধ্য দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, যাতে পরিমাণগতভাবে আলোর প্রাবল্য কমে যায়। প্রিজম M_1 এবং M_2 গঠন করে এমন একটি যুগ্ম একবর্ণ উৎপাদক (Double monochromator), যা যন্ত্রস্থিত স্লিটের সাহায্যে শুধুমাত্র 5100Å তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোর জোগান দেয়। এদের মধ্যস্থিত শাটার (S) 0·001 সেকেণ্ড সময়ের স্থায়িত্বের একক আলোকগুচ্ছের নিক্রমণ ঘটায়। আলোর প্রাবল্যের পরিমাপ করা হয় থার্মোপাইলের সাহায্যে। আপতিত রশ্মিকে তাপে পরিণত করে যে তাপ-তড়িৎ প্রভবের (Thermoeletric potential) সৃষ্টি হয়, তাকে একটা স্থির বর্তনীযুক্ত সুগ্রাহী গ্যাল্ভ্যানোমিটার দিয়ে মেপে নেওয়া হয়।

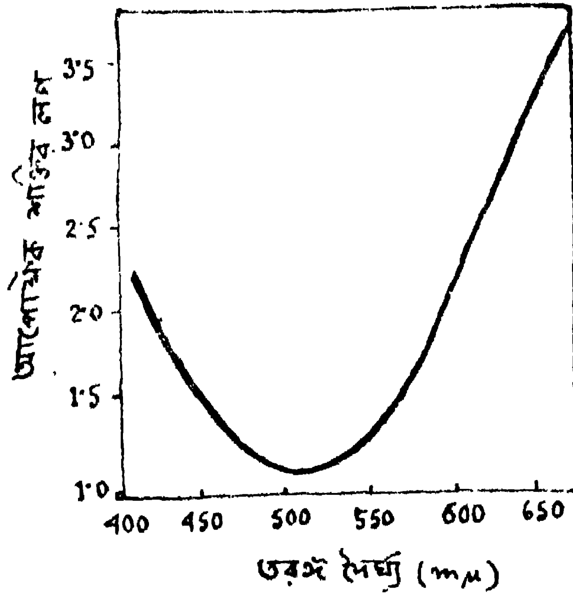
বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলো নিয়ে একইভাবে কাজ করেছেন হেচ ও তাঁর সহকর্মীরা। তাঁদের এই পরীক্ষা থেকে যে ফলাফল পাওয়া গেছে, তাথেকে তাঁরা আলোর শক্তি ও তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের মধ্যে একটা সংযোগ স্থাপন করতে পেরেছেন [4নং চিত্র]। তারা দেখতে পেয়েছেন 5100Å তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের নিরপেক্ষ দর্শনমাত্রার প্রক্রিয়ায় হলো $2·1 \times 10^{-10}$ থেকে $5·7 \times 10^{-10}$ আর্গ; অর্থাৎ শুধুমাত্র যে আলো এসে প্রথমে চোখের কর্নিয়াতে পড়ে, তার শক্তির পরিমাণগত অবস্থাই হলো এটি। তাই বলে এই সবটুকু আলো কখনও রেটিনাতে পৌঁছুতে পারে না বা এর সবটুকুই অনুভূতি জাগাবার জন্যে দায়ী নয়।



3নং চিত্র

5100Å তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোকণার মধ্যে যে শক্তি রয়েছে, শক্তিসূত্র থেকে দেখা যায় তার পরিমাণ হলো $3·84 \times 10^{-9}$ আর্গ। অতএব $2·1 \times 10^{-10}$ থেকে $5·7 \times 10^{-10}$ আর্গ শক্তিতে আলোকণার সংখ্যাগত অবস্থা স্পষ্টতঃই দেখা যাচ্ছে 54 থেকে

148, অর্থাৎ অনুভূতি জাগাবার জন্যে নিমেষপক্ষে 54 থেকে 148টি আলোকণাকে অতি অবশ্য চোখে এসে পড়তে হবে। কিন্তু চোখে এসে পড়া এই সব কয়টি আলোকণাই শেষ পর্যন্ত রেটিনাতে



4নং চিত্র

গিয়ে পৌঁছুতে পারে না। কর্নিয়া থেকে রেটিনায় যাবার পথে তাদের অনেকগুলিই হারিয়ে যায়। তাই যথার্থ অনুভূতি জাগাবার জন্যে যতগুলি আলোকণার প্রয়োজন, তাদের সংখ্যা এর চেয়ে আরও কম।

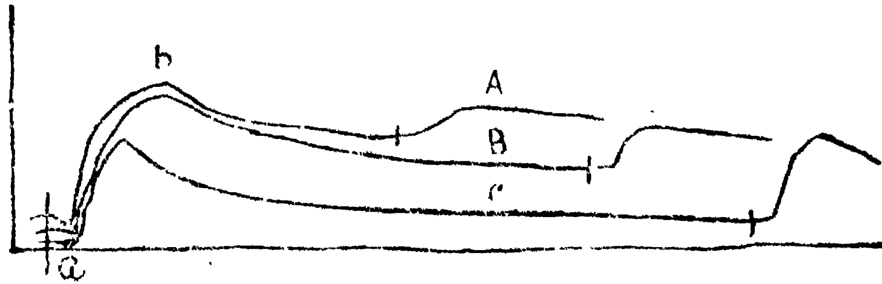
চোখে এসে-পড়া আলোর শতকরা চারভাগ কর্নিয়া থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে যায়। ফিরে যায় আলোক অক্ষের সঙ্গে 20° থেকে 30° কোণে বিচ্যুতি ঘটিয়ে। আবার কর্নিয়া থেকে রেটিনায় যাবার পথে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ আলোকণা হারিয়ে যায় লেন্স ও চোখের ভিতরকার তরল পদার্থে (Ocular media), অর্থাৎ চোখের ভিতরকার লেন্স, অ্যাকোয়াস হিউমার ও ভিট্রিয়াস হিউমার পঞ্চাশ ভাগ আলোক শোষণ করে নেয়। বাকী যে আলো-কণাগুলি রেটিনাতে গিয়ে পৌঁছায়, তার সবকয়টিই আবার আলোক গ্রাহক-কোষে শোষিত হতে পারে না। তার একটা অংশ রেটিনাকে ভেদ করে তার ঠিক পিছনকার ব্ল্যাক প্রিন্টিং বা কালোস্তরে (কোরয়েড) গিয়ে শোষিত হয়। ঐ স্তরে না আছে কোন আলোক গ্রাহক-কোষ, না আছে তার কোন প্রকার অনুভূতি জাগাবার ক্ষমতা। শেষ পর্যন্ত হেচ ও তাঁর সঙ্গীরা দেখিয়েছেন, চোখে পড়া 5100 Å তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোর কুড়ি শতাংশ মাত্র গ্রাহক-কোষে শোষিত হয়; অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে মাত্র 5 থেকে 14টি আলোকণা গ্রাহক-কোষের আলোক-সুগ্রাহী পদার্থে শোষিত হয় এবং দর্শনের অনুভূতি জাগায়। তাই প্রকৃত নিরপেক্ষ দর্শনমাত্রা 5 থেকে 14টি আলোকণার মধ্যে সীমিত বলা চলে। অবশ্য এই সংখ্যাও নাকি উর্ধ্বসীমা। প্রকৃত অনুভূতির ব্যাপারটা নাকি আরো কম সংখ্যক আলোকণার দ্বারা সম্পন্ন হতে পারে। আবার এমন ইঙ্গিতও পাওয়া গেছে, একটা আলোকণা নাকি একটিমাত্র গ্রাহক-কোষকে কর্মক্ষম করতে পারে। তাই যদি সত্য হয়, তবে আমরা বলতে পারি, অনুভূতি জাগাবার জন্যে অন্ততঃপক্ষে 5 থেকে 14টি রড্ গ্রাহক-কোষকে সক্রিয় অংশ নিতেই হবে।

রড্ ও কোণ্ গ্রাহক-কোষে আলোক-সুগ্রাহী যে পদার্থ রয়েছে, তা হলো যথাক্রমে রোডপ্সিন (Rhodopsin) ও আয়োডপ্সিন (Iodopsin)। এই আলোক-সুগ্রাহী পদার্থগুলিতে আলো শোষণের ফলে যে রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া ঘটে অনেকটা বৃত্তাকার পথে, তারই ফলে জন্ম হয় স্নায়ু-প্রবাহের। এখানে তার বিশদ আলোচনা সম্ভব নয়, তবে এইটুকু বলা চলে যে, এই রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটাবার পথে সাহায্য করে বড় অংশীদার ভিটামিন-এ। ভিটামিন-এ-এর অভাব তাই এই পরিবর্তনকে বাধা দেয়, দেখবার পক্ষে বিঘ্ন ঘটায়, মানুষ রাতকানা হয়। শুধু তাই নয়,

চোখের উপরিভাগকে সিক্ত রাখবার জন্যে সর্বদা যে ল্যাক্রিমাল গ্রন্থি থেকে গ্রন্থিরস নিঃসৃত হয় সেই গ্রন্থিটিও ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে, চোখের উপরিভাগ শুকোতে থাকে, রক্তবর্ণ ধারণ করে, চোখে ছানি পড়ে।

স্নায়ু-প্রবাহ অনেকটা তড়িৎ-প্রবাহের মতই। রেটিনার সংস্পর্শে একটা ইলেকট্রোডকে রেখে অন্যটিকে চোখের পিছনে স্থাপন করে আলোক-সম্পাত ঘটিয়ে রেটিনার বিভব পরিবর্তনের পর্যায়-ক্রমিক রেকর্ড করা যায়। এই রেকর্ডকে বলা হয় ERG বা ইলেক্ট্রো রেটিনোগ্রাম [5 নং ছবি] সম্ভবতঃ রড্ গ্রাহক কোষ। কম দীপনে এবং বেগুনী আলো সম্পাতে সবচেয়ে বড় আকার ধারণ করে এই তরঙ্গটি। নিগেটিভ a-তরঙ্গটি, দেখা গেছে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে আলোকসহা চোখে এবং লাল আলোর উপস্থিতিতে। বলা হয় কোন গ্রাহক-কোষের মধ্যে ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় এর জন্ম হয়, কারণ লাল আলোতে কোণ্ গ্রাহক-কোষের অনুভূতির মাত্রা সবচেয়ে বেশী।

অতএব দেখা যাচ্ছে, রেটিনায় অবস্থানকারী এই দু-জাতের গ্রাহক কোষই আলোক-শক্তির রূপান্তর



5 নং চিত্র

এই রেকর্ডের আকৃতি ও প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে চোখে বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোক সম্পাতে এবং পরিবেশ অনুযায়ী চোখের খাপ খাওয়ার অবস্থার পরিবর্তনে।

যে তিনটি রেকর্ড ছবিতে দেখানো হয়েছে, তার প্রথম দুটি (A ও B) নেওয়া হয়েছে চোখকে ঘন্টা-খানেক অন্ধকারে রেখে, চোখসওয়া করে, তৃতীয়টি (c) আলোতে। বড় পজিটিভ b-তরঙ্গটির উৎস ঘটায় এবং এদের অনুভূতির মাত্রা বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোতে বিভিন্ন হয়। আলোক-শক্তির এই রূপান্তর তড়িৎ-শক্তির জন্ম দেয়, যা স্নায়ুর মারফৎ মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে সঞ্চালিত হয়ে দর্শনের অনুভূতি জাগায়। অতএব বলা চলে—আলো, চোখ ও দর্শনের অনুভূতি জাগাবার মধ্যে যে ব্যবস্থা রয়েছে, তার সুষ্ঠু ক্রিয়া না হলে কোন কিছুই দেখা সম্ভব নয়।

সঞ্চয়ন

খাদ্য ও ধাতব সম্পদের অফুরন্ত ভাণ্ডার

যেদিন মানুষ প্রথম সাগরতীরে এসে দাঁড়িয়েছিল, সেদিন থেকেই সেই অনন্ত অতল জলের তলায় কি রয়েছে, তা জানবার জন্যে সে আকুল হয়েছে, সীমাহীন সমুদ্র তার মনে বিস্ময় সৃষ্টি করেছে।

আজ হাজার হাজার বছর পরেও সেই অবাক-দৃষ্টি নিয়েই সমুদ্রের দিকে সে তাকিয়ে রয়েছে। ঊর্ধ্বাকাশের মহাশূন্যে সে উধাও হয়েছে—চলে গেছে দূর থেকে দূরান্তরে নিঃসীম মহাজগতে। মহাজাগতিক রশ্মির কোন কোন রহস্যেরও সন্ধানও সে করেছে। পৃথিবী থেকে আড়াই লক্ষ মাইল দূরে চাঁদের বুকে সে পায়ে হেঁটে বেড়িয়ে এসেছে। কিন্তু মাত্র সাত মাইল নীচে সমুদ্রের তলদেশ সে আজও স্পর্শ করতে পারে নি—দেখে নি। সেই অতল জলের বাধা আজও মনে হয় যেন দুর্লঙ্ঘ্য।

এই দুর্লঙ্ঘ্য বাধা সত্ত্বেও সমুদ্রবেষ্টিত এই পৃথিবীর মানুষ সমুদ্রকে আজ অনেকখানি জানতে ও বুঝতে পেরেছে। সমুদ্রে সে সন্ধান পেয়েছে অফুরন্ত অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদের। বিজ্ঞানীরাও আজ বলছেন—খাদ্য, ধাতব পদার্থ ও তৈল সম্পদের দিক থেকে সমুদ্রই মানুষের শেষ আশ্রয় ও অবলম্বন। এই সকল সম্পদের অফুরন্ত ভাণ্ডার হচ্ছে সমুদ্র। পৃথিবীর জনসংখ্যা দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে, তেমনি বাড়ছে শিল্প। মানুষের সুখ ও সমৃদ্ধতর জীবনযাপনের আশা-আকাঙ্খা বেড়েছে প্রচুর পরিমাণে। এই পরিস্থিতিই জীবনযাত্রার পক্ষে অপরিহার্য উপকরণের নূতন নূতন ক্ষেত্র সন্ধানে মানুষকে বাধ্য করছে।

বিগত 2000 বছরের মধ্যে মানুষ যে পরিমাণ ধাতব পদার্থ ব্যবহার করে এসেছে, আগামী 30 বছরে তার বহুগুণ বেশী ধাতব পদার্থ প্রয়োজন হবে মানুষের। গত 100 বছরের মধ্যে মানুষ যে পরিমাণে শক্তিকে কাজে লাগিয়েছে, আগামী 20 বছরের মধ্যে শক্তির ব্যবহারও তার তিনগুণ বেড়ে যাবে। তবে যে হারে জনসংখ্যা বাড়ছে, তাতে দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যাভাব থেকে বাঁচতে হলে আগামী 20 বছরের মধ্যে পৃথিবীর খাদ্যোৎপাদন শতকরা 50 ভাগ বাড়াতে হবে। এই বিষয়টিই সবচেয়ে চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। উন্নতিশীল রাষ্ট্রসমূহে অপুষ্টিজনিত সমস্যা ও বুভুক্ষা গুরুতর আকারে দেখা দিয়েছে। ভারত, পাকিস্তান এবং দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটি রাষ্ট্রে খাদ্য-উৎপাদন দ্বিগুণ বাড়ানো প্রয়োজন।

এই সকল জরুরী কারণেই মানুষের সম্পদ-সন্ধানী দৃষ্টি ফেরাতে হয়েছে সমুদ্রের দিকে। বিজ্ঞানীরা বলেন, সমুদ্রের উৎপাদন-শক্তি পৃথিবীর শস্যক্ষেত্রের চেয়ে হাজার গুণ বেশী। আলুর উদ্ভাবন খাদ্যজগতে এনেছে বিপ্লব। মানুষের উপযোগী সামুদ্রিক খাদ্যের যে দিন ব্যাপক চাষ সম্ভব হবে, সেদিন ঐ সকলও নিয়ে আসবে নূতন দিনের ইঙ্গিত এবং খাদ্যজগতে আর একটি নূতন বিপ্লব।

সারা বিশ্বের সমুদ্রের জলে মেশানো আছে 60 লক্ষ টন সোনা। এই বিরাট সম্পদ উদ্ধারের পথ আজও উদ্ভাবিত হয় নি। কিন্তু সমুদ্রের তলায় ছড়ানো রয়েছে কোটি কোটি টনের ম্যাঙ্গানিজ, নিকেল, কোবাল্ট, তামা প্রভৃতি ধাতু ও ফসফেটের পিণ্ড। একমাত্র লোহিত সাগরের তলায়ই রয়েছে

1200 কোটি টাকার প্রাকৃতিক সম্পদ। মানুষ বর্তমানে এই সকল সম্পদ সংগ্রহের দিকে দৃষ্টি দিয়েছে।

এই সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে, তার আগে সমুদ্রের তলার ও অপেক্ষাকৃত অল্প গভীরে মহীসোপান বা কন্টিনেন্টাল শেল্ফ এলাকার সকল খবরাখবর নিতে হবে। ঐ সকল সম্পদ সংগ্রহের জন্যে কারিগরী দিক থেকে যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন, সেই সকল ব্যবস্থা উদ্ভাবন ও গ্রহণ করতে হবে।

এই পৃথিবীর মানুষ শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকে। এই মানুষের পক্ষে বায়ুহীন শূন্যময় মহাকাশে বেঁচে থাকবার মত সমুদ্রের তলায়ও বেঁচে থাকা কঠিন। তার কারণ অনেক। একে তো সমুদ্রের উপরে আছে ভীষণ, ভয়াল সামুদ্রিক ঝড়—তাথেকে রক্ষা পাওয়া মানুষের পক্ষে কঠিন। যখন সে সমুদ্রের গভীরে 300 ফুটেরও নীচে নামে, তখন প্রকৃতপক্ষে কোন কিছুই তার দৃষ্টিগোচর হয় না, সূর্যের আলো ঐ পর্যন্ত আদৌ পৌঁছুতে পারে না। আর আছে অসহ্য চাপ, প্রচণ্ড শীতলতা। তাহলেও শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির সাহায্য নিয়ে সে সমুদ্রের গভীরে গিয়েছে। কিন্তু ঐ সকল যন্ত্রপাতির ক্ষমতা সীমিত। তাই সুদীর্ঘকাল সমুদ্রের তলায় থাকা তার পক্ষে সম্ভব হয় নি।

সাম্প্রতিক কালে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে। সকল দেশের সহযোগিতায় মানুষ সমুদ্রজয়ের সঙ্কল্প নিয়েছে। ভারত মহাসাগরে আন্তর্জাতিক তথ্যানুসন্ধানী অভিযান দিয়েই এর সুরু হয়। 1960 সালে পাঁচ বছরের জন্যে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। তারপর 1970-এর দশকের জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমুদ্র সম্পর্কে একটি দশসালা পরিকল্পনা গ্রহণের প্রস্তাব করে। ঐ দশসালা পরিকল্পনা সংক্রান্ত সকল কাজকর্ম রাষ্ট্রসঙ্ঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থার দীর্ঘমেয়াদী সামুদ্রিক তথ্যানুসন্ধান ও গবেষণা কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়।

বিভিন্ন দেশের মিলিত উদ্যোগে ভারত মহাসাগরে তথ্যানুসন্ধানী অভিযান চালাবার ফলে ঐ সমুদ্রের উপকূলবর্তী এলাকার বহু স্থানে প্রচুর সম্পদের সন্ধান পাওয়া গেছে। বর্তমানে ভারত মহাসাগর থেকে বিশ লক্ষ টন মৎস্য সংগৃহীত হয়ে থাকে। উল্লিখিত তথ্যানুসন্ধানের ফলে এই সংগ্রহের পরিমাণ দশগুণ বাড়ানো যেতে পারে এবং বর্তমানে মাছ ধরবার যে সকল সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি রয়েছে, সেগুলির সাহায্যেই ঐ পরিমাণ সামুদ্রিক মৎস্য সংগ্রহ করা সম্ভব। মাছে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন আছে—উন্নতিশীল রাষ্ট্রসমূহে, বিশেষ করে ভারত প্রভৃতি রাষ্ট্রে এই প্রোটিনের অভাব সামুদ্রিক মৎস্যের সাহায্যে মিটানো যেতে পারে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা।

আমেরিকার ন্যাশন্যাল অ্যাকাডেমী অব সায়েন্স-এর একদল তথ্যানুসন্ধানী বিজ্ঞানী আরব সাগর সম্পর্কে সমীক্ষা গ্রহণ করে বলেছেন, একমাত্র ঐ সাগর থেকে এক কোটি টন মাছ পাওয়া যেতে পারে। তার ফলে ঐ এলাকায় মৎস্যজীবীদের মোট বার্ষিক আয় 750 কোটি টাকায় গিয়ে পৌঁছুতে পারে। ঐ এলাকা ঐ মাছ রপ্তানী করে 500 কোটি টাকারও বেশী বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারে।

সম্প্রতি সমুদ্রসংলগ্ন জলাশয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৎস্যাদি চাষের যে ব্যবস্থা হয়েছে, তা ইতিমধ্যেই বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই ব্যবস্থাকে বলা হয় অ্যাকোয়া কালচার। ইন্দোনেশিয়াতে ঐ সকল জলাশয়ে প্রতি বর্গমাইলে 1300 টন মাছ সংগৃহীত হয়েছে। কিন্তু সমুদ্রোপকূলবর্তী এলাকায় প্রতি বর্গমাইলে সেই স্থলে সংগৃহীত হয়েছে মাত্র দশ টন। রাষ্ট্রসঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ায় 140000 বর্গমাইলেরও বেশী জমিকে

জলাশয়ে পরিণত করে উল্লিখিত পদ্ধতিতে মাছের চাষ করা যেতে পারে। সমগ্র পৃথিবীর সমুদ্র থেকে যে পরিমাণ মৎস্য সংগৃহীত হয়ে থাকে, তার সমপরিমাণ মৎস্য ঐ সকল জলাশয় থেকে সংগৃহীত হতে পারে।

সমুদ্রে খাদ্যসম্পদের সন্ধান ও সংগ্রহ করতে যে সময় লাগবে, তার চেয়ে অনেক বেশী সময় লাগবে ধাতব পদার্থ সংগ্রহ করতে। তবে সমুদ্র থেকে ধাতব সম্পদ সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা খাদ্য-সম্পদ সংগ্রহ করবার মত জরুরী নয়। পৃথিবীর বহু গবেষণা কেন্দ্রেই সমুদ্র-বিজ্ঞানীরা নতুন নতুন পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করছেন। মানুষ যাতে সমুদ্রের দু-হাজার ফুট নীচে গিয়ে সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস থাকতে পারে, তথ্যানুসন্ধানে উদ্যোগী হতে পারে তারই জন্যে এই সকল প্রচেষ্টা। সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ এক ধরণের তথ্যানুসন্ধানী ডুবোজাহাজ বা সাবমেরিনও তৈরি হচ্ছে। এই সকল জাহাজ সমুদ্রের 20000 ফুট নীচে পর্যন্ত যাবে। অধিকাংশ সমুদ্রই এই পরিমাণে গভীর।

সামুদ্রিক সম্পদ সন্ধানের দিক থেকে মানুষ আজ এক নতুন যুগের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁচেছে। গত দশ বছর সে সমুদ্রের অফুরন্ত সম্পদ সম্পর্কে নানা কল্পনা করে এসেছে, প্রকৃত তথ্যও সংগ্রহ করেছে। সমুদ্রের বিরাট মৎস্য-সম্পদ সংগ্রহ করে বুভুক্ষা ও অনাহার সম্পূর্ণ দূর করবার কথা, সমুদ্র-গর্ভের অফুরন্ত ধাতব সম্পদ সংগ্রহের কথাও সে ভেবেছে। আজ সমুদ্র-বিজ্ঞানী ও তথ্যানুসন্ধানীরা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার ভিত্তিতে মিলিত উদ্যোগে এই সকল স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করবার জন্যে ব্রতী হয়েছেন।

স্থায়ী ফেরাইট চুম্বক

মলয় সরকার*

চুম্বকের সঙ্গে সভ্য মানুষ বহুদিন ধরে পরিচিত। এর ব্যবহার চলে আসছে প্রায় খৃঃ পূঃ 600 সাল থেকে। এই বস্তুটি পেয়ে মানুষ চুপ করে বসে থাকে নি। অনুসন্ধিৎসু মানুষ এর গুণাগুণ পরীক্ষা করে একে কাজে লাগিয়েছে। তাঁরা জানতো যে, চুম্বক সব সময় উত্তর-দক্ষিণে মুখ করে থাকে। সে জন্যে তখনকার দিনে চুম্বক কেবলমাত্র নৌবিভাগে অর্থাৎ জাহাজেই দিক নির্ণয় করবার কাজে ব্যবহৃত হতো।

সে সময়ে এই কাজে কেবলমাত্র প্রাকৃতিক চুম্বকই ব্যবহৃত হতো। কারণ তখনও কৃত্রিম চুম্বক তৈরির কৌশল মানুষের জানা ছিল না। তখন যে প্রাকৃতিক চুম্বক ব্যবহৃত হতো, তার নাম লোড স্টোন। এটি একটি ফেরাস ফেরাইট যৌগ। লোড স্টোন প্রথম পাওয়া যায় ম্যাগ্-নেশিয়াতে। তাই দেশের নাম থেকে চুম্বকের নাম হলো ম্যাগ্নেট।

সুপ্রাচীন কাল থেকেই মানুষ চুম্বকের সঙ্গে পরিচিত হলেও বহুদিন পর্যন্ত কৃত্রিম চুম্বক তৈরির কোন চেষ্টাই হয় নি। কৃত্রিম উপায়ে স্থায়ী চুম্বক তৈরির প্রথম চেষ্টা করেন উইলিয়াম গিলবার্ট। স্থায়ী চুম্বক সম্বন্ধে তাঁর রচিত পুস্তক De Magnete প্রকাশিত হয় 1600 খৃষ্টাব্দে। 1600 খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত লোড স্টোনই একমাত্র স্থায়ী চুম্বকের উৎস ছিল।

* রসায়ন বিভাগ, ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব টেক্নোলজী, খড়্গপুর।

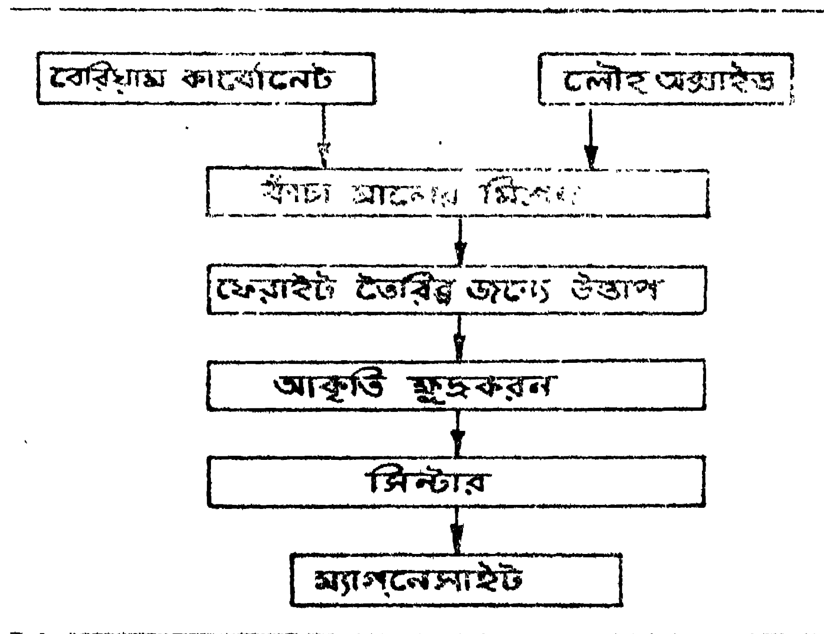
তারপর 150 বছর পরে 1750 খৃষ্টাব্দে বৃটিশ মিউজিয়ামের লাইব্রেরিয়ান, গোইন নাইট (Gowin Knight) অক্সাইড চূর্ণ থেকে স্থায়ী চুম্বক তৈরি করতে সক্ষম হন। সমসাময়িক কালে বৃটেন ছাড়া আর কোন দেশ স্থায়ী চুম্বক তৈরি করতে পারতো না। সে জন্যে চুম্বক বিক্রয় করে বৃটেন প্রচুর অর্থোপার্জন করেছিল।

এর পরে প্রায় দু-শ' বছর এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোন আবিষ্কার হয় নি। আবার 1938 সালে জাপানে ক্যাটো (Kato) ও টাকেই (Takei) নামে দু-জন বৈজ্ঞানিক কোবাল্ট ফেরাইট থেকে স্থায়ী চুম্বক প্রস্তুত করেন। 1954 সালে 'A Class of New Parmanent Magnet Materials' নামক পত্রিকায় অ্যানাইসোট্রপিক (Anisotropic) বেরিয়াম ফেরাইট থেকে চুম্বক তৈরির কথা প্রকাশিত হয়। বর্তমানেও এই পদ্ধতিতেই স্থায়ী চুম্বক তৈরি করা হচ্ছে।

স্থায়ী চুম্বকের সাধারণ ফর্মুলা হলো [MO, $6Fe_2O_3$]—M = বেরিয়াম, স্ট্রনশিয়াম, সীসা, অথবা এগুলির মিশ্রণ। এই ফেরাইটের কেলাসের আকৃতি ষড়ভুজের মত। বেরিয়াম ফেরাইট চুম্বক তৈরির উপায় 1নং চিত্রে দেখানো হয়েছে।

এই পদ্ধতিতে বেরিয়াম কার্বনেট ও ফেরিক অক্সাইডের বিক্রিয়া হলো নিম্নরূপ—

$BaCO_3 + 6Fe_2O_3 \rightleftharpoons BaO + 6Fe_2O_3 + Co_2$। স্ট্রনশিয়াম অথবা সীসা ফেরাইটগুলি তাপীয় বিশ্লেষণের (Thermal decomposition) দ্বারা প্রস্তুত হয়। এর সঙ্গে সিলিকা, লেড্ সিলিকেট, বোরাক্স, বেন্টোনাইট ইত্যাদি মেশানো হয়। কখনও কখনও লৌহ যৌগের পরিমাণ কম দিলে সুফল পাওয়া যায়। কাঁচা মালের মিশ্রণের জন্যে রিবন ব্লেণ্ডার (Ribbon blender), এজ রানার (Edge runner) বল মিলস (Ball mills) প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়।



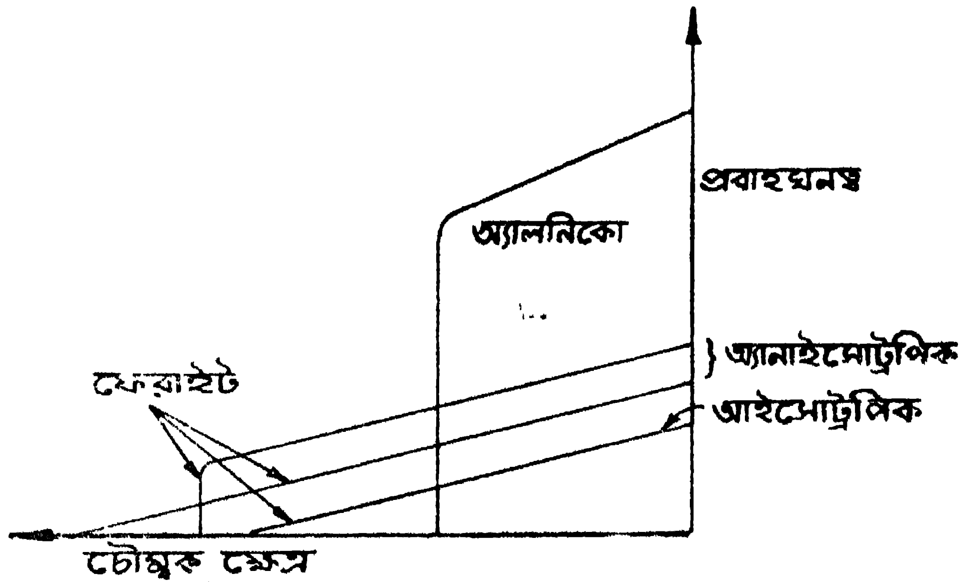
1নং চিত্র

ফেরাইট তৈরির তাপমাত্রা 100°C থেকে 1300°C হতে পারে। এই সময় একে স্ফটিকীকরণ করা হয়। এর পরে স্ফটিকের আকৃতি

সমান ও ছোট করা হয়। বল মিলস ব্যবহৃত হয়, কারণ প্রচুর পরিমাণে স্ফটিক তৈরির কাজে বল মিলস সাহায্য করে।

আমরা অ্যালনিকো (ALNICO) চুম্বকের কথা জানি। এই চুম্বক অ্যালুমিনিয়াম, নিকেল, ও কোবাল্ট থেকে তৈরি হয়। সে জন্যে তিনটি উপাদানের প্রথম দুটি অক্ষর নিয়ে এই চুম্বককে অ্যালনিকো (AL-NI-CO) বলা হয়। আমরা এই অ্যালনিকো চুম্বকের সঙ্গে ফেরাইটের গুণাগুণ তুলনা করতে পারি। 2নং চিত্রে দুই রকমের অ্যানাইসোট্রপিক ফেরাইট ও এক রকমের আইসোট্রপিক ফেরাইট দেখানো হয়েছে। দুটি অ্যানাইসোট্রপিক ফেরাইটের মধ্যে একটির সর্বোচ্চ পিক্‌ এনার্জি প্রোডাক্ট (Peak Energy Product) ও দ্বিতীয়টির সর্বোচ্চ প্রতিরোধ ক্ষমতা (Coercive force) আছে। অ্যালনিকো চুম্বকের প্রতিরোধ ক্ষমতা ফেরাইট চুম্বকের অর্ধেক বা তারও কম। ফেরাইট চুম্বকের এই সব গুণাগুণের জন্যে আজকাল নানাভাবে এই চুম্বক ব্যবহৃত হয়।

চুম্বক আমাদের নব সভ্যতার এক বিশিষ্ট উপাদান। এর প্রয়োজনীয়তা অসংখ্য। টেলিভিসন সেট, বৈদ্যুতিক ঘড়ি, লাইডস্পীকার, ডায়নামো, ডাইরেক্ট কারেন্ট মোটর (D. C. Motor) প্রভৃতি নানা কাজে এই চুম্বক ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া ইলেকট্রন অপটিক্সের (Electron optics) কাজেও এই চুম্বক ব্যবহৃত হয়।



2নং চিত্র

বিজ্ঞান-সংবাদ

জীবাণুরও গন্ধ শোঁকবার শক্তি আছে

পশুদের মত জীবাণুদেরও গন্ধ শোঁকবার শক্তি আছে, তারাও কোন্‌টা তাদের খাদ্য, কোন্‌টা অখাদ্য বুঝতে পারে—আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা এই তথ্য আবিষ্কার করেছেন। ডাঃ স্যামুয়েল কোগেলের নেতৃত্বে এই বিষয়ে গবেষণা চালানো হয়েছিল। তিনি বলেছেন যে, সমুদ্র দূষিত হচ্ছে। সমুদ্রের মলিনতা দূর করবার ব্যাপারে এই আবিষ্কার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। সামুদ্রিক জীবাণু সমুদ্রকে মলিনতা থেকে মুক্ত রাখে এবং সামুদ্রিক জীবজন্তুর বিকাশের পক্ষেও সহায়ক হয়ে থাকে। সমুদ্রের কোন কোন অঞ্চলে মলিনতা বৃদ্ধির যে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে—জীবাণুর সাহায্যে সেই আশঙ্কা দূর করা যেতে পারে।

মস্তিষ্কে শল্য-চিকিৎসার নূতন পদ্ধতি

মস্তিষ্ক ও হৃদ্‌যন্ত্রের শল্য-চিকিৎসার সময় রোগীকে যান্ত্রিক হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের সাহায্যে বাঁচিয়ে রাখা হয়। আমেরিকার দু-জন শল্য-চিকিৎসক এই যন্ত্রের সাহায্য না নিয়েই দু-জন রোগীর মস্তিষ্কের শল্য-চিকিৎসা করেছেন। এরা দু-জনই ক্যান্সার রোগে ভুগছিলেন। চিকিৎসকগণ রোগীর দেহকে বরফ দিয়ে ঢেকে হৃৎপিণ্ডকে শীতল করেন এবং মস্তিষ্ককে শীতল করেন যথেষ্ট পরিমাণ বরফ-জল দিয়ে। তারপর ঐ স্থানে শল্য-চিকিৎসা চালানো হয়। চিকিৎসকগণ বলেছেন যে, মস্তিষ্কের কোন রকম ক্ষতি না করে ঐ পদ্ধতিতে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে শল্য-চিকিৎসা করা সম্ভব হয়েছে, তবে রোগীকে বাঁচানো যায় নি। মস্তিষ্কের রোগদুষ্ট স্থানে রক্ত চলাচল বন্ধ থাকে বলে ঐ স্থানটি শীতল না করে শল্য-চিকিৎসা করা সম্ভব নয়। নতুবা পাঁচ মিনিট পরেই রোগীর অবস্থার অবনতি ঘটে।

ধূমপানের সঙ্গে হৃদ্‌রোগের সম্পর্ক

আমেরিকার টেনেসী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ টেড পি ম্যাকডোনাল্ড বলেছেন—যারা ধূমপান করে না, তাদের তুলনায় যারা ধূমপান করে, তাদের মৃত্যুর হার যে নয় গুণ বেশী—এই কথা আমরা জানি। কিন্তু কি যে তার কারণ, সেই বিষয়ে অনুসন্ধান খুব কমই হয়েছে। তিনি এই প্রসঙ্গে আরও বলেন যে, রক্তপ্রবাহে অতি ক্ষুদ্র গোলাকার যে অনুচক্রিকা বা প্লেটলেট্‌স্‌ আছে, তাদের প্রকৃতি আঠালো। প্রাথমিক পরীক্ষায় দেখা গেছে—যারা ধূমপান করে, ধোঁয়ার সংস্পর্শে এসে এই সকল পদার্থ আরও আঠালো হয়ে পড়ে। তারই ফলে রক্ত হয়তো জমাট বেঁধে যায়, ফলে হৃদ্‌রোগের আক্রমণ হয়ে থাকে এবং ঐ রোগেরও উপসর্গ দেখা দেয়।

কুষ্ঠরোগ চিকিৎসায় অগ্রগতি

সুইডেনের ডাক্তার আরমুর হানসেন 1873 সালে কুষ্ঠ ব্যাধির জীবাণুর সন্ধান পেয়েছিলেন, কিন্তু তখন পর্যন্ত গবেষণাগারে কোন কৃত্রিম উপায়ে সেই সকল জীবাণু তৈরি করা সম্ভব হয় নি। এই কথা আমেরিকার লেপ্রোসী ফাউণ্ডেশনের ডাঃ জন এইচ হাংক্স দশ বছর আগে 1961 সালে বলেছিলেন। তাঁর এই কথা আজও খানিকটা সত্য হলেও বিশেষ সীমিত অবস্থার মধ্যে একজন ভারতীয় তরুণ চিকিৎসক

সম্প্রতি কুষ্ঠরোগের জীবাণু কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। এর নাম ডাঃ বেদরেড্ডী কাণ্ডাস্বামী। ইনি এই বিষয়ে আমেরিকান লেপ্রোসী ফাউণ্ডেশন জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগিতায় এক বছর ধরে গবেষণা করেছেন।

ডাঃ কাণ্ডাস্বামী সম্প্রতি বালটিমোরে এক সাক্ষাৎকারে তাঁর এই গবেষণা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, কৃত্রিম উপায়ে এই রোগের জীবাণু তৈরি করা সম্ভব হয়েছে বলে এই রোগের প্রতিষেধক টিকা আবিষ্কারের পথও সুগম হলো। এই রোগ স্নায়ু, চোখ, ত্বক এবং মিউকাস মেনব্রেন নষ্ট করে দেয়। পৃথিবীর প্রায় 1 কোটি 10 লক্ষ লোক এই রোগে ভুগছে। ডাঃ কাণ্ডাস্বামী বর্তমানে মাদ্রাজের একটি কুষ্ঠরোগ কেন্দ্রে নিযুক্ত রয়েছেন।

আমেরিকার জন হপকিন্স ইউনির্ভাসিটি স্কুল অব হাইজীন অ্যাণ্ড পাবলিক হেলথে তথ্যানুসন্ধান কালে তিনি প্রাথমিক অবস্থায় এই রোগের লক্ষণ নির্ণয়ের পন্থা নিরূপণ, কোন কোন কুষ্ঠ-ব্যাধি সংক্রামক কিনা, তা নির্ধারণ এবং নূতন ঔষধ আবিষ্কারের জন্যে চেষ্টা করেছেন। এই রোগের প্রাথমিক লক্ষণ—দেহের রোগাক্রান্ত অঙ্গ অসাড় হয়ে পড়ে।

আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্য লুইজিয়ানার প্রখ্যাত কারভিল লেপ্রোসী হাসপাতালে আয়োজিত একটি আলোচনা সভায় ডাঃ কাণ্ডাস্বামী বলেছিলেন যে, আমেরিকায় এই রোগ চিকিৎসায় বহু নূতন ঔষধপত্র বের হয়েছে। ভারতের 25 লক্ষ কুষ্ঠ রোগীর চিকিৎসায় এই সকল ঔষধ খুবই কাজে লাগবে এবং এই রোগ দূরীকরণের উদ্যোগে খুবই সহায়ক হবে বলেই তাঁর ধারণা। তিনি এই প্রসঙ্গে আরও বলেন যে, আমেরিকায় সারা বছরে মাত্র 47 জন এই রোগে আক্রান্ত হলেও এই রোগ সম্পর্কে সে দেশে যে পরিমাণে গবেষণা ও শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা হয়ে থাকে, তার তুলনা নেই।

ভারত সরকার ভারতের কুষ্ঠরোগীদের সম্পর্কে সমীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করেছেন। জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয়ে উন্নততর পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। রোগাক্রান্তদের সম্পর্কে সমীক্ষা গ্রহণের উন্নততর পদ্ধতি এই রোগ নিয়ন্ত্রণের পক্ষে খুবই সহায়ক হবে। প্রথম অবস্থায় যাতে এই রোগ ধরা পড়ে ও রোগীদের পৃথক করে রাখা হয়, তার ব্যবস্থা করতে হবে। রোগীরা সম্পূর্ণ অশক্ত ও অবশ হয়ে পড়বার আগেই তাদের পৃথক করে রাখলে এই রোগের সংক্রমণ প্রতিহত করা যেতে পারে।

ভারত সরকার কুষ্ঠরোগ ও রোগীদের সমীক্ষা সম্পর্কে একটি ব্যাপক কার্যসূচী গ্রহণ করেছেন। প্রতিটি বাড়ীতে গিয়ে রোগীদের খোঁজ নেওয়া হচ্ছে, চিকিৎসকদের পাঠানো হচ্ছে এবং রোগীদের নিয়মিত চিকিৎসা যাতে হতে পারে তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বর্তমানে আমেরিকায় এই রোগের যে সকল ঔষধপত্র বের হচ্ছে, তাতে এই রোগ সম্পূর্ণ নির্মূল করা সম্ভব হবে। ভারতে এই রোগের চিকিৎসায় সালফোন ব্যবহৃত হয়। এই ঔষধ খুবই কার্যকরী হয়ে থাকে এবং চিকিৎসার খরচও খুবই কম। এই রোগ সম্পর্কে সাধারণ লোকের একটা ভীষণ আতঙ্ক রয়েছে। এই রোগ খুব একটা সংক্রামক নয় এবং এর সম্পূর্ণ নিরাময়ও সম্ভব।

জন হপকিন্স ইউনির্ভাসিটি স্কুল অব হাইজীন অ্যাণ্ড পাবলিক হেলথ আমেরিকার একটি সুবিখ্যাত চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা ও শিক্ষার জন্যে 1961 সালে জন হপকিন্স ইউ-নির্ভাসিটি সেন্টার ফর মেডিকেল রিসার্চ অ্যাণ্ড

ট্রেনিং নামে কলকাতায়ও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। 1963 সাল থেকে ঐ কেন্দ্রে কলকাতার অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব হাইজীন অ্যাণ্ড পাবলিক হেলথের সহযোগিতায় কুষ্ঠরোগ সম্পর্কে গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধানের ব্যবস্থা হয়েছে।

গ্রহদের দূরত্ব বিষয়ে একটি আলোচনা

শ্রীকামিনীকুমার দে

সূর্য হইতে গ্রহদের দূরত্বের মধ্যে একটি সরল সম্বন্ধ পাওয়া যায়। ইহাতে 3—এই সংখ্যার একটি প্রভাব দৃষ্ট হয়। সূর্য হইতে ক্রমবর্ধমান দূরত্ব অনুসারে গ্রহগুলি হইল :—বুধ, শুক্র, পৃথিবী মঙ্গল, (গ্রহাণুপুঞ্জ), বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন এবং প্লুটো। সূর্য হইতে পৃথিবীর দূরত্বকে 10 ধরা হয়। এখন 3 হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিগুণোত্তর ছয়টি সংখ্যা নেওয়া হইল—

3 6 12 24 48 96

শুক্র হইতে ইউরেনাস পর্যন্ত গ্রহগুলির দূরত্বের জন্য

পৃথিবীর দূরত্ব = শুক্রের দূরত্ব + 3 অর্থাৎ শুক্রের দূরত্ব = 10−3 = 7

মঙ্গলের দূরত্ব = পৃথিবীর দূরত্ব + 6 = 10 + 6 = 16

গ্রহাণুপুঞ্জের দূরত্ব = মঙ্গলের দূরত্ব + 12 = 16+12 = 28

বৃহস্পতির দূরত্ব = গ্রহাণুপুঞ্জের দূরত্ব + 24 = 28 + 24 = 52

শনির দূরত্ব = বৃহস্পতির দূরত্ব + 48 = 52 + 48 = 100

ইউরেনাসের দূরত্ব = শনির দূরত্ব + 96 = 100 + 96 = 196

কিন্তু প্রথম গ্রহ বুধ এবং শেষ দুইটি গ্রহ নেপচুন ও প্লুটোর দূরত্বের নিকটবর্তী মান পাইতে হইলে

বুধের দূরত্ব + 3 = শুক্রের দূরত্ব অর্থাৎ বুধের দূরত্ব = 7−3 = 4

নেপচুনের দূরত্ব = ইউরেনাসের দূরত্ব + 96 = 196 + 96 = 292

আবার প্লুটোর দূরত্ব = নেপচুনের দূরত্ব + 96 = 292 + 96 = 388

এখানে বুধের জন্য প্রথম সংখ্যা 3 এবং নেপচুন ও প্লুটো প্রত্যেকের জন্য শেষ সংখ্যা 96 প্রয়োগ করা হইয়াছে।

সূর্য হইতে পৃথিবীর দূরত্বকে (পনেরো কোটি কিলোমিটার) গ্রহ-তারার দূরত্ব পরিমাপের একক ধরা হয়; ইহাকে জ্যোতিষীয় একক বলা হয়।

উপরে যে সমস্ত দূরত্ব সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহাদিগকে 10 দিয়া ভাগ করিলে গ্রহদের দূরত্ব জ্যোতিষীয় এককে পাওয়া যায়।

নিম্নে প্রথম সারিতে জ্যোতিষীয় এককে গ্রহদের উক্ত পর্যায়ে প্রাপ্ত দূরত্ব, দ্বিতীয় সারিতে প্রকৃত দূরত্ব, তৃতীয় সারিতে তাহাদের ভর (পৃথিবীর ভরকে একক ধরিয়া) এবং চতুর্থ সারিতে গতিপথে তাহাদের বেগ (প্রতি সেকেণ্ডে মাইলে) দেওয়া হইয়াছে।

গ্রহ	বুধ	শুক্র	পৃথিবী	মঙ্গল	গ্রহাণু-পুঞ্জ	বৃহস্পতি	শনি	ইউরেনাস	নেপচুন	প্লুটো
(প্রাপ্ত) দূরত্ব	·4	·7	1	1·6	(2·8)	5·2	10·0	19·6	29·2	38·8
প্রকৃত দূরত্ব	·387	·72	1	1·52	—	5·2	9·54	19·19	30·07	39·52
ভর	0·05	0·81	1	0·11	—	318	95·2	14·6	17·2	0·1
গতিপথে বেগ (প্রতি সেকেণ্ডে মাইল)	29·7	21·7	18·5	15	—	8·1	6·0	4·2	3·4	3

বুধ হইতে ইউরেনাস পর্যন্ত প্রাপ্ত দূরত্বের সহিত প্রকৃত দূরত্বের বিশেষ পার্থক্য নাই। নেপচুন ও প্লুটোর ক্ষেত্রে পার্থক্যটা কিছু বেশী হইলেও স্থূলভাবে ধরিতে গেলে ইহা গ্রাহ্য নহে। তবে অন্তরতম গ্রহ বুধ এবং বহির্গ্রহ নেপচুন ও প্লুটোর দূরত্ব অন্যান্য গ্রহদের নিয়মে পাওয়া যায় নাই। ইহা একটা সমস্যা বটে।

তৃতীয় সারি হইতে দেখা যায় বুধের ভর শুক্রের ভরের $\frac{1}{16}$। এমনও তো হইতে পারে, বুধ আদিতে শুক্রের উপগ্রহ ছিল (বর্তমানে শুক্রের কোন উপগ্রহ নাই, ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়), কিন্তু শুক্রের আকর্ষণ তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই, সূর্য তাহাকে নিজের দিকে টানিয়া লইয়াছে। অতঃপর বুধ তাহার বেগ অনুযায়ী দূরত্বে থাকিয়া সূর্য প্রদক্ষিণ করিতে কোন বাধা নাই। (দূরের গ্রহের বেগ কম, কাছের গ্রহের বেগ বেশী, চতুর্থ সারি দ্রষ্টব্য) প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিজ্ঞানী লিট্‌লটনের মতে প্লুটো এক সময়ে নেপচুনের উপগ্রহ ছিল। নেপচুনের ভর প্লুটোর ভরের অন্ততঃ 170 গুণ। প্লুটোর কক্ষের উত্তকেন্দ্রিকতা অত্যধিক। সূর্যের নিকটতম অবস্থানে আসিলে ইহা নেপচুনের কক্ষের ভিতরই ঢুকিয়া পড়ে। তখন ইহা সূর্য হইতে 29 একক দূরে আর দূরতম অবস্থানে সূর্য হইতে অন্ততঃ 40 একক দূরে। এই সমস্ত কারণে মনে হয়, প্লুটো নেপচুনের উপগ্রহ ছিল। নেপচুনের আকর্ষণ প্লুটোকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই, কিন্তু ইহা সূর্যের প্রবল আকর্ষণের হাত এড়াইতে পারে নাই, তাই সূর্যের আকর্ষণে বাঁধা পড়িয়া সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে—বুধ যেমন শুক্র হইতে সূর্যের নিকটতর, প্লুটো সে রকম নেপচুন হইতে নিকটতর হইল না কেন? তদুত্তরে বলা যায়, প্লুটো যখন নেপচুনের উপগ্রহ ছিল, তখন ইহা গ্রহকে পূর্ব হইতে পশ্চিমাভিমুখে প্রদক্ষিণ করিত। (সাধারণতঃ উপগ্রহ এবং গ্রহদের গতি পশ্চিম হইতে পূর্বাভিমুখে, কিন্তু নেপচুনের যে দুইটি উপগ্রহ আছে, তাহাদের বড়টি পূর্ব হইতে পশ্চিমাভিমুখে গ্রহ প্রদক্ষিণ করে)। তাহা হইলে প্লুটোর লব্ধি বেগ ইউরেনাসের বেগ অপেক্ষা কম হয় এবং এই কারণে ইহা নেপচুন হইতে দূরবর্তী গ্রহে পরিণত হইয়াছে। তাহা যেন হইল; কিন্তু ইউরেনাসের পরবর্তী গ্রহ নেপচুনের দূরত্বে যে ব্যতিক্রম, তাহার কোন সমাধান আমরা পাই না। উপরে প্রদত্ত তৃতীয় সারিতে দেখা যায়, ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটোর ভর যথাক্রমে 14·6, 17·2 এবং 0·1; ইহাদের ভরের সমষ্টি 31·9। পূর্ববর্তী গ্রহ শনির ভর 95·2। এই ভরের মধ্যেই হয়তো কোন রহস্য নিহিত আছে। আদিতে এই তিনটি গ্রহই কি 19·6 দূরত্বে এক ছিল? প্রথমে ইউরেনাস ও নেপচুন এবং তাহাদের উপগ্রহের উদ্ভব হয়, তারপর নেপচুনের উপগ্রহ প্লুটো বিচ্ছিন্ন হইয়া গ্রহে পরিণত হয়। ইহাও লক্ষণীয় যে, ইউরেনাস এবং নেপচুনের গঠন-উপাদান একই, প্রধানতঃ জল, মিথেন এবং অ্যামোনিয়া।

মহাবিশ্ব ভ্রমণের গতিবেগ সমস্যা

শ্রীস্বপনকুমার ঘোষ

অজানাকে জানবার ও অদেখাকে দেখবার মানুষের যে স্বভাবজাত কৌতূহল, তা চরিতার্থ করতে গিয়েই মানুষ আজ চাঁদে পৌঁছুতে পেরেছে। শুধু চাঁদে পৌঁছেই সে ক্ষান্ত নয়, সে যেতে চায় অন্যান্য গ্রহে—মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, নেপচুন ইত্যাদিতে। সে চায় এই মহাবিশ্ব তোলপাড় করে তার জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে তুলতে। এই মহাবিশ্বের আদিই বা কোথায়, অন্তই বা কোথায়? মহাবিশ্ব কি চিরস্থায়ী, না কালের স্রোতে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে কোনদিন? এ কি সসীম, না অসীম, এই সব প্রশ্ন ভাবিয়ে তুলেছে পৃথিবীর মানুষকে। তাই সে আজ নিজের গণ্ডীর মধ্যে বাঁধা থেকে মোটেই তৃপ্ত নয়, সে চায় মহাবিশ্ব ভ্রমণ করে নিজের বিজয়-বার্তা ঘোষণা করতে।

মানুষের হাতে আজ যে সবচেয়ে দ্রুতগামী মহাকাশযান আছে, তার গতিবেগ ঘণ্টায় 40,000 কিলোমিটার অর্থাৎ সেকেণ্ডে প্রায় 11 কিলোমিটার মাত্র। এই গতিবেগে নিকটতম প্রতিবেশী চাঁদে যেতে আসতেই সময় লাগে প্রায় এক সপ্তাহ। কাজেই মহাবিশ্ব ভ্রমণের পক্ষে এই গতিবেগ নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর নয় কি? মহাবিশ্ব ভ্রমণের বাসনা চরিতার্থ করতে হলে চাই আমাদের আরও অনেক বেশী দ্রুতগামী মহাকাশযান। আলোর গতিবেগ সেকেণ্ডে 300,000 কিলোমিটার। বর্তমান কালের বৈজ্ঞানিক উন্নতির যুগে আলোর গতিবেগসম্পন্ন মহাকাশযানের কথা আর নিছক কল্পনা মাত্র নয়। কিন্তু তাই যদি সম্ভব হয়—যদি আলোর গতিতে গমনই সম্ভব হয়, তবুও নিকটতম নক্ষত্র প্রক্সিমা সেণ্টোরিতে (Alpha Centauri) যেতে ও ফিরে আসতে সময় লাগবে প্রায় সাড়ে আট বছর। কাজেই আরও দূর-দূরান্তরে যেতে হলে যা সময় লাগবে, তাতে মহাবিশ্ব ভ্রমণের সমস্ত আশাই ধূলিসাৎ হয়ে যাবে না কি? সুতরাং লক্ষ্যভেদ করতে হলে আমাদের ছুটতে হবে আলোর চেয়েও অনেক দ্রুত গতিতে। এই প্রচণ্ড গতিতে মহাবিশ্ব পরিভ্রমণ কতদূর সম্ভব, তার উত্তরটা নিহিত আছে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্বে (Einstein's theory of relativity)।

গতি শব্দটা আপেক্ষিক। চরম স্থিতি কি, তা নিয়ে অনেক আলোচনা বিজ্ঞানীরা করেছেন। ইথারকে (Ether) অনেকে চরম স্থিতিশীল মাধ্যম বলে মেনেও নিয়েছেন, যদিও এই কল্পিত ইথার ছাড়া মহাবিশ্বের সমস্ত কিছুই গতিশীল। গতিবেগের সংযোজন সূত্র (Addition law) অনুযায়ী চলন্ত ট্রেন থেকে ট্রেনের গতির অভিমুখে গুলি ছুঁড়লে গুলির গতিবেগ হয় গুলির আসল গতিবেগ ও ট্রেনের গতিবেগের সমষ্টির সমান। এটা পরীক্ষা করে সত্য বলে প্রমাণিতও হয়েছে।

কিন্তু গুলির বদলে আলোক রশ্মি নিক্ষেপ করলে ঐ সূত্র আর খাটবে না; অর্থাৎ আলোর গতিবেগ সর্বদা ধ্রুবক থাকে, উৎস বা দর্শকের গতির উপর নির্ভরশীল নয়।

আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের (Special theory of relativity) একটা বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কোন বস্তুর স্থির অবস্থায় যা ভর থাকে, গতিশীল অবস্থায় তা থাকে না। বেগ যত বাড়ে, ভরও তত বাড়ে।

সূত্র অনুযায়ী, $m = \frac{m_0}{\sqrt{1-\left(\frac{v}{c}\right)^2}}$ { যেখানে m = গতিশীল অবস্থার ভর ; m_0 = স্থির অবস্থার ভর (rest-mass) ; v = বস্তুর গতিবেগ ; c = আলোর গতিবেগ।

সূত্র থেকে সহজেই দেখা যায় যে, বেগ যত বাড়বে, ভরও তত বাড়বে। কাজেই বস্তুটিকে ক্রমশঃ গতিশীল করতে আরও বেশী শক্তির প্রয়োজন হবে। যখন বস্তুর গতিবেগ আলোর বেগের সমান হবে, তখন ভর হয়ে উঠবে অসীম। কাজেই বস্তুকে আলোর বেগ পেতে হলে দরকার হবে অসীম শক্তির অর্থাৎ এটা অসম্ভব। কাজেই কোন বস্তুরই বেগ ক্রমশঃ বাড়িয়ে আলোর বেগের সমান করা সম্ভব নয়।

বর্তমানে বিজ্ঞানীদের তাই প্রশ্ন, কোন বস্তু কি আলোর চেয়ে জোরে চলতে পারে না? বিজ্ঞানীরা এই রকম একটা কণার নাম দিয়েছেন Tachyon (অর্থাৎ অতি দ্রুতগামী কণা)—যা সর্বদাই আলোর চেয়ে দ্রুতগতিতে চলে। এর বৈশিষ্ট্য হলো—এর গতিবেগ যখন বাড়ে, তখন এটি শক্তি হারায় এবং গতিবেগ যখন কমে, তখন শক্তি অর্জন করে। অর্থাৎ এটির ধর্ম সাধারণ কম গতিশীল বস্তুর ঠিক বিপরীত। অসীম গতিতে চলবার সময় Tachyon সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলে এবং Tachyon-এর স্থির অবস্থায় ভর অসীম। এই কণার গতিবেগ কমিয়ে আলোর বেগের সমান করতে হলে দরকার হবে অসীম শক্তির—অর্থাৎ তাও অসম্ভব।

কাজেই আলোর গতিবেগ এমনই একটা মজার ব্যাপার যে, ভরসম্পন্ন কোন বস্তুই, কি সাধারণ বস্তু, কি Tachyon—কেউ এই গতি অর্জন করতে পারে না। অথচ এর চেয়ে কম বা বেশী বেগসম্পন্ন কণা পাওয়া যায়। কাজেই আলোর গতিবেগ একটা two-sided limit।

এভাবে আলোর গতিবেগ কণাসমূহকে তাদের গতিবেগ অনুযায়ী তিন শ্রেণীতে ভাগ করে। যথাঃ—(1) সাধারণ কণা, যার গতিবেগ আলোর বেগের চেয়ে কম, কিন্তু সমান বা বেশী হতে পারে না। (2) Tachyon, যার বেগ আলোর বেগের চেয়ে বেশী, কিন্তু কম বা সমান হতে পারে না। (3) Photon, Neutrino ইত্যাদি ভরবিহীন কণিকা, যা আলোর বেগে চলে—কম বা বেশী গতিশীল করা যায় না।

এখন প্রশ্ন, এই Tachyon কণার অস্তিত্ব আছে কিনা বা তৈরি করা যায় কিনা। অনেক বিজ্ঞানী এই ধরণের কণা তৈরি করেছেন বলে জানা গেছে। যা হোক, যদি ধরে নেওয়া যায় যে, Tachyon-এর অস্তিত্ব আছে এবং তাকে আলাদা করা যায়, তবে প্রশ্ন এই যে, Tachyon কণাকে মহাবিশ্ব-ভ্রমণে কাজে লাগানো যাবে কি না?

আমরা কোন মহাকাশযানকে আলোর চেয়েও দ্রুতগতিতে চালাতে পারবো কি? উত্তরে বলতে হয়—না, কারণ স্থির রকেটের গতিবেগ ক্রমশঃ বাড়িয়ে কখনই আলোর গতিবেগের বাধা (Light barrier) অতিক্রম করা যাবে না। কারণ তাতে দরকার হবে অসীম শক্তির। অবশ্য যদি কোন রকমে আলোর চেয়ে দ্রুতগামী রকেটের আবিষ্কার সম্ভব হয়, তবে তাকে আরও দ্রুতগামী করতে অসুবিধা হবে না। কারণ তখন তার বেগ বাড়াতে শক্তির প্রয়োজন হবে না এবং আমাদের মহাবিশ্ব ভ্রমণের স্বপ্নও সফল হয়ে উঠবে। তবে Tachyon যেমন উৎপত্তির সময়ই আলোর গতির চেয়ে বেশী বেগ অর্জন করে, সেরূপ রকেট আবিষ্কার করা এখনও সম্ভব হয় নি। অদূর ভবিষ্যতে তা হয়তো সম্ভব হয়ে উঠবে। Tachyon-কে

অবশ্য মহাকাশ ভ্রমণের কাজে লাগানো না গেলেও space communication-এর কাজে ভালভাবেই ব্যবহার করা যাবে।

এই প্রচণ্ড গতিবেগে মহাবিশ্ব ভ্রমণের আর একটা সমস্যা আছে। এটা হলো আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের আর একটা দিক। কোন ঘড়ি যখন ঠিকমত চলে, তখন হঠাৎ স্লো বা ফাষ্ট যায় না। তেমনি কোন রুলারের দৈর্ঘ্য হঠাৎ ছোট বা বড় হয়ে যায় না। কিন্তু আইনস্টাইনের তত্ত্ব অনুযায়ী যখন কোন বস্তু দ্রুততর গতিতে চলতে থাকে, বস্তুটার দৈর্ঘ্যের বা কলা-কৌশলের (যন্ত্রের ক্ষেত্রে) সঙ্কোচন ঘটবে—বস্তুটা যেদিকে যাচ্ছে, সেদিকে অর্থাৎ একটা ঘড়ি স্লো চলবে এবং একটা রুলার দৈর্ঘ্যে ছোট হয়ে যাবে। এই ঘটনাটা দৃশ্যমান হবে তখনই যখন বস্তুটা আলোর বেগের কাছাকাছি গতিতে চলে। কম গতিতে চলবার সময় এটা বুঝতে পারা যায় না। যে ব্যক্তি ঘড়ি বা রুলারের সঙ্গে ঐ একই গতিতে চলতে থাকে, সে এই পরিবর্তনটা অনুভব করতে পারবে না। কিন্তু কোন স্থির ব্যক্তির পক্ষে এটা দেখা সম্ভব হলে সে দেখবে যে, ঘড়িটা স্লো চলছে এবং রুলারটা ছোট হয়ে গেছে। বস্তুর গতি যত বাড়বে, এই পরিবর্তনের মানও তত বাড়বে এবং আলোর গতিবেগে ঘড়িটা যাবে বন্ধ হয়ে এবং রুলারের দৈর্ঘ্য হয়ে যাবে Zero। কাজেই এদিক থেকেও বোঝা যাচ্ছে যে, কোন বস্তুই আলোর গতিবেগ অর্জন করতে পারে না।

আমাদের শরীর অর্থাৎ heart-কে ঘড়ির মত মনে করলে, কোন মানুষ যখন প্রচণ্ড গতিতে ভ্রমণ করবে, তখন তার সমস্ত শারীরিক প্রক্রিয়াগুলি আস্তে চলতে থাকবে; অর্থাৎ স্থির মানুষের চেয়ে তার বয়সও বাড়বে ধীরে ধীরে। গতিবেগ যত বাড়বে, heart ততই আস্তে চলবে। যখন ঐ ব্যক্তি আলোর গতিবেগ অর্জন করবে, তখন কিন্তু একটা মজার ব্যাপার ঘটবে। তার সমস্ত শারীরিক ক্রিয়া যাবে বন্ধ হয়ে। কিন্তু মানুষটি মারা যাবে না। কাজেই আলোর গতিবেগে ভ্রমণ করবার সময় মানুষের heart বন্ধ হয়ে গেলেও তা চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে না। সত্যই বেশ অবাক ব্যাপার, নয় কি? কিন্তু এরকম ঘটবে না, কারণ আলোর গতিবেগ অর্জন করা সম্ভব হবে না।

এই ব্যাপারে একটা মজার উদাহরণ দেওয়া যাক। 30 বছর বয়স্ক কোন মহাকাশযাত্রী যদি আলোর বেগের কাছাকাছি গতিতে মহাকাশ যাত্রা আরম্ভ করে, তাহলে আইনস্টাইনের তত্ত্ব অনুযায়ী তার দেহের যন্ত্রপাতি সব আস্তে চলতে থাকবে। ধরা যাক, যাত্রা শেষে সে বাড়ী ফিরে এলো। তার ঘড়ি অনুযায়ী সে হয়তো দেখলো যে, সে মাত্র 2 বছর মহাকাশযানে ছিল—শুধু তাই নয়, তার বয়সও ঠিক সেই অনুপাতেই মাত্র 2 বছর বেড়েছে; অর্থাৎ তার বর্তমান বয়স হয়েছে ঠিক 32 বছর। কিন্তু বাড়ী ফিরে এসে সে যদি দেখে তার স্ত্রী, যাত্রার সময়ে যার বয়স ছিল মাত্র 25 বছর, এখন 75 বছরের বৃদ্ধা এবং তার পুত্র, যাত্রার সময়ে যার বয়স ছিল 5 বছর এখন 55 বছর-বয়স্ক এক ব্যক্তি, অথচ তার নিজের বয়স মাত্র 32 বছর, সে কি সত্যই অত্যন্ত অবাক হয়ে যাবে না? যদিও পৃথিবীতে 50 বছর কেটে গেছে, মহাকাশযানে তার ঘড়ি ও শরীর অনুযায়ী কেটেছে মাত্র 2 বছর। কারণ ঘড়ি ও তার heart দুই-ই স্লো চলেছে। মানুষ যদি আলোর 90% বেগেও ভ্রমণ করে (এবং মানুষের দৈর্ঘ্যের অভিমুখে), তবে তার দৈর্ঘ্য কমে হয়ে যাবে অর্ধেক। সেই অবস্থার চেহারাটা কল্পনা করাই যায় না।

সর্বশেষে প্রশ্ন—মানুষ মহাবিশ্ব ভ্রমণে সফলতা লাভ করতে পারবে কি না? উত্তরটা এখনও অনিশ্চিত। কারণ অন্যান্য বহু সমস্যা ছাড়াও

গতিবেগ সমস্যার সমাধানের পথেই বাধা অনেক। কিন্তু যত দূর এবং যত দ্রুতই ভ্রমণ করুক, সে যদি তার ঘড়ি অনুযায়ী মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে মহাবিশ্ব ভ্রমণ শেষ করে পৃথিবীতে ফিরে আসে—তবুও পৃথিবীতে সে কাউকে চিনতেই পারবে না—পৃথিবীতে তখন বহু যুগ-যুগান্তর পেরিয়ে গেছে।

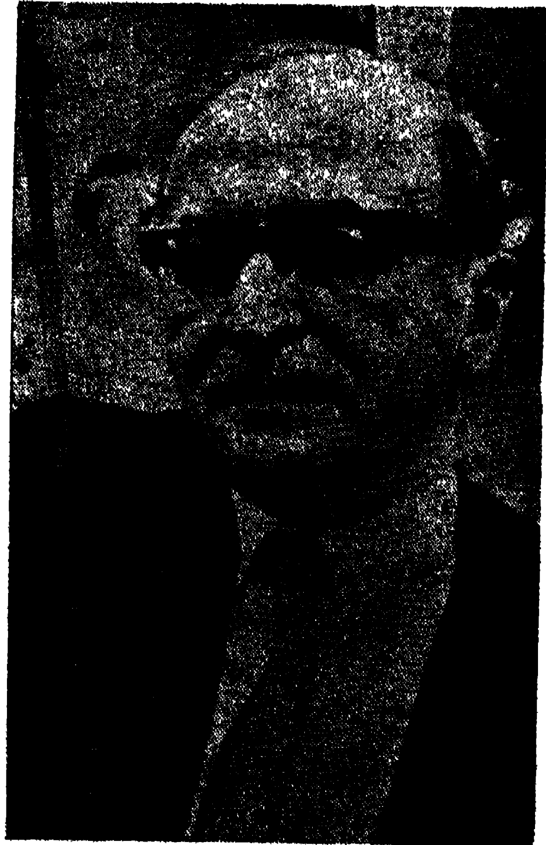
1971 সালে বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার

পদার্থ-বিজ্ঞান

1971 সালের জন্যে পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে হাঙ্গেরীজাত ও বর্তমান বৃটিশ নাগরিক অধ্যাপক ডেনিস গ্যাবরকে (Dennis Gabor)। তিনি লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজ অফ সায়েন্স অ্যাণ্ড টেক্নোলজির ফলিত ইলেকট্রনিক্স বিষয়ের এমেরিটাস অধ্যাপক। ত্রিমাত্রিক লেন্সবিহীন আলোকচিত্র হোলোগ্রাফির (Holography) উদ্ভাবকরূপে তিনি বিজ্ঞান-জগতে সুপ্রসিদ্ধ।

সুসঙ্গত আলোর সাহায্যে এই হোলোগ্রাফি সৃষ্ট হয়: এই পদ্ধতিতে কোন বস্তু থেকে নিঃসৃত আলোক-তরঙ্গ দ্বিতীয় একটি সুসঙ্গত আলোক-রশ্মির সাহায্যে একটি ফটোগ্রাফিক অবদ্রবে 'জমিয়ে' দেওয়া হয়। দ্বিতীয় আলোক রশ্মির সাহায্যেই তারপর আকাঙ্ক্ষিত ত্রিমাত্রিক আলোক চিত্র বা হোলোগ্রাম রূপায়িত হয়। হোলোগ্রাম হচ্ছে আসলে ত্রিমাত্রিক প্রতিবিম্ব। 1948 সালে অধ্যাপক গ্যাবর যখন ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিশ্লেষণ শক্তি বিবর্ধনের প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত ছিলেন, তখন তিনি এই হোলোগ্রাফি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। 1961 সালে লেসার রশ্মি আবিষ্কৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হোলোগ্রাফির ব্যাপকতর প্রয়োগ দেখা যায় এবং পরবর্তী বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম লেসার-হোলোগ্রাম সৃষ্টির পর বৃটেন ও আমেরিকায় এই বিষয়ে গবেষণা দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলে।

1900 সালের জুন মাসে গ্যাবর হাঙ্গেরীর বুডাপেষ্ট শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের প্রথম প্রেরণা পান বাবার কাছ থেকে। তাঁর বাবা বৃত্তিতে ব্যবসায়ী ছিলেন,



অধ্যাপক ডেনিস গ্যাবর

কিন্তু ইঞ্জিনীয়ারিং ক্ষেত্রে নতুন নতুন জিনিস উদ্ভাবনের দিকে তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল। গ্যাবর বুডাপেষ্টে টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ও তারপর

জার্মেনীর বার্লিনে শিক্ষাগ্রহণ করেন। বার্লিনে তিনি বৈদ্যুতিক যন্ত্রবিদ্যায় ডিপ্লোমা ও পরে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি প্রথমে জার্মান রিসার্চ অ্যাসোসিয়েসনে সহকারী গবেষক ও তারপর সীমেন্স অ্যাণ্ড হালস্কন-এ গবেষক-ইঞ্জিনীয়াররূপে গবেষণা করেন।

সে সময় বার্লিন ছিল তরুণ বিজ্ঞানীদের কাছে তীর্থক্ষেত্রস্বরূপ। গ্যাবর সেখানে আইনষ্টাইন, প্লাঙ্ক, শ্রোয়েডিঙ্গার, ফন লাউয়ে প্রমুখ মহারথীদের বক্তৃতা শোনবার সুযোগ পান। উচ্চ শক্তিসম্পন্ন ক্যাথোড রশ্মির অসিলোগ্রাফ সম্পর্কে গ্যাবর প্রথমে গবেষণা সুরু করেন। তিনি এক্ষেত্রে যে সব নতুন নতুন জিনিষ উদ্ভাবন করেন, তার কয়েকটি বেশ কিছুকাল আদর্শস্থানীয় বলে চলেছিল। সীমেন্স-এ থাকাকালে তিনি গ্যাসের মোক্ষণ সম্পর্কে গবেষণা করেন এবং গ্যাস মোক্ষণের তত্ত্ব ও প্লাজ্মা সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহী হয়ে ওঠেন। 20 বছর পরে ইম্পিরিয়াল কলেজে তিনি কোন কোন প্লাজ্মা অবস্থায় ইলেকট্রনগুলির মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার এক ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হন।

1933 সালে নাৎসীরা ক্ষমতায় আসবার সঙ্গে সঙ্গে ডক্টর গ্যাবর জার্মেনী ছেড়ে হাঙ্গেরীতে চলে আসেন এবং পরের বছর বৃটেনে এসে বৃটিশ টমসন হিউষ্টন প্রতিষ্ঠানে গবেষক-ইঞ্জিনীয়ার হিসাবে যোগদান করেন। এখানে তিনি গ্যাস-মোক্ষণ সম্পর্কে গবেষণা চালিয়ে যান এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র সম্পর্কে গবেষণা করবার সময় হোলোগ্রাফীর পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। সে সময় এই পদ্ধতি 'তরঙ্গস্তর পুনর্গঠন' (Wave front reconstruction) নামে পরিচিত ছিল।

1948 সালে ডক্টর গ্যাবর লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইম্পিরিয়াল কলেজে ইলেকট্রনিক্সের বিষয়ে রীডার নিযুক্ত হন। 1958 সালে তিনি ফলিত ইলেকট্রনিক পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হন এবং 1967 সালে এই পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি ইম্পিরিয়াল কলেজের এমেরিটাস অধ্যাপক এবং অন্যতম সিনিয়র রিসার্চ ফেলো।

পদার্থ-বিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্যে ডক্টর গ্যাবর দেশ-বিদেশের বহু সম্মান ও পদক লাভ করেছেন। তিনি হাঙ্গেরীর অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স-এর সম্মানীয় সদস্য, লণ্ডনের রয়েল সোসাইটির ফেলো এবং সি. বি. ই। তিনি একজন সমাজ-সচেতন সুলেখকও। 'Inventing the future' নামে তাঁর গ্রন্থখানি বিজ্ঞানী মহলে বিশেষ সমাদর লাভ করেছে। এছাড়া 'The Electron microscope' এবং সম্প্রতি (1970) 'Innovation: Scientific, Technological and Social' নামে তাঁর দুখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এবং প্রায় 100টি গবেষণা-নিবন্ধের তিনি রচয়িতা।

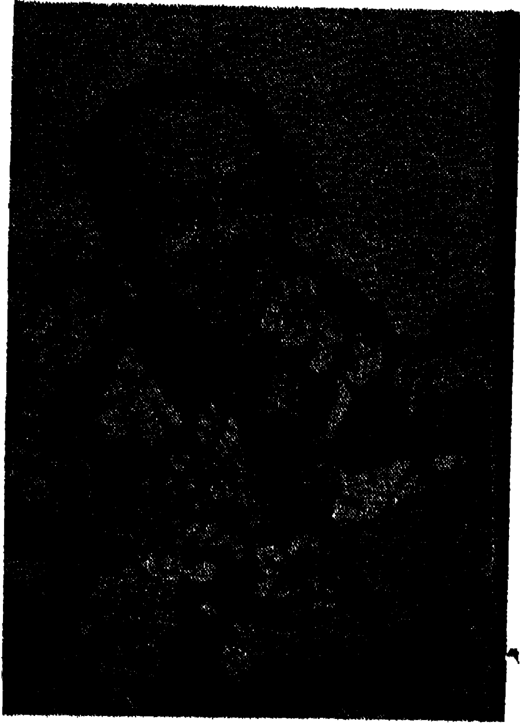
শারীরতত্ত্ব ও ভেষজ বিজ্ঞান

এবছর (1971) শারীরতত্ত্ব ও ভেষজ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভ্যাণ্ডারবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীর-বিজ্ঞানী ডক্টর আর্ল উইলবার সাদারল্যাণ্ড (জুনিয়র) [নভেম্বর '71 সংখ্যায় এই সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে]। শারীরতত্ত্বে যে অবদানের স্বীকৃতিতে সাদারল্যাণ্ডকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে, তার উল্লেখ করে স্টকহোমের ক্যারোলিনস্কা মেডিকেল ইনস্টিটিউট বলেছেন—যে প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন হর্মোন দেহের মধ্যে তাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করে থাকে, তা এতদিন রহস্যময় ছিল। ডক্টর সাদারল্যাণ্ডের গবেষণার ফলে তাদের অনেকগুলির সাধারণ কার্যপ্রণালী আজ আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছি।

25 বছর আগে সাদারল্যাণ্ড যখন এই বিষয়ে গবেষণা সুরু করেন, তখন তিনি কোন রোগ-বিশেষ নিরাময় বা প্রতিরোধ করবার, অথবা স্বাস্থ্য

উন্নতির কোন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনের বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ আরম্ভ করেন নি। 1946-47 সালে ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষক হিসাবে কাজ করবার সময় তিনি নিছক কৌতূহলবশে হর্মোন সংক্রান্ত অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হন।

আমরা জানি, হর্মোন বা অন্তঃস্রাবী রস হচ্ছে বিশেষ ধরণের রাসায়নিক পদার্থ। প্রাণিদেহের মধ্যে থাইরয়েড, পিটুইটারি ইত্যাদি অন্তঃস্রাবী



ডক্টর আর্ল ডাব্লিউ সাদারল্যাণ্ড

গ্রন্থি থেকে বিশেষ বিশেষ হর্মোন নিঃসৃত হয়ে থাকে। দেহের প্রতিটি কোষের বিপাকীয় কার্যকলাপে বিভিন্ন হর্মোনের প্রভাব অপরিসীম। কোন কোষ কিভাবে কাজ করবে ও কতটা কাজ করবে, তা নিয়ন্ত্রণ করে হর্মোন। বিভিন্ন অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি থেকে প্রয়োজন অনুসারে তারা নিঃসৃত হয় ও তারপর রক্তে এসে মেশে। এরপর রক্তের মধ্য দিয়ে শরীরের বিভিন্ন অংশে বাহিত হয় ও সেই সমস্ত অংশের যথাযথ কাজ করবার নিয়ন্ত্রক হিসাবে তারা ভূমিকা গ্রহণ করে।

1956 পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতেন, প্রয়োজন অনুসারে হর্মোন সরাসরি কোষে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং প্রত্যক্ষভাবে তার যাবতীয় রাসায়নিক কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু ঐ বছর সাদারল্যাণ্ড যকৃতের কোষকলায় সম্পূর্ণ নতুন এক ধরণের রাসায়নিক যৌগ আবিষ্কার করেন। তিনি এই যৌগের নাম দেন সাইক্লিক অ্যাডিনোসাইন মনোফসফেট (Adenosine monophosphate) বা সংক্ষেপে সাইক্লিক এ-এম-পি (Cyclic a m p)। আগে ধারণা ছিল, হর্মোনই প্রত্যক্ষভাবে কোষের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। সাদারল্যাণ্ড তাঁর ব্যাপক অনুসন্ধানের পর জানালেন, সাইক্লিক এ-এম-পি-ই কোষের যাবতীয় কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে। কোষ কখনও তার পরিমাণ বাড়ায়, কখনও বা কমিয়ে দেয়। তিনি পরীক্ষা করে দেখালেন, যখন কেউ উত্তেজিত হয়, তখন তার অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয় অ্যাড্রিনেলিন হর্মোন এবং তার ফলে সেই লোকটির হৃদ্‌স্পন্দন বেড়ে যায়। পরে আরও দেখা গেল, অ্যাড্রিনেলিন হৃদ্‌পিণ্ডের পেশী কোষে সাইক্লিক এ-এম-পি-র মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে এবং এই বস্তুটিই পেশীর কাজ করবার ক্ষমতা বাড়িয়েছে।

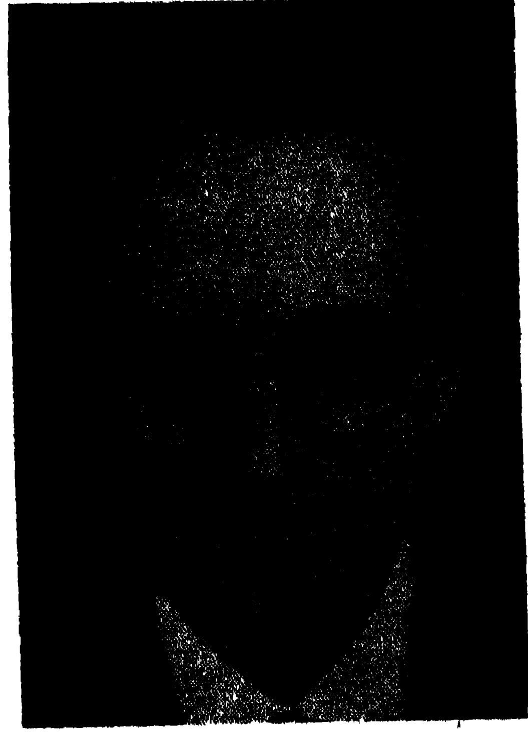
সাদারল্যাণ্ডের এই আবিষ্কার সম্পর্কে চিকিৎসক সমাজ প্রথমে সংশয় প্রকাশ করে বিরূপ সমালোচনা করেন। এর পরের দশ বছর সাদারল্যাণ্ড এই বিষয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। 1960 সালের পর পৃথিবীর সর্বত্র সাইক্লিক এ-এম-পি-কে কেন্দ্র করে ব্যাপক অনুসন্ধান চলে এবং সাদারল্যাণ্ডের আবিষ্কারের গুরুত্ব স্বীকৃত হয়। বস্তুতঃ সাদারল্যাণ্ডের আবিষ্কার জীবনের ধারা অনুশীলনে একটি বড় রকমের অগ্রগতি বলে স্বীকৃত হয়েছে। অধুনা

দু-হাজারের মত বিজ্ঞানী এই বিষয়ে গবেষণা চালাচ্ছেন।

ডক্টর সাদারল্যাণ্ডের উদ্ভাবিত তত্ত্ব ভবিষ্যতে নানা সম্ভাবনার পথ খুলে দিতে পারে। এর ফলে বহুমূত্র, কলেরা—এমন কি, ক্যান্সার নিরাময়ে এবং নানা ব্যাধির চিকিৎসায় নতুন ভেষজ তৈরি হতে পারে। ডক্টর সাদারল্যাণ্ড নিজে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন—এই গবেষণার ধারা থেকে উপজাত হিসাবে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের এক নতুন অথবা উন্নত পদ্ধতি গড়ে উঠবে, এমন আশা করা অবাস্তব নয় বলে মনে হয়।

রসায়ন

রসায়ন শাস্ত্রে এবছর (1971) এমন একজন বিজ্ঞানীকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে, যিনি রসায়ন ও পদার্থ-বিজ্ঞান উভয় ক্ষেত্রকে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার অবদানে সমৃদ্ধ করেছেন। তিনি হচ্ছেন ক্যানাডার জাতীয় গবেষণা সংস্থার (National Researeh Council) ডক্টর গেরহার্ড হার্জবার্গ (Gerhard Herzberg)। অণুসমূহের বিশেষতঃ মুক্ত উপাণুর ইলেকট্রনিক গঠন-বৈশিষ্ট্য ও জ্যামিতি সম্পর্কে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্যে তাঁকে বিজ্ঞান-জগতের সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। ডক্টর হার্জবার্গ জন্মসূত্রে জার্মান, কিন্তু বর্তমানে ক্যানাডার নাগরিক। ক্যানাডাবাসীদের মধ্যে তিনিই এই সর্বপ্রথম



ডক্টর গেরহার্ড হার্জবার্গ

নোবেল পুরস্কার পেলেন। (ডক্টর হার্জবার্গের কাজের বিস্তৃত আলোচনা পরে প্রকাশিত হবে।)

—রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

কৃষি-সংবাদ

মিষ্টি করলা

করলা বললেই যে তিক্ত সব্জীটির কথা মনে পড়ে, গুজরাটের জুনাগড় জেলায় উৎপন্ন ছোট করলাগুলি কিন্তু তার ব্যতিক্রম। এই জাতের করলার স্বাদ মোটেই তিক্ত নয় বরং অত্যন্ত সুস্বাদু। সাধারণতঃ সেচযুক্ত জমির প্রান্তদেশে এগুলি জন্মানো হয়।

প্রায় সব ধরণের জমিতেই এই জাতের করলার চাষ করা যেতে পারে। তবে বালুকাময় দোআঁশ কিম্বা পলিদোআঁশ মাটিতে এর ফলন খুব বেশী হয়। এর বীজগুলি পাত্‌লা, ছোট আকৃতির ও হলদেটে সাদা রঙের হয়। ফেব্রুয়ারীর শেষের দিকে বীজ পোঁতবার মাস খানেকের মধ্যেই এই করলার কচি লতায় ফুল এসে যায় ও তার আরও পনের দিন পরেই ছোট ছোট করলা ধরতে আরম্ভ করে। লতার বাড় ঠিকমত হবার জন্যে সপ্তাহে দু-বার করে জল দেওয়া ও মাচার ভিতর দিয়ে পর্যাপ্তভাবে হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা রাখা দরকার। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকাল এই করলার পক্ষে অনুকূল সময়।

খুদে করলার লতায় সতেজ ডাঁটাগুলি যখন ছোট ছোট সবুজ পাতা, হলুদ ফুল ও কচি কচি করলায় ভরে ওঠে, তা দেখতে খুব ভাল লাগে। আকারে এই জাতের করলা গোল হয় এবং এগুলির সাদাটে সবুজ রঙের পাত্‌লা খোসার উপরে মাঝে মাঝে সাদা রঙের ছোপ থাকে। করলাগুলির প্রত্যেকটির ওজন সাধারণতঃ আট থেকে দশ গ্রাম পর্যন্ত হয়ে থাকে। তরকারীতে সুগন্ধের জন্যে প্রায়ই এগুলির ব্যবহার করা হয়।

নভেম্বর মাস পর্যন্ত এই লতাগাছে নিয়মিত ফল ধরে। কচি ও কোমল থাকা অবস্থায় তিন দিন অন্তর ফল তোলা হয়। পাকা অবস্থায় এগুলির রং সাদাটে সবুজ থেকে হলদেটে জাফরানীতে বদ্‌লে যায়, ডাঁটাগুলি লালচে হয়ে যায় ও বীজগুলি ক্রমে পরিণত হয়ে ওঠে।

খাদ্যমূল্যের দিক দিয়েও এই করলা বিশেষ সমৃদ্ধ। এগুলিতে প্রচুর পরিমাণে লৌহ এবং এ, বি ও সি ভিটামিন থাকে। মাখনে রান্না করা হলে এর ক্যালোরির পরিমাণও খুব বেড়ে যায় এছাড়া বহুমূত্র ও বাতরোগের পক্ষে এগুলি বিশেষ উপকারী।

[ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ, (কৃষি-ভবন), নতুন দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত]

উদ্ভিদের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করবার নুতন পদ্ধতি

উদ্ভিদের বিকাশ ও বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করবার একটি নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। সঙ্কর জাতীয় উদ্ভিদ উৎপাদন ও তার বৃদ্ধিতে বর্তমানে যে সময় লাগে, তার অনেক কম সময়েই এই কৃত্রিম উপায়ে তাদের বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটানো যাবে।

আমেরিকার অ্যারিজোনার কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের জেনিটিসিস্ট রবার্ট জি. ম্যাকড্যানিয়েল এই বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারে মার্কিন কৃষি গবেষণা কৃত্যকের সহযোগিতা করছেন।

তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছেন—এই নূতন প্রক্রিয়ার নাম মাইটোকণ্ড্রিয়াল কমপ্লিমেণ্টেশন সংক্ষেপে এম. সি.। কয়েক প্রকার উদ্ভিদ বেছে নিয়ে তাদের মধ্যে পরাগ-সংযোগ ঘটিয়ে সঙ্কর জাতীয় উদ্ভিদ সৃষ্টি করবার পর এই সকল নূতন চারা কি রকম শক্ত-সমর্থ হবে, কি রকম ফলনশীল হবে—ইত্যাদি বিষয় এই প্রক্রিয়ায় জানা যাবে।

যথোপযুক্ত পরিমাণে এম. সি. ব্যবহার করে পাঁচ বছরের স্থলে দু-বছরের মধ্যেই ঐ সকল সঙ্কর জাতীয় উদ্ভিদের বিকাশ ও বৃদ্ধি ঘটানো যাবে।

তিনি এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলেন যে, গবেষণাগারের মাঠে সাধারণতঃ বিভিন্ন উদ্ভিদের মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে বিপরীত পরাগ-সংযোগ ঘটানো হয় অর্থাৎ ক্রস-পলিনেশনের দ্বারা সঙ্কর জাতীয় উদ্ভিদ উৎপাদন করা হয়। ঐ গাছ বড় হবার জন্যে অপেক্ষা করতে হয়, তারপর সেই সঙ্কর জাতীয় গাছে ফল ধরে এবং বীজ হয়। সেই নতুন বীজের চারা আবার রোপণ করা হয়। ঐ সকল নতুন গাছের বৃদ্ধির সময় ফসল উৎপাদনের ক্ষমতা ও অন্যান্য গুণাগুণ পরীক্ষা করে দেখা হয়। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সন্তোষজনক বলে বিবেচিত হলে বহু প্রকার সঙ্করজাতীয় গাছের মধ্যে মাত্র কয়েকটি বেছে নেওয়া হয়। এভাবে শক্তিশালী এবং অতি উচ্চ ফলনশীল উদ্ভিদ সৃষ্টি করা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।

নব-উদ্ভাবিত মাইটোকণ্ড্রিয়াল কমপ্লিমেন্টেশন প্রক্রিয়ায় বহু প্রকার সঙ্করজাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে ভবিষ্যতে কোন্ কোন্‌টি শক্তিশালী এবং উচ্চ ফলনশীল উদ্ভিদে পরিণত হবে, তা চারা অবস্থায়ই জানা যায়। ফলে সময় সংক্ষেপ হয়। তবে তিনি এই প্রসঙ্গে আরও বলেছেন যে, সকল উদ্ভিদকে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা করে দেখা হয়। তাদের মধ্যে কোন্ কোন্‌টি ভবিষ্যতে উচ্চ ফলনশীল হবে, তার আভাস পাওয়া গেলে তাদের মাঠে রোপণ করে গুণাগুণ পরীক্ষা করে দেখবার প্রয়োজন হয়ে থাকে।

ডক্টর ম্যাকডানিয়েলের ধারণা—কেবল মাত্র ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রেই নয়, পশু-প্রজননের ক্ষেত্রেও এই এম. সি. পরীক্ষা-পদ্ধতি এক নব-দিগন্তের সন্ধান দিবে।

প্রচণ্ড শীত থেকে শাকসব্জী ও ফসল রক্ষায় অভিনব উপাদান

প্রচণ্ড শীত থেকে শস্য ও শাকসব্জী রক্ষা করবার একটি অভিনব উপাদান মার্কিন কৃষি-বিজ্ঞানীরা উদ্ভাবন করেছেন। তাঁরা প্রথমে প্রচণ্ড শীতের কবল থেকে শাকসব্জী ও ফসলকে কাপড়, কাগজ অথবা প্লাষ্টিকের আবরণ দিয়ে ঢেকে রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কৃতকার্য হন নি। তারপর টেক্সাসের ওয়েসলাকোর কৃষি-গবেষণা কৃত্যকের বিজ্ঞানীরা এই অভিনব ইনস্যুলেটিং বা তাপ প্রতিরোধক উপাদানটি আবিষ্কার করেছেন। চারা গাছের গোড়ায় মাটির সঞ্চিত তাপমাত্রা অক্ষুণ্ণ রাখবার উপায় উদ্ভাবনই ছিল তাঁদের প্রথম লক্ষ্য। তার পর ঐ উপাদানটি যাতে সস্তা হয়, সে দিকেও তাঁরা দৃষ্টি রেখেছেন। রাতে যখন ঠাণ্ডা ও বরফ পড়বে, তখন ঐ উপাদান গাছপালাকে ঢেকে রাখবে এবং সকাল বেলায় সূর্যের আলোয় সেই উপাদানের আবরণ আর থাকবে না। ঐ বস্তুটি গাছপালার উপর ছড়িয়ে দেবার জন্যে স্বহস্তে বহনযোগ্য সস্তা একটি জেনারেটর অর্থাৎ বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদক যন্ত্রের প্রয়োজন।

মিঃ মার্ভিন ডি. হেলম্যান ও জন এফ. বার্থোলিক—এই দু-জন বিজ্ঞানী রেটজোলেট আর 30, ক্লরোনিক এফ-68 এবং জিলেটিন ও জল মিশিয়ে এই অভিনব উপাদান তৈরি করেছেন। এটি কোন বিষাক্ত পদার্থ নয়। এতে মাটিরও কোন ক্ষতি হয় না। এই উপাদান গাছপালার উপর ছড়িয়ে দেবার পর দেখা গেছে, এর আবরণের মধ্যের তাপমাত্রা, বাইরের তাপমাত্রার তুলনায় 22 ডিগ্রী ফারেনহাইট বেশী থাকে। গরম জলের সঙ্গে এই সকল পদার্থ মেশালে ফেনা হয়। সেই ফেনাই গাছপালার উপর যন্ত্রের সাহায্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। থাল কেটে গাছ লাগিয়ে ব্যবহার করলে ঐ সব উপাদান অনেক কম লাগে।

কীট-পতঙ্গের সাহায্যে আগাছা ধ্বংসের অভিনব পদ্ধতি

খাল-বিল, নদী-নালায় অনেক রকম আগাছা জন্মায়। এই সকল আগাছা নৌকা বা অন্যান্য যান চলাচলের পথে বাধা সৃষ্টি করে, শস্যেরও ক্ষতি করে। ভেষজ দ্রব্যের সাহায্যে এদের নির্মূল করা যায়। কিন্তু তাতে জল দূষিত হয়ে থাকে।

অনেক রকম পোকামাকড় এই সকল আগাছা খেয়ে বেঁচে থাকে। বিজ্ঞানীরা বলছেন যে, এই সকল কীট-পতঙ্গের চাষ করে বিপুল পরিমাণে সেগুলিকে ঐ সকল আগাছার উপর ছেড়ে দিয়ে এদের নির্মূল করা যেতে পারে।

ইউরেশিয়াম মিল ফয়েল নামক এক প্রকার আগাছা আমেরিকায় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। প্যারাপোনিক্স নামে এক প্রকার কীটের চাষ করে এই সমস্যা সমাধান করা যায় কি না, সে বিষয়ে আমেরিকায় কীট-বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখছেন। তাঁরা জানিয়েছেন যে, যে সকল জলজ গাছপালা মানুষের বিশেষ কাজে লাগে—ঐ কীট যে তাদের কোন ক্ষতি সাধন করে না, তা বিশেষভাবে প্রমাণিত হলেই আগাছা নির্মূল করবার ব্যাপারে এদের সাহায্য নেওয়া হবে।

সঙ্করজাতীয় সূর্যমুখী ফুলের বীজ

সূর্যমুখী ফুলের বীজ থেকে তৈল উৎপাদন করা হয় এবং সয়াবীন তৈলের পরেই সূর্যমুখীর বীজের তৈলের চাহিদা আছে।

আমেরিকায় তিন-চার রকমের সূর্যমুখী ফুলের গাছ আছে। বিভিন্ন জাতীয় ফুলের মধ্যে পরাগ সংযোগ ঘটিয়ে মার্কিন কৃষি গবেষণা দপ্তরের বিজ্ঞানীরা এক প্রকার বর্ণসঙ্কর সূর্যমুখী গাছ উৎপাদনের চেষ্টা করছেন এবং ডক্টর মুরে এল. কিন্‌স্ম্যান এই ব্যাপারে কৃতকার্যও হয়েছেন। তিনি বলেছেন, বর্তমানে ঐ সকল সঙ্করজাতীয় সূর্যমুখীর বীজ ভুট্টা ও সরগমের মত চাষ করা যাবে এবং প্রচুর সূর্যমুখীর বীজ পাওয়া যাবে।

গবাদি পশুর রোগ 'লেপ্‌টোস্পাইরা'র টিকা আবিষ্কার

লেপ্‌টোস্পাইরা (Leptospira) নামে এক প্রকার রোগ হরিণ, শেয়াল, ইঁদুর, রেকুন প্রভৃতি নানা জাতীয় বন্যজন্তুর মধ্যে দেখা যায়। এই রোগ জল ও খাদ্যবস্তুর মাধ্যমে গৃহপালিত জীবজন্তু, বিশেষ করে গবাদি পশু এবং মানুষের মধ্যেও সংক্রামিত হয়ে থাকে। ঐ সকল জীব-জন্তুর প্রস্রাবের মাধ্যমেই ঐ রোগের জীবাণু বাহিত হয়। অগ্নিমান্দ্য এবং জ্বর এই রোগের প্রধান লক্ষণ। ঐ রোগে আক্রান্ত গবাদি পশুর দুগ্ধ হ্রাস পায় এবং গর্ভস্রাব হয়। তরুণ প্রাণীদের বৃদ্ধি হয় না এবং ঐ রোগ কোন কোন সময়ে মারাত্মক হয়ে থাকে।

আমেরিকার আইওয়া রাজ্যের আমেসের পশু রোগ সংক্রান্ত গবেষণাগারে এই রোগের টিকা আবিষ্কৃত হয়েছে। এই টিকা ব্যবহার করে গবাদি পশু, শূকর প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তুর ক্ষেত্রে বিশেষ সুফল পাওয়া গেছে। যে সকল জন্তুদের টিকা দেওয়া হয়েছে, তাদের মূত্রাশয় আক্রান্ত হয় নি এবং অন্যান্য রোগের লক্ষণও দেখা যায় নি।

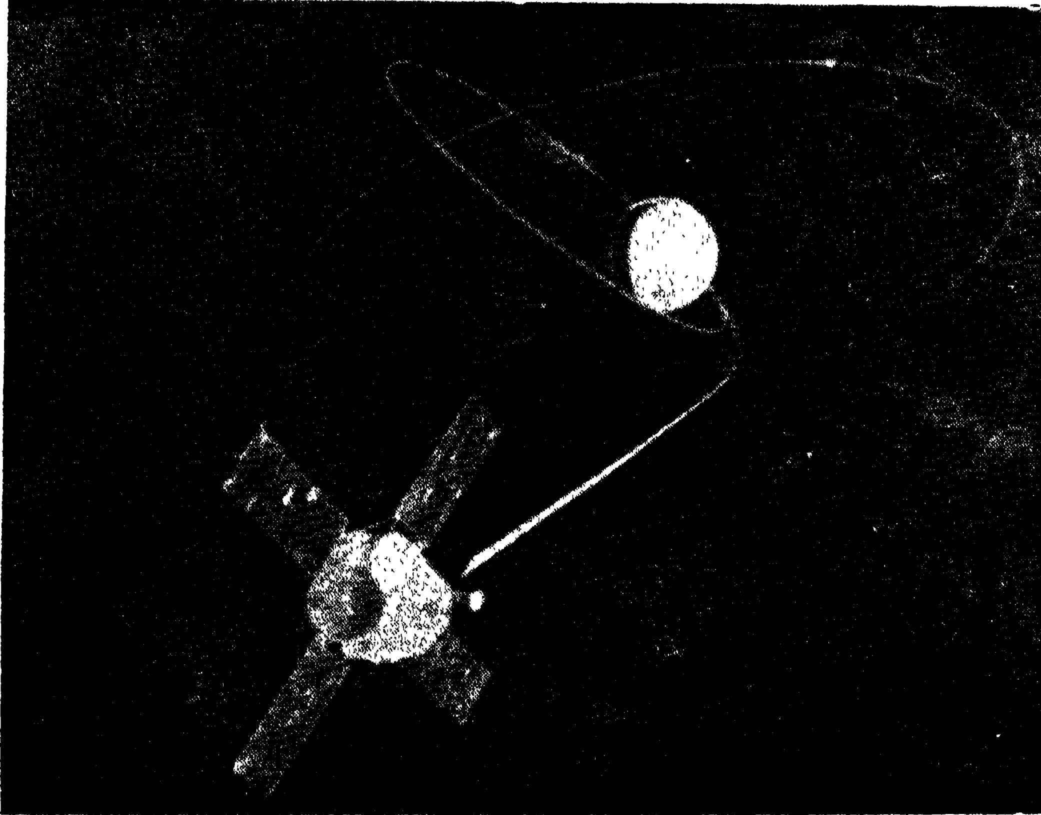
এই রোগের নিদান ও চিকিৎসা করা খুবই কঠিন। বাইরে থেকে রোগের লক্ষণ দেখা না গেলেও পশুর দেহে ঐ রোগের বীজাণু থাকতে পারে এবং অন্যান্য পশু ঐ রোগের বীজাণুর দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ডিসেম্বর — 1971

চতুর্বিংশ বর্ষ — দ্বাদশ সংখ্যা



ছবিতে দেখা যাচ্ছে, ইউ. এস. এ-র স্পেসক্র্যাফ্‌ট্‌ মেরিনার-9 মঙ্গলগ্রহ পরিক্রমার জন্যে তার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। মেরিনার-9 মঙ্গলগ্রহের পৃষ্ঠদেশের 70 শতাংশেরও বেশী জায়গার টেলিভিসন-ছবি তুলবে। তাছাড়া তাপমাত্রা, গঠন-উপাদান ও চতুর্দিকের বায়ুমণ্ডলের চাপ প্রভৃতি বিষয়েও তথ্য সংগৃহীত হবে। ছবিতে ডিমোস (বাইরের বলয়) ও ফোবোস (ছোট বলয়) নামক মঙ্গলগ্রহ-পরিক্রমারত উপগ্রহ দুটিকে দেখা যাচ্ছে। 1971 সালের 30শে মে কেপ কেনেডি থেকে মেরিনার-9 মঙ্গলগ্রহ অভিমুখে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে।

বাতাসে ভাসমান অদৃশ্য জীব-জগৎ

এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয়—যে বায়ুস্তর পৃথিবী বেষ্টন করে আছে, তার মধ্যে লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবাণু ভেসে বেড়াচ্ছে। খালি চোখে দেখা যায় না বলেই এদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা বিশেষ সচেতন নই। জীবাণুগুলি যে পৃথিবীর কাছাকাছি বায়ুস্তরেই রয়েছে তা নয়, পৃথিবী থেকে দূরবর্তী উর্ধ্বাকাশের বায়ুস্তরেও এদের উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া গেছে। সমুদ্রের উপরের বায়ুস্তরেও এদের অস্তিত্ব আছে। সাধারণতঃ নীচের বায়ুস্তর থেকে যতই উপরে ওঠা যায়, জীবাণুর সংখ্যা ততই কমে আসে।

বায়ুমণ্ডলকে কিন্তু জীবাণুর বাসস্থান হিসাবে ধরা যায় না। এরা স্বল্পকালের জন্যে বাতাসে ভাসমান পর্যটক মাত্র। ভাসমান অবস্থায় কিছু কিছু জীবাণুর মৃত্যু ঘটলেও বেশীর ভাগই বেঁচে থাকে এবং উপযুক্ত মাধ্যমে পতিত হলে সেখানে বংশবিস্তার করে।

হল্যাণ্ডের অধিবাসী অ্যাণ্টনী ভ্যান লেভেনহুক সর্বপ্রথম এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবাণুগুলিকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হন। তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন যে, বাতাসে ভাসমান ধূলিকণার সঙ্গে এরা নিয়ত অবস্থান করে। এরপর 1861 খৃষ্টাব্দে প্যারিসে লুই পাস্তুর সর্বপ্রথম দেখালেন যে, বাতাসে ভাসমান জীবাণুগুলিকে উপযুক্ত মাধ্যমের সাহায্যে বাঁচিয়ে রেখে তাদের বংশবৃদ্ধি করানো সম্ভব। তিনি আরও দেখান যে, এই সকল জীবাণুই বিভিন্ন জৈব পদার্থের পচনের মূল কারণ। বিভিন্ন রকম রোগের সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক আছে কিনা, ক্রমশঃ সে বিষয়ে গবেষণা সুরু হয়। 1873 খৃষ্টাব্দে কানিংহাম কলিকাতার আলিপুর জেলের অভ্যন্তরস্থিত বাতাসে বিভিন্ন জীবাণুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করেন, কিন্তু তিনি রোগের আক্রমণের সঙ্গে এদের কোন রকম সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হন নি। ক্রমশঃ এই বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন দেশে গবেষণা সুরু হয়ে যায় এবং অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হয়।

এই জীবাণুগুলি সাধারণতঃ ব্যাক্টিরিয়া, ঈষ্ট ও অ্যাক্টিনোমাইসিটিস ছত্রাক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এদের মধ্যে বিভিন্ন উদ্ভিদের পরাগরেণুও একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এদের মূল উৎস মাটি ও বিভিন্ন ধরণের উদ্ভিদ। ছত্রাক শ্রেণীভুক্ত জীবাণুগুলি সজীব উদ্ভিদের উপর পরগাছার মত অথবা মৃত উদ্ভিজ্জ পদার্থের উপর বংশবৃদ্ধি করে এবং কিছু কিছু সরাসরি বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণতঃ পল্লীগ্রাম অপেক্ষা শহরের বাতাসে ছত্রাকজাতীয় জীবাণু কম থাকে। এর কারণ সম্ভবতঃ মূল উৎস—উদ্ভিদের প্রাচুর্যের অভাব। অন্য দিকে ব্যাক্টিরিয়া গোষ্ঠীভুক্ত জীবাণু শহরের বাতাসে অধিক সংখ্যায় থাকে—সম্ভবতঃ দৈনন্দিন গার্হস্থ্য কাজকর্ম থেকে উদ্ভূত পচনশীল জৈব পদার্থ ই এর মূল কারণ।

বর্ষাকালে ভিজা জামা, কাপড়, জুতা, পাউরুটি, আচার, ফলমূল প্রভৃতির উপর যে ছাতা পড়ে, তা ছত্রাকজাতীয় জীবাণু ছাড়া আর কিছুই নয়। বায়ুর আর্দ্রতা এবং উষ্ণতা উভয়েরই যথেষ্ট প্রভাব আছে এই জীবাণুগুলির প্রাদুর্ভাবের উপর। অধিক বৃষ্টিপাতের দরুণ বাতাসে ভাসমান জীবাণুগুলি বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে নেমে আসে, ফলে বাতাস অনেকটা জীবাণুমুক্ত থাকে। অন্য দিকে অনাবৃষ্টি বা অল্পবৃষ্টির ফলে উদ্ভূত মৃত উদ্ভিদগুলি জীবাণুদের আবাসভূমি হিসাবে কাজ করে এবং এর ফলে জীবাণুর বংশবৃদ্ধি হয়। এই সকল কারণে বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জীবাণুর সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। এমনও দেখা যায় যে, একই দিনের মধ্যে আবহাওয়ার তারতম্যে বাতাসে ভাসমান এই জীবাণুগুলির সংখ্যা ও প্রকৃতিগত তারতম্য ঘটে থাকে। এই জীবাণুগুলি সম্বন্ধে জানতে হলে প্রথমতঃ এদের বাতাস থেকে নামিয়ে এনে উপযুক্ত মাধ্যমের সাহায্যে বেড়ে উঠতে সাহায্য করা হয় এবং পরে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এদের প্রকৃতিগত পার্থক্য নির্ণয় করা হয়।

বর্তমানে উদ্ভিদ-রোগ বিশেষজ্ঞদের দ্বারা এই বিষয়টি নিয়ে বিশেষভাবে গবেষণা হচ্ছে—তার প্রধান কারণ এই জীবাণুগুলির একটি বিশেষ অংশ উদ্ভিদের মধ্যে রোগ উৎপত্তির জন্যে দায়ী। চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরাও এই বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহী, কারণ বাতাসে ভাসমান কিছু জীবাণু শ্বাসকার্য চলবার সময় আমাদের দেহের ভিতরে প্রবেশ করে এবং হাঁপানী বা অন্যান্য অ্যালার্জি জাতীয় রোগের সৃষ্টি করে। শিল্পক্ষেত্রে, বিশেষতঃ বস্ত্রশিল্প, চর্মশিল্প, ফল ও অন্যান্য খাদ্যসংরক্ষণশিল্প প্রভৃতির ক্ষেত্রেও এই বিষয়টির উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বাতাসে ভাসমান জীবাণু নিয়ে অনেক গবেষণা সুরু হয়েছে। বিশেষ করে আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড ও আরও অনেক দেশ এই বিষয়ে অনেকটা এগিয়ে গেছে। অবশ্য আমাদের দেশও পিছিয়ে নেই। ভারতবর্ষের অনেক গবেষণাগার ও হাসপাতালে অদৃশ্য এই জীবাণু সম্বন্ধে ব্যাপক গবেষণা সুরু হয়েছে। এই অজানা জগৎ সম্বন্ধে ভবিষ্যতে অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হবার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

রমা চক্রবর্তী*

* বসু বিজ্ঞান মন্দির, কলিকাতা-9

পারদর্শিতার পরীক্ষা

রসায়নবিষয়ক 6টি প্রশ্ন নীচে দেওয়া হলো। উত্তর দেবার জন্যে মোট সময় 3 মিনিট। ঐ সময়ের মধ্যে যতগুলি প্রশ্নের উত্তর ঠিক হবে, সেই হিসাবে রসায়নে তোমার পারদর্শিতা সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যেতে পারে। সঠিক উত্তরের সংখ্যা 6, 5, 4, 3, 2, 1 বা 0 হলে পারদর্শিতা যথাক্রমে খুব বেশী, বেশী, একটু বেশী, চলনসই, একটু কম, কম বা খুব কম।

1. কোন্ মৌলটি সবচেয়ে সক্রিয় ?
   (ক) ফ্লোরিন
   (খ) ক্লোরিন
   (গ) ব্রোমিন
   (ঘ) আয়োডিন
2. অ্যামোনিয়ার জলীয় দ্রবণে ফেনল্‌ফ্‌থ্যালিন মেশালে দ্রবণটি কোন্ রঙের হয় ?
   (ক) লাল
   (খ) নীল
   (গ) সবুজ
3. কোন্ ধরণের লোহায় কার্বনের ভাগ সবচেয়ে কম ?
   (ক) কাঁচা লোহা
   (খ) পেটা লোহা
   (গ) ইস্পাত
4. কাঁসার প্রস্তুতিতে কোন্ কোন্ ধাতু ব্যবহৃত হয় ?
   (ক) টিন ও দস্তা
   (খ) দস্তা ও তামা
   (গ) তামা ও টিন
5. কোন্ দুটি অ্যাসিডের মিশ্রণে 'অ্যাকোয়া রিজিয়া' তৈরি হয় ?
   (ক) সালফিউরিক অ্যাসিড ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড
   (খ) হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ও নাইট্রিক অ্যাসিড
   (গ) নাইট্রিক অ্যাসিড ও সালফিউরিক অ্যাসিড
6. হাইড্রোজেনের আণবিক ভার কত ?
   (ক) 1·008
   (খ) 2·016
   (গ) 4·032

(উত্তর—746 পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত ও জয়ন্ত বসু*

* সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা—9

জিওর্দানো ব্রুনো

আদালত গৃহের মধ্যে দাঁড়িয়ে সেই নির্ভীক জ্ঞানতপস্বী চার্চের বিচারকদের উদ্দেশ্যে বললেন—তোমরা আমার বিচার করছ বটে, অথচ ভয় পেয়ে গেছ দেখছি তোমরাই—এই ঘোষণা ছিল সত্য। তখনকার দিনে ইউরোপের অনেক দার্শনিক এবং বিজ্ঞানীই বিশ্বের চিরসত্য আবিষ্কারের অপরাধে মধ্যযুগীয় চার্চের বলি হয়েছিলেন। কিন্তু সেদিনকার বহু অনাবিষ্কৃত সত্যের রহস্য উদ্ঘাটনে যাঁরা অগ্রসর হয়েছিলেন, তাঁদের মত ছিল অভ্রান্ত ও প্রগতিশীল। কিন্তু মধ্যযুগীয় চার্চের মতবাদ ছিল ক্ষয়িষ্ণু। নতুন নতুন মতবাদ দেখে সেদিনকার চার্চের কর্তাব্যক্তিরা হয়েছিলেন শঙ্কিত এবং ক্রুদ্ধ। বুঝেছিলেন পুরনো কুসংস্কারাচ্ছন্ন মতবাদ দিয়ে মানুষকে আর বেশী দিন ভাওতা দেওয়া যাবে না। তাই ধ্বংস এবং পরাজয় আসন্ন বুঝেই প্রগতির নিশানবাহক সেই সব মনীষীদের হত্যা করে জিততে চেয়েছিলেন চার্চের কর্তারা।

চার্চের ঘৃণ্য চক্রান্তে পড়ে ইউরোপের যে সব বিজ্ঞানী, দার্শনিক মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তাঁদের ভিতর জ্যোতিবিজ্ঞানী জিওর্দানো ব্রুনো ছিলেন অন্যতম।

1547 সালে ইটালীর ভিনিস নগরীর নোলা শহরে জিওর্দানো ব্রুনো জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র পনেরো বছর বয়সেই তিনি ডোমিনিসিয়ার প্রজাতন্ত্রের নাগরিকত্ব লাভ করেন।

ব্রুনো মনেপ্রাণে কোপারনিকাসের মতবাদ গ্রহণ করেছিলেন, যদিও কোপারনিকাসের সঙ্গে ব্রুনোর কোন ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না। কোপারনিকাস ছিলেন এক প্রতিষ্ঠাবান যাজক আর ব্রুনো ছিলেন এক ভবঘুরে সাধু। তাঁর চরিত্র ছিল সরল, প্রাণে অফুরন্ত উৎসাহ আর উদ্দীপনা থাকায় তিনি দ্বিধা-শঙ্কা বলে কিছু জানতেন না এবং সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্যে জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করতেন। লেখাপড়া শেষ করেই ব্রুনো প্রচলিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আপন মত প্রচার করতে সুরু করেন। বাইবেলের অবৈজ্ঞানিক ধারণাগুলি আজগুবী বলে ঘোষণা করলেন। তবে এর প্রতিক্রিয়া ঘটতে দেরী হলো না। রোমান ক্যাথলিক ধর্মমতের সম্বন্ধে কেউ অবিশ্বাস পোষণ করলে ইনকুইজিসন নামে এক বিশেষ বিচারালয়ে তাদের বিচার করা হতো। ব্রুনোর বিরুদ্ধেও তারা গ্রেপ্তারী পরয়ানা জারী করলো। তিনি একথা জানতে পেরে ইটালী ত্যাগ করে প্রথমে গেলেন লিয়নস্, তারপর তুঁলো। মন্টপেলিয়ার ও প্যারিস প্রভৃতি ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপনা করে দিন কাটাতে লাগলেন। শেষে 1583 খৃষ্টাব্দে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন এবং এখানেই তিনি তিনখানা বই প্রকাশ করে বিশ্ববাসীকে নিজের মতবাদ জানান। তাঁর

মতে, ঈশ্বর অসীম ও তাঁর সৃষ্ট এই বিশ্বও অসীম। তিনি কেবল একটা পৃথিবী সৃষ্টি করেন নি, বিশ্বে তিনি বহু সৌরজগতের সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেকটি সৌরজগতের কেন্দ্রেই আছে সূর্যের মত এক-একটি নক্ষত্র। এর ফলে তিনি সৌরকেন্দ্রিক তত্ত্বকে নাড়া দিলেন। পূর্বমত ছিল সূর্য বিশ্বের কেন্দ্র। জিওর্দানো বললেন—বিশ্ব অসীম, তার কেন্দ্রে বা প্রান্তে কেউ আছে বলা অর্থহীন। ব্রুনোর জ্যোতির্বিদ্যা ও দর্শনের মত ছিল প্রগতিবাদী, ফলে এই মতবাদ বাইবেলীয় ধারণা প্রচারে প্রত্যক্ষভাবে আঘাত হানলো। চার্চের কর্তারা হলেন ভয়ানক ক্রুদ্ধ।

1593 খৃষ্টাব্দে ব্রুনো লুকিয়ে লণ্ডন থেকে ইটালীতে ফিরে এলেন। ইনকুইজিসন পেয়ে গেলেন খবর। অল্প দিনের মধ্যেই গ্রেপ্তার হলেন ব্রুনো। দীর্ঘ সাত বছর ধরে তার উপর চললো নির্যাতন, কিন্তু একচুলও নিজ মত থেকে নড়লেন না তিনি। এবার বিচারের ব্যবস্থা করলো ইনকুইজিসন। বিচার নয় প্রহসন। আসামী নিজেকেই নির্দোষ প্রমাণের চেষ্টা করতো। আসামীর সাক্ষীদেরও নির্যাতিত হতে হতো বলে কেউ সাক্ষ্য দিত না। আসামীরা উকীল নিযুক্ত করবার অধিকার পেলেও ভয়ে কোন উকীল তাদের পক্ষ সমর্থন করতো না। ব্রুনো মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলেন।

খৃষ্টধর্ম প্রেমের ধর্ম, তাই ব্রুনোকে বিনা রক্তপাতে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া হলো; অর্থাৎ বিচারকেরা তাঁকে পুড়িয়ে মারবার আদেশ দিলেন। 1604 খৃষ্টাব্দে ব্রুনোকে প্রকাশ্য রাজপথে চিতায় পুড়িয়ে হত্যা করা হলো।

ব্রুনোকে হত্যা করা হলো সত্য, কিন্তু কনো কর্তৃক প্রবর্তিত সত্যকে কেউ হত্যা করতে পারলো না। রাণী এলিজাবেথের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডক্টর উইলিয়াম গিলবার্ট ব্রুনোর বিশ্বচিত্রকে গ্রহণ করে দেশ-বিদেশে প্রচার করতে লাগলেন।

ব্রুনো আজও অমর সত্যের মধ্যে, বিজ্ঞানের মধ্যে, তাঁর মতবাদের মধ্যে।

অনুপ রায়

হীরকের কথা

হীরক কি এবং প্রকৃতপক্ষে এর মূল উপাদান কি? এই প্রশ্নের উত্তর অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকদের জানা ছিল না। সর্বপ্রথম বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সার আইজাক নিউটন বললেন যে, সাধারণ কাঠকয়লার মতই হীরক একটি দাহ্য পদার্থ। তাঁর কথা শুনে সে যুগের লোকেরা কেউ একথা বিশ্বাস করে নি। অবশ্য অবিশ্বাস করবার মত কথাই বটে—মহামূল্য রত্ন হীরক কিনা সাধারণ কাঠকয়লার মতই দাহ্য পদার্থ! অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রখ্যাত রসায়ন-বিজ্ঞানী ল্যাভয়সিঁয়ে (ফ্রান্স) বাস্তব পরীক্ষায় প্রমাণ করে দেখালেন যে, নিউটনের পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত এবং হীরকের সঙ্গে সাধারণ অঙ্গার বা কার্বনের মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। ল্যাভয়সিঁয়ে একখণ্ড হীরককে পুড়িয়ে দেখলেন এবং একমাত্র কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ছাড়া আর কিছুই পেলেন না। 1814 সালে সার হামফ্রি ডেভি এবং তাঁর ছাত্র মাইকেল ফ্যারাডে ইটালির ফ্লোরেন্স শহরে হীরকখণ্ডের দহনে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না, তা পরীক্ষা করে দেখালেন এবং সমবেত জনসাধারণের সামনে প্রমাণ করলেন যে, হীরক কার্বনের রূপভেদ ছাড়া আর কিছুই নয়। এরপর আর বিশ্বাস করতে অসুবিধা রইলো না যে, কয়লা, গ্র্যাফাইট, হীরক প্রভৃতি একই মৌলিক পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন বাহ্যিক রূপ। এখন সাধারণ-ভাবে একটা প্রশ্ন এসে পড়ে। তা হলো—কি কারণে একই মৌলিক পদার্থ সম্পূর্ণ বিভিন্ন বাহ্যিক রূপে প্রকাশিত হয়? এর কারণ হলো কার্বন-পরমাণুর বিভিন্ন সজ্জা মৌলিক পদার্থটিকে বিভিন্ন রূপ দিয়ে থাকে। হীরকে কার্বন-পরমাণুর সজ্জা এমনই যে, হীরক একটি সুন্দর অষ্টতল স্ফটিকরূপে প্রকাশিত, কিন্তু গ্র্যাফাইট বা সাধারণ কয়লায় পরমাণু-সজ্জা অনুরূপ নয়। শুধুমাত্র পরমাণু-সজ্জার বৈচিত্র্যের জন্যেই একটি মহামূল্য রত্ন আর অপরটি সস্তা জ্বালানী।

ভারতবর্ষের গোলকুণ্ডা, ব্রেজিল, রাশিয়ার ইউরাল পর্বতমালা, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে খনিজ পদার্থরূপে হীরক পাওয়া যায়। দক্ষিণ আফ্রিকায় হীরক অন্যান্য পাথরের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। এই হীরক-মিশ্রিত পাথরগুলিকে বাইরের জল-বাতাসে ফেলে রাখা হয়, ফলে পাথরগুলি ছোট ছোট টুকরায় ভেঙ্গে যায় এবং পরে টুকরাগুলিকে যান্ত্রিক উপায়ে আরো ছোট করা হয়। এর পর টুকরাগুলিতে জল মিশিয়ে একটি চর্বি-মাখানো মসৃণ টেবিলের উপর দিয়ে প্রবাহিত করলে অপেক্ষাকৃত ভারী হীরকখণ্ডগুলি চর্বিতে আটকে যায়। এভাবে হীরককে খনিজ অবস্থা থেকে নিষ্কাশন করা হয়। আমাদের দেশে কোন

কোন নদীতীরের বালির সঙ্গে হীরক মিশ্রিত থাকে। সেগুলিকেও ঐ উপায়ে নিষ্কাশিত করা হয়।

আগেই বলেছি, বিশুদ্ধ হীরকখণ্ড একটি অষ্টতল স্ফটিক এবং স্বচ্ছ ও বর্ণহীন। হীরকের সঙ্গে অবিশুদ্ধ পদার্থ মিশ্রিত থাকবার ফলেই হীরক বিভিন্ন বর্ণের হয়ে থাকে। এই হীরকের টুক্‌রাগুলিকে সুকৌশলে কেটে মহামূল্য রত্নে পরিণত করা হয়। টুক্‌রা-গুলিকে কাটবার উপর এদের ঔজ্জ্বল্য নির্ভর করে। পৃথিবীর মধ্যে শুধু হল্যাণ্ডে হীরক কাটবার ব্যবসায় আছে।

একটি বিশেষ এককের সাহায্যে হীরকের ওজন নির্ণয় করা হয়। এই একক হলো ক্যারেট এবং এক ক্যারেট $\frac{1}{5}$ গ্র্যামের সমান। সবচেয়ে ভারী হীরক হলো কুলিয়ান, এর ওজন 3032 ক্যারেট অর্থাৎ প্রায় 606 গ্র্যাম। এছাড়া কোহিনূর হীরকের ওজন 186 ক্যারেট। হীরক পৃথিবীতে সবচেয়ে কঠিন মৌলিক পদার্থ। বোয়ার্ট নামে কালো রঙের এক প্রকার হীরক আছে, রত্ন হিসেবে এর কোন মূল্য নেই, কিন্তু কাচ কাটবার কাজে, পাথর কাটবার যন্ত্রে এবং পালিশের কাজে এই হীরক ব্যবহৃত হয়।

এ তো গেল খনিজ হীরকের কথা। হীরকের দুষ্প্রাপ্যতা এবং শিল্প-জগতে এর চাহিদার জন্যে কৃত্রিম উপায়ে হীরক নির্মাণের চেষ্টা সুরু হয়। গত শতাব্দীর শেষের দিকে বহু বৈজ্ঞানিক রসায়নগারে হীরক প্রস্তুতির জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। বৈজ্ঞানিকদের চেষ্টা ছিল, কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সাধারণ কয়লাকে হীরকের স্ফটিকে রূপান্তরিত করা। তাঁরা স্ফটিকীকরণের সাধারণ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু সমস্যা হলো, কয়লার দ্রবণ প্রস্তুত করা, কারণ কয়লা জল বা অন্য কোন তরল পদার্থে দ্রবীভূত হয় না। কয়লা অতি উচ্চ চাপ ও উষ্ণতায় এবং সম্পূর্ণ বায়ুশূন্য স্থানে তরলীকৃত লোহায় দ্রবীভূত হয়। এই দ্রবণকে পরে ঠাণ্ডা করলে ছোট ছোট হীরকের স্ফটিক পাওয়া যায়। 1879 সালে বৃটিশ বৈজ্ঞানিক জে. বি. হ্যানয় সর্বপ্রথম অনুরূপ পদ্ধতিতে হীরক সংশ্লেষণে সাফল্য লাভের দাবী করেন। পরবর্তী কালে 1890 সালে ফ্রান্সের রসায়ন-বিজ্ঞানী হেনরী ময়সানও কৃত্রিম উপায়ে হীরক প্রস্তুতে সাফল্য লাভ করেন। হ্যানয় বা ময়সান কর্তৃক প্রদর্শিত প্রক্রিয়ায় সংশ্লেষিত হীরক কিন্তু খনিজ হীরক অপেক্ষা মোটেই সুলভ হলো না—তার সুস্পষ্ট কারণ হলো নির্মাণ-ব্যয়ের প্রাচুর্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলবার সময় জার্মেনীর প্রখ্যাত রসায়ন-বিজ্ঞানী রুন্‌টে, গ্যাসেল এবং রেবেন্‌টিস্ক কৃত্রিম উপায়ে হীরক সংশ্লেষণের জন্যে বহু গবেষণা করেও ব্যর্থ হন।

প্রকৃতপক্ষে 1955 সালের ফেব্রুয়ারী মাসে নিউইয়র্কের জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী সর্বপ্রথম ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কৃত্রিম হীরক উৎপাদনের কথা ঘোষণা করেন। উক্ত সংস্থা অঙ্গার-সমন্বিত পদার্থকে প্রতি বর্গইঞ্চিতে দেড়লক্ষ পাউণ্ড চাপ প্রয়োগ করে এবং পাঁচ হাজার ডিগ্রী ফারেনহাইট উষ্ণতায় উত্তপ্ত করে কৃত্রিম হীরকের স্ফটিক প্রস্তুতে সক্ষম হন।

প্রাকৃতিক হীরক অপেক্ষা এসব কৃত্রিম হীরকের মূল্য বেশ কিছুটা কম পড়ে। এখন একটা প্রশ্ন উঠতে পারে—প্রাকৃতিক হীরক এবং কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত হীরকের গুণ বা ধর্মের কোন তারতম্য আছে কি না? তারতম্য যা আছে, তা হলো তাদের আকার, গঠন-প্রকৃতি ও তাদের মধ্যে অন্য অবিশুদ্ধ পদার্থের অবস্থিতিতে। কৃত্রিম সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে এখনো খনিজ হীরকের মত অত বড় স্ফটিক পাওয়া সম্ভব হয় নি। কাজেই অলঙ্কারে কৃত্রিম হীরকের মত অত ক্ষুদ্র স্ফটিক ব্যবহৃত হয় না। হীরক কিন্তু শুধুমাত্র অলঙ্কারের শোভা-বর্ধনেই ব্যবহৃত হয় না; শিল্পজগতে, বিশেষ করে যুদ্ধাস্ত্রের উপকরণ নির্মাণে হীরক ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। কৃত্রিম উপায়ে বৃহত্তর হীরকের স্ফটিক প্রস্তুতির জন্যে এখনো ব্যাপক গবেষণা চলছে।

শ্রীজ্যোতির্ময় দুই

উত্তর

(পারদর্শিতার পরীক্ষা)

1. (ক)

2. (ক)

[প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, লাল দ্রবণটি খোলা বাতাসে রেখে দিলে অ্যামোনিয়া উবে যাওয়ায় লাল রং অদৃশ্য হয়। এজন্যে এই লাল রংকে ভ্যানিশিং কালার বা ম্যাজিক রং বলা হয়।]

3. (খ)

[কাঁচা লোহায় কার্বন থাকে শতকরা 2.2—4.5 ভাগ, পেটা লোহায় শতকরা 0.12—0.25 ভাগ এবং ইস্পাতে শতকরা 0.25—1.5 ভাগ।]

4. (গ)

[শতকরা 80 ভাগ তামা ও 20 ভাগ টিনের সংমিশ্রণে কাঁসা প্রস্তুত হয়।]

5. (খ)

[তিন বা চার ভাগ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ও এক ভাগ নাইট্রিক অ্যাসিডের মিশ্রণে 'অ্যাকোয়া রিজিয়া' তৈরি হয়।] $3HCl + HNO_3$ concentrated

6. (খ)

[হাইড্রোজেন অণুতে দুটি পরমাণু থাকে। ঐ দুটির পারমাণবিক ভারের যোগফল হচ্ছে হাইড্রোজেনের আণবিক ভার।

$$\text{এখন, পারমাণবিক ভার} = \frac{\text{উপাদানের একটি পরমাণুর ভার} \times 16}{\text{অক্সিজেনের একটি পরমাণুর ভার}}$$

এই হিসাবে হাইড্রোজেনের পারমাণবিক ভার হলো 1.008; সুতরাং হাইড্রোজেনের আণবিক ভার = 2×1.008 = 2.016]

ভ্রম সংশোধন :—নভেম্বর'71 সংখ্যার 690 পৃষ্ঠায় 5131 কিলোমিটার ও 330 কিলোমিটারের স্থলে 'মিটার' হবে।

সেলুলোজ

সেলুলোজ হলো এক ধরণের কার্বোহাইড্রেট, যা উদ্ভিদ-কোষের প্রাচীর গঠন করে পেক্‌টিন নামক কিছু জৈব পদার্থের সঙ্গে। এই শক্ত আর মৃত কোষ-প্রাচীর উদ্ভিদ-কোষের মধ্যেকার প্রোটোপ্লাজমকে ধরে রাখে। কার্বোহাইড্রেট হচ্ছে কার্বন, অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন মিলিত এক ধরণের যৌগ। কার্বোহাইড্রেটে কার্বনের সঙ্গে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন সব সময় 2 : 1 অনুপাতে থাকে। চাল, গম, ভুট্টা, বাঁশ, খড় ইত্যাদির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট পাওয়া যায়।

উদ্ভিদ সূর্যালোকে তার পাতার ক্লোরোফিলের সাহায্যে বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং জলীয় বাষ্প শোষণ করে প্রথমে ফরম্যালডিহাইড এবং ক্রমশঃ শর্করা, ষ্টার্চ এবং সবশেষে সেলুলোজ গঠন করে। সেলুলোজ নিষ্ক্রিয় পদার্থ। তরল ক্ষার বা অ্যাসিড, ক্লোরিন প্রভৃতি পদার্থের সঙ্গে সেলুলোজ কোন বিক্রিয়া করে না বলে ফিল্টার কাগজ তৈরি করতে এই সেলুলোজ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। সেলুলোজ অ্যাসিড বা ক্ষারে নিষ্ক্রিয় বলে সাধারণ তুলা বা পাটের আঁশ লঘু অ্যাসিড বা ক্ষারে দ্রবীভূত করলে বিশুদ্ধ সেলুলোজ পাওয়া যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, তুলার বেশীর ভাগ অংশই হলো সেলুলোজ।

বর্তমানে সেলুলোজ আমাদের যে কত কাজে লাগে, তা বলে শেষ করা যায় না। কাপড়, কাগজ, মারসিরাইজড্ কাপড় বা তুলা, নাইট্রোসেলুলোজ জাতীয় বিস্ফোরক, কৃত্রিম সিল্ক, সেলুলয়েড প্রভৃতি পদার্থে সেলুলোজ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। যে সব জিনিষের নাম করলাম, তার কয়েকটা সম্বন্ধে আলোচনা করছি।

কাগজ প্রস্তুতি—উদ্ভিদের সেলুলোজ থেকে কাগজ প্রস্তুতির আধুনিক পদ্ধতি প্রথম আবিষ্কৃত হয় চীনে। ঘাস, খড়, কাঠ প্রভৃতি পদার্থ সেলুলোজে পরিপূর্ণ। তাই ঘাস, খড়, কাঠ প্রভৃতি পদার্থকে টুকরা টুকরা করে কেটে কষ্টিক সোডার সঙ্গে মিশিয়ে উত্তপ্ত করলে সেলুলোজের সঙ্গে মিশ্রিত লিগনিন নিষ্কাশিত হয়ে যায় এবং উৎপন্ন বিশুদ্ধ সেলুলোজের তন্তুগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এবারে এই সেলুলোজকে ব্লিচিং পাউডার বা অন্য কোন পদার্থ মিশিয়ে বিরঞ্জিত করা হয়। এই বিরঞ্জিত সেলুলোজ তন্তুর সঙ্গে মেশানো হয় অ্যালাম, সাবান ইত্যাদি সাইজিং পদার্থ। এখন এই বিচ্ছিন্ন সেলুলোজ তন্তুর ছিদ্রগুলি ভরবার জন্যে কিছু পূরক (জিপ্‌সাম বা চীনামাটি) মেশানো হলে যে সেলুলোজের মণ্ড পাওয়া যায়, তা রোলারের সাহায্যে পিষে নিলে অতি উৎকৃষ্ট কাগজ পাওয়া যায়। সাইজিং পদার্থ মেশাবার আগে বিরঞ্জিত মণ্ডকে যদি অর্ধঘন

সালফিউরিক অ্যাসিডে ডুবিয়ে রাখা যায়, তবে এক রকম অর্ধস্বচ্ছ কাগজ পাওয়া যায়। ওই কাগজই হলো পার্চমেন্ট পেপার, যা টাকা তৈরি বা দলিল প্রভৃতি লেখবার জন্যে ব্যবহৃত হয়। আবার পূরক না মিশিয়ে যে কাগজ পাওয়া যায়, তা হলো ফিল্টার পেপার।

কৃত্রিম সিল্ক—সেলুলোজ ইথার ও অ্যালকোহলের দ্রবণে মেশালে যে ঘন আঠালো পদার্থ পাওয়া যায়, তা সূক্ষ্ম ছিদ্রের মধ্য দিয়ে বায়ুতে চালালে যে সূক্ষ্ম তন্তু পাওয়া যায়, সেই তন্তুকে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোসালফাইডে ভিজিয়ে নিলেই কৃত্রিম সিল্ক বা রেয়ন উৎপন্ন হয়। বর্তমানে বস্ত্রশিল্পে এর চাহিদা খুব বেশী। সূক্ষ্ম ছিদ্রের বিভিন্ন রকম পরিবর্তন করে বিভিন্ন শ্রেণীর রেয়ন প্রস্তুত করা হয়।

মারসিরাইজ্‌ড্‌ কাপড়—ঘন ক্ষারীয় দ্রবণে যদি কোন সূতির কাপড় ভেজানো যায়, তবে সূতার সেলুলোজগুলি ফুলে গোলাকৃতির তন্তুতে পরিণত হয় এবং সূতির কাপড় এক অদ্ভুত দীপ্তি লাভ করে—ঠিক সিল্কের কাপড়ের মত দেখায়। এগুলি সূতির কাপড়ের চেয়ে অনেক টেকসই। জন মার্সার নামে জনৈক রাসায়নিক প্রথম এটি আবিষ্কার করেন বলেই তাঁর নাম অনুযায়ী এই কাপড়ের নাম হয়েছে মারসিরাইজ্‌ড্‌ কাপড়। অনুরূপভাবে তুলাকে (কার্পাস) মারসিরাইজ্‌ড্‌ তুলায় রূপান্তরিত করা যায়।

সেলুলোজের সাহায্যে বিস্ফোরক দ্রব্য তৈরি করা যায়, সে কথা আগেই বলেছি। সেলুলোজকে অ্যাসিড (নাইট্রিক) মিশ্রণে নিম্নতাপে অনেকক্ষণ রাখলে এক বিশেষ ধরণের নাইট্রোসেলুলোজের উৎপত্তি হয়, যার নাম গান-কটন। এই গান-কটন দিয়ে বন্দুকের বারুদ তৈরি হয়। এই জাতীয় নাইট্রোসেলুলোজ নাইট্রোগ্লিসারিনের সঙ্গে মেশালে করডাইট জাতীয় বিস্ফোরক তৈরি হয়।

সেলুলোজকে কর্পূর ও অ্যালকোহলের সঙ্গে উচ্চচাপে মিশ্রিত করলে এক ধরণের প্লাষ্টিক তৈরি হয়, যার নাম সেলুলয়েড। এই সেলুলয়েড ছাঁচে ফেলে ফিল্ম, চিরুনী, ফাউন্টেন পেন ইত্যাদি অনেক জিনিষ তৈরি করা যায়। সেলুলয়েড খুবই দাহ্য পদার্থ।

এভাবে সেলুলোজ দিয়ে আরও অনেক পদার্থ তৈরি করা যায়। তাই সেলুলোজ শুধু উদ্ভিদের কোষ-প্রাচীরেই নয়, পরোক্ষভাবে আমাদের জীবনযাত্রায় অনেক সহায়তা করছে।

শ্রীচন্দন মুখোপাধ্যায়

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন 1. : ক) বিদ্যুৎ চম্‌কানো কি? এর অন্তর্নিহিত পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই।

খ) বিদ্যুৎ চম্‌কানোর পর মেঘের যে ভীষণ গর্জন শোনা যায়, তার কারণ কি?

দিলীপকুমার গিরি, ঘুশুড়ী, হাওড়া
দীপঙ্কর চক্রবর্তী, আগরতলা

প্রশ্ন 2. : কোঁচকানো জামাকাপড় গরম ইস্ত্রির দ্বারা ঘষলে টান হয়, কিন্তু ঠাণ্ডা ইস্ত্রির দ্বারা ঘষলে হয় না কেন?

ঊর্মিলা দাশগুপ্ত, চড়কডাঙ্গা, কলিকাতা-10

উত্তর 1. : ক) বিদ্যুৎ চম্‌কানো হচ্ছে মেঘ ও পৃথিবীর মধ্যে অথবা মেঘে মেঘে তড়িৎ-মোক্ষণের ফল। পরস্পর বিপরীত তড়িৎ-ধর্মী মেঘ যখন কাছাকাছি আসে, তখন এদের মধ্যে দূরত্বের যথেষ্ট ব্যবধান থাকা সত্বেও এরা উচ্চ বিভববিশিষ্ট হবার দরুণ কিছু আধান এদের অন্তর্বর্তী মাধ্যমের ভিতর দিয়ে এক মেঘ থেকে অন্য মেঘে যাতায়াত করে। এর ফলে প্রায় 1 অ্যাম্পিয়ারের মত তড়িৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হয়। তখন একই পথে অধিক মাত্রায় আধান প্রবাহিত হতে থাকে। একে বলা হয় লীডার স্ট্রোক। এর ফলে তড়িৎ-প্রবাহের মাত্রা হয় প্রায় 10^3 অ্যাম্পিয়ার। এই লীডার স্ট্রোক অপর মেঘে পৌঁছানোমাত্রই ঐ পথে বিপরীত মুখে অপর মেঘ থেকে সমস্ত আধান প্রথম মেঘের দিকে প্রবাহিত হয়। একে বলা হয় রিটার্ন স্ট্রোক। এই প্রক্রিয়ায় তড়িৎ-প্রবাহের মাত্রা হয় প্রায় 10^4 থেকে 10^5 অ্যাম্পিয়ারের মত। তড়িৎ-মোক্ষণের তীব্রতা রিটার্ন স্ট্রোকেই সবচেয়ে বেশী। এই সময় যে আলোকের উৎপত্তি হয়, পৃথিবী থেকে আমরা তাকেই বিদ্যুৎ চম্‌কানো বলে থাকি। মেঘ ও পৃথিবীর বেলাতেও একই পদ্ধতি কার্যকরী হয়।

খ) তড়িৎ-মোক্ষণের সময় পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রচুর তাপের সৃষ্টি হয়। এই তাপের প্রভাবে বাতাসের মধ্যে হঠাৎ অধিক মাত্রায় সঙ্কোচন ও প্রসারণ সুরু হয়ে যায়। ফলে প্রচণ্ড শব্দের উৎপত্তি হয়, যা আমরা পৃথিবী থেকে শুনি এবং মেঘের গর্জন বলে জানি।

উত্তর 2. : কোঁচকানো জামাকাপড় যখন ঠাণ্ডা ইস্ত্রির দ্বারা ঘষা হয়, তখন জামাকাপড়ের উপর শুধুমাত্র চাপই প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু গরম ইস্ত্রি প্রয়োগে জামাকাপড় একই সঙ্গে চাপ ও তাপের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। কোঁচকানো অবস্থায়

জামাকাপড়ের মধ্যেকার সুতার স্থিতিস্থাপকতা ধর্ম ঠাণ্ডা ইস্ত্রি প্রয়োগে, সাধারণতঃ পুরাপুরি নষ্ট হয় না। কিন্তু চাপ এবং তাপের প্রভাবে এই ধর্ম নষ্ট হয়ে যায়, ফলে জামাকাপড় টান হয়। ঠাণ্ডা ইস্ত্রি প্রয়োগের পর সুতার স্থিতিস্থাপকতা বজায়-থাকায় জামাকাপড় আবার কুঁচকে যায়।

শ্যামসুন্দর দে*

* ইনস্টিটিউট অব রেডিও-ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স ; বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-9

বিবিধ

গোখরোর বিষে ক্যান্সার সারতে পারে

নয়াদিল্লী থেকে সম্প্রতি ইউ. এন. আই. কর্তৃক প্রচারিত সংবাদে প্রকাশ—যে গোখরো সাপের কামড়ে মানুষের মৃত্যু হয়, সেই গোখরো সাপের বিষই এখন মানুষের মারাত্মক ব্যাধি ক্যান্সার নিরাময়ে লাগতে পারে।

বোম্বাইয়ের ক্যান্সার রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে, কোন কোন জাতের ক্যান্সার নিরাময়ে গোখরো সাপের বিষ ফলপ্রদভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

ইনষ্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা গোখরো সাপের বিষ থেকে একরকম নির্বিষ (নন-টক্সিক) প্রোটিন পৃথক করতে পেরেছেন, যা কোন কোন ক্যান্সার নিরাময় করতে পারে।

টেষ্ট-টিউবে এবং জীবজন্তুর দেহে ক্লিনিক্যাল পরীক্ষায় এই গোখরো-প্রোটিন ব্যবহার করে উৎসাহব্যঞ্জক ফল পাওয়া গেছে বলে তাঁরা জানিয়েছেন।

গোখরোর বিষ থেকে বিষাক্ত প্রোটিন পৃথক করবার পর এই ক্যান্সার নিরাময়-কারী গোখরো-প্রোটিন আবিষ্কৃত হয়েছে। গোখরোর কামড়ে যে মৃত্যু হয়, তা এই বিষাক্ত প্রোটিনের জন্তে। গোখরোর বিষ থেকে প্রাণঘাতী প্রোটিনগুলি দূর করা হলে—অবশিষ্ট অংশে খুব সামান্যই বিষ থাকে। বিষের এই অবশিষ্ট অংশ থেকেই ক্যান্সার নিরাময়কারী নির্বিষ প্রোটিন পৃথক করা হয়।

বোম্বাইয়ের ক্যান্সার রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, এই নির্বিষ প্রোটিন সাধারণ কোষগুলিকে ছেড়ে দিয়ে কেবল টিউমার সেলগুলি ধ্বংস করে ক্যান্সার নিরাময় করে।

প্রোটিন যখন বেছে বেছে টিউমার-কোষের ঝিল্লীর উপর আক্রমণ চালায়, তখন এই সব কোষ ধ্বংস হয়।

গোখরোর প্রোটিনের এই নির্বিষ আচরণ ক্যান্সার কোষের ঝিল্লীর পরীক্ষার সম্ভাবনাও উন্মুক্ত করে দিয়েছে। ক্যান্সার কোষের ঝিল্লী সাধারণ কোষের ঝিল্লী থেকে স্বতন্ত্র।

প্রধান সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।